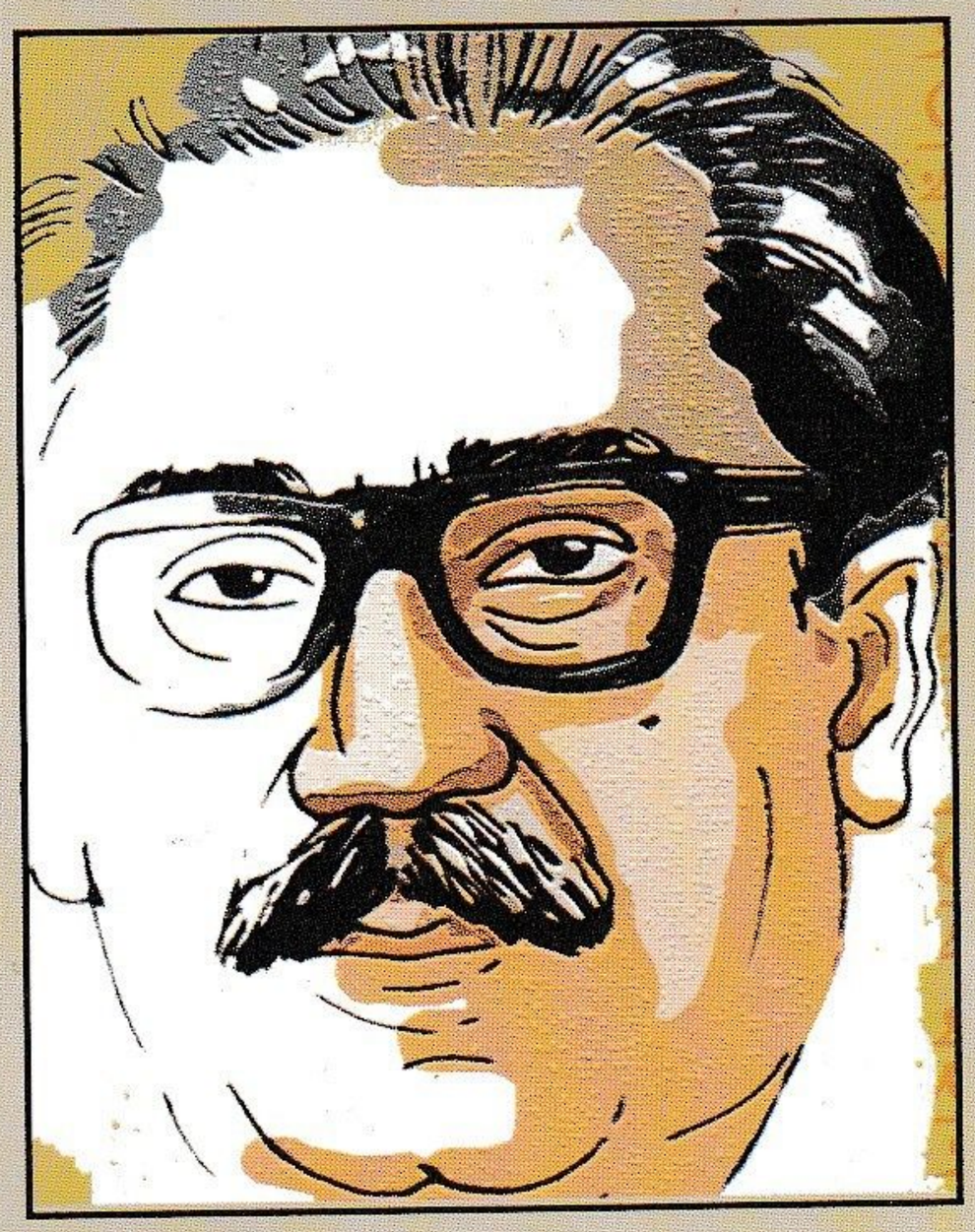
স্বাধীনতার মহানায়ক

এম আর এ তাহা





প্রচ্ছদ : নিয়াজ চৌধুরী তুলি

স্বাধীনতার মহানায়ক

স্বাধীনতার মহানায়ক

এম আর এ তাহা

ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ

স্বাধীনতার মহানায়ক

এম আর এ তাহা

স্বত্ব
লেখক

দ্বিতীয় মুদ্রণ
এপ্রিল ২০১২

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা ২০০৮

প্রকাশক
ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ
৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২৪৭৬০, ০১৭১৫ ৪২৮২১০, ০১৭১২ ২৩৫৩৪২
e-mail : ittadisutrapat@yahoo.com

প্রচ্ছদ
নিয়াজ চৌধুরী তুলি

অক্ষরবিন্যাস
বন্ধু কম্পিউটার্স

মুদ্রণ
নিউ এস আর প্রিন্টিং প্রেস
৩৪ শ্রীদাস লেন, ঢাকা-১১০০

মূল্য
৩৫০ টাকা

SHADINATAR MOHANAYAK by M R A Taha, Published by Ittadi Grantha Prokash. Price 350 ISBN : 984 850 920 3

উৎসর্গ

আমার প্রিয় পুত্র
শাহ্‌রিয়ার তাহা-কে

ভূমিকা

এ দেশের রাজনীতিতে ঘটে যাওয়া বাহান্নর ভাষা আন্দোলন, যুক্তফ্রন্ট ঘোষিত ২১ দফা, ঐতিহাসিক ৬ দফা, ছাত্রদের ঘোষিত ১১ দফা, স্বাধীনতাযুদ্ধ, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা ইত্যাদি থেকে যাকে অস্বীকার করা যায় না, যার নেতৃত্বে দীর্ঘ সংগ্রামের পর আজকের এই বাংলাদেশ। যিনি কোনোদিন কোনো শক্তির নিকট মাথা নত করেননি, যে নাম শাশ্বত সত্য, যে নাম চিরস্মরণীয়। যার ডাকে হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সকল বাঙালি সাড়া দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন মুক্তিসংগ্রামে, যার কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল অগ্নিঝরা বাণী—

'এবারের সংগ্রাম—মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম—স্বাধীনতার সংগ্রাম'

তিনি অকুতোভয় বীরসেনানী বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁকে ঘিরে এ যাবৎ বহু গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে। যা বাংলাদেশের আর কোনো রাজনৈতিক নেতাকে ঘিরে হয়নি। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে গ্রন্থ রচনা করার ইচ্ছে আমার দীর্ঘদিনের।

শেখ মুজিব এমন একজন ব্যক্তিত্ব যাকে বাদ দিলে বাংলাদেশের ইতিহাস লেখা যাবে না, তেমনি তাঁকে নিয়ে কিছু লিখতে হলে বাংলাদেশ, বাংলাদেশের মানুষ, মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা সবকিছুই ধারাবাহিকভাবে চলে আসে। ১৯৪৭ সাল থেকে শুরু হয় বাংলাভাষার জন্য আন্দোলন। ভাষা আন্দোলন তথা বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলন একদিনের আন্দোলন নয়– বহু দিনের, বহু যুগের। যখন জিন্নাহ সাহেব ঢাকায় এসে ঘোষণা করলেন– 'একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।' ঠিক তখন থেকেই গর্জে ওঠে ছাত্রসমাজ। কেউ মানতে পারেনি এই ঘোষণাকে। তাই তো সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ ওঠে। গঠিত হয় সংগ্রাম পরিষদ।

১৯৪৮ সালের ১১ মার্চকে ঘোষণা করা হয় প্রতিবাদ দিবস হিসেবে। শুরু হয় ছাত্র-জনতার মিছিল, বিক্ষোভ, ধর্মঘট। ফলে সরকারের পুলিশ বাহিনী হাজার হাজার ভাষাকর্মীকে গ্রেফতার করে। শেষ পর্যন্ত ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে সরকার নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয়। উর্দুর সঙ্গে বাংলাও রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পায়। কিন্তু সেটা শুধু কাগজে-কলমে। বাস্তবে নয়। তাই তো শুরু হয় আবারো আন্দোলন। ২৬

জানুয়ারি ১৯৫২। খাজা সাহেব পল্টন ময়দানে এক জনসভায় প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন– একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। তিনি ভেবেছিলেন, পূর্ববাংলার ছাত্রসমাজ হয়তো '৪৮ সালের পর এখন আর উচ্চবাচ্য করবে না। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা সেদিনই বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। আন্দোলন চলতে থাকে। জারি হয় ১৪৪ ধারা। সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের সভায় ১৪৪ ধারা ভাঙার প্রস্তাব পুরোপুরি গৃহীত না হলেও ২১ ফেব্রুয়ারি ভোরে ১৪৪ ধারা ভেঙে ছাত্ররা বেরিয়ে আসে রাজপথে। শুরু হয় পুলিশি নির্যাতন। টিয়ার গ্যাস, লাঠিচার্জ আর গুলি। বেশকিছু ছাত্রছাত্রী গুলিবিদ্ধ হয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ ইমারজেন্সিতে আশ্রয় নিল। হঠাৎ একটি গুলি এসে একটি ছেলের উরু ভেদ করল। মেডিকেল হোস্টেলের শেডের নিচে মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল। রক্তে লাল হয়ে গেল জায়গাটি। ইমারজেন্সিতে নেওয়া হলো তাকে। অসহ্য যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল ছেলেটি। তবুও পাশের একটি ছেলেকে ডেকে বলল, 'আমার বাড়িতে একটু খবর পাঠাবেন। বিষ্ণুপ্রিয়া ভবন...পল্টন লাইন। ছেলেটির নাম বরকত। স্নাতকোত্তর রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র। মুর্শিদাবাদে তাঁর বাড়ি। বাড়িতে রয়েছে তার মা। বরকত এই বাংলার মাটিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল।

বরকত আমার ফুফাতো ভাই। তার স্মৃতি আজও আমার মনে পড়ে। ছাত্রজীবনে সে ছিল অত্যন্ত মেধাবী। বাংলাভাষার জন্য বরকতসহ আরও ক'জন গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেলেন। সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ আরও অনেকে।

বরকতের মা অর্থাৎ আমার ফুফুকে নিয়ে দেখা করতে গিয়েছিলাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে। তখন তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। সেদিন খুব কাছ থেকে তার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হয়েছিল। ঐদিন ছাড়াও আমার সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর আরও কয়েকবার কথা হয়েছে। 'বাংলাভাষা' এবং 'বাংলাদেশ' দুটি শব্দেই বঙ্গবন্ধুর অবদান রয়েছে।

বঙ্গবন্ধু ছাত্রজীবনেই হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং বাংলার বাঘখ্যাত এ কে ফজলুল হকের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন। বলা যায়, তাদের উত্তরাধিকারী হিসেবেই বঙ্গবন্ধুর অবস্থান ছিল। তিনি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নিকট শিখেছেন গণতন্ত্র ও রাজপথের রাজনীতি এবং সশস্ত্র সংগ্রামের শিক্ষা নিয়েছেন সুভাষ বসুর কাছ থেকে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বক্তৃতা দেওয়ার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। বাংলার মানুষ তাঁর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের কথা আজও ভুলতে পারেনি। পাকিস্তানি শাসকদের জেল-জুলুম-অত্যাচার সহ্য করেও বঙ্গবন্ধু তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে চলে। বাঙালি জাতির গণতান্ত্রিক চেতনা ও নৈতিক বল সংহত করেন। '৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর গড়া আওয়ামী লীগই যোগ্য নেতৃত্ব দেন। যার ফলে আমাদের আজকের স্বাধীন বাংলাদেশ।

বিশিষ্ট লেখক মযহারুল ইসলাম তার 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় লিখেছেন– 'ইতিহাসের মূল লক্ষ্য একটি সমাজ ও জাতি– কিন্তু কোনো সমাজে

বা জাতিতে এমন একজন ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে, যার কার্যকলাপ সেই সমাজ বা জাতিকে এক নতুন মাহাত্ম্যে অভিষিক্ত করে– নতুনভাবে আলোড়িত করে– একটি দেশ, সমাজ বা জাতিকে নবজন্ম দান–শেখ মুজিব এমনি এক অসাধারণ ব্যক্তি।'

বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবনকে নিয়ে এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সম্পর্কে এ যাবৎ বহু গ্রন্থ রচনা হয়েছে। এ গ্রন্থ রচনা করতে গিয়ে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত কিছু গ্রন্থ এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা (গ্রন্থপুঞ্জিতে রয়েছে) থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি। চেষ্টা করেছি প্রত্যেকটি ঘটনার মূল্যায়ন এবং বিশ্লেষণ করতে। বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করার পর এ দেশে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তিরা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। তারা বঙ্গবন্ধুর অবদানকে অস্বীকার করে। স্বাধীনতার সঠিক ইতিহাসকে বিকৃত করতে শুরু করে। নতুন প্রজন্মকে ভুলেভরা ইতিহাস জানতে অনেকটা বাধ্য করেছে। আমি চেষ্টা করেছি নতুন প্রজন্ম যেন বইটি পড়ে সঠিক ইতিহাস জানতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে।

আমি দীর্ঘদিন যাবৎ অসুস্থ থাকায় এবং ব্যবসায়িক কাজে ব্যস্ততার কারণে কাজটি করতে গিয়ে অনেক সময় নিতে হয়েছে। এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তৈরি করতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছিল ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ-এর স্বত্বাধিকারী জহিরুল আবেদীন জুয়েল। তিনি আমাকে প্রচুর বই সংগ্রহ করে দিয়েছেন। তার অনুপ্রেরণার কথা ভোলা যায় না। ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ গ্রন্থটি প্রকাশের দায়িত্ব নেওয়ায় তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

এম আর এ তাহা

মহাখালী, ঢাকা

সূচিপত্র

বঙ্গবন্ধুর জন্ম ও বাল্যকাল / ১৩

বঙ্গবন্ধুর বংশ তালিকা / ১৭

বঙ্গবন্ধুর ছাত্রজীবন ও রাজনৈতিক জীবন / ২১

যুক্তফন্ট ঘোষিত ২১ দফা কর্মসূচি / ২৯

আমাদের বাঁচার দাবি ৬ দফা কর্মসূচি / ৩১

ছাত্রদের ১১ দফা / ৪৪

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

মামলার পূর্ণ বিবরণ / ৪৯

অভিযুক্ত ব্যক্তিদের তালিকা / ৭৭

শেখ মুজিবের জবানবন্দি / ৮১

মামলা প্রত্যাহার– শেখ মুজিবের মুক্তিলাভ / ৮৮

বঙ্গবন্ধুর প্রথম বেতার ও টেলিভিশন ভাষণ / ৯১

১২ নভেম্বর প্রাকৃতিক দুযোর্গ ও ১৯৭০-এর নির্বাচন / ১০১

আওয়ামী লীগের ঘোষণাপত্র / ১০৩

অসহযোগ আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনামা / ১২৭

২ মার্চ ১৯৭১ বঙ্গবন্ধুর বিবৃতির পূর্ণ বিবরণ / ১৩৭

৬ মার্চ দৈনিক পাকিস্তানের সম্পাদকীয় / ১৪০

বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ / ১৪৩

৭ মার্চ-এর ভাষণের উত্থাপিত দাবি ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা / ১৪৭

অগ্নিঝরা উত্তাল মার্চের দিনগুলো / ১৫৪
২৫ মার্চ রাতে শেখ মুজিবুর রহমানের গ্রেফতার প্রসঙ্গ / ১৯২
স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র পাঠ ও একটি জাতির জন্ম / ১৯৪
তাজউদ্দীন আহমদের ১৭ এপ্রিল ১৯৭১-এর ভাষণ / ২০৬
১০ জানুয়ারি ১৯৭২ দিলি-র প্যারেড গ্রাউন্ডে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ / ২১৭
১০ জানুয়ারি ১৯৭২ ঢাকায় রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ / ২২০
১১ জানুয়ারি ১৯৭২ রাতে বাংলাদেশ অস্থায়ী শাসনতান্ত্রিক আদেশের পূর্ব বিবরণ / ২২৪
বাংলাদেশের সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ / ২২৬
১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণ / ২২৯
বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ডেভিড ফ্রস্টের সাক্ষাৎকার / ২৩৫
১৯৭২ সালের মে দিবসে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ / ২৪৬
জাতিসংঘে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ / ২৫২
বঙ্গবন্ধুর শাসনের সাড়ে তিন বছর / ২৫৮
১৫ আগস্ট ১৯৭৫ জাতির জনকের মৃত্যু / ২৭৯
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস / ২৮৬
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা / ২৯৬
পরিশিষ্ট / ৩০২
আলোকচিত্র / ৩১৩
গ্রন্থপুঞ্জি / ৩১৯

বঙ্গবন্ধুর জন্ম ও বাল্যকাল

স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, বাঙালি জাতির জনক, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। টুঙ্গিপাড়া গ্রামের কৃতী সন্তান শেখ বংশের উজ্জ্বল রত্ন মঙ্গলবার রাত ৮ ঘটিকায় শেখ পরিবারের শেখ লুৎফর রহমানের ঔরশে এবং সাহেরা বেগমের গর্ভে ভূমিষ্ঠ হন। প্রবাদ আছে, মঙ্গলবারে জন্মগ্রহণকারীরা সাধারণত একরোখা ও জেদি হয়। বঙ্গবন্ধুও অনেকটা সে রকমই হন। তবে তিনি সব সময় অন্যায়ের বিরোধী ছিলেন। নিজে কখনো অন্যায় করতেন না, আর কাউকে করতে দেখলে তা সহ্য করতে পারতেন না।

মাতা-পিতা আদর করে তাঁকে খোকন বলেই ডাকতেন। কিন্তু নানা শেখ আব্দুল মজিদ খোকনের নাম রাখলেন শেখ মুজিবুর রহমান। 'মুজিব' আরবি শব্দ। এর অর্থ উত্তরদান। কুরআন মজিদের সূরা হুদের ৫ম রুকুর শেষ আয়াতে এই শব্দটি বিদ্যমান।

সড়ে সাত কোটি মানুষের প্রাণের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মা-বাবা তাঁকে খুব আদর করতেন। শেখ মুজিব মাতা-পিতার তৃতীয় সন্তান হলেও তিনি ছিলেন প্রথম পুত্রসন্তান। তাই স্বাভাবিকভাবেই তাঁর আদর একটু বেশি। তবে মা-বাবা সব সময় সতর্ক থাকতেন যেন প্রশ্রয় না পায়। সকলের প্রিয়পাত্র মুজিব ছিলেন হ্যাংলা ছিপছিপে, শ্যামলা, লম্বা ও সুশ্রী। স্বপ্নভোজী মুজিব বেতাগা, ডুমুর, মাছ ও কাঁচাকলা ভালোবাসতেন। খাওয়ার প্রতি কখনোই লক্ষ্য ছিল না। তবে তিনি নিরামিষ খুব পছন্দ করতেন। মাছের মধ্যে প্রিয় ছিল– চিংড়ি, কৈ এবং শিং মাছ।

ছোট্টবেলা থেকেই তিনি আবহমান বাংলার আলো-বাতাসে বড় হয়েছেন। গ্রামের অসহায় গরিব-দুঃখী মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না খুব কাছে থেকে দেখেছেন। তৎকালীন জমিদার-মহাজনদের অত্যাচার, শোষণ, নিপীড়ন দেখেছেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি অন্যায়ের প্রতিবাদ করতেন। অন্যায়ের সঙ্গে কখনো আপস করেননি।

বালক শেখ মুজিবের বাল্যশিক্ষা বাড়িতেই শুরু হয় বোনদের সঙ্গে। গৃহশিক্ষক ছিলেন পণ্ডিত সাখাওয়াতুল্লাহ। আগেরকালের পণ্ডিতরা ছাত্রদের শাস্তি দিয়েই পাণ্ডিত্য ফলাতেন। কান ধরে ওঠবস, কান ধরে টানাটানি, নাকে খত দেওয়া ইত্যাদি। কিন্তু সাখাওয়াতুল্লাহ ছিলেন শান্তিপ্রিয় শিক্ষক। বঙ্গবন্ধুর বাবা অবশ্য এসব শাস্তি মোটেই পছন্দ করতেন না।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথমেই টুঙ্গিপাড়ার গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। পিতা শেখ লুৎফর রহমান মাদারীপুর দেওয়ানি আদালতের সেরেস্তাদার ছিলেন। তিনি শেখ মুজিবকে গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়িয়ে মাদারীপুর নিয়ে যান। সেখানে ১৯৩৪ সালে মাদারীপুর ইসলামিয়া হাইস্কুলে ভর্তি করেন চতুর্থ শ্রেণীতে। মাদারীপুর থাকাকালীন বঙ্গবন্ধুর বেরিবেরি রোগ হয় এবং চোখে ছানি পড়ে যায়। ডাক্তারি ভাষায় একে 'গ্লুফুমা' বলা হয়। এদিকে পরের বছরই বঙ্গবন্ধুর বাবা লুৎফর রহমান গোপালগঞ্জে বদলি হন। তাই শেখ মুজিবকেও চলে আসতে হয় গোপালগঞ্জে। এখানে এসে ভর্তি হন পঞ্চম শ্রেণীতে গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে। কিন্তু চোখের সমস্যার কারণে পড়তে অসুবিধা হতে লাগল। তাই দ্রুত তাঁর বাবা তাঁকে নিয়ে কলকাতা মেডিকেল কলেজে যান। সেখানে তৎকালীন বিখ্যাত চক্ষুবিশারদ ডা. টি আহমেদ তাঁর চিকিৎসা শুরু করেন। চোখে শেষ পর্যন্ত অস্ত্রোপচার করতে হলো। ডাক্তার পরামর্শ দিলেন নিয়মিত চশমা ব্যবহার করতে। তখন থেকেই তিনি চশমা পরা শুরু করলেন। চোখের সমস্যার কারণে তিন বছর লেখাপড়া বন্ধ ছিল। তখন তিনি গৃহশিক্ষক হামিদ মাস্টারের নিকট পড়তেন। হামিদ মাস্টার ছিলেন ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী। ত্রিশের দশকে শেখ মুজিব তাঁর গৃহশিক্ষক হামিদ মাস্টার দ্বারা প্রভাবিত হন। যতটুকু জানা যায়, শেখ মুজিবের রাজনীতির প্রথম পাঠটা তার কাছ থেকেই শেখা। রাজনৈতিক কারণে যতবারই শেখ মুজিব গ্রেফতার হয়েছেন তাঁর মা সায়েরা বেগম হামিদ মাস্টারের নাম উচ্চারণ করে কাঁদতেন।

বঙ্গবন্ধু ১৯৩৭ সালে গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হন। তখন মিশন স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন গিরিশ বাবু। তিনি শেখ মুজিবকে খুব ভালোবাসতেন। শেখ মুজিবের সদাহাস্য মুখ, প্রফুল্ল ব্যবহার, বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে সক্রিয় অংশগ্রহণ তাঁকে তাঁর শিক্ষকদের মাঝে তুলে ধরতে সহযোগিতা করছে। মিশন স্কুলে তিনি সকল শিক্ষকের প্রিয় ছাত্রে পরিণত হন। স্কুলজীবনে বিভিন্ন বিষয়ের মাঝে ইতিহাস ছিল তাঁর প্রিয় বিষয়। আর খেলাধুলার মধ্যে ছিল ফুটবল ও ভলিবল। ছেলেবেলা থেকেই শেখ মুজিব ছিলেন একরোখা ও ডানপিটে। ন্যায্য কথা বলতে কখনো কাউকে ছাড়েননি। তাঁর মনে কখনো ভয় স্পর্শ করেনি। স্কুলের ছাত্ররা তাঁকে 'মুজিব ভাই' বলে ডাকতেন। নেতা নেতা ভাব সেই ছোটবেলা থেকেই তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত হতো। তিনি যেখানেই যেতেন অন্য ছাত্ররা তাঁর পিছু পিছু হাঁটতো। স্কুলে পড়া অবস্থায় তাঁর মধ্যে নেতৃত্বের ভাবটা চলে আসে। প্রধান শিক্ষকের নিকট কিছু বলতে হলে তাঁকেই অগ্রগামী হতে হয়।

শেখ মুজিব বাল্যকাল থেকেই দয়ালু। অভাবী লোক তাঁর নিকট হাত পেতে কিছু পাননি এমন নজির নেই। শেখ মুজিব স্কুলে পড়া অবস্থায় ১৯৩৮ সালের ১৬ জানুয়ারি বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরেবাংলা একে ফজলুল হক এবং তাঁর বাণিজ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গোপালগঞ্জ পরিদর্শনে আসেন। এলাকায় সাজসাজ রব। মাইক বাজছে।

স্কুলের শিক্ষকরা ছোটাছুটি করছেন। তাদের আগমনে কৃষক-প্রজা পার্টি ও মুসলিম লীগ তাদের সংবর্ধনার আয়োজন করে। শেখ মুজিব অন্য ছাত্রদের নিয়ে সংবর্ধনার পক্ষে কাজ করেন। অপেক্ষার পালা শেষ করে স্কুলের ভেতর যখন কয়েকটি গাড়ি ঢুকলো নামলেন দু'জন মন্ত্রী। শিক্ষকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে পুরো স্কুল পরিদর্শন শেষে একে ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী যখন বাংলোতে ফিরে যাচ্ছেন ঠিক তখনই পথ আগলে দাঁড়ালেন শেখ মুজিব। স্কুলের শিক্ষকরাসহ সকল ছাত্র হতভম্ব হয়ে গেলেন। হেডমাস্টার বারবার ধমক দিচ্ছেন; কিন্তু নাছোড়বান্দা তাঁর কথা না শোনা পর্যন্ত পথ ছাড়তে নারাজ। শেরেবাংলার মতো সিংহপুরুষ তো অবাক! এতটুকু ছেলে! তিনি জিজ্ঞেস করেন– 'তুমি কি চাও?' শেখ মুজিব জবাব দেন– ছাত্রাবাসের ছাদ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়ে। ছাত্রদের বিছানাপত্র নষ্ট হয়ে যায়। তাই এটা সারাবার ব্যবস্থা করে না দিলে পথ ছাড়ব না। শেখ মুজিব আরও বলেন, এ কাজে মাত্র ১২০০ টাকা প্রয়োজন।

শেরেবাংলা মুজিবের ব্যবহারে মুগ্ধ হন। সঙ্গে সঙ্গে তার স্বেচ্ছাধীন তহবিল থেকে ১২০০ টাকা মঞ্জুর করে দেন। বাংলার দুই মহান নেতার সঙ্গে শেখ মুজিবের এটাই ছিল প্রথম সাক্ষাৎ। প্রথম সাক্ষাতেই মন্ত্রীদ্বয় বুঝতে পেরেছিলেন এই ছেলেটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নেতা হবে। তাঁদের এ পরিচয় পরবর্তী সময়ে আরও ঘনিষ্ঠ হয়। বিশেষ করে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বঙ্গবন্ধুর সৎসাহস ও ব্যবহারে মুগ্ধ হন। সোহরাওয়ার্দী সাহেব বাংলাতে গিয়েই পিয়ন মারফত বঙ্গবন্ধুকে ডেকে পাঠান। তাঁর সঙ্গে নানারূপ আলাপ-আলোচনা করার পর তাদের ঘনিষ্ঠতা আরও বেড়ে যায়।

শেখ মুজিব নাবালক থাকা অবস্থায় অর্থাৎ ১০ বছর বয়সে বিয়ে করেন। তখন তাঁর স্ত্রী চাচাতো বোন রেনুর বয়স মাত্র ৩ বছর। রেনু তার ডাকনাম হলেও আসল নাম ফজিলাতুন্নেসা। বঙ্গবন্ধুর শ্বশুর শেখ জহিরুল হক চাকরি করতেন যশোর কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেন্টের অডিটর হিসেবে। ৭ বছর বয়সে ফজিলাতুন্নেসা মা-বাবাকে হারান। তখন থেকেই বঙ্গবন্ধুর মা সাহেরা বেগম ফজিলাতুন্নেসাকে লালন-পালন করেন। পরে শেখ মুজিব ও ফজিলাতুন্নেসার আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ে হয় ১৯৩৯ সালে। তখন শেখ মুজিবের বয়স ১৯ এবং ফজিলাতুন্নেসার বয়স ৯। ১৮ বছর বয়সে শেখ মুজিবের প্রথম বন্দী জীবনের অভিজ্ঞতা হয়। অবশ্য সেদিন পুলিশ তাঁকে বেশি সময় আটকে রাখতে পারেনি। ছাত্রদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে কোর্ট থেকে তিনি মুক্তিলাভ করেন। জেলে কাটানো প্রথম অভিজ্ঞতা নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেন–'আমার যেদিন প্রথম জেল হয়, সেদিন থেকেই আমার নাবালকত্ব ঘুচেছে বোধহয়।' এর পর থেকে তিনি বহুবার জেল খেটেছেন। জেল-জুলুমই বোধ হয় তাঁর রাজনৈতিক চেতনা বেশি উদ্বুদ্ধ করেছে। এর কয়েক মাস পরই গোপালগঞ্জে এক জনসভায় গোলযোগের অভিযোগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ কয়েকজন ছাত্রকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এ ঘটনায় ৭ দিন জেল খেটে তিনি মুক্তিলাভ করেন। সম্ভবত সেদিনের জেলের

অভিজ্ঞতাই পরবর্তী সময়ে দুর্জয় সাহসী ও দুর্দম উৎসাহী হয়। বাল্যকালেই তাঁর রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ হয় তিনটি বিষয়ে। একটি হলো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পরাভব, দ্বিতীয়টি হলো হিন্দু জমিদারদের স্বেচ্ছাচারিতা ও অসহিষ্ণুতা এবং শেষ হলো সাধারণ মানুষের অভাব-অনটন ও অসহায়ত্ব।

সাধারণ মানুষের অভাব-অনটন দেখলে শেখ মুজিব কখনো সহ্য করতে পারতেন না। একবার গ্রামে প্রচণ্ড খাদ্যাভাব দেখা দেয়। তখন গ্রামে ভালো ফসল হয়নি, তাই কৃষকদের প্রচণ্ড অভাব-অনটন। শেখ মুজিবের প্রাণ কেঁদে উঠলো। তাদের ছিল গোলাভরা ধান। তিনি গোলা থেকে ধান বের করে বিতরণ শুরু করলেন গরিব-দুঃখীদের মাঝে। তবে এসব নিয়ে তাঁর বাবা তাঁকে কখনোই কিছু বলতেন না। বরং এসব সমাজসেবা কাজে তাঁকে উৎসাহ দিতেন। তাঁর চাচা শেখ আব্দুর রশীদ সাহেবও তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। অনেকটা তাঁর চাচার কাছ থেকেই সমাজসেবামূলক কাজে অনুপ্রাণিত হন।

স্কুলজীবনে বঙ্গবন্ধুর খেলাধুলার প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহ ছিল। তিনি গোপালগঞ্জ ওয়ান্ডারার্স ফুটবল টিমে নিয়মিত খেলতেন। ভলিবলও তিনি ভালো খেলতেন। তবে খেলাধুলার পাশাপাশি তিনি যে জিনিসটি খুব বেশি পছন্দ করতেন, তা হলো ব্রতচারী। তাতে খেলা ও আনন্দ দুই-ই ছিল। তিনি গুরুসদয় দত্ত প্রবর্তিত ব্রতচারী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। গ্রামে এসে তাঁর প্রতিবেশীদের নিয়ে ব্রতচারী নাচ-গান করতেন। সে সময় তাঁর কণ্ঠে নিচের দুটো কলি অহরহ ধ্বনিত হতো–

'ও আমার বাংলাদেশের মাটি
তোমায় রাখবো পরিপাটি।'

বঙ্গবন্ধুর বংশ তালিকা

দরবেশ শেখ আউয়াল

তৎপুত্র শেখ জহিরুদ্দীন

তৎপুত্র শেখ জান মাহমুদ ওরফে তেকড়ি শেখ

তৎপুত্র শেখ বোরহান উদ্দীন

শেখ বোরহান উদ্দীন-এর তিন ছেলে

ক. শেখ একরাম হোসেন

খ. শেখ তাজ মাহমুদ

গ. শেখ কুদরত উল্লাহ ওরফে কদু শেখ

ক. শেখ একরাম হোসেন-এর তিন ছেলে

১. শেখ আবদুল মজিদ

২. শেখ আবদুল হামিদ

৩. শেখ আবদুর রশীদ

২. শেখ আবদুল হামিদ-এর পুত্র

ক. শেখ লুৎফর রহমান

ক. শেখ লুৎফর রহমান-এর পুত্র

১. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান

২. শেখ আবু নাসের

১. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর তিন ছেলে ও দুই মেয়ে

শেখ কামাল

শেখ জামাল

শেখ রাসেল

শেখ হাসিনা

শেখ রেহানা

খ. শেখ তাজ মাহমুদের তিন কন্যা

গ. শেখ কদুরত উল্লাহ ওরফে কদু শেখের পাঁচ ছেলে

১. শেখ মফিজউদ্দীন
২. শেখ আবদুল গফুর
৩. শেখ আবদুর রহীম
৪. শেখ আবদুল খালেক
৫. শেখ আবদুল জব্বার

৩. শেখ আবদুর রহীম-এর এক ছেলে

শেখ আবদুল হক

শেখ আবদুল হক-এর তিন ছেলে

ক. শেখ আবদুল কুদ্দুস
খ. শেখ আবদুল মান্নান
গ. শেখ আবদুল হান্নান

ক. শেখ আবদুল কুদ্দুসের দুই ছেলে

১. শেখ মুহম্মদ মুসা
২. শেখ মুহম্মদ ইয়াহিয়া

খ. শেখ আবদুল মান্নানের চার ছেলে ও শেখ আবদুল হান্নানের দুই ছেলে

৫. শেখ আবদুল জব্বার-এর ছয় ছেলে

ক. শেখ সৈয়দুল হক
খ. শেখ অহিদুল হক
গ. শেখ নিযামুল হক
ঘ. শেখ শামসুল হক
ঙ. শেখ সুলতান আহমদ
চ. শেখ নুরুল হক

৫. ক. শেখ সৈয়দুল হক-এর তিন ছেলে

১. শেখ মাহফুজুল হক
২. শেখ মনজুরুল হক
৩. শেখ মোজাহারুল হক

খ. শেখ অহিদুল হক-এর তিন ছেলে ও দুই মেয়ে

১. শেখ ইসরাইল হক
২. শেখ আশরাফুল হক
৩. শেখ মুহম্মদ জাফর সাদিক

গ. শেখ নিয়ামুল হক-এর এক ছেলে

১. শেখ ফরিদউদ্দীন

ঘ. শেখ শামসুল হক-এর পাঁচ ছেলে

১. শেখ রেয়াজুল হক (বঙ্গবন্ধুর প্রাইভেট সেক্রেটারি ছিলেন)
২. শেখ মণি মিয়া
৩. শেখ শাহ আলম
৪. শেখ ঈমাম
৫. শেখ শামীম

ঙ. শেখ সুলতান আহমদ-এর এক ছেলে

১. শেখ যায়েদ হোসেন

চ. শেখ নুরুল হক-এর তিন ছেলে

১. শেখ ফজলুল হক মণি
২. শেখ সেলিম
৩. শেখ মায়ারুফ

শেখ পরিবারের বৈবাহিক সম্পর্ক

শেখ পরিবারের ছেলেমেয়েদের বিয়ে-শাদি বাইরে খুব কমই হতো। শরীয়তের পরিপন্থী ব্যতিরেকে সবরকম বৈবাহিক সম্বন্ধ সে পরিবারে প্রচলিত ছিল। তাই যত দূর জানা যায়, এ পরিবারের বিয়ে পারিবারিক সূত্র ধরেই হতো।

শেখ একরাম হোসেনের তিন ছেলে

শেখ আবদুল মজিদ
শেখ আবদুল হামিদ
শেখ আবদুর রশীদ

শেখ আবদুল হামিদ বঙ্গবন্ধুর দাদা।

তাঁর ছেলে শেখ লুৎফর রহমান– বঙ্গবন্ধুর পিতা।

শেখ লুৎফর রহমান বিয়ে করেন শেখ আবদুল মজিদ-এর ছোট মেয়ে ছাহেরা বেগমকে। তাঁর চাচাতো বোন।

শেখ জহুরুল হক বিয়ে করেন শেখ পরিবারের মধ্যে শেখ সৈয়দুল হকের মেয়ে।

শেখ জহুরুল হকের দু'মেয়ে :

জিন্নাতুন্নেসা– পাঁচ বছর বয়সে বিয়ে হয় শেখ মুহম্মদ মুসার সাথে। তখন মুসা সাহেবের বয়স ১৩ বছর।

ফজিলাতুন্নেছা (রেণু) তিন বছর বয়সে বিয়ে হয় নয় বছর বয়স্ক শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে।

শেখ লুৎফর রহমানের চার মেয়ে অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর চার বোন।
তাদের বিয়ে হয় :
প্রথমা কন্যা : দত্তপাড়ায় নুরুদ্দীন চৌধুরীর সাথে বিয়ে হয়।
দ্বিতীয়া কন্যা : শেখ আবদুল জব্বার-এর ছেলে শেখ নুরুল হক-এর সাথে।
শেখ নুরুল হক-এর তিন ছেলে–
শেখ ফজলুল হক মণি, শেখ সেলিম ও শেখ মায়ারুফ।

তৃতীয়া কন্যা : বিয়ে হয় বরিশালের আবদুর রব সেরনিয়াবাত-এর সঙ্গে।

কনিষ্ঠা কন্যার বিয়ে হয় কাশিয়ানা থানার অন্তর্গত পারুলিয়া গ্রামের সৈয়দ হোসেন সাহেবের সঙ্গে। তিনি সরকারি চাকুরে ছিলেন। বাংলাদেশ সরকারের যুগ্ম কার্যাধ্যক্ষ ছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর বড় মেয়ে শেখ হাসিনার বিয়ে হয় ১৯৬৯ সালে বিএ অনার্স ছাত্রী থাকাকালীন ডাক্তার ওয়াজেদ আলী মিয়ার সাথে। বঙ্গবন্ধুর নাতির নাম– জয় ও পুতুল।

বঙ্গবন্ধুর ছাত্রজীবন ও রাজনৈতিক জীবন

১৯৪২ সালে কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভর্তি হওয়ার পর থেকে মূলত রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। ইসলামিয়া কলেজ ছিল মুসলিম রাজনীতির অন্যতম কেন্দ্র। রাজনীতির দীক্ষা গ্রহণ করেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নিকট। শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং শেরেবাংলা ফজলুল হকের চোখ পড়েছিল তখনই যখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মিশন স্কুলের ছাত্র। সেখানে তার সাহসিকতা তাদের মুগ্ধ করে। সেই মুগ্ধতাকে ভুলতে পারেননি সোহরাওয়ার্দী এবং বাংলার বাঘখ্যাত একে ফজলুল হক। সেদিনই শহীদ সোহরাওয়ার্দী বঙ্গবন্ধুকে নিভৃতে ডেকে কথা বলেন, তিনি বুঝতে পারেন যে, মুজিব বড় হলে অনেক বড় নেতা হবেন। ১৯৪০ সালে শেখ মুজিব নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনে যোগ দেন এবং বঙ্গীয় মুসলিম লীগের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। যদিও মুজিব স্কুলজীবন থেকে একজন প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে গড়ে ওঠেন।

১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষকালে বঙ্গবন্ধু কলকাতার দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের কল্যাণে কাজ করেন। সে সময় টাঙ্গাইলের একজন ব্যবসায়ীর সঙ্গে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শেখ মুজিবের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ওই সময়কালে মুজিব গোপালগঞ্জ ও টুঙ্গিপাড়ার মানুষের দুঃখ-কষ্টের সাথী হয়েছিলেন। নিজের বাড়ির গোলার ধান, চাল স্থানীয় জনসাধারণের মাঝে বিলিয়ে দেন।

মুসলিম লীগের প্রধান কার্যালয় ছিল শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কলকাতার ৩নং ওয়েলেসলি ফার্স্ট লেনের পূর্বের বাড়িতে। নিয়মিত যাতায়াত থাকায় শেখ মুজিবের সঙ্গে ওই কার্যালয়ে বাংলার অনেক নেতার দেখা হয়। মুজিব তখন তরুণ রাজনৈতিক কর্মী। কিন্তু তাঁর রাজনীতিতে চেতনা ছিল সুদৃঢ়। মুসলিম লীগের সদস্য সংগ্রহের উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল শেখ মুজিবের। ১৯৪৪ সলে বাংলার মুসলিম লীগের সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় পাঁচ লাখের বেশি। '৪৪ সালে মুসলিম লীগের বার্ষিক কাউন্সিল সভায় শেখ মুজিবের শক্তিশালী বক্তৃতা শুনে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী শেখ মুজিবকেই উত্তরাধিকারী ভাবতে শুরু করেন। রাজনীতিতে সময় ব্যয় করলেও শেখ মুজিব কখনো লেখাপড়ার প্রতি অবহেলা করেননি। তিনি মনে করতেন– আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে হলে শিক্ষা লাভের প্রয়োজন অত্যধিক। তিনি ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে বিএ পাস করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ইসলামিয়া কলেজ থেকেই বিএ পাস করেন।

শেখ হাসিনা তাঁর পিতার শৈশবকাল সম্পর্কে *'শেখ মুজিব-আমার পিতা'* শিরোনামের প্রবন্ধে লিখেছেন, "পিতা, সবার জীবনের অত্যন্ত স্নেহের, শ্রদ্ধেয় আপনজন এবং একান্ত কাম্য বিষয়। সন্তান বা পিতা যে যত বড় হোন না কেন, কারো আবেদন কারো কাছে যেন বিন্দুমাত্র কমতি হওয়ার কোনো অবকাশ নেই। পিতা-মাতা-সন্তান এ সম্পর্ক তো চিরন্তন ও স্বাভাবিক। তাই আজকের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি তো বঙ্গবন্ধু কন্যা। তাঁর হৃদয়ে সাড়া জাগায় পিতৃস্নেহ, হাহাকার তোলে পিতৃ হারার বেদনা, করে তোলে তাকেও আর দশটি মানবের মতো শোকাভিভূত। তাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কলমের আঁচড়ে প্রিয়তম পিতার স্মৃতি ও বেদনাময় স্মৃতি বিধৃত হয়েছে–

বাইগার নদীর তীরঘেঁষে ছবির মতো সাজানো সুন্দর একটি গ্রাম সে গ্রামটির নাম টুঙ্গিপাড়া। বাইগার নদী এঁকে-বেঁকে গিয়ে মিশেছে মধুমতী নদীতে। এই মধুমতী নদীর অসংখ্য শাখার একটি বাইগার নদী। নদীর দু'পাশে তাল, তমাল, হিজল গাছের সবুজ সমারোহ। ভাটিয়ালি গানের সুর ভেসে আসে হালধরা মাঝির কণ্ঠ থেকে। পাখির গান আর নদীর কলকল ধ্বনি এক অপূর্ব মনোরম পরিবেশ গড়ে তোলে। প্রায় দু'শ' বছর পূর্বে মধুমতী নদী এই গ্রাম ঘেঁষে বয়ে যেত। এই নদীর তীরঘেঁষে গড়ে উঠেছিল জনবসতি। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে ধীরে ধীরে নদী দূরে সরে যায়। চরে জেগে উঠে আরো অনেক গঞ্জ। সেই দু'শ' বছর আগে ইসলাম ধর্ম প্রচারের দায়িত্ব নিয়েই আমাদের পূর্বপুরুষরা এসে এই নদী বিধৌত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সুষমামণ্ডিত ছোট্ট গ্রামটিতে তাদের বসতি গড়ে তোলেন এবং তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল কলকাতা বন্দরকে কেন্দ্র করে। অনাবাদি জমিজমা চাষবাস শুরু করেন এবং গ্রামের বসবাসকারী কৃষকদের নিয়ে একটা আত্মনির্ভরশীল গ্রাম হিসেবেই এই গ্রামটিকে বেশ বর্ধিষ্ণু গ্রাম রূপে গড়ে ওঠে। আমাদের পূর্ব-পুরুষরা টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জমিজমা ক্রয় করে বসতির জন্য কলকাতা থেকে কারিগর ও মিস্ত্রি এনে দালানবাড়ি তৈরি করেন। যা সমাপ্ত হয় ১৮৫৪ সালে। এখনো কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই দালানের ধ্বংসাবশেষ। ১৯৭১ সালে যে দুটো দালানে বসতি ছিল, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আগুন দিয়ে সে দুটোই জ্বালিয়ে দেয়। এই দালান-কোঠায় বসবাস শুরু হওয়ার পর ধীরে ধীরে বংশবৃদ্ধি হতে থাকে আর আশপাশে বসতির সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। এই দালানেরই উত্তর-পূর্ব কোণে টিনের চৌচালা ঘর তোলেন আমার দাদার বাবা শেখ আবদুল হামিদ। আমার দাদা শেখ লুৎফর রহমান এ বাড়িতেই সংসার গড়ে তোলেন। আর এখানেই জন্ম নেন আমার আব্বা, ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ। আমার আব্বার নাম শেখ আবদুল মজিদ। আমার আবার আকিকার সময় নাম রাখেন শেখ মুজিবুর রহমান। আমার দাদির দুই কন্যাসন্তানের পর প্রথম পুত্রসন্তান আমার আব্বা। আর তাই আমার দাদির বাবা তার সমস্ত সম্পত্তি দাদিকে দান করেন এবং নাম রাখার সময় বলে যান, 'মা সায়রা, তোর ছেলের নাম এমন রাখলাম যে নাম জগৎজোড়া খ্যাত হবে।

আমার আব্বার শৈশব কেটেছিল টুঙ্গিপাড়ার নদীর পানিতে ঝাঁপ দিয়ে, মেঠো পথের ধুলোবালি মেখে বর্ষার কাদাপানিতে ভিজে। বাবুই পাখি বাসা কেমন করে গড়ে তোলে, মাছরাঙা কীভাবে ডুব দিয়ে মাছ ধরে, কোথায় দোয়েল পাখির বাসা এসব দেখে। দোয়েল পাখির সুমধুর সুর আমার আব্বাকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করত। আর তাই গ্রামের ছোট ছেলেদের সঙ্গে মাঠে-ঘাটে ঘুরে প্রকৃতির সাথে মিশে বেড়াতে তাঁর ভালো লাগত। ছোট্ট শালিক পাখির ছানা, ময়না পাখির ছানা ধরে তাদের কথা বলা ও শিষ দেয়া শেখাতেন। বানর ও কুকুর পুষতেন, তারা তাঁর কথামতো যা বলতেন তাই করত। আবার এগুলো দেখাশোনার ভার দিতেন ছোট বোন হেলেনের ওপর। এই পোষা পাখি, জীবজন্তুর প্রতি এতটুকু অবহেলা তিনি সইতে পারতেন না। মাঝে মাঝে এজন্য ছোট বোনকে বকাও খেতে হতো। আমাদের বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম দিকঘেঁষে একটা সরু খাল চলে গেছে যে খাল মধুমতী ও বাইগর নদীর সংযোগ রক্ষা করে। এই খালের পাড়েই বড় কাচারি ঘর। আর এই কাচারি ঘরের পাশে মাস্টার, পণ্ডিত ও মৌলভী সাহেবদের থাকার ঘর ছিল। এরা গৃহশিক্ষক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত ছিলেন এবং তাদের কাছে আমার আব্বা আরবি, বাংলা, ইংরেজি ও অঙ্ক শিখতেন।

আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরই গড়ে তোলা গিমাডাঙ্গা টুঙ্গিপাড়া স্কুল। তখন ছিল প্রাথমিক বিদ্যালয়। বাড়ি থেকে প্রায় সোয়া কিলোমিটার দূরে। আমার আব্বা এই স্কুলেই প্রথম লেখাপড়া করেন। একবার বর্ষাকালে নৌকা করে স্কুল থেকে ফেরার সময় নৌকাডুবি হয়ে যায়। আমার আব্বা খালের পানিতে পড়ে যান। এরপর আমার দাদি তাঁকে আর ওই স্কুলে যেতে দেননি। একরত্তি ছেলে চোখের মণি, গোটা বংশের আদরের দুলাল, তাঁর এতটুকু কষ্ট যেন সকলেরই কষ্ট। সেই স্কুল থেকে নিয়ে গিয়ে গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুলে ভর্তি করে দেন। গোপালগঞ্জ আমার দাদার কর্মস্থল ছিল। সেই থেকে গোপালগঞ্জেই তিনি পড়ালেখা করতে শুরু করেন। মাঝখানে একবার দাদা মাদারীপুরে বদলি হন। তখন কিছুদিনের জন্য মাদারীপুরেও আব্বা পড়ালেখা করেন। পরে গোপালগঞ্জেই তাঁর কৈশোর বেলা কাটে।

আমার আব্বার শরীর ছিল বেশ রোগা। তাই আমার দাদি সবসময়ই ব্যস্ত থাকতেন কীভাবে তাঁর খোকার শরীর ভালো করা যায়। আদর করে দাদা-দাদিও খোকা বলেই ডাকতেন। আর ভাই-বোন, গ্রামবাসীদের কাছে ছিলেন মিয়া ভাই বলে পরিচিত। গ্রামের সহজ-সরল মানুষদের সঙ্গে অত্যন্ত সহজভাবে তিনি মিশতেন। আমার দাদি সব সময় ব্যস্ত থাকতেন খোকার শরীর সুস্থ করে তুলতে। তাই দুধ ছানা মাখন ঘরেই তৈরি হতো। বাগানের ফল, নদীর তাজা মাছ সব সময় খোকার জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত থাকত। কিন্তু আমার আব্বাই ছোটবেলা থেকে ছিপছিপে পাতলা ছিলেন, তাই দাদির আফসোসেরও সীমা ছিল না যে কেন তার খোকা একটু হৃষ্টপুষ্ট নাদুসনুদুস হয় না। খাবার বেলায় খুব সাধারণত ভাত, মাছের ঝোল, সবজিই তিনি পছন্দ করতেন। খাবার শেষে দুধ-ভাত-কলা ও গুড় খুব পছন্দ করতেন। আমার চার ফুফু ও এক চাচা ছিলেন।

এই চার বোনের মধ্যেই দুই বোন বড় ছিলেন। ছোট ভাইটির যাতে কোনো কষ্ট না হয় এজন্য সদাসর্বদা ব্যস্ত থাকতেন বড় দুই বোন। বাকিরা ছোট কিন্তু দাদা-দাদির কাছে খোকার আদর ছিল সীমাহীন। আমাদের বাড়িতে আশ্রিতের সংখ্যাও ছিল প্রচুর। আমার দাদার বা দাদির বোনদের ছেলেমেয়ে বিশেষ করে যারা পিতৃহারা, মাতৃহারা তাদের দাদা-দাদি নিজেদের কাছে এনেই মানুষ করতেন। আর তাই প্রায় সতের-আঠারজন ছেলেমেয়ে একই সঙ্গে বড় হয়ে ওঠে।

আব্বার যখন দশ বছর বয়স তখন তাঁর বিয়ে হয়। আমার মায়ের বয়স ছিল মাত্র তিন বছর। আমার মা পিতৃহারা হবার পর তাঁর দাদা এই বিয়ে দিয়ে সমস্ত সম্পত্তি মা ও খালার নামে লিখে দেন। আমার খালা-মায়ের থেকে তিন-চার বছরের বড়। আত্মীয়ের মধ্যেই দুই বোনকে বিয়ে দেন এবং আমার দাদাকে (গার্ডিয়ান) মুরব্বি করে দেন। আমার মা'র যখন ছয়-সাত বছর বয়স তখন তার মা মারা যান এবং তখন আমার দাদি কোলে তুলে নেন আমার মাকে। আর সেই থেকে একই সঙ্গে সব ছেলেমেয়ের সঙ্গে তিনি বড় হতে থাকেন।

আমার আব্বার লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলার প্রতি দারুণ ঝোঁক ছিল। বিশেষ করে ফুটবল খেলাকে খুব পছন্দ করতেন। মধুমতী নদীর পার হয়ে চিতলমারী ও মোল্লারহাট যেতেন খেলতে। গোপালগঞ্জে স্কুলের টিম ছিল। এদিকে আমার দাদাও খেলতে পছন্দ করতেন। আব্বা যখন খেলতেন তখন দাদাও মাঝে মাঝে খেলা দেখতে যেতেন। দাদা আমাদের কাছে গল্প করতেন যে, তোমার আব্বা এত রোগা ছিল যে বলে জোরে লাথি মেরে মাঠে গড়িয়ে পড়ত। আব্বা যদি ধারে-কাছে থাকতেন তবে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করতেন। আমরা তখন সত্যিই খুব মজা পেতাম। এর পেছনে মজার ঘটনা হলো মাঝে মাঝে আব্বার টিম ও দাদার টিমের মধ্যেও খেলা হতো। এখনো আমি যখন ওই সমস্ত এলাকায় যাই, অনেক বয়স্ক লোকের সঙ্গে পরিচয় হয় যারা আব্বার ছোটবেলার কথা বলেন। আমাদের বাড়িতেই এই খেলার অনেক ফটো ও কাগজ ছিল। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদারবাহিনী আমাদের বাড়ি পুড়িয়ে দেয়, ফলে সব শেষ হয়ে যায়।

তিনি ছোটবেলা থেকে অত্যন্ত হৃদয়বান ছিলেন। তখনকার দিনের ছেলেদের পড়াশোনার তেমন সুযোগ ছিল না। অনেকে বিভিন্ন বাড়িতে জায়গির থেকে পড়াশোনা করত। চার-পাঁচ মাইল পথ হেঁটে স্কুলে আসতে হতো। সকালে ভাত খেয়ে স্কুলে আসত। আর সারাদিন অভুক্ত অবস্থায় অনেক দূরে হেঁটে তাদের ফিরতে হতো। যেহেতু আমাদের বাড়িটা ছিল ব্যাংকপাড়ায়, আব্বা তাদের বাড়িতে নিয়ে আসতেন। স্কুল থেকে ফিরে দুধ-ভাত খাবার অভ্যাস ছিল এবং সকলকে নিয়েই তিনি খাবার খেতেন। দাদির কাছে শুনেছি আব্বার জন্য মাসে কয়েকটা ছাতা কিনতে হতো। কারণ আর কিছুই নয়, কোনো ছেলে গরিব, ছাতা কিনতে পারে না, দূরের পথ রোদ বা বৃষ্টিতে কষ্ট হবে দেখে তাকে ছাতা দিয়ে দিতেন। এমনকি পড়ার বইও মাঝে মাঝে দিয়ে আসতেন। দাদির

কাছে গল্প শুনেছি যখন ছুটির সময় হতো। তখন দাদি আমগাছের নিচে এসে দাঁড়াতেন। খোকা আসবে, দূর থেকে রাস্তার ওপর নজর রাখতেন। একদিন দেখেন তার খোকা গায়ে চাদর জড়িয়ে হেঁটে আসছে পরনের পাজামা-পাঞ্জাবি নেই। কি ব্যাপার? এক গরিব ছেলেকে তার শতছিন্ন কাপড় দেখে সব দিয়ে এসেছেন।

আমার দাদা-দাদি অত্যন্ত উদার প্রকৃতির ছিলেন। আমার আব্বা যখন কাউকে কিছু দান করতেন তখন কোনোদিনই তাকে বকাঝকা করতেন না, বরং উৎসাহ দিতেন। আমার দাদা ও দাদির এই উদারতার আরো অনেক নজির রয়েছে।

স্কুলে পড়তে পড়তে আব্বার বেরিবেরি রোগ হয় এবং চোখ খারাপ হয়ে যায়। ফলে চার বছর লেখাপড়া বন্ধ থাকে। তিনি সুস্থ হওয়ার পর আবার স্কুলে ভর্তি হন। এ সময় আব্বার একজন গৃহশিক্ষক ছিলেন, তাঁর নাম ছিল হামিদ মাস্টার। তিনি ছিলেন ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় এবং বহু বছর জেল খাটেন। পরবর্তী পর্যায়ে আব্বা বিভিন্ন সময় যখন জেলে থাকতেন অথবা পুলিশ গ্রেফতার করতে আসত, আমার দাদা-দাদি মাঝে মাঝেই সেই মাস্টার সাহেবের নাম নিতেন আর কাঁদতেন। এমনিতে আমার দাদা-দাদি অত্যন্ত উদার মনের মানুষ ছিলেন। ছেলের কোনো কাজে কখনো তারা বাধা দিতেন না বরং উৎসাহ দিতেন। অত্যন্ত মুক্ত পরিবেশে আমার বাবার মনের বিকাশ ঘটেছে। প্রতিটি কাজ যখনই যেটা ন্যায়সঙ্গত মনে হয়েছে আমার দাদা তা করতে নিষেধ না করে বরং উৎসাহ দিয়েছেন। আব্বার স্কুলমাস্টার ছোট্ট একটা সংগঠন গড়ে তুলে বাড়ি বাড়ি ঘুরে ধান, টাকা, চাল জোগাড় করে গরিব মেধাবী ছেলেদের সাহায্য দিতেন। যেখানেই কোনো অন্যায় দেখতেন সেখানেই তিনি প্রতিবাদ করতেন। একবার একটি অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে তিনি প্রথম সরকার সমর্থকদের দ্বারা ষড়যন্ত্রের শিকার হন ও গ্রেফতার হয়ে কয়েকদিন জেলে থাকেন।

কৈশোরেই তিনি খুব বেশি অধিকার সচেতন ছিলেন। একবার যুক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরেবাংলা গোপালগঞ্জ সফরে যান এবং স্কুল পরিদর্শন করেন। সেই সময় সাহসী কিশোর মুজিব তাঁর কাছে স্কুলঘরে বর্ষার পানি পড়ার অভিযোগ তুলে ধরেন এবং মেরামত করার অঙ্গীকার আদায় করে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

গোপালগঞ্জ স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করে তিনি কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজে পড়তে যান। তখন বেকার হোস্টেলে থাকতেন। এ সময়ে তিনি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সংস্পর্শে আসেন। হলওয়ে মনুমেন্ট আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন সক্রিয়ভাবে। এ সময় থেকে তার রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ শুরু হয়।

১৯৪৬ সালে তিনি বিএ পাস করেন। পাকিস্তান-ভারত ভাগ হওয়ার সময়ে যখন দাঙ্গা হয়, তখন দাঙ্গা দমনে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। কাজ করে যেতেন নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। আমার মেঝো ফুফু তখন কলকাতায় থাকতেন। ফুফুর কাছে শুনেছি মাঝে মাঝে অনেক অভুক্ত অবস্থায় হয়তো দু'দিন বা তিন দিন কাজ করে গেছেন। মাঝে মাঝে যখন ফুফুর খোঁজ-খবর নিতে যেতেন তখন ফুফু জোর করে কিছু খাবার খাইয়ে

দিতেন। অন্যায়কে তিনি কোনোদিনই প্রশ্রয় দিতেন না। ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তিনি কখনো পিছপা হননি।

পাকিস্তান হওয়ার পর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন। তখন তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের আন্দোলনে সমর্থন দেন ও সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। সচিবালয়ের সামনে অবস্থান ধর্মঘট করতে গিয়ে গ্রেফতার হন। অল্প কয়েকদিন পর মুক্তি পান। এ সময় পাকিস্তানের সংবিধান রচনা করার কথা ঘোষণা দেন মুহম্মদ আলী জিন্নাহ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দিলে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি বাঙালি প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। ছাত্রসমাজ এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। এই আন্দোলনে ১৯৪৯ সালে আমার আব্বা গ্রেফতার হন। আমি তখন খুবই ছোট্ট, ভাই কামাল কেবল জন্মগ্রহণ করেছে। আব্বা ওকে দেখারও সুযোগ পাননি।

একটানা ১৯৫২ সাল পর্যন্ত তিনি বন্দি ছিলেন। সেই সময় আমাদের দুই ভাই-বোনকে নিয়ে আমার মা দাদা-দাদির কাছেই থাকতেন। একবার একটা মামলা উপলক্ষে আব্বাকে গোপালগঞ্জ নিয়ে যাওয়া হয়। কামাল তখন অল্প অল্প কথা বলা শিখেছে। কিন্তু আব্বাকেও কখনো দেখেনি, চেনেও না। আমি যখন বারবার আব্বার কাছে ছুটে যাচ্ছি আব্বা আব্বা বলে ডাকছি ও শুধু অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছে। গোপালগঞ্জ থানায় একটি বড় পুকুর আছে। যার পাশে বড় খেলার মাঠ। ওই মাঠে আমরা দুই ভাইবোন খেলা করতাম ও ফড়িং ধরার জন্য ছুটে বেড়াতাম। আর মাঝে মাঝেই আব্বার কাছে ছুটে আসতাম। অনেক ফুল-পাতা কুড়িয়ে এনে থানার বারান্দায় কামালকে নিয়ে খেলতে বসেছি। ও হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা করল, হাসু আপা তোমার আব্বাকে আমি একটু আব্বা বলি। কামালের সেই কথা আজ যখন মনে পড়ে আমি তখন চোখের পানি রাখতে পারি না। আজ ও নেই। আমাদের আব্বা বলে ডাকারও কেউ নেই, ঘাতকের বুলেট শুধু আব্বাকেই ছিনিয়ে নেয়নি, আমার মা, কামাল, জামাল ছোট্ট রাসেলও রেহাই পায়নি। রেহাই পায়নি কামাল-জামালের নব পরিণীতা বধূ সুলতানা ও রোজী, যাদের হাতের মেহেদির রঙ বুকের রক্ত মিশে একাকার হয়ে গেছে। খুনিরা এখানেই শেষ করেনি, আমার একমাত্র চাচা শেখ নাসের, তরুণ নেতা আমার ফুফাতো ভাই শেখ মণি, আমার ছোট্টবেলার খেলার সাথী শেখ মণির অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজুকে খুন করেছে। এই খুনিরা একই সাথে আক্রমণ করেছে আবদুর রব সেরনিয়াবাত (আমার ফুপা), তাঁর তের বছরের কন্যা বেবি, দশ বছরের ছেলে আরিফকে, তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আবুল হাসনাত আবদুল্লাহর চার বছরের শিশুপুত্র বাবুও খুনিদের হাত থেকে রেহাই পায়নি। কর্নেল জামিল, যিনি আমার পিতার জীবন রক্ষার জন্য ঘুম থেকে ওঠে ছুটে এসেছিলেন তাকেও তারা হত্যা করে কেমন বর্বর নিষ্ঠুরতা? আজো গুলির আঘাতে পঙ্গু হয়ে আছেন আমার মেঝো ফুফু।

সেদিন কামাল আব্বাকে ডাকার অনুমতি চেয়েছিল, আমি সঙ্গে সঙ্গে ওকে আব্বার কাছে নিয়ে যাই। আব্বাকে ওর কথা বলি। আব্বা ওকে কোলে তুলে নিয়ে অনেক

আদর করেন। আজ আর তারা কেউই বেঁচে নেই, আজ বারবার আমার মন আব্বাকে ডাকার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। মায়ের স্নেহ, ভাইদের সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকি, কিন্তু শত চিৎকার করলেও তো কাউকে আমি পাব না। তাদের জীবন নৃশংসভাবে বুলেট দিয়ে চিরদিনের মতো যে ঘাতকরা স্তব্ধ করে দিল, তাদের কি বিচার হবে না?"

১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু প্রাণ হারান। সে ঘটনাটি শেখ মুজিবকে ব্যথিত করে এবং কষ্ট দেয়। নেতাজি ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমানের সংগ্রামী জীবনের প্রতীক। শেখ মুজিবুর রহমান হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নিকট শিখেছেন গণতন্ত্র ও রাজপথের রাজনীতি এবং সুভাষ বসুর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করলেন সশস্ত্র সংগ্রামের। এ দু'জন নেতার রাজনৈতিক শিক্ষার কারণেই শেখ মুজিব সিদ্ধান্ত নিলেন সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলার স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে।

মুসলিম লীগকে জনগণের দলে উন্নীত করতে শেখ মুজিব উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪৫ সালের নভেম্বর মাসে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও আবদুল হাসিম প্রত্যেক জেলায় নির্বাচনী অফিস প্রতিষ্ঠা এবং একজন সম্পাদক নিয়োগ করেন। সে সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফরিদপুর জেলার দায়িত্ব পান। সে সময় কেন্দ্রীয় আইন সভার নির্বাচনে ১৩২টি আসনের মধ্যে ৩০টি আসনে মুসলিম লীগ প্রার্থী বিজয়ী হয়। শেখ মুজিবের সুষ্ঠু নির্বাচনী প্রচারের ফলে ফরিদপুর-বরিশাল এলাকায় মুসলিম লীগ প্রার্থী বিজয়ী হয়।

১৯৪৭-এর আগস্টের মাঝা মাঝিতে দেশ বিভাগের পর স্বাভাবিকভাবেই পাকিস্তানের শাসনভার মুসলিম লীগের ওপর ন্যস্ত হয়। তখন শেখ মুজিব ছাত্রসমাজের নিকট অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। তার প্রভাব এতই বেশি ছিল যে, তার উপস্থিতিতে উত্তেজিত ছাত্ররাও শান্ত হয়ে যেত। ১৯৪৭ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর শেখ মুজিবুর রহমান ও ফজিলতুন্নেসার প্রথম কন্যার জন্ম হয়। নাম রাখা হয় শেখ হাসিনা। ওই বছরই তিনি বিএ পরীক্ষা দেন। ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে বিএ পাস করেন। শেখ মুজিবের পিতার ইচ্ছা ছিল তাঁর ছেলে উকিল হবে। তাই পিতার নির্দেশে মুজিব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে ভর্তি হন। আইন পড়ার সাথে সাথে তিনি রাজনৈতিক দল গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। সে সময় ঢাকার মুসলিম লীগ নেতা কামরুদ্দিন আহমেদ গণতান্ত্রিক যুবলীগ গঠন করেন। শেখ মুজিবুর রহমান তখন এ দলের অন্যতম নেতা ছিলেন।

১৯৪৮ সালের ২৪ মার্চ কার্জন হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ তার ভাষণে বলেন, একমাত্র উর্দু এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। ঠিক তখনই ছাত্রনেতারা প্রতিবাদ জানান। ধীরে ধীরে এটি আন্দোলনে রূপ নেয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্ন বেতনভুক্ত চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসের ৩ তারিখ ধর্মঘট আহ্বান করে। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ এই ধর্মঘটের

সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে ৫ মার্চ থেকে ধর্মঘটে যোগ দেয়। মুসলিম ছাত্রনেতাদের মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবও ছিলেন। এ ঘটনায় বঙ্গবন্ধুসহ ৬ ছাত্রকে জরিমানা করা হয়। শেখ মুজিব ছাড়া সকলেই জরিমানা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসেন। কিন্তু শেখ মুজিব ছিল তার কথায় অনড়। যে কারণে তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে আর লেখাপড়া করা সম্ভব হয়নি। তাঁর সেদিনের আচরণেই ধরা পড়েছিল সে একদিন বড় মাপের নেতা হবেন। সেদিনের মুচলেকা দেওয়ার পর শেখ মুজিব বলেছিলেন, 'শেখ মুজিব আবার এই বিশ্ববিদ্যালয়েই আসবে তবে ছাত্র হিসেবে নয়, একজন দেশকর্মী হিসেবে'। অবশ্য তাঁর কথা অক্ষরে অক্ষরে তিনি প্রমাণ করেছিলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে যেদিন ফিরে এসেছিলেন তখন তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। তাঁকে দেওয়া হয়েছিল ডাকসুর আজীবন সদস্যপদ।

যুক্তফ্রন্ট ঘোষিত ২১ দফা কর্মসূচি

১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগ ও কৃষক-শ্রমিক পার্টি একত্র হয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে। আওয়ামী লীগ সহ-সভাপতি আবুল মনসুর আহমেদ ২১ দফা প্রণয়ন করেন এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পরীক্ষা করে তা অনুমোদন করে দেন। আওয়ামী লীগের পক্ষে মওলানা ভাসানী এবং কৃষক-শ্রমিক পার্টির পক্ষে এ কে ফজলুল হক ঐতিহাসিক ২১ দফায় স্বাক্ষর করেন। নিম্নে ঐতিহাসিক ২১ দফা দেয়া হলো :

২১ দফা :

১। বাংলাভাষা হবে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা।

২। ক্ষতিপূরণ ব্যতিরেকে যে কোনোপ্রকার জমিদারি বিলুপ্তকরণ এবং উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন। করের পরিমাণ হ্রাস।

৩। পাটশিল্পকে জাতীয়করণ, পাট উৎপাদকের জন্য উপযুক্ত মূল্য নির্ধারণ। মুসলিম আমলের পাটশিল্পের দালালদের অনুসন্ধান করে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ।

৪। সমবায় শিল্পপ্রথা প্রতিষ্ঠার দ্বারা কুটিরশিল্প ও শ্রমশিল্পের উন্নতি।

৫। লবণশিল্পে পূর্ব পাকিস্তানের স্বনির্ভরতার জন্য এই শিল্পের পত্তন এবং পার্টি দালালদের মতো লবণশিল্পের দালালদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ।

৬। সর্বপ্রকার উদ্বাস্তু বিশেষত কারিগর ও শিল্প শ্রমিকদর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৭। বন্যা ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের জন্য সেচ পরিকল্পনা।

৮। পূর্ববঙ্গের শিল্প প্রতিষ্ঠার দ্বারা শিল্প শ্রমিকদের আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধান।

৯। বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা এবং শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন ও ভাতাব্যবস্থা।

১০। সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থা বিলোপের দ্বারা মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন।

১১। ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত কালাকানুস বাতিল করে তাদের স্বাধীন বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরকরণ।

১২। প্রশাসনিক ব্যয় সংকোচন, উচ্চ ও নিম্ন পর্যায়ের কর্মচারীদের বেতনে সমতা আনয়ন। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীদের ১০০০ টাকার বেশি বেতন গ্রহণ না করা।

১৩। সর্বপ্রকার দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, উৎকোচের অবসান এবং এই উদ্দেশ্যে ১৯৫০

সালের পরবর্তী সময়ের প্রত্যেক সরকারি অফিসার ও বাণিজ্যপতিদের সম্পত্তির হিসাব গ্রহণ ।

১৪ । বিভিন্ন জননিরাপত্তা আইন ও অর্ডিন্যান্স কর্তৃক ধৃত বন্দিদের মুক্তি এবং সভা-সমিতি, প্রেস ও বাকস্বাধীনতা দান ।

১৫ । বিচারব্যবস্থা ও প্রশাসন ব্যবস্থা পৃথকীকরণ ।

১৬ । বর্ধমান ভবনকে প্রথমে ছাত্রাবাস এবং পরে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের গবেষণাগারে পরিণতকরণ ।

১৭ । ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলাভাষা আন্দোলনের শহীদের স্মৃতিরক্ষার্থে একটি শহীদ স্তম্ভ নির্মাণ ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারবর্গের ক্ষতিপূরণ ।

১৮ । ২১ ফেব্রুয়ারি 'শহীদ দিবস' এবং ছুটির দিন ঘোষণা ।

১৯ । ঐতিহাসিক লাহোর সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক এবং মুদ্রা ব্যবস্থা ছাড়া অন্য সকল বিষয়ে পূর্ববঙ্গের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা । প্রতিরক্ষা বিষয়ে কেন্দ্রে যেমন থাকবে 'নেভি হেড-কোয়ার্টার্স' তেমনি পূর্ববঙ্গকে অস্ত্রের ব্যাপারে স্বনির্ভর করার জন্য পূর্ববঙ্গে 'অস্ত্র কারখানা' প্রতিষ্ঠা আনসারদের পুরোপুরি সৈনিকরূপে স্বীকৃতিদান ।

২০ । যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা কোনো কারণেই আইনসভা বা মন্ত্রিসভার কার্যকাল বৃদ্ধি করবেন না এবং যাতে নির্বাচনী কমিশনারের মাধ্যমে স্বাধীন পক্ষপাতহীন নির্বাচন হতে পারে তার জন্য নির্বাচনের ৬ মাস পূর্বে বাধ্যতামূলক পদত্যাগ ।

২১ । প্রত্যেক আইনসভা সদস্যদের পদ শূন্য হবার তিন মাসের মধ্যে উপনির্বাচন দ্বারা পূরণকরণ এবং যদি যুক্তফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থী পরপর তিনটি উপনির্বাচনে পরাজিত হয় তবে মন্ত্রিসভা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করবে ।

আমাদের বাঁচার দাবি ৬ দফা কর্মসূচি

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রামের ফসল ৬ দফা। জানা যায়, তিনি আলফা ইন্স্যুরেন্স অফিসে বসে ৬ দফা প্রণয়ন করেন। আওয়ামী লীগের ১১ দফার মধ্যে নিহিত ছিল ৬ দফা। ১৯৬৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলের জাতীয় কনফারেন্সে বাঙালিদের মুক্তির দাবি পেশ করবেন বলেই বঙ্গবন্ধু সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সেই অনুযায়ী ৬ দফা প্রণয়ন করেছিলেন। ১৯৬৬ সালের ১৩ মার্চ আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেদিনের বৈঠকে ৬ দফা অনুমোদিত হয়। তবে সিদ্ধান্ত হয় ১৮, ১৯ ও ২০ মার্চ অনুষ্ঠিত কাউন্সিল অধিবেশনে অনুমোদন নিতে হবে। অবশেষে ১৮ মার্চ মতিঝিল ইডেন হোটেলে আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে ৬ দফা গৃহীত হয়। এই ৬ দফাই বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রথম কর্মসূচি।

আমার প্রিয় দেশবাসী ভাই-বোনেরা,

আমি পূর্ব পাকিস্তানবাসীর বাঁচার দাবিরূপে ৬ দফা কর্মসূচি দেশবাসী ও ক্ষমতাসীন দলের বিবেচনার জন্য পেশ করিয়াছি। শান্তভাবে উহার সমালোচনা করার পরিবর্তে কায়েমি স্বার্থীদের দালালরা আমার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা শুরু করিয়াছেন। জনগণের দুশমনদের এই চেহারা ও গালাগালির সহিত দেশবাসী সুপরিচিতি। অতীতে পূর্ব পাকিস্তানবাসীর নিতান্ত সহজ ও ন্যায্য দাবি যখনই উঠিয়াছে, তখনই এই দালালরা এমনিভাবে হৈ-হৈ করিয়াই উঠিয়াছেন। আমাদের মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি, পূর্ব-পাক জনগণের মুক্তি-সনদ একুশ দফা দাবি, যুক্ত-নির্বাচন-প্রথার দাবি, ছাত্র-তরুণদের সহজ ও স্বল্প-ব্যয়, শিক্ষা-লাভের দাবি, বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম করার দাবি ইত্যাদি সকল প্রকার দাবির মধ্যেই এই শোষকের দল ও তাহাদের দালালরা ইসলাম ও পাকিস্তান ধ্বংসের ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন।

আমার প্রস্তাবিত ৬ দফা দাবিতেও এঁরা তেমনিভাবে পাকিস্তান দুই টুকরা করিবার দুরভিসন্ধি আরোপ করিতেছেন। আমার প্রস্তাবিত ৬ দফা দাবিতে যে পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে পাঁচ কোটি শোষিত-বঞ্চিত আদম সন্তানের অন্তরের কথাই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে, তাতে আমার কোনো সন্দেহ নাই। খবরের কাগজের লেখায়, সংবাদে ও সভা-সমিতির বিবরণে, সকল শ্রেণীর সুধীজনের বিবৃতিতে আমি গোটা দেশবাসীর উৎসাহ-উদ্দীপনার সাড়া দেখিতেছি— তাতে আমার প্রাণে সাহস ও বুকে বল আসিয়াছে। সর্বোপরি, পূর্ব

পাকিস্তানের জনগণের জাতীয় প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগ আমার ৬ দফা দাবি অনুমোদন করিয়াছেন। ফলে ৬ দফা দাবি আজ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জাতীয় দাবিতে পরিণত হইয়াছে। এ অবস্থায় কায়েমি স্বার্থী শোষকদের প্রচারণায় জনগণ বিভ্রান্ত হইবেন না, সে বিশ্বাস আমার আছে।

কিন্তু এও আমি জানি, জনগণের দুশ্‌মনদের ক্ষমা অসীম, তাঁদের বিত্ত প্রচুর, হাতিয়ার এঁদের অফুরন্ত, মুখ এঁদের দশটা, গলার সুর এঁদের শতাধিক। এঁরা বহুরূপী। ইমান, ঐক্য ও সংহতির নামে এঁরা আছেন সরকারি দলে। আবার ইসলাম ও গণতন্ত্রের দোহাই দিয়া এঁরা আছেন অপজিশন দলে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দুশ্‌মনির বেলায় এঁরা সকলে একজোট। এঁরা নানা ছলা-কলায় জনগণকে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করিবেন। সে চেষ্টা শুরুও হইয়া গিয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানবাসীর নিষ্কাম সেবার জন্য এঁরা ইতিমধ্যেই বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। এঁদের হাজার চেষ্টাতেও আমার অধিকার সচেতন দেশবাসী বিভ্রান্ত হইবেন না তাতেও আমার কোনো সন্দেহ নাই। তথাপি ৬ দফা দাবির তাৎপর্য ও ইহার অপরিহার্যতা জনগণের মধ্যে প্রচার করা সমস্ত গণতন্ত্রী, বিশেষত আওয়ামী লীগ কর্মীদের অবশ্য কর্তব্য। আশা করি, তাঁরা সকলে অবিলম্বে ৬ দফার ব্যাখ্যায় দেশময় ছড়াইয়া পড়িবেন। কর্মী ভাইদের সুবিধার জন্য ও দেশবাসী জনসাধারণের কাছে সহজবোধ্য করার উদ্দেশ্যে আমি ৬ দফার প্রতিটি দফার দফাওয়ারি সহজ সরল ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও যুক্তিসহ এই পুস্তিকা প্রচার করিলাম। আওয়ামী লীগের তরফ হইতেও এ বিষয়ে আরও পুস্তিকা ও প্রচারপত্র প্রকাশ করা হইবে। আশা করি, সাধারণভাবে সকল গণতন্ত্রী, বিশেষভাবে আওয়ামী লীগের কর্মীগণ ছাড়াও শিক্ষিত পূর্ব পাকিস্তানি মাত্রেই এইসব পুস্তিকার সদ্ব্যবহার করিবেন।

১নং দফা

এই দফায় বলা হইয়াছে যে, ঐতিহাসিক লাহোর-প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করতঃ পাকিস্তানকে একটি সত্যিকার ফেডারেশনরূপে গড়িতে হইবে। তাতে পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার থাকিবে। সকল নির্বাচন সার্বজনীন প্রাপ্ত-বয়স্কদের সরাসরি ভোটে অনুষ্ঠিত হইবে। আইনসভাসমূহের সার্বভৌমত্ব থাকিবে।

ইহাতে আপত্তির কি আছে? লাহোর-প্রস্তাব পাকিস্তানের জনগণের নিকট কায়েদে আজমসহ সকল নেতার দেওয়া নির্বাচনী ওয়াদা। ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচন এই প্রস্তাবের ভিত্তিতেই হইয়াছিল। মুসলিম বাংলার জনগণ একবাক্যে পাকিস্তানের বাক্সে ভোটও দিয়াছিলেন এই প্রস্তাবের দরুনই। ১৯৫৪ সনের সাধারণ নির্বাচনে পূর্ববাংলার মুসলিম আসনের শতকরা সাড়ে ৯৭টি যে একুশ দফার পক্ষে আসিয়াছিল, লাহোর-প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনার দাবি ছিল তার অন্যতম প্রধান দাবি। মুসলিম লীগ তখন কেন্দ্রের ও প্রদেশের সরকারি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। সরকারি সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতা লইয়া তাঁরা এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধতা করিয়াছিলেন। এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিলে

ইসলাম বিপন্ন ও পাকিস্তান ধ্বংস হইবে, এসব যুক্তি তখনও দেওয়া হইয়াছিল। তথাপি পূর্ববাংলার ভোটাররা এই প্রস্তাবসহ একুশ দফার পক্ষে ভোট দিয়াছিল। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের পক্ষের কথা বলিতে গেলে এই প্রশ্ন চূড়ান্তভাবে গণতান্ত্রিক উপায়ে মীমাংসিত হইয়াই গিয়াছে। কাজেই আজ লাহোর-প্রস্তাবভিত্তিক শাসনতন্ত্র রচনার দাবি করিয়া আমি কোনও নূতন দাবি তুলি নাই; পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের পুরানো দাবিরই পুনরুল্লেখ করিয়াছি মাত্র। তথাপি লাহোর-প্রস্তাবের নাম শুনিলেই যাঁরা আঁতকাইয়া উঠেন, তাঁহারা হয় পাকিস্তান-সংগ্রামে শরিক ছিলেন না, অথবা প্রস্তাবই ভালো, না প্রেসিডেনশিয়াল পদ্ধতির সরকার ও পরোক্ষ নির্বাচন এবং ক্ষমতাহীন আইনসভাই ভালো, এ বিচারভার জনগণের ওপর ছাড়িয়া দেওয়াই কি উচিত নয়? তবে পাকিস্তানের ঐক্য-সংহতির এই তরফদারেরা এইসব প্রশ্নে রেফারেন্ডামের মাধ্যমে জনমত যাচাই-এর প্রস্তাব না দিয়া আমার বিরুদ্ধে গালাগালি বর্ষণ করিতেছেন কেন? তাঁহারা যদি নিজেদের মতে এতই আস্থাবান, তবে আসুন এই প্রশ্নের ওপরই গণভোট হইয়া যাক।

২নং দফা

এই দফায় আমি প্রস্তাব করিয়াছি যে, ফেডারেশন সরকারের এখতিয়ারে কেবলমাত্র দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রীয় ব্যাপার এই দুইটি বিষয়ে থাকিবে। অবশিষ্ট সমস্ত বিষয় স্টেটসমূহের (বর্তমান ব্যবস্থায় যাকে প্রদেশ বলা হয়) হাতে থাকিবে।

এই প্রস্তাবের দরুনই কায়েমি স্বার্থে দালালরা আমার ওপর সর্বাপেক্ষা বেশি চটিয়াছেন। আমি নাকি পাকিস্তানকে দুই টুকরা করতঃ ধ্বংস করিবার প্রস্তাব দিয়াছি। সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি ইহাদের এতই অন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে যে, ইহারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মৌল সূত্রগুলি পর্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন। ইহারা ভুলিয়া যাইতেছেন যে, ব্রিটিশ সরকারের ক্যাবিনেট মিশন ১৯৪৬ সালে যে 'প্ল্যান' দিয়াছিলেন এবং যে 'প্ল্যান' কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও যোগাযোগ ব্যবস্থা এই তিনটি মাত্র বিষয় ছিল এবং বাকি সব বিষয়ই প্রদেশের হাতে দেওয়া হইয়াছিল। ইহা হইতে এটাই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ব্রিটিশ সরকার, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সকলের মত এই যে, এই তিনটি মাত্র বিষয় কেন্দ্রের হাতে থাকিলেই কেন্দ্রীয় সরকার চলিতে পারে। অন্য কারণে কংগ্রেস চুক্তি-ভঙ্গ করায় ক্যাবিনেট প্ল্যান পরিত্যক্ত হয়। তাহা না হইলে এই তিন বিষয় লইয়াই আজও ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার চলিতে থাকিত। আমি আমার প্রস্তাবে ক্যাবিনেট প্ল্যানেরই অনুসরণ করিয়াছি। যোগাযোগ ব্যবস্থা আমি বাদ দিয়াছি সত্য, কিন্তু তাহার যুক্তিসঙ্গত কারণও আছে। অখণ্ড ভারতের বেলায় যোগাযোগ ব্যবস্থাও অখণ্ডতা ছিল। ফেডারেশন গঠনের রাষ্ট্র-বৈজ্ঞানিক মূলনীতি এই যে, যে-যে বিষয়ে ফেডারেটিং স্টেটসমূহের স্বার্থ এক ও অবিভাজ্য, কেবল সেই সেই বিষয়ই ফেডারেশনের এখ্‌তিয়ার দেওয়া হয়। এই

মূলনীতি অনুসারে অখণ্ড ভারতে যোগাযোগ ব্যবস্থা এক ও অবিভাজ্য ছিল। পেশাওয়ার হইতে চাটগাঁ পর্যন্ত একই রেল চলিতে পারিত। কিন্তু পাকিস্তানে তা নয়। দুই অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা এক ও অবিভাজ্য তো নয়ই, বরং সম্পূর্ণ পৃথক। রেলওয়েকে প্রাদেশিক সরকারের হাতে ট্রান্সফার করিয়া বর্তমান সমরকারও তা স্বীকার করিয়াছেন। টেলিফোন-টেলিগ্রাফ পোস্টাফিসের ব্যাপারেও এ সত্য স্বীকার করিতেই হইবে।

তবে বলা যাইতে পারে যে, একশ' দফায় যখন কেন্দ্রকে তিনটি বিষয় দিবার সুপারিশ ছিল, তখন আমি আবার বর্তমান প্রস্তাবে মাত্র দুই বিষয় দিলাম কেন? এই প্রশ্নের জবাব আমি ৩নং দফার ব্যাখ্যায় দিয়াছি। এখানে আর পুনরুক্তি করিলাম না।

আরেকটা ব্যাপারে ভুল ধারণা সৃষ্টি হইতে পারে। আমার প্রস্তাবে ফেডারেটিং ইউনিটকে 'প্রদেশ' না বলিয়া 'স্টেট বলিয়াছি। ইহাতে কায়েমি স্বার্থ শোষকরা জনগণকে এই বলিয়া ধোঁকা দিতে পারে এবং দিতেও শুরু করিয়াছে যে, 'স্টেট' অর্থে আমি 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেট' বা স্বাধীন রাষ্ট্র বোঝাইয়াছি। কিন্তু তাহা সত্য নয়। ফেডারেটিং ইউনিটকে দুনিয়ার সর্বত্র সব বড় বড় ফেডারেশনেই 'প্রদেশ' বা 'প্রভিন্স' না বলিয়া 'স্টেটস্' বলা হইয়া থাকে। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকে ফেডারেশন অথবা ইউনিয়ন বলা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন, ফেডারেল জার্মানি, এমনকি আমাদের প্রতিবেশী ভারত রাষ্ট্র সকলেই তাহাদের প্রদেশসমূহকে 'স্টেট ও কেন্দ্রকে ইউনিয়ন বা ফেডারেশন বলিয়া থাকে। আমাদের পার্শ্ববর্তী আসাম ও পশ্চিম বাংলা 'প্রদেশ' নয় 'স্টেট'। এরা যদি ভারত ইউনিয়নের প্রদেশ হইয়া 'স্টেট হওয়ার সম্মান হইতে পারে, তবে পূর্ব পাকিস্তানকে এইটুকু নামের মর্যাদা দিতেই বা কর্তারা এত এলার্জিক কেন?

৩নং দফা

এই দফায় আমি মুদ্রা সম্পর্কে দুইটি বিকল্প বা অল্টারনেটিভ প্রস্তাব দিয়াছি। এই দুটি প্রস্তাবের যে কোনও একটি গ্রহণ করিলেই চলিবে :

(ক) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রার প্রচলন করিতে হইবে। এই ব্যবস্থা অনুসারে কারেন্সি কেন্দ্রের হাতে থাকিবে না, আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকিবে। দুই অঞ্চলের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র 'স্টেট' ব্যাংক থাকিবে।

(খ) দুই অঞ্চলের জন্য একই কারেন্সি থাকিবে। এ ব্যবস্থায় এ মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে। কিন্তু এ অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকিতে হইবে যাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হইতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানের একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকিবে; দুই অঞ্চলে দুইটি পৃথক ব্যাঙ্ক থাকিবে।

এই দুইটি বিকল্প প্রস্তাব আমি করি নাই। যদি আমার দ্বিতীয় অল্টারনেটিভ গৃহীত নয়, তবে মুদ্রা কেন্দ্রের হাতেই থাকিয়া যাইবে। ঐ অবস্থায় আমি একুশ দফা প্রস্তাবের খেলাফে কোনও সুপারিশ করিয়াছি, একথা বলা চলে না।

যদি পশ্চিম পাকিস্তানি ভাইরা আমার এই প্রস্তাবে রাজি না হন, তবেই শুধু প্রথম বিকল্প অর্থাৎ কেন্দ্রের হাত হইতে মুদ্রাকে প্রদেশের হাতে আনিতে হইবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ভুল বোঝাবুঝির অবসান হইলে আমাদের এবং উভয় অঞ্চলের সুবিধার খাতিরে পশ্চিম পাকিস্তানি ভাইরা এই প্রস্তাবে রাজি হইবেন। আমরা তাঁদের খাতিরে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ত্যাগ করিয়া সংখ্যা-সাম্য মানিয়া লইয়াছি, তাঁহারা কি এইটুকু করিবেন না?

আর যদি অবস্থাগতিতে মুদ্রাকে প্রদেশের এলাকায় আনিতেও হয়, তবু তাতে কেন্দ্র দুর্বল হইবে না। পাকিস্তানের কোনও অনিষ্ট হইবে না। ক্যাবিনেট প্ল্যানে নিখিল ভারতীয় কেন্দ্রের যে প্রস্তাব ছিল, তাতে মুদ্রা কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল না। ঐ প্রস্তাব পেশ করিয়া বৃটিশ সরকার এবং ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে, মুদ্রাকে কেন্দ্রীয় বিষয় না করিয়াও কেন্দ্র চলিতে পারে। কথাটা সত্য। রাষ্ট্রীয় অর্থ-বিজ্ঞানে এই ব্যবস্থার স্বীকৃতি আছে। কেন্দ্রের বদলে প্রদেশের হাতে অর্থনীতি রাখা এবং একই দেশে পৃথক পৃথক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকার নজির দুনিয়ার বড় বড় শক্তিশালী রাষ্ট্রেও আছে। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি চলে ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেমের মাধ্যমে পৃথক পৃথক স্টেট ব্যাঙ্কের দ্বারা। এতে যুক্তরাষ্ট্র ধ্বংস হয় নাই; তাহাদের আর্থিক বুনিয়াদও ভাঙিয়া পড়ে নাই। অত যে শক্তিশালী দোর্দণ্ডপ্রতাপ সোভিয়েট ইউনিয়ন, তাহাদেরও কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও অর্থমন্ত্রী বা অর্থ দফতর নাই। শুধু প্রাদেশিক সরকারের অর্থাৎ স্টেট রিপাবলিকসমূহেরই অর্থমন্ত্রী ও অর্থ দফতর আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক প্রয়োজন ঐসব প্রাদেশিক মন্ত্রী ও মন্ত্রী দফতর দিয়াই মিটিয়া থাকে। দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশেও আঞ্চলিক সুবিধার খাতিরে দুইটি পৃথক ও স্বতন্ত্র রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বহুদিন আগে হইতেই চালু আছে।

আমার প্রস্তাবের মর্ম এই যে, উপরোক্ত দুই বিকল্পের দ্বিতীয়টি গৃহীত হইলে মুদ্রা কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে থাকিবে। সে অবস্থায় উভয় অঞ্চলের একই নক্‌শার মুদ্রা বর্তমানে যেমন আছে তেমনি থাকিবে। পার্থক্য শুধু এই হইবে যে, পূর্ব পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে ইস্যু হইবে এবং তাতে 'পূর্ব পাকিস্তান' বা সংক্ষেপে 'ঢাকা' লেখা থাকিবে। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে ইস্যু হইবে এবং তাতে 'পশ্চিম পাকিস্তান' বা সংক্ষেপে 'লাহোর' লেখা থাকিবে। পক্ষান্তরে, আমার প্রস্তাবের দ্বিতীয় বিকল্প না হইয়া যদি প্রথম বিকল্পও গৃহীত হয়, সে অবস্থাতেও উভয় অঞ্চলের মুদ্রা সহজে বিনিময়যোগ্য থাকিবে এবং পাকিস্তানের ঐক্যের প্রতীক ও নিদর্শনস্বরূপ উভয় আঞ্চলিক সরকারের সহযোগিতায় একই নক্‌শার মুদ্রা প্রচলন করা হইবে।

একটু তলাইয়া চিন্তা করিলেই বোঝা যাইবে যে, এই দুই ব্যবস্থার একটি গ্রহণ করা ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানকে নিশ্চিত অর্থনৈতিক মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করার অন্য কোনও উপায় নাই। সারা পাকিস্তানের জন্য এই মুদ্রা হওয়ায় ও দুই অঞ্চলের মুদ্রার মধ্যে

কোনও পৃথক চিহ্ন না থাকায় আঞ্চলিক কারেন্সি সার্কুলেশনে কোনও বিধি-নিষেধ ও নির্ভুল হিসাব নাই। মুদ্রা ও অর্থনীতি কেন্দ্রীয় সরকারের এখ্‌তিয়ারে থাকায় অতি সহজেই পূর্ব পাকিস্তানের আয় পশ্চিম পাকিস্তানে চলিয়া যাইতেছে। সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, শিল্প-বাণিজ্য, ব্যাঙ্কিং, ইন্স্যুরেন্স ও বৈদেশিক মিশনসমূহের হেড অফিস পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত থাকায় প্রতি মিনিটে এই পাচারের কাজ অবিরাম গতিতে চলিতেছে। সকলেই জানেন সরকারি স্টেট ব্যাঙ্ক ও ন্যাশনাল ব্যাঙ্কসহ সমস্ত ব্যাঙ্কের হেড অফিস পশ্চিম পাকিস্তানে। এই সেদিন মাত্র প্রতিষ্ঠিত ছোট দু-একখানি ব্যাঙ্ক ইহার সাম্প্রতিক ব্যতিক্রম মাত্র। এইসব ব্যাঙ্কের ডিপজিটের টাকা, শেয়ার মানি, সিকিউরিটি মানি, শিল্প-বাণিজ্যের আয়, মুনাফা ও শেয়ারমানি, এক কথায় পূর্ব পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত সমস্ত আর্থিক লেনদেনের টাকা বালুচরে ঢালা পানির মতো একটানে তলদেশে হেড অফিসে অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানে চলিয়া যাইতেছে, পূর্ব পাকিস্তান শুকনা বালুচর হইয়া থাকিতেছে। বালুচরে পানির দরকার হইলে টিউবওয়েল খুঁদিয়া তলদেশ হইতে পানি তুলিতে হয়। অবশিষ্ট পানি তলদেশে জমা থাকে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় অর্থও তেমনি চেকের টিউবওয়েলের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে আনিতে হয়। উদ্বৃত্ত আর্থিক সেভিং তলদেশেই অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানেই জমা থাকে। এই কারণেই পূর্ব পাকিস্তানে ক্যাপিটেল ফর্মেশন হইতে পারে নাই। সব ক্যাপিটেল ফর্মেশন পশ্চিমে হইয়াছে। বর্তমান ব্যবস্থা চলিতে থাকিলে কোনও দিন পূর্ব পাকিস্তানে মূলধন গঠন হইবেও না। কারণ সেভিং মানেই ক্যাপিটেল ফর্মেশন।

শুধু ফ্লাইট-অব-ক্যাপিটেল বা মুদ্রা পাচারই নয়, মুদ্রাস্ফীতি হেতু পূর্ব পাকিস্তানে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দুর্মূল্য, জনগণের বিশেষত পাটচাষীদের দুর্দশা সমস্তের জন্য দায়ী এই মুদ্রাব্যবস্থা ও অর্থনীতি। আমি ৫নং দফার ব্যাখ্যায় এ ব্যাপারে আরও বিস্তারিতভাব এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি। এখানে শুধু এইটুকু বলিয়া রাখিতেছি যে, এই ফ্লাইট-অব-ক্যাপিটেল বন্ধ করিতে না পারিলে পূর্ব পাকিস্তানিরা নিজেরা শিল্প-বাণিজ্যে এক পা-ও অগ্রসর হইতে পারিবে না। কারণ এ অবস্থায় মূলধন গড়িয়া উঠিতে পারে না।

৪নং দফা

এই দফায় আমি প্রস্তাব করিয়াছি যে, সকল প্রকার ট্যাক্স-খাজনা-কর ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের সে ক্ষমতা থাকিবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভিনিউ-এর নির্ধারিত অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে অটোমেটিক্যালি জমা হইয়া যাইবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাঙ্কসমূহের ওপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রেই থাকিবে। এইভাবে জমাকৃত টাকাই ফেডারেল সরকারের তহবিল হইবে।

আমার এই প্রস্তাবেই কায়েমি স্বার্থের কালোবাজারি ও মুনাফাখোর শোষকরা

সবচেয়ে বেশি চমকিয়া উঠিয়াছে। তাহারা বলিতেছে, ট্যাক্স ধার্যের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের না থাকিলে সে সরকার চলিবে কিরূপে? কেন্দ্রীয় সরকারের তাতে যে একেবারে খয়রাতি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে। খয়রাতের ওপর নির্ভর করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার দেশরক্ষা করিবেন কেমনে? পররাষ্ট্রনীতিই বা চালাইবেন কি দিয়া? প্রয়োজনের সময় চাঁদা না দিলে কেন্দ্রীয় সরকার তো অনাহারে মারা যাইবেন। অতএব এটা নিশ্চয়ই পাকিস্তান ধ্বংসেরই ষড়যন্ত্র।

কায়েমি স্বার্থীরা এই ধরনের কত কথাই না বলিতেছেন। অথচ এর একটা আশঙ্কাও সত্য নয়। সত্য যে নয় সেটা বুঝিবার মতো বিদ্যাবুদ্ধি তাঁহাদের নিশ্চয়ই আছে। তবু যে তাঁরা এসব কথা বলিতেছেন, তার একমাত্র কারণ তাঁহাদের ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত স্বার্থ। সে স্বার্থ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে অবাধে শোষণ ও লুণ্ঠন করার অধিকার। তাঁহারা জানেন যে, আমার এই প্রস্তাবে কেন্দ্রকে ট্যাক্স ধার্যের দায়িত্ব দেওয়া না হইলেও কেন্দ্রীয় সরকার নির্বিঘ্নে চলার মতো যথেষ্ট অর্থের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সে ব্যবস্থা নিখুঁত করিবার শাসনতান্ত্রিক বিধান রচনার সুপারিশ করা হইয়াছে। এটাই সরকারি তহবিলের সবচেয়ে অমোঘ, অব্যর্থ ও সর্বাপেক্ষা নিরাপদ উপায়। তাঁরা এটাও জানেন যে, কেন্দ্রকে ট্যাক্স ধার্যের ক্ষমতা না দিয়াও ফেডারেশন চলার বিধান রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্বীকৃত। তাঁরা এ খবরও রাখেন না যে, ক্যাবিনেট মিশনের যে প্ল্যান ব্রিটিশ সরকার রচনা করিয়াছিলেন এবং কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাতেও সমস্ত ট্যাক্স ধার্যের ক্ষমতা প্রদেশের হাতে দেওয়া হইয়াছিল; কেন্দ্রকে সে ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। ৩নং দফার ব্যাখ্যায় আমি দেখাইয়াছি যে, অর্থমন্ত্রী ও অর্থ দফতর ছাড়াও দুনিয়ার অনেক ফেডারেশন চলিতেছে। তার মধ্যে দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী ফেডারেশন সোভিয়েট ইউনিয়নের কথাও আমি বলিয়াছি। তথায় কেন্দ্রে অর্থমন্ত্রী বা অর্থ দফতর বলিয়া কোনও বস্তুর অস্তিত্বই নাই। তাকে কি অর্থাভাবে সোভিয়েট ইউনিয়ন ধ্বংস হইয়া গিয়াছে? তার দেশরক্ষা বাহিনী ও পররাষ্ট্র দফতর কি সেজন্য দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে? পড়ে নাই। আমার প্রস্তাব কার্যকর হইলেও তেমনি পাকিস্তানের দেশরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল হইবে না। কারণ আমার প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় তহবিলের নিরাপত্তার জন্য শাসনতান্ত্রিক বিধানের সুপারিশ করা হইয়াছে। সে অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন বিধান থাকিবে যে, আঞ্চলিক সরকার যেখানে যখন যে খাতেই যে টাকা ট্যাক্স ধার্য ও আদায় করুন না কেন, শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত সে টাকার হারের অংশ রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় তহবিলে জমা হইয়া যাইবে। সে টাকায় আঞ্চলিক সরকারের কোনও হাত থাকিবে না। এই অবস্থায় অনেক সুবিদা হইবে। দ্বিতীয়ত, ট্যাক্স ধার্য ও আদায়ের জন্য কোনও দফতর বা অফিসারবাহিনী রাখিতে হইবে না। তৃতীয়ত, অঞ্চলে ও কেন্দ্রের জন্য ট্যাক্স ধার্য ও আদায়ের মধ্যে ডুপ্লিকেশন হইবে না। তাতে আদায়ী খরচায় অপব্যয় ও অপচয় বন্ধ হইবে। ঐভাবে সঞ্চিত টাকার দ্বারা গঠন ও উন্নয়নমূলক অনেক কাজ করা যাইবে। অফিসারবাহিনীকেও উন্নততর সৎ কাজে নিয়োজিত করা যাইবে। চতুর্থত,

ট্যাক্স ধার্য ও আদায়ের একীকরণ সহজতর হইবে। সকলেই জানেন, অর্থ-বিজ্ঞানীরা এখন ক্রমেই সিংগ্‌ল্‌ ট্যাক্সেশনের নীতিকে সকলেই অধিকরত বৈজ্ঞানিক ও ফলপ্রসূ বলিয়া অভিহিত করিতেছেন। ট্যাক্সেশনকে ফেডারেশনের এলাকা হইতে অঞ্চলের এখ্‌তিয়ারভুক্ত করা এই সর্বোত্তম ও সর্বশেষ আর্থিক নীতিগ্রহণের প্রথম পদক্ষেপ বলা যাইতে পারে।

৫নং দফা

এই দফায় আমি বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যাপারে নিম্নরূপ শাসনতান্ত্রিক বিধানের সুপারিশ করিয়াছি :

১. দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক পৃথক হিসাব রাখিতে হইবে,

২. পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের এখ্‌তিয়ারে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের এখ্‌তিয়ারে থাকিবে।

৩. ফেডারেশনের প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা দুই অঞ্চল হইতে সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত হারাহারি মতে আদায় হইবে।

৪. দেশজাত দ্রব্যাদি বিনা শুল্কে উভয় অঞ্চলের মধ্যে আমদানি-রফতানি চলিবে।

৫. ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে বিদেশের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং আমদানি-রফতানি করিবার অধিকার আঞ্চলিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করিয়া শাসনতান্ত্রিক বিধান করিতে হইবে।

পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক নিশ্চিত মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার জন্য এই ব্যবস্থা ৩নং দফার মতোই অত্যাবশ্যক। পাকিস্তানের আঠার বছরের আর্থিক ইতিহাসের দিকে একটু নজর দিলে দেখা যাইবে যে :

(ক) পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা দিয়া পাকিস্তানের শিল্প গড়িয়া তোলা হইয়াছে এবং হইতেছে। সেই সকল শিল্পজাত দ্রব্যের অর্জিত বিদেশী মুদ্রাকে পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা বলা হইতেছে।

(খ) পূর্ব পাকিস্তানে মূলধন গড়িয়া না উঠায় পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা ব্যবহারের ক্ষমতা পূর্ব পাকিস্তানের নাই, এই অজুহাতে পূর্ব পাকিস্তানের বিদেশী আয় পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হইতেছে। এইভাবে পূর্ব পাকিস্তান শিল্পায়িত হইতে পারিতেছে না।

(গ) পূর্ব পাকিস্তান যে পরিমাণে আয় করে সেই পরিমাণ ব্যয় করিতে পারে না। সকলেই জানেন, পূর্ব পাকিস্তান যে পরিমাণ রফতানি করে আমদানি করে সাধারণত তার অর্ধেকেরও কম। ফলে অর্থনীতির অমোঘ নিয়ম অনুসারেই পূর্ব পাকিস্তানে ইন্‌ফ্লেশন বা মুদ্রাস্ফীতি ম্যালেরিয়া জ্বরের মতো লাগিয়াই আছে। তাহার ফলে আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম এত বেশি। বিদেশ হইতে আমদানি করা একই জিনিসের পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানি দামের তুলনা করিলেই

এটা বোঝা যাইবে। বিদেশী মুদ্রা বণ্টনের দায়িত্ব এবং অর্থনৈতিক অন্যান্য সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের এখ্‌তিয়ার থাকার ফলেই আমাদের এই দুর্দশা।

(ঘ) পাকিস্তানের বিদেশী মুদ্রার তিনভাগের দুইভাগই অর্জিত হয় পাট হইতে। অথচ পাটচাষীকে পাটের ন্যায্য মূল্য তো দূরের কথা আবাদী খরচটাও দেওয়া হয় না। ফলে পাটচাষীদের ভাগ্য আজ শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের খেলার জিনিসে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তান সরকার পাটের চাষ নিয়ন্ত্রণ করেন কিন্তু চাষীকে পাটের ন্যায্য দাম দিতে পারেন নাই। এমন অদ্ভুত অর্থনীতি দুনিয়ার আর কোন দেশে নাই। যতদিন পাট থাকে চাষীর ঘরে, ততদিন পাটের দাম থাকে পনর-বিশ টাকা। ব্যবসায়ীর গুদামে চলিয়া যাওয়ার সাথে সাথে তার দাম হয় পঞ্চাশ। এ খেলা গরিব চাষী চিরকাল দেখিয়া আসিতেছে। পাট-ব্যবসায় জাতীয়করণ করিয়া পাট রফতানিকে সরকারি আয়ত্তে আনা ছাড়া এর কোনও প্রতিকার নাই, একথা আমরা বহুবার বলিয়াছি। এ উদ্দেশ্যে আমরা আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভার আমলে জুট মার্কেটিং কর্পোরেশন গঠন করিয়াছিলাম। পরে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে পুঁজিপতিরা আমাদের সে আরাব্ধ কাজ ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন।

(ঙ) পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রাই যে শুধু পশ্চিম পাকিস্তানে খরচ হইতেছে তাহা নয়, আমাদের অর্জিত বিদেশী মুদ্রার জোরে যে বিপুল পরিমাণ বিদেশী লোন ও এইড আসিতেছে, তাও পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় হইতেছে। কিন্তু সে লোনের সুদ বহন করিতে হইতেছে পূর্ব পাকিস্তানকেই। ঐ অবস্তার প্রতিকার করিয়া পাটচাষীকে পাটের ন্যায্য মূল্য দিতে হইলে, আমদানি-রফতানি সমান করিয়া জনসাধারণকে সস্তা দামে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করিয়া তাহাদের জীবন সুখময় করিতে হইলে এবং সর্বোপরি আমাদের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা দিয়া পূর্ব পাকিস্তানির হাতে পূর্ব পাকিস্তানকে শিল্পায়িত করিতে হইলে আমার প্রস্তাবিত এই ব্যবস্থা ছাড়া উপায়ান্তর নাই।

৬নং দফা

এই দফায় আমি পূর্ব পাকিস্তানে মিলিশিয়া বা প্যারামিলিটারি রক্ষীবাহিনী গঠনের সুপারিশ করিয়াছি। এ দাবি অন্যায়ও নয়, নতুনও নয়। একুশ দফার দাবিতে আমরা আনসার বাহিনীকে ইউনিফর্মধারী সশস্ত্র বাহিনীতে রূপান্তরিত করার দাবি করিয়াছিলাম। তাহা তো করা হয়ই নাই, বরঞ্চ পূর্ব পাকিস্তান সরকারের অধীনস্থ ইপিআর বাহিনীকে এখন কেন্দ্রের অধীনে নেওয়া হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র-কারখানা ও নৌ-বাহিনীর হেডকোয়ার্টার স্থাপনকরতঃ এ অঞ্চলকে আত্মরক্ষায় আত্মনির্ভর করার দাবি একুশ দফার দাবি। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার বার বছরেও আমাদের একটি দাবিও পূরণ করেন নাই। পূর্ব পাকিস্তান অধিকাংশ পাকিস্তানির বাসস্থান। এটাকে রক্ষা করা কেন্দ্রীয় সরকারেরই নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। সে দায়িত্ব পালনে আমাদের

দাবি করিতে হইবে কেন? সরকার নিজে হইতে সে দায়িত্ব পালন করেন না কেন? পশ্চিম পাকিস্তান আগে বাঁচাইয়া সময় ও সুযোগ থাকিলে পরে পূর্ব পাকিস্তান বাঁচানো হইবে, ইহাই কি কেন্দ্রীয় সরকারের অভিমত? পূর্ব পাকিস্তানের রক্ষাব্যবস্থা পশ্চিম পাকিস্তানেই রহিয়াছে এমন সাংঘাতিক কথা শাসনকর্তারা বলেন কোন্ মুখে? মাত্র সতের দিনের পাক-ভারত যুদ্ধই কি প্রমাণ করে নাই আমরা কত নিরূপায়? শত্রুর দয়া ও মর্জির ওপর তো আমরা বাঁচিয়া থাকিতে পারি না। কেন্দ্রীয় সরকারের দেশরক্ষা নীতি কার্যতঃ আমাদেরকে তাই করিয়া রাখিয়াছে।

তবু আমরা পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতির খাতিরে দেশরক্ষা ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রাখিতে চাই। সঙ্গে সঙ্গে এও চাই যে, কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানকে এ ব্যাপারে আত্মনির্ভর করিবার জন্য এখানে উপযুক্ত পরিমাণ দেশরক্ষা বাহিনী গঠন করুন। নৌ-বাহিনী অস্ত্র কারখানা স্থাপন করুন। নৌ-বাহিনীর দফতর এখানে নিয়া আসুন। এ সব কাজ সরকার কবে করিবেন জানি না। কিন্তু ইতিমধ্যে অল্প খরচে ছোটখাটো অস্ত্রশস্ত্র দিয়া আধাসামরিক বাহিনী গঠন করিতেও পশ্চিমা ভাইদের এত আপত্তি কেন? পূর্ব পাকিস্তান রক্ষার উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র যুদ্ধ-তহবিলে চাঁদা উঠিলে তাও কেন্দ্রীয় রক্ষা তহবিলে নিয়া যাওয়া হয় কেন? ঐসব প্রশ্নের উত্তর নাই। তবু কেন্দ্রীয় ব্যাপারে অঞ্চলের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার আমরাও চাই না। এ অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তান যেমন করিয়া পারে গরিবী হালেই আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিবে, এমন দাবি কি অন্যায়? এই দাবি করিলেই সেটা হইবে দেশদ্রোহিতা?

এ প্রসঙ্গে পাকিস্তানি ভাই-বোনদের খেদমতে আমার কয়েকটি আরজ আছে :

এক. তাঁহারা মনে করিবেন না আমি শুধু পূর্ব পাকিস্তানিদের অধিকার দাবি করিতেছি। আমার ৬ দফা কর্মসূচিতে পশ্চিম পাকিস্তানিদের দাবিও সমভাবেই রহিয়াছে। এ দাবি স্বীকৃত হইলে পশ্চিম পাকিস্তানিরাও সমভাবে উপকৃত হইবেন।

দুই. আমি যখন বলি, পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার ও স্তূপিকৃত হইতেছে তখন আমি আঞ্চলিক বৈষম্যের কথাই বলি, ব্যক্তিগত বৈষম্যের কথা বলি না। আমি জানি, এ বৈষম্য সৃষ্টির জন্য পশ্চিম পাকিস্তানিরা দায়ী নয়। আমি এও জানি যে, আমাদের মতো দরিদ্র পশ্চিম পাকিস্তানেও অনেক আছেন। যতদিন ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অবসান না হইবে, ততদিন ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এই অসাম্য দূর হইবে না? কিন্তু তাহার আগে আঞ্চলিক শোষণও বন্ধ করিতে হইবে। এই আঞ্চলিক শোষণের জন্য দায়ী আমাদের ভৌগোলিক অবস্থান এবং সেই অবস্থানকে অগ্রাহ্য করিয়া যে অস্বাভাবিক ব্যবস্থা চালাইবার চেষ্টা চলিতেছে সেই ব্যবস্থা। ধরুন, যদি পাকিস্তানের রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে না হইয়া পূর্ব পাকিস্তানে হইত, পাকিস্তানের দেশরক্ষা বাহিনীর তিনটি দফতরই যদি পূর্ব পাকিস্তানে হইত, তবে কার কি অসুবিধা-সুবিধা হইত এটুকু বিচার করুন। পাকিস্তানের মোট রাজস্বের শতকরা বাষট্টি টাকা খরচ হয় দেশরক্ষা বাহিনীতে এবং শতকরা বত্রিশ টাকা খরচ হয় কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনায়। এই একুশ শতকরা

চুরানব্বই টাকা পশ্চিম পাকিস্তানে না হইয়া তখন খচর হইত পূর্ব পাকিস্তানে। আপনারা জানেন অর্থ-বিজ্ঞানের কথা : সরকারি আয় জনগণের ব্যয় এবং সরকারি ব্যয় জনগণের আয়। এই নিয়মে বর্তমান ব্যবস্থায় সরকারের গোটা আয়ের অর্ধেক পূর্ব পাকিস্তানের ব্যয় ঠিকই, কিন্তু সরকারি ব্যয়ের সবটুকুই পশ্চিম পাকিস্তানের আয়। রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে অবহিত থাকায় সরকারি, আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং বিদেশী মিশনসমূহ তাহাদের সমস্ত ব্যয় পশ্চিম পাকিস্তানেই করিতে বাধ্য হইতেছেন। এই ব্যয়ের সাকুল্যই পশ্চিম পাকিস্তানের আয়। ফলে, প্রতিবছর পশ্চিম পাকিস্তানের আয় ঐ অনুপাতে বাড়িতেছে এবং পূর্ব পাকিস্তান তাহার মোকাবিলায় ঐ পরিমাণ গরিব হইতেছে। যদি পশ্চিম পাকিস্তানের বদলে পূর্ব পাকিস্তানে আমাদের রাজধানী হইত তবে এইসব খরচ পূর্ব পাকিস্তানে হইত। আমরা পূর্ব পাকিস্তানিরা এই পরিমাণে ধনী হইতাম। আপনারা পাকিস্তানিরা ঐ পরিমাণে গরিব হইতেন। তখন আপনারা কি করিতেন? যেসব দাবি করার জন্য আমাকে প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতার তহ্মত দিতেছেন সেইসব দাবি আপনারা নিজেরাই করিতেন। আমাদের চেয়ে জোরেই করিতেন। অনেক আগেই করিতেন। আমাদের মতো আঠার বছর বসিয়া থাকিতেন না। সেটা করা আপনাদের অন্যায়ও হইত না।

তিন. আপনারা ঐসব দাবি করিলে আমরা পূর্ব পাকিস্তানিরা কি করিতাম, জানেন? আপনাদের সব দাবি মানিয়া লইতাম। আপনাদিগকে প্রাদেশিকতাবাদী বলিয়া গাল দিতাম না। কারণ, আমরা জানি এবং বিশ্বাস করি, ও সব আপনাদের হক্ (পাওনা)। নিজের হক্ (পাওনা) দাবি করা অন্যায় নয়, কর্তব্য। এ বিশ্বাস আমাদের এতই আন্তরিক যে, সে অবস্থা হইলে আপনাদের দাবি করিতে হইত না। আপনাদের দাবি করার আগেই আপনাদের হক্ আপনাদিগকে বোঝাইয়া দিতাম। আমরা নিজেদের হক্ দাবি করিতেছি বলিয়া আমাদের স্বার্থপর বলিতেছেন। কিন্তু আপনারা যে নিজেদের হকের সাথে সাথে আমাদের হক্টাও খাইয়া ফেলিতেছেন, আপনাদের লোকে কি বলিবে? আমরা শুধু নিজেদের হক্টাই চাই। আপনাদের হক্টা আত্মসাৎ করিতে চাই না। আমাদের দিবার আওকাৎ থাকিলে বরঞ্চ পরকে কিছু দিয়াও দেই। দৃষ্টান্ত চান? শুনুন তবে :

(১) প্রথম গণপরিষদে আমাদের মেম্বার সংখ্যা ছিল ৪৪; আর আপনাদের ছিল ২৮। আমরা ইচ্ছা করিলেই গণতান্ত্রিক শক্তিতে ভোটের জোরে রাজধানী ও দেশরক্ষার সদর দফতর পূর্ব পাকিস্তানে আনিতে পারিতাম। তাহা করি নাই।

(২) পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাল্পতা দেখিয়া ভাই-এর দরদ লইয়া আমাদের ৪৪টা আসনের মধ্যে ৬টাতে পূর্ব পাকিস্তানির ভোটে পশ্চিম পাকিস্তানি মেম্বর নির্বাচন করিয়াছিলাম।

(৩) ইচ্ছা করিলে ভোটের জোরে শুধু বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করিতে

পারিতাম। তাহা না করিয়া বাংলার সাথে উর্দুকেও রাষ্ট্রভাষার দাবি করিয়াছিলাম।

(৪) ইচ্ছা করিলে ভোটের জোরে পূর্ব পাকিস্তানের সুবিধাজনক শাসনতন্ত্র রচনা করিতে পারিতাম।

(৫) আপনাদের মন হইতে মেজরিটি ভয় দূর করিয়া সে স্থলে ভ্রাতৃত্ব ও সমতাবোধ সৃষ্টির জন্য উভয় অঞ্চলে সকল বিষয়ে সমতা বিধানের আশ্বাসে আমরা সংখ্যাগুরুত্ব ত্যাগ করিয়া সংখ্যা-সাম্য গ্রহণ করিয়াছিলাম।

চার. সুতরাং পশ্চিম পাকিস্তানি ভাই সাহেবান, আপনারা দেখিতেছেন, যেখানে-যেখানে আমাদের দান করিবার আওকাৎ ছিল, আমরা দান করিয়াছি। আর কিছুই নাই দান করিবার। থাকিলে নিশ্চয় দিতাম। যদি পূর্ব পাকিস্তানে রাজধানী হইত তবে আপনাদের দাবি করিবার আগেই আমরা পশ্চিম পাকিস্তানে সত্যসত্যই দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করিতাম। দ্বিতীয় রাজধানীর নামে ধোঁক দিতাম না। সে অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের সকল প্রকার ব্যয় যাতে উভয় অঞ্চলে সমান হয়, তাহার নিখুঁত ব্যবস্থা করিতাম। সকল ব্যাপারে পশ্চিম পাকিস্তানকে সামগ্রিকভাবে এবং প্রদেশসমূহকে পৃথক পৃথকভাবে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতাম। আমরা দেখাইতাম, পূর্ব পাকিস্তানি মেজরিটি বলিয়াই পাকিস্তান শুধু পূর্ব পাকিস্তানিদের নয়, ছোট-বড় নির্বিশেষে তাহা সকল পাকিস্তানির। পূর্ব পাকিস্তানে রাজধানী হইলে তাহার সুযোগ লইয়া আমরা পূর্ব পাকিস্ত ানিরা সব অধিকার ও চাকুরি গ্রাস করিতাম না। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসনভার পশ্চিম পাকিস্তানিদের হাতেই দিতাম। আপনাদের কটন বোর্ডে আমরা চেয়ারম্যান হইতে যাইতাম না। আপনাদের প্রদেশের আমরা গভর্নর হইতেও চাহিতাম না। আপনাদের পিআইডিসি, আপনাদের ওয়াদা, আপনাদের ডিআইডি, আপনাদের পোর্ট ট্রাস্ট, আপনাদের রেলওয়ে ইত্যাদির চেয়ারম্যানী আমরা দখল করিতাম না। আপনাদেরই করিতে দিতাম। সমস্ত অল্ পাকিস্তানি প্রতিষ্ঠানকে পূর্ব পাকিস্তানে কেন্দ্রীভূত করিতাম না। ফলতঃ পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনীতিতে মোটা ও পশ্চিম পাকিস্তানকে সরু করিতাম না। দুই অঞ্চলের মধ্যে এই মারাত্মক ডিসপ্যারিটি সৃষ্টি হইতে দিতাম না।

এমনি উদারতা, এমন নিরপেক্ষতা, পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে এমন ইন্‌সাফ-বোধই পাকিস্তানি দেশপ্রেমের বুনিয়াদ। এটা যার মধ্যে আছে কেবল তিনিই দেশপ্রেমিক। যে নেতার মধ্যে এই প্রেম আছে, কেবল তিনিই পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের ওপর নেতৃত্বের যোগ্য। যে নেতা বিশ্বাস করেন, দুইটি অঞ্চল আসলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় দেহের দুই চোখ, দুই কান, দুই নাসিকা, দুই পাটি দাঁত, দুই হাত, দুই পা; যে নেতা বিশ্বাস করেন পাকিস্তানকে শক্তিশালী করিতে হইলে এইসব জোড়ার দুইটিকেই সমান সুস্থ ও শক্তিশালী করিতে হইবে; যে নেতা বিশ্বাস করেন পাকিস্তানের এক অঙ্গ দুর্বল হইলে গোটা পাকিস্তানই দুর্বল হইয়া পড়ে; যে নেতা বিশ্বাস করেন ইচ্ছা করিয়া বা জানিয়া-শুনিয়া যাহারা পাকিস্তানের এ অঙ্গকে দুর্বল করিতে চায়

তাহারা পাকিস্তানের দুশ্‌মন; যে নেতা দৃঢ় ও সবল হস্তে সেই দুশ্‌মনদের শায়েস্তা করিতে প্রস্তুত আছেন, কেবল তিনিই পাকিস্তানের জাতীয় নেতা হইবার অধিকারী। কেবল তাঁরই নেতৃত্বে পাকিস্তানের ঐক্য অটুট ও শক্তি অপরাজেয় হইবে। পাকিস্তানের মতো বিশাল ও অসাধারণ রাষ্ট্রের নায়ক হইতে হইলে নায়কের অন্তরও হইতে হইবে বিশাল ও অসাধারণ। আশা করি, আমার পশ্চিম পাকিস্তানি ভাইরা এই মাপকাঠিতে আমার ৬ দফা কর্মসূচির বিচার করিবেন। তা যদি তাঁহারা করেন তবে দেখিতে পাইবেন, আমার এই ৬ দফা শুধু পূর্ব পাকিস্তানের বাঁচার দাবি নয়, গোটা পাকিস্তানেরই বাঁচার দাবি।

আমার প্রিয় ভাই-বোনেরা, আপনারা দেখিতেছেন যে, আমার ৬ দফা দাবিতে একটিও অন্যায়, অসঙ্গত, পশ্চিম পাকিস্তানবিরোধী বা পাকিস্তান ধ্বংসকারী প্রস্তাব করি নাই। বরঞ্চ আমি যুক্তিতর্ক সহকারে দেখাইলাম, আমার সুপারিশ গ্রহণ করিলে পাকিস্তান আরো অনেক বেশি শক্তিশালী হইবে। তথাপি কায়েমি স্বার্থের মুখপাত্ররা আমার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার এলজাম লাগাইতেছেন। এটা নতুনও নয়, বিস্ময়ের কথাও নয়। পূর্ব পাকিস্তানের মজলুম জনগণের পক্ষে কথা বলিতে গিয়া আমার বাপ-দাদার মতো মুরুব্বিরাই এদের হাতে লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন, আর আমি কোন ছার? দেশবাসীর মনে আছে, আমাদের নয়নমণি শেরে বাংলা ফজলুল হককে এরা দেশদ্রোহী বলিয়াছেন। দেশবাসী এও দেখিয়াছেন যে, পাকিস্তানের অন্যতম স্রষ্টা, পাকিস্তানের সর্বজনমান্য জাতীয় নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দীকেও দেশদ্রোহিতার অভিযোগে কারাবরণ করিতে হইয়াছিল এদেরই হাতে। অতএব দেখা গেল পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবির কথা বলিতে গেলে দেশদ্রোহিতার বদনাম ও জেল-জুলুমের ঝুঁকি লইয়াই সে কাজ করিতে হইবে। অতীতে এমন অনেক জেল-জুলুম ভুগিবার তক্‌দির আমার হইয়াছে। মুরুব্বিদের দোওয়ায়, সহকর্মীদের সহৃদয়তায় এবং দেশবাসীর সমর্থনে সেসব সহ্য করিবার মতো মনের বল আল্লাহ্‌ আমাকে দান করিয়াছেন। সাড়ে পাঁচ কোটি পূর্ব পাকিস্তানির ভালোবাসাকে সম্বল করিয়া আমি এ কাজে যে-কোনও ত্যাগের জন্য প্রস্তুত আছি। আমার দেশবাসীর কল্যাণের কাছে আমার মতো নগণ্য ব্যক্তির জীবনের মূল্যই বা কতটুকু? মজলুম দেশবাসীর বাঁচার জন্য সংগ্রাম করার চেয়ে মহৎ কাজ আর কিছুই আছে বলিয়া আমি মনে করি না। মরহুম শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর ন্যায় যোগ্য নেতার কাছেই আমি এ জ্ঞান লাভ করিয়াছি। তাঁহার পায়ের তলে বসিয়াই এতকাল দেশবাসীর খেদমত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। তিনিও আজ বাঁচিয়া নাই, আমিও আজ যৌবনের কোঠা বহু পিছনে ফেলিয়া প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছিয়াছি। আমার দেশের প্রিয় ভাই-বোনেরা আল্লাহ্‌র দরগায় শুধু এই দোয়া করিবেন, বাকি জীবনটুকু আমি যেন তাঁহাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি-সাধনায় নিয়োজিত করিতে পারি।

আপনাদের স্নেহধন্য খাদেম

৪ চৈত্র, ১৩৭২

শেখ মুজিবুর রহমান

ছাত্রদের ১১ দফা

পাকিস্তানের আবালবৃদ্ধবনিতা, ছাত্র-জনতা, কৃষক-মজুর, মেহনতী শিক্ষক, ডাক্তার-কবিরাজ, রিক্সাওয়ালা, ডোম-মেথর, মাঝি-কুলি দেশের সকল শ্রেণী, সকল স্তরের মানুষ এক বাক্যে, সমস্ত অন্তর দিয়ে ঐতিহাসিক ১১ দফা সমর্থন করেছিল। ১১ দফাকে তাদের প্রাণের দফা বলে স্বীকার করে নিয়েছিল।

মজলম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ছাত্র-জনতার ১১ দফার সমর্থনে সুস্পষ্ট এং দ্বিধাহীনভাবে বলেছিলেন, "ছাত্রদের ১১-দফা সারা পাকিস্তানের ১২ কোটি জনতার দাবি। এই ১১-দফা সঠিকভাবে কায়েম হলে আমাদের দলের ১৪ দফাও বহুলাংশে কায়েম হয়ে যাবে। সুতরাং ১১-দফার জন্যে শুধু ছাত্ররাই প্রাণ দেবে কেন? এই ১১-দফার জন্যে কৃষক-মজুর, মেহনতী মজলুম জনগনও অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিবে।"

এই ১১ দফার আন্দোলনের কৃষক সমিতির সদস্য ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান প্রথম শহীন হন। এই ১১ দফা দাবির ওপর তিনি রক্তের স্বাক্ষর অঙ্কিত করে অমর হয়ে রয়েছেন। শত শত ছাত্র-জনতার প্রাণরক্তে জনতার মুক্তিসনদ ১১ দফা লিখা হয়ে গেছে।

পূর্ব পাকিস্তানের বিশেষ জনপ্রিয় সংগ্রামী নেতা শেখ মুজিবুর রহমান লক্ষাধিক জনতার সামনে সুস্পষ্টভাবে ওয়াদা করেছিলেন, "১১ দফা দাবির ভেতরে আমাদের দলের ৬ দফাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সুতরাং ছাত্রদের ১১ দফা কায়েম করার সংগ্রামে আমরাও শরীক হবো। তিনি প্রসঙ্গক্রমে আরো বলেন যে, ছাত্র-জনতা আমাকে ফাঁসির কবল হতে মুক্ত করে এনেছে। তাদের সাথে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করব না, করতে পারি না।"

জনতার রক্তের কালিতে লেখা সেই ঐতিহাসিক ১১ দফা নিম্নে দেয়া হলো :

১. (ক) সচ্ছল কলেজসমূহকে প্রাদেশিকীকরণের নীতি পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং জগন্নাথ কলেজসহ প্রাদেশিকীকরণকৃত কলেজসমূহকে পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া দিতে হইবে।

(খ) শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের জন্য প্রদেশের সর্বত্র বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চলে স্কুল-কলেজ স্থাপন করিতে হইবে এবং বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত স্কুল-কলেসসমূহকে সত্ত্বর অনুমোদন দিতে হইবে। কারিগরী শিক্ষা প্রসারের

জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, পলিটেকনিক, টেকনিক্যাল ও কমার্শিয়েল ইনস্টিটিউট স্থাপন করিতে হইবে।

(গ) প্রদেশের কলেজসমূহে দ্বিতীয় শিফটে নৈশ আই.এ; আই.এস.সি; আই.কম ও বি.এ; বি.এস.সি; বি.কম এবং প্রতিষ্ঠিত কলেজসমূহে নৈশ এম.এ. ও এমকম ক্লাস চালু করিতে হইবে।

(ঘ) ছাত্র বেতন শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাস করিতে হইবে। স্কলারশিপ ও স্টাইপেন্ডের সংখ্যা সৃষ্টি করিতে হইবে এবং ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার অপরাধে স্কলারশিপ ও স্টাইপেন্ড কাড়িয়া লওয়া চলিবে না।

(ঙ) হল, হোস্টেলের ডাইনিং হল ও ক্যান্টিন খরচার শতকরা ৫০ ভাগ সরকার কর্তৃক 'সাবসিডি' হিসাবে প্রদান করিতে হইবে।

(চ) হল ও হোস্টেল সমস্যার সমাধান করিতে হইবে।

(ছ) মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অফিস-আদালতে বাংলা ভাষা চালু করিতে হইবে। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত সংখ্যক অভিজ্ঞ শিক্ষকের ব্যবস্থা করিতে হইবে। শিক্ষকের বেতন বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার দিতে হইবে।

(জ) অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করিতে হইবে। নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার করিতে হইবে।

(ঝ) মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে এবং অটোমেশন প্রথা বিলোপ, নমিনেশন ভর্তি প্রথা বন্ধ, মেডিক্যাল কাউন্সিল অর্ডিন্যান্স বাতিল, ডেন্টাল কলেজকে পূর্ণাঙ্গ কলেজে পরিণত করা প্রভৃতি মেডিক্যাল ছাত্রদের দাবী মানিয়া লইতে হইবে। নার্স ছাত্রীদের সকল দাবী মানিয়া লইতে হইবে।

(ঞ) প্রকৌশল শিক্ষার অটোমেশন প্রথা বিলোপ, ১০% ও ৭৫% রুল বাতিল, সেন্ট্রাল লাইব্রেরীর সুব্যবস্থা, প্রকৌশলী ছাত্রদের শেষ বর্ষেও ক্লাস দেওয়ার ব্যবস্থাসহ সকল দাবী মানিয়া লইতে হইবে।

(ট) পলিটেকনিক ছাত্রদের 'কনডেন্স কোর্স'-এর সুযোগ দিতে হইবে এবং বোর্ড ফাইনালে পরীক্ষা বাতিল করিয়া একমাত্র সেমিস্টার পরীক্ষা ভিত্তিতেই ডিপ্লোমা দিতে হইবে।

(ঠ) টেক্সটাইল, সিরামিক, লেদার টেকনোলজি এবং আর্ট কলেজ ছাত্রদের সকল দাবি অবিলম্বে মানিয়া লইতে হইবে। আইইআর ছাত্রদের দশ-দফা; সমাজকল্যাণ কলেজ ছাত্রদের, এম.বি.এ. ছাত্রদের ও আইনের ছাত্রদের সমস্ত দাবী মানিয়া লইতে হইবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্য বিভাগকে আলাদা 'ফ্যাকাল্টি' করিতে হইবে।

(ড) কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ ছাত্রদের ন্যায্য দাবী মানিয়া লইতে হইবে।

কৃষি ডিপ্লোমা ছাত্রদের কনডেন্স কোর্সের দাবিসহ কৃষি ছাত্রদের সকল দাবী মানিয়া লইতে হইবে।

(ঢ) ট্রেনে, স্টিমারে ও লঞ্চে ছাত্রদের 'আইডেন্টিটি' কার্ড দেখাইয়া শতকরা পঞ্চাশ ভাগ 'কন্সেশনে' টিকিট দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। মাসিক টিকিটেও এই 'কন্সেশন' দিতে হইবে। পশ্চিম পাকিস্তানের মত বাসে ১০ পয়সা ভাড়ায় শহরের যে কোন স্থানে যাতায়াতের ব্যবস্থা করিতে হইবে। দূরবর্তী অঞ্চলে বাসে যাতায়াতেও শতকরা ৫০ ভাগ 'কন্সেশন' দিতে হইবে। ছাত্রীদের স্কুল-কলেজে যাতায়াতের জন্য পর্যাপ্ত বাসের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সরকারি ও আধা সরকারি উদ্যোগে আয়োজিত খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ছাত্রদের শতকরা ৫০ ভাগ 'কন্সেশন' দিতে হইবে।

(ণ) চাকুরীর নিশ্চয়তা বিধান করিতে হইবে।

(ত) কুখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স সম্পূর্ণ বাতিল করিতে হইবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হইবে।

(থ) শাসকগোষ্ঠীর শিক্ষা সংকোচন নীতির প্রামাণ্য দলিল জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ও হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট সম্পূর্ণ বাতিল করিতে এবং ছাত্র সমাজ ও দেশবাসীর স্বার্থে গণমুখী ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েম করিতে হইবে।

২. প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। বাক-স্বাধীনতা, ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দিতে হইবে। দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিতে হইবে।

৩. নিম্নলিখিত দাবীসমূহ মানিয়া লইবার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হইবে :

(ক) দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো হইবে ফেডারেশন শাসনতান্ত্রিক রাষ্ট্র-সংঘ এবং আইন পরিষদের ক্ষমতা হইবে সার্বভৌম।

(খ) ফেডারেল সরকারের ক্ষমতা দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি ও মুদ্রা এই কয়টি বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকিবে। অপরাপর সকল বিষয়ে অঙ্গ রাষ্ট্রগুলোর ক্ষমতা হইবে নিরঙ্কুশ।

(গ) দুই অঞ্চলের জন্য একই মুদ্রা থাকিবে। এই ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে। কিন্তু এই অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকিতে হইবে যে, যাহাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হইতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানে একটি ফেডারেশন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকিবে। দুই অঞ্চলে দুইটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকিবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্যে পৃথক অর্থনীতি প্রবর্তন করিতে হইবে।

(ঘ) সকল প্রকার ট্যাক্স, খাজনা, কর ধার্য ও আদায়ের সকল ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের কোন কর ধার্য করিবার ক্ষমতা থাকিবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভিনিউর নির্ধারিত অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে জমা হইবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাঙ্কসমূহের উপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রে থাকিবে।

(ঙ) ফেডারেশনের প্রতিটি রাষ্ট্র বহিঃবাণিজ্যের পৃথক হিসাব রক্ষা করিবে এবং বহিঃবাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত মুদ্রা অঙ্গরাষ্ট্রগুলির এক্তিয়ারধীন থাকিবে। ফেডারেল সরকারের প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা অঙ্গরাষ্ট্রগুলি সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রের নির্ধারিত ধারা অনুযায়ী প্রদান করিবে। দেশজাত দ্রব্যাদি বিনা শুল্কে অঙ্গরাষ্ট্রগুলির মধ্যে আমদানী-রপ্তানী চলিবে। এবং ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে বিদেশী রাষ্ট্রগুলির সাথে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং আমদানি-রপ্তানী করিবার অধিকার অঙ্গরাষ্ট্রগুলির হাতে ন্যস্ত করিয়া শাসনতন্ত্রে বিধান করিতে হইবে।

(চ) পূর্ব পাকিস্তানকে মিলিশিয়া বা প্যারা মিলিটারী রক্ষীবাহিনী গঠনের ক্ষমতা দিতে হইবে। পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র কারখানা নির্মাণ ও নৌবাহিনীর সদর দপ্তর স্থাপন করিতে হইবে।

৪. পশ্চিম পাকিস্তানের বেলুচিস্তান, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ সিন্ধুসহ সকল প্রদেশের স্বায়ত্তশাসন প্রদান করতঃ সাব ফেডারেশন গঠন।

৫. ব্যাঙ্ক-বীমা, পাট ব্যবসা ও বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণ করিতে হইবে।

৬. কৃষকের উপর হইতে খাজনা ও ট্যাক্সের হার হ্রাস করিতে হইবে এবং বকেয়া খাজনা ও ঋণ মওকুফ করিতে হইবে। সার্টিফিকেট প্রথা বাতিল ও তহশিলদারদের অত্যাচার বন্ধ করিতে হইবে। পাটের সর্বনিম্ন মূল্য মণ প্রতি ৪০ টাকা নির্দ্ধারণ এবং আখের ন্যায্যমূল্য দিতে হইবে।

৭. শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরী বোনাস দিতে হইবে এবং শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে। শ্রমিক স্বার্থবিরোধী কালাকানুন প্রত্যাহার করিতে হইবে এবং ধর্মঘটের অধিকার ও ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার প্রদান করিতে হইবে।

৮. পূর্ব-পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জল সম্পদের সার্বিক ব্যবহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৯. জরুরী আইন প্রত্যাহার, নিরাপত্তা আইন ও অন্যান্য নিবর্তনমূলক আইন প্রত্যাহার করিতে হইবে।

১০. সিয়াটো, সেন্টো, পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল করিয়া জোট বহির্ভূত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি কায়েম করিতে হইবে।

১১. দেশের বিভিন্ন কারাগারে আটক সকল ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, রাজনৈতিক কর্মী ও

নেতৃবৃন্দের অবিলম্বে মুক্তি, গ্রেফতারী পরোয়ানা ও হুলিয়া প্রত্যাহারের এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাসহ সকল রাজনৈতিক কারণে জারীকৃত মামলা প্রত্যাহার করিতে হইবে।

সংগ্রামী ছাত্র সমাজের পক্ষে :

আবদুর রউফ, সভাপতি
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ।
খালেদ মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগ।
সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক, সভাপতি
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র-ইউনিয়ন।
সামসুদ্দোহা, সাধারণ সম্পাদক
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন।
মোস্তফা জামাল হায়দার, সভাপতি
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন।
দীপা দত্ত, সহ সম্পাদিকা
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন
তোফায়েল আহমদ, সহ-সভাপতি
ডাকসু।
নাজিম কামরান চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক, ডাকসু।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার পূর্ণ বিবরণ

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামিদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনয়ন করা হয়েছে; নিম্নে তার পূর্ণ বিবরণ দেওয়া গেল :

১৯৬৮ সালের ফৌজদারি আইন সংশোধনী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) অর্ডিন্যান্স-এর ৪ ধারা অনুযায়ী, ১৯৬৮ সালের ২১ এপ্রিলের বিজ্ঞপ্তি নং এস, আর, ও, ৫৯ (আর)/৬৮ বলে গঠিত বিশেষ ট্রাইব্যুনাল সমক্ষে ।

রাষ্ট্র

বনাম

শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য আসামি

বাদীপক্ষের তরফ থেকে মামলার বিবৃতি (যাকে অতঃপর 'অভিযোগপত্র' বলে উল্লেখ করা হবে) উপরোক্ত অর্ডিন্যান্সের ৫ ধারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক পেশ করা হলো :

যথাবিধি সম্মান পুরঃসর নিবেদন এই–

১। ভারতীয় অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থের সাহায্যে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘটিয়ে পাকিস্তানকে এর একটি অংশ থেকে বঞ্চিত করে সেই অংশে ভারতের স্বীকৃত একটি স্বাধীন সরকার গঠন করার এক ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব গোপনসূত্রে জানা যায় । এই গোপনসূত্র ধরে ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে, পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধি অনুযায়ী কিছুসংখ্যক লোককে এবং পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা বাহিনীর সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী আরো কয়েক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয় ।

২। ওই ব্যক্তিদের কয়েকজনের প্রদত্ত বা তাঁদের কাছ থেকে উদ্ধারকৃত দলিল-পত্রাদিতে ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণকারী গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজনের সাংকেতিক নাম; ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অস্ত্র ও গোলাবারুদের বর্ণনা ও পরিমাণ; 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস'-এর আগে এবং 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' করণীয় কার্যাবলি সম্বন্ধে বিভিন্ন নির্দেশ এবং অন্যান্য স্মারকলিপি বিধৃত আছে ।

৩। সংগ্রামের প্রধান পরিকল্পনা ছিল– সামরিক ইউনিটগুলোর অস্ত্রাগারগুলো দখল করে সেগুলোকে পঙ্গু করে দেওয়া। জনশক্তির অভাব পুষিয়ে নেয়ার জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের কায়দায় অতর্কিত আক্রমণের মাধ্যমে এই অভিযান পরিচালনার কথা ছিল। এ ব্যাপারে করণীয় কার্যাবলির মধ্যে রয়েছে–

(ক) সশস্ত্র সেনাবাহিনীর লোক, প্রাক্তন সামরিক কর্মচারী এবং বেসামরিক কর্মচারীদের দলভুক্ত করা, যাদের দ্বারা সশস্ত্র সংগ্রামের অগ্রগামী দল গঠন করা যায়;

(খ) ভারতের কাছ থেকে অর্থ ও অস্ত্র সাহায্য ছাড়া দেশের মধ্য থেকে অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করা;

(গ) প্রচারণার মাধ্যমে দেশের সর্বত্র রাজনৈতিক অসন্তোষ সৃষ্টি করা এবং

(ঘ) সংগ্রামের পক্ষে সুবিধাজনক স্থানগুলোকে বলপূর্বক দখল করার জন্য 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস'-এর জন্য মাহেন্দ্র মুহূর্ত ধার্য করা।

৪। এই উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করার জন্য পাকিস্তানের ষড়যন্ত্রকারীদের প্রতিনিধিরা এবং অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থ সাহায্য দিতে প্রস্তুত। ভারতীয় প্রতিনিধিদের মধ্যে এক বৈঠকের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৬৭ সালের ১২ জুলাই ভারতস্থ আগরতলায় এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

৫। এই ষড়যন্ত্রের সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে আরও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি এবং এই ঘটনাবলির আরো তাৎপর্যপূর্ণ বিবরণ এর পরের অনুচ্ছেদসমূহে রয়েছে। কোনো বৈঠকের আলোচনার সারাংশ দেওয়ার সময় প্রত্যেক বৈঠকের আলোচনার ষড়যন্ত্রের যে সকল সাধারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বারবার উল্লিখিত হতো, সেগুলো প্রায়ই বাদ দেওয়া হয়েছে। পাঁচটি তালিকা যথা– ক তালিকা, আসামিদের তালিকা, সাক্ষীদের তালিকা, দলিলপত্রের তালিকা এবং জিনিসপত্রের তালিকা, যা অভিযোগপত্রের সাথে রয়েছে। পরিশিষ্ট-১-এ সেগুলোর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আসামিদের সাংকেতিক নাম ব্যাখ্যা করা হয়েছে পরিশিষ্ট-২-এ। অভিযোগে যে নাম প্রথমবার উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে পুরা নাম দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই নাম যখন পুনর্বার উল্লিখিত হয়েছে, সেখানে শুধু নামের ওই অংশটুকু দেওয়া হয়েছে, যা দ্বারা তাকে অন্যদের থেকে পৃথক করা যায়। তবে পুরোপুরি শনাক্ত করার জন্য অভিযোগে যে নাম যখন উল্লিখিত হয়েছে, সে নামের সাথে আসামি বা সাক্ষী শব্দ এবং আসামির তালিকা ও সাক্ষীর তালিকায় তাদের নামের যে ক্রমিক নম্বর, তা দেওয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে কোন স্থানের প্রথম উল্লেখ, ওই স্থানের পুরা বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এটা যখন পুনর্বার উল্লেখ করা হয়েছে, তখন শুধু বর্ণনায় ওই অংশটুকু দেওয়া হয়েছে, যার দ্বারা ওই স্থানকে অন্য স্থান থেকে পৃথক করা যায়।

৬। ১৯৬৪ সালের ১৫ থেকে ২১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ১নং আসামি শেখ মুজিবুর রহমান

করাচি গিয়েছিলেন। ২নং আসামি পাকিস্তান নৌবাহিনীর লে. মোয়াজ্জেম হোসেন (বর্তমান লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন) কর্তৃক আহূত এক বৈঠকে যোগদানের জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানান হয়েছিল। এর আগে ১৯৬৪ সালের প্রথমদিকে ওই লে. মোয়াজ্জেম হোসেন তার নিজের বাসভবন করাচির ১নং কে, ডি, এ স্কিম-এর ডি। ৭৭নং বাড়িতে ৩নং আসামি স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান, ৪নং আসামি প্রাক্তন লিডিং সিম্যান সুলতান উদ্দীন আহমদ, ৫নং আসামি লিডিং সিম্যান নূর মোহাম্মদ এবং ১নং সাক্ষী লে. মোজাম্মেল হোসেন-এর সাথে একমত হয়ে পূর্ব পাকিস্তান দখল করার জন্য একটি বিপ্লব সংঘ সংগঠনের উদ্দেশ্যে ১নং আসামি শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আলোচনার সিদ্ধান্ত হয়। এই বৈঠক ২নং সাক্ষী কামাল উদ্দীন আহমদ-এর বাড়িতে ৩।৪৭, এম, এস, জি, পি, স্কুল টিচার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি (যাহা মোয়ালামাবাদ নামে সাধারণ্যে পরিচিত), করাচি অনুষ্ঠিত হয়। নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা এই বৈঠকে যোগদান করেন :

(১) শেখ মুজিবুর রহমান ১নং আসামি; (২) মোয়াজ্জেম ২নং আসামি, (৩) স্টুয়ার্ড মুজিব ৩নং আসামি; (৪) সুলতান ৪নং আসামি; (৫) নুর মোহাম্মদ ৫নং আসামি; (৬) জনাব আহম্মদ ফজলুর রহমান সি, এসপি, ৬নং আসামি; (৭) মোজাম্মেল ১নং সাক্ষী।

২নং আসামি মোয়াজ্জেম বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তির জন্য নৌবাহিনীতে নিযুক্ত পূর্ব পাকিস্তানি এক সংগ্রামী শক্তি গঠন করে এবং সেনাবাহিনী ও বিমানবাহিনীর পূর্ব পাকিস্তানিদেরও দলভুক্ত করার কথা ছিল। তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, এই দলের সফল প্রসারণের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতা এবং সিভিল সার্ভিসের কর্মচারীদের সমর্থন ও সহযোগিতার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। তিনি আরো বলেন, এই দলের তহবিলের জন্য অর্থের প্রয়োজন। ১নং আসামি শেখ মুজিবুর রহমান শুধু রাজিই হননি, অধিকন্তু একথাও বলেন, তিনি নিজেও ওই মতে বিশ্বাসী। তিনি পূর্ণ সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দেন এবং প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ৬নং আসামি এ, এফ, রহমান ২নং আসামি মোয়াজ্জেম-এর সাথে এক হন যে, পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্যের একমাত্র জবাব হচ্ছে সশস্ত্র বিদ্রোহ। তিনি আরো বলেন, তাঁদের কাজের এই প্রতিক্রিয়া ভারতে কিরূপ হবে, সে সম্বন্ধে তাঁর নিশ্চিত ধারণা নেই। ১নং আসামি শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, এটা তাঁর দায়িত্ব। তবে একথাও বলেন, আপাতত তাঁরা আস্তে আস্তে অগ্রসর হতে পারেন; কারণ বিরোধী দল যদি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়লাভ করে তবে এই সংগ্রামের প্রয়োজন নাও হতে পারে। প্রায় ওই সময়েই প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিলো।

৭। ১নং আসামি শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৫ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সমাপ্তির পর আবার করাচি যান এবং সেখানে ১৫ জানুয়ারি থেকে ২১ জানুয়ারি পর্যন্ত অবস্থান

করেন। ওই দুই তারিখের মধ্যে কোনো একদিন ২নং আসামি মোয়াজ্জেম-এর পূর্বোক্ত বাড়িতে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তাতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা যোগদান করেন :

(১) শেখ মুজিবুর রহমান ১নং আসামি; (২) মোয়াজ্জেম ২নং আসামি; (৩) নূর মোহাম্মদ ৫নং আসামি; (৪) এ, এফ, রহমান ৬নং আসামি; (৫) ফ্লাইট-সার্জেন্ট মাহফিজুল্লাহ ৭নং আসামি; (৬) লে. মোজাম্মেল হোসেন ১নং সাক্ষী এবং আরও কয়েকজন যাঁদের শনাক্ত করা হয়নি।

১নং আসামি শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, পূর্ব পাকিস্তানিদের জন্য সম্মানজনকভাবে বেঁচে থাকার একমাত্র উপায় হচ্ছে তাদের নিজেদের পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আলাদা করে নেওয়া। তিনি পূর্ণ সমর্থন ও আর্থিক সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দেন এবং ২নং আসামি মোয়াজ্জেমকে এই আন্দোলন ত্বরান্বিত করার জন্য তাঁর সদর দফতর পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তরিত করার আহ্বান জানান।

৮। করাচিস্থ কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান দফতরে সেই সময়ে নিযুক্ত ৩নং সাক্ষী জনাব মোহাম্মদ আমির হোসেন মিয়ার সঙ্গে ৩নং আসামি স্টুয়ার্ড মুজিব, ৪নং আসামি সুলতান, ৮নং আসামি প্রাক্তন করপোরাল আবুল বাশার মোহাম্মদ আবদুস সামাদ-এর অন্তরঙ্গতা ছিল। ১৯৬৫ সালের জানুয়ারি মাসের কোনো এক সময়ে, ৩নং আসামি স্টুয়ার্ড মুজিব, ২নং আসামি মোয়াজ্জেমের সাথে ৩নং সাক্ষী আমির হোসেনকে পরিচয় করিয়ে দেন। ৩নং সাক্ষী আমির হোসেন এতে বিশেষভাবে সন্তুষ্ট হন এবং এই দলের একজন সক্রিয় সদস্য হয়ে যান।

৯। ১৯৬৫ সালের জানুয়ারি এবং আগস্ট মাসের মধ্যে ২নং আসামি মোয়াজ্জেমের বাড়িতে কয়েকটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকগুলোতে সাধারণত নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা যোগদান করেছিলেন:

(১) মোয়াজ্জেম ২নং আসামি; (২) স্টুয়ার্ড মুজিব ৩নং আসামি; (৩) সুলতান ৪নং আসামি; (৪) নূর মোহাম্মদ ৫নং আসামি; (৫) হাবিলদার দলিলউদ্দিন ৯নং আসামি; (৬) আমির হোসেন ৩নং সাক্ষী।

এই সকল ব্যক্তি এই সংঘের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। এই বৈঠকগুলোতে তাদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং তাঁদের সাফল্যের জন্য করণীয় কার্যপদ্ধতি আলোচিত হয়েছিল।

১০। পূর্ব পাকিস্তানে কাজ শুরু করার জন্য কিছুসংখ্যক সক্রিয় সদস্যের সেখানে স্থায়ীভাবে থাকার বন্দোবস্তের প্রয়োজন হয়। তদানুসারে ২নং আসামি মোয়াজ্জেমের নির্দেশক্রমে ৩নং আসামি স্টুয়ার্ড মুজিব ও ৪নং আসামি সুলতান ছুটিতে ঢাকায় যান। তাঁদের স্থায়ীভাবে পূর্ব পাকিস্তানে বদলি করার চেষ্টাও করা হয়। ১৯৬৫ সালের আগস্ট মাসে ২নং আসামি মোয়াজ্জেম, ৩নং আসামি স্টুয়ার্ড মুজিব ও ৪নং আসামি সুলতানের মারফত ১নং আসামি শেখ মুজিবুর রহমানের

সাথে আলোচনা করে ১নং আসামি শেখ মুজিবর রহমানের ঢাকাস্থিত ধানমন্ডি আবাসিক এলাকায় ৩২নং রোডের ৬৭৭নং বাড়িতে একটি দলীয় বৈঠক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। ৪নং আসামি সুলতান একটি বীমাকৃত খামে ১,৫০০ টাকা ৩নং সাক্ষী আমির হোসেনের নামে পাঠান এবং আরো ৫০০ টাকা টেলিগ্রাম মানি-অর্ডার যোগে ৫নং আসামি নূর মোহাম্মদের নিকট পাঠান। এই টাকা দলীয় বৈঠকে যোগদান করার জন্য করাচি হতে ঢাকা যাবার যাতায়াত খরচ হিসাবে ২নং আসামি মোয়াজ্জেমের কাছে দেওয়ার জন্য পাঠানো হয়েছিল। ওই টাকা যথাসময়ে পাঠানো হয়েছিল এবং ২নং আসামি মোয়াজ্জেমের কাছে দেওয়া হয়েছিল।

১১। উপরোক্ত বৈঠক অনুষ্ঠানের জন্য ১৯৬৫ সালের ২৯ আগস্ট তারিখটি ধার্য হয়। ২নং আসামি মোয়াজ্জেম এবং ৩নং সাক্ষী আমির হোসেন পি, আই, এ বিমানযোগে করাচি থেকে ঢাকা রওনা হন।

১২। পূর্বোক্ত বৈঠক পূর্বনির্ধারিত স্থানে বিকাল ৩ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হয় এবং এতে উপস্থিত থাকেন:

(১) শেখ মুজিবুর রহমান ১নং আসামি; (২) মোয়াজ্জেম ২নং আসামি; (৩) স্টুয়ার্ড মুজিব ৩নং আসামি; (৪) সুলতান ৪নং আসামি; (৫) জনাব রুহুল কুদ্দুস, সি,এস,পি, ১নং আসামি; (৬) আমির হোসেন ৩নং সাক্ষী।

২নং আসামি মোয়াজ্জেম কাজের অগ্রগতির পর্যালোচনা করেন এবং দাবি করেন যে, তিনি ১নং আসামি শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ও আশীর্বাদের সশস্ত্র বাহিনীর বহুসংখ্যক কার্যরত ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীকে দলভুক্ত করেছেন। আর ওই সকল ব্যক্তি পূর্ব পাকিস্তানে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার সংকল্প গ্রহণ করেছেন। বৈঠকে যোগদানকারীদের সকলেই এই অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন। ২নং আসামি মোয়াজ্জেম তহবিল, অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। ১নং আসামি শেখ মুজিবুর রহমান ভারত থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্যের আশ্বাস দেন। তখনকার মতো তিনি ২নং আসামি মোয়াজ্জেমকে এক লাখ টাকার ব্যবস্থা করে দেওয়ার দায়িত্ব নেন, যা ২,০০০ টাকা হতে ৪,০০০ টাকার কিস্তিতে ৩নং আসামি স্টুয়ার্ড মুজিব এবং ৪নং আসামি সুলতান আদায় করবেন।

১৩। ১৯৬৫ সালের ১ সেপ্টেম্বর তারিখে ৩নং আসামি স্টুয়ার্ড মুজিব ১নং আসামি শেখ মুজিবুর রহমানের কাছ থেকে তার ঢাকাস্থ ধানমন্ডিতে ৭০০ টাকা গ্রহণ করেন এবং তা ৩নং সাক্ষী আমির হোসেনের নিকট অর্পণ করেন।

১৪। ১৯৬৫ সালের ৯ সেপ্টেম্বর তারিখে ৩নং আসামি স্টুয়ার্ড মুজিব ১নং আসামি শেখ মুজিবুর রহমানের কাছ থেকে তাঁর ঢাকাস্থ ধানমন্ডির বাড়ি থেকে ৪,০০০ টাকা নেন এবং তা ৩নং সাক্ষী আমির হোসেনের কাছে দেন। ৩০০ টাকা ৩নং আসামি

স্টুয়ার্ড মুজিব এবং ৪নং আসামি সুলতানকে তাঁদের ব্যক্তিগত খরচের জন্য দেন এবং অবশিষ্টাংশ ২নং আসামি মোয়াজ্জেমকে দিবার জন্য তাঁর নিজের কাছে রেখে দেন।

১৫। পাক-ভারত যুদ্ধ বেঁধে গেলে ছুটির দরুন বা সাময়িকভাবে কর্তব্য-ব্যপদেশে পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত সামরিক কর্মচারীরা পশ্চিম পাকিস্তানে তাদের নিজ নিজ কার্যস্থলে ফিরে যেতে পারেননি। তাঁদের পূর্ব পাকিস্তানে কাজে যোগ দিবার জন্য ডাকা হয়। ফলে ৩নং আসামি স্টুয়ার্ড মুজিব এবং ৪নং আসামি সুলতানকে ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চট্টগ্রাম নৌ-ঘাঁটির সাথে সংযুক্ত করা হয়। ওই নৌ-ঘাঁটির সাথে সংযুক্ত থাকাকালে তারা ওই ষড়যন্ত্র সংক্রান্ত কার্যকলাপ চালিয়ে যান।

১৬। ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ৬নং আসামি এ, এফ রহমানের করাচির ভিক্টোরিয়া রোডস্থ ইলাকো হাউসের ২১নং বাড়ির ৬নং ফ্ল্যাটে দলের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন :

(১) মোয়াজ্জম ২নং আসামি; (২) নূর মোহাম্মদ ৫নং আসামি; (৩) এ, এফ, রহমান ৬নং আসামি; (৪) সামাদ ৮নং আসামি; এবং (৫) আমির হোসেন ৩নং সাক্ষী।

এই বৈঠকে কাজের অগ্রগতির পর্যালোচনা করা হয় এবং ১নং আসামি শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকার প্রশংসা করা হয়। ৬নং আসামি এ,এফ, রহমান যুক্তরাজ্য থেকে ট্রানজিস্টার সংবলিত ট্রান্সমিটার সংগ্রহ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ২নং আসামি মোয়াজ্জেমকে পূর্ব পাকিস্তানে বদলি করার প্রচেষ্টা চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ ব্যাপারে ৬নং আসামি এ, এফ, রহমানের বাড়িতে ঐ সময়ে অতিথি হিসেবে অবস্থানরত ৪নং সাক্ষী জনাব কে, জি, আহমদের মধ্যস্থতাকে কাজে লাগাবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

১৭। একই মাসে (১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর) করাচির কারসাজে অফিসার্স কোয়ার্টারে ২নং আসামি মোয়াজ্জেমের বাসভবনে আর একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১৬নং অনুচ্ছেদে উল্লেখিত ব্যক্তিরা যোগদান করেন। ২নং আসামি মোয়াজ্জেম এই বিবরণ দেন যে, ৩নং আসামি স্টুয়ার্ড মুজিব ও ৪নং আসামি সুলতান পূর্ব পাকিস্তানে কর্মতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং দলীয় কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য শিগগিরই ৮নং আসামি সামাদ ও ৩নং সাক্ষী আমির হোসেনকে ঢাকায় পাঠানো হবে। ২নং আসামি মোয়াজ্জেম ৩ হাজার স্বেচ্ছাসেবককে দলে ভর্তি করেছেন বলে দাবি করেন এবং জানান যে, সাজ-সরঞ্জামে সজ্জিত হলেও প্রতিরক্ষা বাহিনীর কতিপয় অফিসারের সঠিক নেতৃত্ব পেলে তারা অচিরেই পূর্ব পাকিস্তান থেকে সামরিক বাহিনীর পশ্চিম পাকিস্তানি কর্মচারীদের বহিষ্কার করবে। ১৬নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত বৈঠকে আলোচিত বিষয়গুলোও এই বৈঠকে আলোচনা করা হয়।

১৮। একই মাসে (১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর) ৭নং আসামি মাহফিজুল্লাহ করাচির কোরঙ্গী ক্রীকে তাঁর ৩২৯। ২নং বাসভবনে আর একটি বৈঠক আহ্বান করেন। এই বৈঠকে নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা যোগদান করেন :

(১) সুলতান ৪নং আসামি; (২) মাহফিজুল্লাহ ৭নং আসামি; (৩) ফ্লাইট-সার্জেন্ট মোহাম্মদ ফজলুল হক ১১নং আসামি; (৪) ওয়ারেন্ট অফিসার মোশাররফ এইচ, শেখ ৫নং সাক্ষী; (৫) সার্জেন্ট শামসুদ্দিন আহমদ ৬নং সাক্ষী এবং অপর কয়েক ব্যক্তি যাঁদের শনাক্ত করা যায়নি।

৭নং আসামি মাহফিজুল্লাহ ও ৪নং আসামি সুলতান পুনরুল্লেখ করেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করেই কেবল পূর্ব পাকিস্তানকে রক্ষা করা যেতে পারে, আর তা সশস্ত্র বিদ্রোহ ভিন্ন করা সম্ভব নয়। ২নং আসামি মোয়াজ্জেমের নেতৃত্বে যে অগ্রগতি হয়েছে, সেটাও উল্লেখ করা হয়।

১৯। ১৯৬৬ সালের ২ ফেব্রুয়ারি ৩নং সাক্ষী আমির হোসেনের করাচি ত্যাগের প্রাক্কালে ২নং আসামি মোয়াজ্জেম তাকে তিনটা টেবিল ডায়েরি দেন– এই ডায়েরির কোন কোন পাতায় তিনি তার জন্য বিভিন্ন নির্দেশ ও স্মারকলিপি লিখে রেখেছিলেন। ২নং আসামি মোয়াজ্জেম তাকে বলেন যে, তিনি তাঁর নোট বুক থেকে উল্লেখিত ডায়েরির নির্দেশগুলো নকল করেছেন। পরিশিষ্ট ২-এ যে সাংকেতিক নামগুলোর ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে, এরই একটি ডায়েরিতে সেগুলো আছে।

১নং আসামি শেখ মুজিবুর রহমানের দাবি অনুযায়ী তাঁকে দেয়ার জন্য তিনি একটি ম্যাপ এবং অস্ত্র ও গোলাবারুদের দুটো তালিকাও তাঁকে দেন।

২নং আসামি মোয়াজ্জেম ৩নং সাক্ষী আমির হোসেনকে কোষাধ্যক্ষ হতে বলেন ও তাঁকে দলের জন্য অর্থ আদায় ও গ্রহণের কর্তৃত্ব প্রদান করেন এবং পূর্ব পাকিস্তানের খরচ বাদে এভাবে সংগৃহীত অর্থ সওদাগরি জাহাজের মাধ্যমে করাচিতে তাঁর (২নং আসামি মোয়াজ্জেম) কাছে পাঠাবার আহ্বান জানান।

২০। ঢাকায় পৌঁছার পর ৩নং সাক্ষী আমির হোসেন চট্টগ্রামে বিদ্রোহের লক্ষ্য সম্পর্কে প্রচারণায় নিয়োজিত ৩নং আসামি স্টুয়ার্ড মুজিব ও ৪নং আসামি সুলতানের কাজের অগ্রগতি নির্ণয়ের জন্য চট্টগ্রাম গমন করেন। ১৯৬৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি মিশ্‌কা হোটেলে তাঁর নিজের কক্ষে তিনি এক দলীয় বৈঠক আহ্বান করেন। এই বৈঠকে নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা যোগদান করেছিলেন :

(১) স্টুয়ার্ড মুজিব ৩নং আসামি; (২) সুলতান ৪নং আসামি; (৩) মিঃ ভূপতি ভূষণ চৌধুরী (মানিক চৌধুরী নামে পরিচিত) ১২নং আসামি; (৪) মিঃ বিধানকৃষ্ণ সেন ১৩নং আসামি; (৫) সুবেদার আবদুর রাজ্জাক, ই,বি, আর ১নং আসামি; (৬) ডা. সায়েদুর রহমান চৌধুরী ৭নং সাক্ষী এবং (৭) প্রাক্তন লে. কমান্ডার মোহাম্মদ শহীদুল হক (পি,এন,ভি,আর) ৮নং সাক্ষী।

২১। পূর্ব পাকিস্তানে এই দলের কর্মকর্তার সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ২নং আসামি

মোয়াজ্জেম ৮নং আসামি সামাদকে ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে ঢাকায় পাঠান। সেনাবাহিনীর দায়িত্ব থেকে তাঁকে অব্যাহতি দেওয়ায় তাঁর রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। তদানুসারে ২নং আসামি মোয়াজ্জেম ৩নং সাক্ষী আমির হোসেনের কাছে একটি চিটি লিখে ৮নং আসামির কর্মসংস্থান না হওয়া পর্যন্ত প্রতি মাসে তাঁকে ৩শ' টাকা করে দেয়ার নির্দেশ দেন।

১৯৬৬ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি তারিখের সেই চিঠিতে ২নং আসামি মোয়াজ্জেম আরো বলেন, তিনি পরশের (১নং আসামি শেখ মুজিবুর রহমানের সাংকেতিক নাম) সাথে সমস্ত ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করেছেন এবং এ নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই।

২২। একই মাসে ৮নং আসামি সামাদ নিম্নলিখিত ৪ জন কেরানি মুজিবুর রহমান ১৫নং আসামি; (২) প্রাক্তন ফ্লাইট-সার্জেন্ট মোহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক ১৬নং আসামি; (৩) প্রাক্তন নায়েব সুবেদার আশরাফ আলী খান ৯নং সাক্ষী এবং (৪) প্রাক্তন এল-নায়েক এ,বি, ইউসুফ ১০নং সাক্ষী। ৩নং সাক্ষী আমির হোসেন তাঁদের দলের মতবাদে দীক্ষিত করেন।

২৩। ১৯৬৬ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি ১নং আসামি শেখ মুজিবুর রহমান চট্টগ্রামে যান এবং লালদীঘি ময়দানে এক জনসভায় অনুষ্ঠান করেন। সেই জনসভার পর ৭নং সাক্ষী সায়েদুর রহমানের বাসভবনে এক দলীয় বৈঠক আহ্বান করেন। চট্টগ্রামের ইনায়েত বাজারে ১১নং রফিক উদ্দিন সিদ্দিকী বাইলেনের এই বাসভবনে অনুষ্ঠিত বৈঠকে নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা যোগদান করেন : (১) শেখ মুজিবুর রহমান ১নং আসামি; (২) স্টুয়ার্ড মুজিব ৩নং আসামি; (৩) মানিক চৌধুরী ১২নং আসামি এবং (৪) সায়েদুর রহমান ৭নং সাক্ষী।

১নং আসামি শেখ মুজিবুর রহমান ৭নং সাক্ষী সায়েদুর রহমানকে দলের বৈঠক অনুষ্ঠানের জন্য জায়গার ব্যবস্থা করার আহ্বান জানান।

২৪। একই মাসে (১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি) ১নং আসামি শেখ মুজিবুর রহমান দলের আর্থিক সাহায্য লাভের জন্য অপর একটি সূত্রের সন্ধান করেন। ১০নং আসামি রুহুল কুদ্দুসের চাচাতো ভাই ১১নং সাক্ষী মোহাম্মদ মোহসিন ইতিপূর্বে ১নং আসামি শেখ মুজিবুর রহমানকে অর্থ প্রদান করে আসছিলেন। ১নং আসামি শেখ মুজিবুর রহমান এই দলের জন্য তাঁকে টাকা দেয়ার আহ্বান জানান। ১১নং সাক্ষী মোহসিন ১নং আসামি শেখ মুজিবুর রহমানের বৈঠকখানা হতে বের হয়ে আসার সময় তাঁকে ৪নং আসামি সুলতান ১নং আসামি শেখ মুজিবুর রহমানের অনুরোধ অনুযায়ী 'মুরাদকে অর্থ দিতে বলে। (মুরাদ ৩নং আসামি স্টুয়ার্ড মুজিবের সাংকেতিক নাম)। তদানুসারে ২।৩ দিন পর ৩নং আসামি স্টুয়ার্ড মুজিব ১১নং সাক্ষী মোহসিনের কাছ থেকে দুই কিস্তিতে ৭০০ টাকা পান।

২৫। ১৯৬৬ সালের মার্চে ২নং আসামি মোয়াজ্জেমের নির্দেশক্রমে ৬নং আসামি, এ, এফ, রহমান ৮নং আসামি সামাদকে তার স্ত্রীর নামে স্থাপিত পেট্রোল পাম্পের

ম্যানেজার হিসেবে নিযুক্ত করেন। পেট্রোল পাম্পটি ঢাকায় ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনারের বাসভবনের কাছে অবস্থিত। এই পেট্রোল পাম্পের নাম গ্রিন ভিউ পেট্রোল পাম্প। ৬নং আসামি এ, এফ, রহমানের মাধ্যমে ভারতীয় হাইকমিশনের কর্মচারী এবং দলের সদস্যদের সাথে গোপনে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্যই এই বন্দোবস্ত করা হয়। ভারতীয় হাইকমিশনের কর্মচারীরা এই পাম্পে যেতেন, পেট্রোল নেয়ার ভান করে।

২৬। ১৯৬৬ সালের ৪ মার্চ ২নং আসামি মোয়াজ্জেম ৩নং সাক্ষী আমির হোসেনের কাছে এক চিঠিতে তিনি তাঁকে ৪নং সাক্ষী কে, জি'র কাছে ঢাকার অভ্যন্তরীণ নৌ-চলাচল কর্তৃপক্ষে তার অন্তর্ভুক্তি ত্বরান্বিত করার আবেদন জানাতে নির্দেশ দেন। তিনি ৩নং সাক্ষী আমির হোসেনকে প্রত্যাশিত ভারতীয় অস্ত্র ও গোলাবারুদ রাখার জন্য বাড়ি ভাড়া করারও নির্দেশ দেন।

২৭। একই মাসে (১৯৬৬ সালের মার্চের গোড়ার দিকে) ৩নং সাক্ষী আমির হোসেন ঢাকার মহাখালীতে দলের এক বৈঠক আহ্বান করেন। এতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা যোগদান করেন।

(১) সামাদ ৮নং আসামি; (২) মুজিব কেরানি ১৫নং আসামি; (৩) এম, এ, রাজ্জাক ১৬নং আসামি; (৪) সার্জেন্ট জহুরুল হক, ১৭নং আসামি; (৫) আশরাফ আলী ৯নং সাক্ষী ও (৬) ইউসুফ ১০নং সাক্ষী এবং আরো কয়েক ব্যক্তি, যাঁদের নাম নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে :

(১) এল এ. সি. এম. এ. নওয়াজ, (২) এল.এ.সি. জেড এ. চৌধুরী ও (৩) সার্জেন্ট মিয়া, পি.এ. এফ (তদন্ত পরিচালনাকালে এসব ব্যক্তির সঠিক পরিচয় পাওয়া সম্ভব হয় নাই)।

বৈঠকে জোর দিয়ে বলা হয় যে, তাঁদের লক্ষ্য অর্জনের একমাত্র পন্থা হচ্ছে সশস্ত্র বিদ্রোহ; একথা বিশদভাবে বলা হয় যে, সংঘের জন্য ভারত সরকার অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ করতে যাচ্ছেন।

২৮। ১নং আসামি শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালের ১২ মার্চ ষড়যন্ত্রকারীদের এক বৈঠক আহ্বান করেন। দিনটা ছিল শনিবার। ২নং আসামি মোয়াজ্জেম ছুটি না নিয়ে করাচি থেকে শুধু শনিবারেই আসতে পারেননি বলে তার সুবিধের প্রতি দৃষ্টি রেখেই এই দিনটি ধার্য করা হয়। প্রায় সূর্যাস্তের সময় ঢাকার ধানমন্ডিতে ১৮নং রোডে তাজউদ্দীনের ৬১৭নং বাড়িতে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ১নং আসামি শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক সহচর তাজউদ্দীন বৈঠকের জন্য তাঁর বাড়ি ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি নিজে এতে উপস্থিত ছিলেন না। বৈঠকে যাঁদের যোগদানের কথা ছিল ১নং আসামি শেখ মুজিবুর রহমান বাসস্টপ থেকে তাঁদের একটি বাড়িতে তুলে পূর্বোল্লেখিত বাড়িতে নিয়ে যান। এই বৈঠকে যোগদান করেন।

(১) শেখ মুজিবুর রহমান ১নং আসামি; (২) মোয়াজ্জেম ২নং আসামি; (৩) স্টুয়ার্ড মুজিব ৩নং আসামি; (৪) রুহুল কুদ্দুস ১০নং আসামি এবং (৫) আমির হোসেন ৩নং সাক্ষী ।

২নং আসামি মোয়াজ্জেম এই মর্মে আশা প্রকাশ করেন যে, অভিযান শুরু করা দিনটিতে পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত জনসাধারণ তাঁদের সমর্থন জানাবে । বৈঠকে যোগদানকারী সকলেই একমত হন যে, ষড়যন্ত্রকারী দলের সদস্যদের অস্ত্র প্রদান এবং অস্ত্রের ব্যবহার সম্পর্কে ট্রেনিং দেয়ার পর্যায় এসে গেছে । ভারতীয় কর্মচারীদের সাথে অস্ত্র চুক্তি সম্পর্কে আলোচনার উদ্দেশ্যে তাঁদের কয়েকজন প্রতিনিধিকে ভারতে প্রেরণের ব্যবস্থাও বিবেচনা করা হয় ।

২৯ । কয়েকদিন পর ৯নং সাক্ষী আশরাফ আলী ৩নং সাক্ষী আমির হোসেনের নিকট পূর্ব পাকিস্তানের একটি ক্যান্টনমেন্টের লে-আউটের নকশা হস্তান্তর করেন ।

৩০ । ২নং আসামি মোয়াজ্জেম ১৯৬৬ সালের ১৯ মার্চ তারিখের এক ৩নং সাক্ষী আমির হোসেনকে জানান, ৬নং আসামি এ এফ রহমান টেলিফোন করে জানিয়েছেন যে, ২নং আসামি মোয়াজ্জেমকে ঢাকায় বদলি করার ব্যবস্থা হয়ে গেছে । তিনি ৩নং সাক্ষী আমির হোসেনকে একথাও জানান যে, ৫নং আসামি নূর মোহাম্মদ অল্প কয়েকদিনের মধ্যে ঢাকা যাবেন এবং পশ্চিম পাকিস্তান দলের কাজকর্ম সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করবেন । একই চিঠিতে তিনি সাংকেতিক ভাষায় আরো লিখেন যে, তিনি তাঁকে তাঁর চাকর শফির (অভিযোগপত্র পেশকালে যার সন্ধান পাওয়া গেছে) মারফত ক্ষুদ্র অস্ত্র পাঠাবে এবং ৩নং সাক্ষী আমির হোসেনকে অস্ত্র কেনার জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে হবে ।

৩১ । এক সপ্তাহ পর ২নং আসামি মোয়াজ্জেম ৩নং সাক্ষী আমির হোসেনের কাছে লিখিত অপর এক চিঠিতে ৬নং আসামি এ, এফ, রহমানের কাছ থেকে টাকা নিয়ে ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে তার কাছে পাঠাবার নির্দেশ দেন । তদানুসারে ৩নং সাক্ষী আমির হোসেন ৬নং আসামি এ, এফ, রহমানের কাছ থেকে নগদ ৫,৫০০ টাকা নেন । তিনি ১৯৬৬ সালে ৩১ মার্চ একটি ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যম ৫,০০০ টাকা ২নং আসামি মোয়াজ্জেমের কাছে পাঠান এবং খরচের জন্য নিজের কাছে ৫০০ টাকা রেখে দেন ।

৩২ । ১৯৬৬ সালের ৩ এপ্রিল ৩নং আসামি স্টুয়ার্ড মুজিব ও ৩নং সাক্ষী আমির হোসেন ঢাকার ধানমন্ডিতে ১নং আসামি শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবনে যান এবং তাঁকে বলেন যে, দলের জন্য ক্ষুদ্র অস্ত্র ও গোলাবারুদ কেনার উদ্দেশ্যে আরো অর্থের প্রয়োজন । ১নং আসামি শেখ মুজিবুর রহমানের কাছ থেকে দলের অর্থ সংগ্রহ করার জন্য ২নং আসামি মোয়াজ্জেম যাকে মনোনীত করেছিলেন সেই ৩নং আসামি স্টুয়ার্ড মুজিবকে ১নং আসামি শেখ মুজিবুর রহমান নগদ ৪ হাজার টাকা দেন । ৩নং আসামি স্টুয়ার্ড মুজিব সেই টাকা ৩নং সাক্ষী আমির হোসেনকে দেন ।

৩৩। পরের দিন ৩নং সাক্ষী আমির হোসেন ২নং আসমি মোয়াজ্জেমের কাছ থেকে সাংকেতিক ভাষায় লেখা যে চিঠি পান, তাতে আরো অর্থ সংগ্রহের জরুরি প্রয়োজনের কথা ব্যক্ত করা হয়। ৩নং সাক্ষী আমির হোসেন তদানুসারে আরো অর্থের জন্য ৩নং আসামি স্টুয়ার্ড মুজিবকে ১০নং আসামি রুহুল কুদ্দুসের কাছে পাঠান। ৩নং আসামি স্টুয়ার্ড মুজিব ১০নং আসামি রুহুল কুদ্দুসের কাছ থেকে ২ হাজার টাকা সংগ্রহ করেন এবং সেই অর্থ ৩নং সাক্ষী আমির হোসেনের কাছে দেন। এরপর ৩নং সাক্ষী আমির হোসেন ২নং আসামি মোয়াজ্জেমকে দেয়ার উদ্দেশ্যে ৩নং আসামি স্টুয়ার্ড মুজিবকে ৬ হাজার টাকাসহ এক সওদাগরি জাহাজে করে চট্টগ্রাম পাঠান।

৩৪। প্রায় সেই সময়েই ৩নং সাক্ষী আমির হোসেন দলের খরচায় ঢাকায় ১০৭নং দীননাথ সেন রোডের বাড়ি ভাড়া নেন। এই বাড়িতে ৮২৪৫২ নম্বরের একটি টেলিফোন ছিল।

৩৫। ১৯৬৬ সালে ৬ এপ্রিল ২নং আসামি মোয়াজ্জেম ইতিপূর্বে তার কাছে প্রেরিত ব্যাংক ড্রাফটের প্রাপ্তি স্বীকার করে ৩নং সাক্ষী আমির হোসেনকে এক চিঠি লিখেন। সেই চিঠিতে সাংকেতিক ভাষায় তিনি ষড়যন্ত্রের জন্য আর্থিক ও অন্যান্য প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করে ৩নং সাক্ষী আমির হোসেনকে একটি বাজেট তৈরি করার আহ্বান জানান। অস্ত্রশস্ত্রে খুঁটিনাটি বিবরণ সম্পর্কে অবহিত না থাকায় ৩নং সাক্ষী আমির হোসেন ১নং আসামি শেখ মুজিবুর রহমান দাবি না করা পর্যন্ত বাজেট তৈরি না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

৩৬। এর অনতিকাল পরেই ৩নং সাক্ষী আমির হোসেন ২নং আসামি মোয়াজ্জেমের কাছ থেকে ১৯৬৬ সালের ৮ এপ্রিলে লেখা আরেকটি চিঠি পান। চিঠিতে তাকে তুষারকে (৬নং আসামি এ, এফ, রহমানের সাংকেতিক নাম) একথা জানাতে বলা হয় যে, তিনি ১৯৬৬ সালে এপ্রিল) ১২নং আসামি মানিক চৌধুরী ঢাকার ধানমন্ডিতে ১নং আসামি শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবনে যান। সেখানে তিনি ৪নং আসামি সুলতানকে আগেই হাজির দেখতে পান। ১নং আসামি শেখ মুজিবুর রহমান ১২নং আসামি মানিক চৌধুরীকে ৪নং আসামি সুলতানের কাছে টাকা প্রদানের নির্দেশ দেন। তিন-চার দিন পর ৪নং আসামি সুলতান ১২নং আসামি মানিক চৌধুরীর চট্টগ্রাম শহরস্থিত ৪১নং রামজয় মহাজন লেনের বাসভবনে গিয়ে দেখা করেন এবং ১২নং আসামি মানিক চৌধুরী ষড়যন্ত্রের জন্য দেড় হাজার টাকা দেন।

৩৮। ওই মাসে (১৯৬৬ সালের এপ্রিল) ১১নং সাক্ষী মোহসিন ১নং আসামি শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে ঢাকার ধানমন্ডিতে তাঁর বাসভবনে গিয়ে দেখা করেন। ১নং আসামি শেখ মুজিবুর রহমান আস্থার সাথে ১১নং সাক্ষী মোহসিনকে জানান যে, তিনি একটি বিপ্লবী দল গঠন করেছেন, যাতে সশস্ত্র বাহিনীর প্রাক্তন ও

কর্মরত লোকদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং এই দলের কর্মতৎপরতার জন্য তাঁকে আর্থিক সাহায্য দানের অনুরোধ করেন।

৩৯। ১৯৬৬ সালের এপ্রিলের শেষের দিকে অথবা ১৯৬৬ সালের মে মাসের শুরুর দিকে কোন এক সময়ে ২নং আসামি মোয়াজ্জেম চট্টগ্রামে তার বদলি হওয়ার পর ৩নং সাক্ষী আমির হোসেনের ঢাকার গেণ্ডারিয়াস্থ ১০৭নং দীননাথ সেন রোডের বাসভবনে গিয়ে দেখা করেন। দলের পক্ষে যে টাকা সংগ্রহ করা হয়েছে এবং দল যে টাকা খরচ করেছে, সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়। ২নং আসামি মোয়াজ্জেম সংঘের নামে যে বিপুল অর্থ খরচ হয়েছে, তার যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে পারেন না। এ নিয়ে ৩নং সাক্ষী আমির হোসেন ও ২নং আসামি মোয়াজ্জেমের মধ্যে বাক-বিতণ্ডা হয়। ৩নং সাক্ষী আমির হোসেন ২নং আসামি মোয়াজ্জেমের নেতৃত্বের প্রতি আস্থা হারান। সেইদিন সন্ধ্যায় ৩নং সাক্ষী আমির হোসেন দুটি ক্যাশবইসহ নগদ ৯ হাজার টাকা এবং হিসাবপত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্র ২নং আসামি মোয়াজ্জেমকে দিয়ে দেন। ২নং আসামি মোয়াজ্জেম তখন ঢাকার ধানমন্ডি আবাসিক এলাকায় ২নং রোডে ডা. খালেকের বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। সেই বাড়িতেই তাঁকে এসব কাজপত্র বুঝিয়ে দেয়া হয়। বাড়িটা 'আলেয়া' নামে পরিচিত। ২নং আসামি মোয়াজ্জেম সেই টাকা থেকে ৩নং সাক্ষী আমির হোসেনকে দীননাথ সেন রোডের যে বাড়িতে তিনি বসবাস করছিলেন, তার ভাড়া মিটিয়ে দেয়ার জন্য দেড় হাজার টাকা প্রদান করেন। এর ৩নং সাক্ষী আমির হোসেন ষড়যন্ত্রের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

৪০। ১৯৬৬ সারে ১ মে ২নং আসামি মোয়াজ্জেমকে চট্টগ্রামের নৌ-ঘাঁটিতে বদলি করা হয়। সেখানে বদলি হয়ে যাওয়ার অব্যবহিত পরেই তিনি এক বৈঠক আহ্বান করেন। ৭নং সাক্ষী সায়েদুর রহমানের কাচারি ঘরে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। দলের বৈঠক অনুষ্ঠানের এই ঘরটি তিনি ব্যবহার করতে দিতে রাজি হয়েছিলেন। কাচারি ঘরটি চট্টগ্রামের ইনায়েত হোসেন বাজারে অবস্থিত। বৈঠকে নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা যোগদান করেন :

(১) মোয়াজ্জেম ২নং আসামি; (২) স্টুয়ার্ড মুজিব ৩নং আসামি (৩) সুলতান ৪নং আসামি; (৪) মানিক চৌধুরী ১২নং আসামি; (৫) মোহাম্মদ খুরশিদ ১৮নং আসামি এবং (৬) সায়েদুর রহমান ৭নং সাক্ষী। ১২নং আসামি মানিক চৌধুরী ও ৭নং সাক্ষী সায়েদুর রহমানকে এই বৈঠকে কার্য-বিবরণী থেকে বাদ দেয়া হয়।

৪১। ১৯৬৬ সালের ৮ মে ১নং আসামি শেখ মুজিবুর রহমানকে এই ষড়যন্ত্রের সাথে সম্পর্কহীন কতিপয় কার্যকলাপের দায়ে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিবলে গ্রেফতার করা হয়। এই ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত থাকার দায়ে তাঁকে গ্রেফতার ও হাজতে প্রেরণ না করা পর্যন্ত পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিবলে তাঁকে আটক রাখা হয়েছিল। (পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিবলে আটক থাকাকালে তাঁর বিরুদ্ধে আনিত বিভিন্ন মোকদ্দমার বিচার হয়)।

৪২। ১নং আসামি শেখ মুজিবুর রহমানের পূর্বোল্লেখিত গ্রেফতারের পর ১৯৬৬ সালের ২০ মে বাসভবনে তাঁর নিজের রাজনৈতিক দলের এক জরুরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেই বৈঠকে যোগদানের জন্য ১২নং আসামি মানিক চৌধুরী চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় যান। বৈঠকে যোগদানের পূর্বে ১২নং আসামি মানিক চৌধুরী ৭নং সাক্ষী সায়েদুর রহমানকে নিয়ে ঢাকার হাইকমিশন অফিসে পাকিস্তানে নিযুক্ত ভারতের ডেপুটি হাইকমিশনারের ফার্স্ট সেক্রেটারি মি. পি, এন, ওঝার কাছে যান। মি. পি, এন, ওঝা ৭নং সাক্ষী সায়েদুর রহমানের বিবরণ লিখে নেন এবং তাঁকে পরে কোনো এক সময় দেখা করতে বলেন। ৭নং সাক্ষী সায়েদুর রহমান অফিস থেকে বেরিয়ে আসেন, তবে ১২নং আসামি মানিক চৌধুরী কিছুক্ষণ সেখানেই অবস্থান করেন।

৪৩। ১৯৬৬ সালের ২০ ও ২১ মের মধ্যে এক রাতে ১২নং আসামি মানিক চৌধুরীকে এই ষড়যন্ত্রের সাথে সম্পর্কহীন কতিপয় কার্যকলাপের সাথে জড়িত থাকার দায়ে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিবলে চট্টগ্রামে গ্রেফতার করা হয়।

৪৪। ওই মাসেই (১৯৬৬ সালের মে) ১২নং আসামি মানিক চৌধুরীর গ্রেফতারের পর ২নং আসামি মোয়াজ্জেম পূর্বোক্ত 'কাচারি ঘরে' ষড়যন্ত্রকারীদের আরো দুটো বৈঠক আহ্বান করেন। বৈঠকে নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা যোগদান করেন :

(১) মোয়াজ্জেম ২নং আসামি; (২) স্টুয়ার্ড মুজিব ৩নং আসামি; (৩) সুলতান ৪নং আসামি; (৪) খুরশীদ ১৮নং আসামি ও (৫) সায়েদুর রহমান ৭নং সাক্ষী।

দলে বিভিন্ন সদস্যকে কি কাজের দায়িত্ব দিতে হবে এবং তাঁদের পরিকল্পনার সফর বাস্তবায়নের জন্য কি কি পন্থা অবলম্বন করতে হবে, সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। ঢাকা, কুমিল্লা, যশোর ও চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট এবং নৌ-ঘাঁটির লে-আউট পরীক্ষা করে দেখা হয়। আরো অর্থ ও অস্ত্র সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেয়া হয়।

৪৫। একই মাসে (১৬৬ সালে মে) চট্টগ্রাম ১২নং সাক্ষী এম, এম, রমিজ, যে চট্টগ্রামে পি, আই, এ'র ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার ছিলেন, ২নং আসামি মোয়াজ্জেমের সংস্পর্শে আসেন এবং এই ষড়যন্ত্রে যোগ দেন।

৪৬। এর অনতিকাল পরে ১২নং সাক্ষী রমিজ ১৯নং আসামি কে, এম, শামসুর রহমান, সি-এস পিকে ষড়যন্ত্রে ভিড়ান। তিনি তখন চট্টগ্রামে উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

৪৭। একই মাসে (১৯৯৬ সালের মে) ৯নং সাক্ষী আশরাফ আলী ও ৮নং আসামি সামাদ দলের খরচে ঢাকায় ১০০। ৩নং আজিমপুর রোডে 'সাইকি' (psyche) নামে অভিহিত একটি বাড়ি ভাড়া নেন। এর পরে এই দুই ব্যক্তি তাদের পূর্ববর্তী বাসস্থান ৩নং সাক্ষী আমির হোসেনের বাড়ি থেকে নতুন বাড়িতে উঠে যান।

৪৮। ১৯৬৬ সালের জুন মাসে ২নং আসামি মোয়াজ্জেম চট্টগ্রামের নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটিতে অবস্থিত তার বাসভবনে ১২নং সাক্ষী রমিজকে একটি নোটবই ও

ফোল্ডার দেন এবং সেগুলোর মধ্যে লিখিত বিষয়বস্তু তাঁকে পড়তে বলেন। পূর্বোক্ত দলিলপত্রে প্রস্তাবিত স্বাধীন রাষ্ট্রের সরকারের লক্ষ্য ও গঠনপদ্ধতির বিবরণ প্রকাশ করা ছিল। সকল সম্পত্তি সরকারের মালিকানাধীনে যাবে, কলকারখানা জাতীয়করণ করা হবে এবং মুদ্রার পরিবর্তে কুপন চালু করা হবে। ২নং আসামি মোয়াজ্জেম তাকে সবুজ ও সোনালি বর্ণে রঞ্জিত নতুন রাষ্ট্রের প্রস্তাবিত পতাকাও দেখান।

৪৯। পরে একই মাসে (১৯৬৬ সালের জুন) ২নং আসামি মোয়াজ্জেম চট্টগ্রামের পাঁচলাইশে পি, আই, এ'র ৬০নং বাড়িতে ১২নং সাক্ষী রমিজের গৃহে এক বৈঠক আহ্বান করেন। এতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা যোগদান করেন : (১) মোয়াজ্জেম ২নং আসামি; (২) স্টুয়ার্ড মুজিব ৩নং আসামি; (৩) খুরশিদ ১৮নং আসামি; (৪) রিসালদার শামসুল হক এসি, ২০নং আসামি; (৫) হাবিলদার আজিজুল হক, এম, এস, জি, ২১নং আসামি; (৬) রমিজ ১২নং সাক্ষী।

এই বৈঠকের উদ্দেশ্য ছিল, দলের সামনের সারির কর্মীদের সাথে রমিজের পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। উপরোল্লেখিত ব্যক্তিরা ছাড়া আরো কয়েকজন কর্মী এই বৈঠকে যোগদান করেছিলেন, কিন্তু তাদের পুরোপুরি শনাক্ত করা যায়নি।

৫০। পরে একই মাসে (১৯৬৬ সালের জুন) ২নং আসামি মোয়াজ্জেম চট্টগ্রামের নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটিতে তাঁর বাসভবনে দলের এক বৈঠক আহ্বান করেন। এতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা যোগদান করেন : (১) মোয়াজ্জেম ২নং আসামি; (২) স্টুয়ার্ড মুজিব ৩নং আসামি; (৩) সুলতান ৪নং আসামি; (৪) সুবেদার রাজ্জাক ১৪নং আসামি; (৫) জহুরুল হক ১৭নং আসামি; (৬) খুরশিদ ১৮নং আসামি; (৭) রিসালদার শামসুল হক ১০নং আসামি; (৮) আশরাফ আলী ৯নং সাক্ষী ও (৯) ইউসুফ ১০নং সাক্ষী।

(অপর এক ব্যক্তিও, যাঁর নাম দেয়া হয়েছিল সার্জেন্ট শফি, এই বৈঠকে যোগদান করেছিলেন, কিন্তু তাঁকে শনাক্ত করা যায়নি)।

২নং আসামি মোয়াজ্জেম তাঁর ডায়েরি ও নোটবুক দেখান। তাতে 'বাংলাদেশ' নামে প্রস্তাবিত নতুন রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য লিপিবদ্ধ ছিল। প্রস্তাবিত জাতীয় পতাকাও দেখানো হয়।

৫১। ৭নং আসামি মাহফিজুল্লাহ ১৯৬৬ সালের জুন/জুলাই মাসে করাচির আবিসিনিয়া লাইনে তার ২৫। ৩নং কোয়ার্টারে বিমানবাহিনীর কর্মচারীদের মধ্যকার ষড়যন্ত্রকারীদের এক বৈঠক আহ্বান করেন। বৈঠকে নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা যোগদান করেন : (১) নূর মোহাম্মদ ৫নং আসামি; (২) মাহফিজুল্লাহ ৭নং আসামি; (৩) এস, এ, সি, মাহফুজুল বারী ২২নং আসামি; (৪) মোশারফ ৫নং সাক্ষী; (৫) কর্পোরাল জামালুদ্দিন আহমদ ১৪নং সাক্ষী ও (৬) কর্পোরাল সিরাজুল ইসলাম ১৫নং সাক্ষী।

এই বৈঠকে আরো কয়েক ব্যক্তি যোগদান করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের সন্ধান পাওয়া যায়নি। ৫নং আসামি নূর মোহাম্মদ নৌ-বাহিনীর কর্মচারী বিধায় এই বৈঠকে তার প্রয়োজনীয়তার ওপর অনেক বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। ৭নং আসামি মাহফিজুল্লাহর অনুরোধে সম্প্রতি ঢাকা প্রত্যাগত ১৪নং সাক্ষী কর্পোরাল জামাল পূর্ব পাকিস্তানের ষড়যন্ত্রকারীরা যে অগ্রগতি সাধন করেছেন, তা শ্রোতাদের অবহিত করেন এবং বলেন যে, ১নং আসামি শেখ মুজিবুর রহমান ও কতিপয় উচ্চপদস্থ বেসামরিক অফিসার তাদের কার্যকলাপে প্রাণসঞ্চার করেছেন। ৭নং আসামি মাহফিজুল্লাহ ১৫নং সাক্ষী সিরাজকে, যার দুটি নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে যাওয়ার কথা, দলের অন্যান্যের সাথে যোগাযোগ রক্ষার উদ্দেশ্যে ১১নং আসামি ফজলুল হক ও ঢাকার পি,এ, এফ স্টেশনে ২২নং আসামি পাকিস্তান বিমান বাহিনীর সার্জেন্ট শামসুল হকের সাথে যোগাযোগ করতে বলেন।

৫২। ১৯৬৬ সালের জুন/জুলাই মাসের কোনো এক সময়ে এ ব্যবস্থা করা হয় যে, ২নং আসামি মোয়াজ্জেম ও ১২নং সাক্ষী রমিজ কুমিল্লা সফর করবেন। তদানুসারে ৩নং আসামি স্টুয়ার্ড মুজিবকে ২৪নং আসামি মেজর (তৎকালে ক্যাপ্টেন) শামসুল আলম, এ, এম, সি-এর কাছে খবর দিতে কুমিল্লায় পাঠানো হয়। ২নং আসামি মোয়াজ্জেম ও ১২নং সাক্ষী রমিজ ২নং আসামি মোয়াজ্জেমের ই-বি-এ ৯৫৯১নং হিলম্রান আই-এম-পি মোটর গাড়িতে চড়ে চট্টগ্রাম ত্যাগ করেন। তাঁরা কুমিল্লা শহরের ২৪নং আসামি শামসুল আলমের বাসভবনে যান। সেখানে তাঁদের সাথে ২৫নং আসামি বালুচ রেজিমেন্টের (তৎকালে ইপিআর-এর) ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ আবদুল মোতালিবও মিলিত হন। ২নং আসামি মোয়াজ্জেম বলেন যে, ২৪নং আসামি শামসুল আলম কুমিল্লার সেক্টর কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন যে, সংগ্রামের সময় পরিকল্পনা থাকবে সামরিক ইউনিটগুলোর অস্ত্রাগার দখল করা এবং এভাবে তাদের যুদ্ধ করার সামর্থ্য পঙ্গু করে দেয়া। অতর্কিত আক্রমণ দ্বারা জনশক্তির অভাব পুষিয়ে নেয়া যাবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি ২৪নং আসামি শামসুল আলমকে সশস্ত্র বাহিনীর কার্যরত ও প্রাক্তন কর্মচারীদের সাথে তার যোগাযোগ বৃদ্ধি করার আহ্বান জানান। ২৫নং আসামি মোতালিব বলেন যে, তিনি পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস-এর সদস্যদের দলভুক্ত করেছেন। পরে তাঁদের পাঁচজন একই গাড়িতে করে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে ২৬নং আসামি ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ শওকত আলী মিয়া এ, ও, সি-র গৃহে যান। সেখানে ৩নং আসামি স্টুয়ার্ড মুজিবও তাঁদের সাথে যোগ দেন। ২৬নং আসামি শওকত ২নং আসামি মোয়াজ্জেমকে জানান যে, তিনি ১৩নং সাক্ষী ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ আবদুল আলীম ভুঁইয়া, এ ও সি ও ২৭নং আসামি ক্যাপ্টেন খোন্দকার নজমুল হুদা এ, এস, সি-র সাথে ঢাকায় যোগাযোগ করেছিলেন এবং ওই দুই অফিসার সংঘ সম্পর্কে আরো তথ্য জানতে চেয়েছেন। ২নং আসামি

মোয়াজ্জেম তারপর শিগগিরই ঢাকায় একটি বৈঠকের ব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতি দেন।

৫৩। একই মাসে অর্থাৎ ১৯৬৬ সালের জুলাই ৭নং সাক্ষী সায়েদুর রহমান ২নং আসামি মোয়াজ্জেমের সাথে শেষোক্ত ব্যক্তির চট্টগ্রামস্থ বাসভবনে গিয়ে দেখা করেন। সেই সময় ২নং আসমি মোয়াজ্জেম ৭নং সাক্ষী সায়েদুর রহমানকে জানান, গ্রেফতারের পূর্বে ১২নং আসামি মানিক চৌধুরী ষড়যন্ত্রের জন্য অস্ত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনারের ফার্স্ট সেক্রেটারি পি, এন ওঝার কাছে অস্ত্রের একটি তালিকা দেয়ার অঙ্গীকার করেছিলেন। ২নং আসামি মোয়াজ্জেম ৭নং সাক্ষী সায়েদুর রহমানকে জিজ্ঞেস করেন, তিনি পি, এন ওঝাকে চেনেন কিনা। ৭নং সাক্ষী সায়েদুর রহমান হ্যাঁ-বাচক জবাব দিলে ২নং আসামি মোয়াজ্জেম ৭নং সাক্ষী সায়েদুর রহমানকে পি, এন ওঝার কাছে অস্ত্রের তালিকা দিয়ে আসতে অনুরোধ করেন। ৭নং সাক্ষী সায়েদুর রহমান তাঁর ওপর পুলিশের নজর থাকার দরুন এই কাজ করতে তার অসামর্থ্যের কথা প্রকাশ করেন।

৫৪। কয়েকদিন পর একদিন সকালে পি, এন ওঝা চট্টগ্রামে ৭নং সাক্ষী সায়েদুর রহমানের বাসভবনে গিয়ে হাজির হন এবং তাঁর কাছে এই অভিযোগ করেন যে, তার অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি (৭নং সাক্ষী সায়েদুর রহমান) তার ঢাকার অফিসে যাননি। সেই সময় ৭নং সাক্ষী সায়েদুর রহমান ১২নং আসামি মানিক চৌধুরীর যে অস্ত্র তালিকা পি, এন ওঝাকে দেয়ার কথা ছিল সে সম্পর্কে ২নং আসামি মোয়াজ্জেমের কথা পি, এন ওঝাকে জানান।

৫৫। পরদিন পি, এন ওঝার নির্দেশক্রমে ৭নং সাক্ষী সায়েদুর রহমান ২নং আসামি মোয়াজ্জেমের কাছ থেকে ওই তালিকা নেন এবং সেটা চট্টগ্রাম রেল স্টেশনে পি, এন ওঝাকে দেন। সেই সময় পি, এন ওঝা তার সাথে ঢাকায় যোগাযোগ করার জন্য ৭নং সাক্ষী সায়েদুর রহমানকে একটি সাংকেতিক শব্দ শিখিয়ে দেন এবং বলেন যে, ২নং আসামি মোয়াজ্জেমকে ঢাকায় পি, এন ওঝার সাথে দেখা করতে হবে।

৫৬। কয়েকদিন পর ৭নং সাক্ষী সায়েদুর রহমানের মাধ্যমে ২নং আসামি মোয়াজ্জেম ঢাকার ধানমন্ডিতে ভারতের ডেপুটি হাইকমিশনারের সরকারি বাসভবনে পি, এন ওঝার সাথে এক বৈঠকের আয়োজন করেন। পি, এন ওঝা ২নং আসামি মোয়াজ্জেমকে এই আশ্বাস দেন যে, অস্ত্রের তালিকাটি তিনি ভারত সরকারে অনুমোদনের জন্য পাঠাবেন। তবে তিনি আপাতত ষড়যন্ত্রকারীদের টাকা-পয়সা দিতে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করেন।

৫৭। ১৯৬৬ সালের আগস্ট মাসের কোনো এক সময় ২৬নং আসামি শওকত ঢাকা যান এবং অর্ডিন্যান্স মেসে ১৩নং সাক্ষী আলীমের সাথে অবস্থান করেন। সেইদিন সন্ধ্যায় ২৬নং আসামি শওকতের সাথে দেখা করেন। সেই সময় ২নং আসামি

মোয়াজ্জেম ঘোষণা করেন যে, পরের দিন সকালে ঢাকার মোহাম্মদপুর হাউজিং এস্টেটে ১২নং সাক্ষী রমিজের ফ্ল্যাটে তিনি এক বৈঠকে বসবেন। উল্লেখিত বৈঠকে নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা যোগদান করেন : (১) মোয়াজ্জেম ২নং আসামি; (২) স্টুয়ার্ড মুজিব ৩নং আসামি; (৩) সুলতান ৪নং আসামি; (৪) নজমুল হুদা ২৭নং আসামি; (৫) শওকত ২৬নং আসামি ও (৬) আলীম ১৩নং সাক্ষী।

২নং আসামি মোয়াজ্জেম সংগ্রামের পরিকল্পনা সংবলিত একটি ডায়েরি ও একটি নোটবই ষড়যন্ত্রকারীদের দেখান। ২নং আসামি মোয়াজ্জেম দাবি করেন যে, তিনি ষড়যন্ত্রের জন্য অস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সাথে ইতিমধ্যে যোগাযোগ করেছেন। তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে, যশোর ও রংপুর এলাকায় কর্মরত লোকদের নেতৃত্ব দানের জন্য সেনাবাহিনীর আরও কয়েকজন অফিসার দলভুক্ত করা সদস্যদের উচিত। তিনি দাবি করেন যে, ২৮নং আসামি ই, বি, আর-এর ক্যাপ্টেন এ, এন, এম নুরুজ্জামান ও তার নিজের নৌসেনা দল চট্টগ্রামের দায়িত্ব পালনের পক্ষে যথেষ্ট। ২নং আসামি মোয়াজ্জেম কুমিল্লায় ২৫নং আসামি মোতালিব ও ২৪নং আসামি শামসুল আলমের কাজের প্রশংসা করেন।

৫৮। ওই মাসেই (১৯৬৬ সালের আগস্ট) ২৭নং আসামি নজমুল হুদা, ২৪নং আসামি শামসুল আলম, ১৩নং সাক্ষী আলীম ও ২৬নং আসামি শওকত দাউদকান্দি রেস্ট হাউসে এক বৈঠকে মিলিত হন। তাঁরা উপলব্ধি করেন যে, কোনো সিনিয়র সামরিক অফিসারের ওপর ষড়যন্ত্রকারীদের নেতৃত্ব অর্পণ করা উচিত। তাঁরা সংগঠকদের বিস্তারিত পরিচয় সম্পর্কে ২নং আসামি মোয়াজ্জেমকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সিদ্ধান্ত নেন।

৫৯। একই মাসে (১৯৬৬ সালের আগস্ট) ২নং আসামি মোয়াজ্জেম দলের কাজের জন্য একটি মোটরগাড়ি কেনার উদ্দেশ্যে ১২নং সাক্ষী রমিজকে সংঘের তহবিল থেকে ৫ হাজার টাকা দেন।

৬০। ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বরের কোন এক সময় ঢাকার মোহাম্মদপুর হাউজিং এস্টেটে ১২নং সাক্ষী রমিজের বি-১২। ই-৮নং ফ্ল্যাটে ষড়যন্ত্রকারীদের সাথে ২নং আসামি মোয়াজ্জেমের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা যোগদান করেন : (১) মোয়াজ্জেম ২নং আসামি; (২) স্টুয়ার্ড মুজিব ৩নং আসামি; (৩) সুলতান ৪নং আসামি; (৪) শামসুর রহমান ১৯নং আসামি; (৫) শামসুল আলম ২৪নং আসামি; (৬) মোতালিব ২৫নং আসামি; (৭) নজমুল হুদা ২৭নং আসামি; (৮) রমিজ ১২নং সাক্ষী; (৯) আলীম ১৩নং সাক্ষী।

২নং আসামি মোয়াজ্জম ষড়যন্ত্রকারীদের কাছে এই তথ্য প্রকাশ করেন যে, ভারতীয় কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ করতে সম্মত হয়েছেন। তিনি প্রাক্তন সৈনিকদের বিভিন্ন গ্রুপে সংঘবদ্ধ করে তাঁদের বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র ব্যবহার সম্পর্কে ট্রেনিং দেওয়ার জন্য ২৫নং আসামি মোতালিবকে

বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে দেন। ২নং আসামি মোয়াজ্জেম সেক্টর কমান্ডারদের আর্থিক প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ২৭নং আসামি নজমুল হুদা, ২৪নং আসামি শামসুল আলম, ১৩নং সাক্ষী আলীম বৈঠকে কার্যবিবরণীতে বাধা দিয়ে এই প্রস্তাব করেন যে, সেনাবাহিনীর কয়েকজন সিনিয়র অফিসারের ওপর নেতৃত্ব অর্পণ করা উচিত। ১৯নং আসামি শামসুর রহমান এই ব্যাপারে কর্নেল এম, এ, জি ওসমানীর (অবসরপ্রাপ্ত) সাথে যোগাযোগ করার দায়িত্ব গ্রহণ করে বিতর্কের অবসান ঘটান। তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন যে, ভারত ও তার সমর্থনকারী শক্তি ব্লক নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রকে সঙ্গে সঙ্গেই স্বীকৃতি দেবে এবং আন্তর্জাতিক বিচার-বিবেচনার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন রাষ্ট্রের ভূ-খণ্ড দখল করা থেকে ভারত বিরত থাকবে। ২নং আসামি মোয়াজ্জেম ঘোষণা করেন যে, স্বাধীনতা লাভের পরক্ষণেই দেশে সামরিক আইন জারি করা হবে এবং স্বাভাবিক পরিস্থিতি পুনরুদ্ধারের পর সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ১২নং সাক্ষী রমিজ এই বলে তার মতপ্রকাশ করেন যে, সশস্ত্র বিদ্রোহের সময় পি, আই, এ ও পি, এ, এফ বিমান এবং রেডিও সেট ব্যবহার করে যোগাযোগ রক্ষা করা হবে। একজন ষড়যন্ত্রকারী এই মর্মে প্রস্তাব করেন যে, বিদ্রোহের সময় পূর্ব পাকিস্তানে যে সকল পশ্চিম পাকিস্তানিকে আটক করা হবে, তাদের বিনিময়ে পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থানরত পূর্ব পাকিস্তানিদের উদ্ধার করা হবে।

৬১। একই মাসে (১৯৬৬ সালে সেপ্টেম্বর) ৭নং সাক্ষী সায়েদুর রহমান দ্বিতীয়বারের মতো ২নং আসামি মোয়াজ্জেম ও মি. পি, এন ওঝার মধ্যে শেষোক্ত ব্যক্তির ঢাকার ধানমন্ডিস্থ বাসভবেন এক বৈঠকের আয়োজন করেন। পি, এন ওঝা ২নং আসামি মোয়াজ্জেমকে বলেন যে, ভারত সরকার ষড়যন্ত্রকারীদের অস্ত্র সরবরাহে সম্মত হয়েছেন এবং কোন তারিখে অস্ত্র ও গোলাবারুদ দেয়া হবে তা তিনি ২নং আসামি মোয়াজ্জেমকে যথা সময়ে জানাবেন।

৬২। ১৯৬৬ সালের অক্টোবর মাসে এই দলের প্রতি সিনিয়র সামরিক অফিসারদের সাড়া সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার উদ্দেশ্যে ১৯নং আসামি শামসুর রহমানের পরামর্শক্রমে ২নং আসামি মোয়াজ্জেম তার চট্টগ্রামের বাসভবন– এংকোরেজ-এ এক বৈঠকের আয়োজন করেন : (১) মোয়াজ্জেম ২নং আসামি; (২) শামসুর রহমান ১৯নং আসামি; (৩) রমিজ ১২নং সাক্ষী।

২নং আসামি মোয়াজ্জেম ষড়যন্ত্রের প্রধান বিষয়গুলো উল্লেখ করেন। তিনি একথাও ব্যক্ত করেন যে, স্বাধীনতা ঘোষণার পর ভারত পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান সীমানা লঙ্ঘন করবে না এবং পশ্চিম পাকিস্তানের কোনোরূপ হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে তারা সমুদ্র ও আকাশপথে বাধা সৃষ্টির মাধ্যমে বিদ্রোহের প্রতি সমর্থন জানাব– এই মর্মে ভারতের সাথে এক 'ভদ্রলোকের চুক্তি' সম্পাদিত হয়েছে। কর্নেল এম, এ, জি ওসমানী শুধু এ আলোচনা শ্রবণ করেন।

৬৩। ১৯৬৬ সালের অক্টোবরে ৭নং সাক্ষী সায়েদুর রহমান তৃতীয়বারের মতো ২নং আসামি মোয়াজ্জেম ও পি, এন ওঝার মধ্যে শেষোক্ত ব্যক্তির ঢাকার ধানমন্ডিস্থ বাসভবনে এক বৈঠকের আয়োজন করেন। পি, এন ওঝা দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে, ভারতে তৎকালীন আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের দরুন অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহের তারিখ ধার্য করা যায়নি। পি, এন ওঝা ভারতের সাধারণ নির্বাচন সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত ষড়যন্ত্রকারীদের অস্ত্র সরবরাহের জন্য অপেক্ষা করার পরামর্শ দেন।

৬৪। একই মাসে (১৯৬৬ সালের অক্টোবর) ৩নং আসামি স্টুয়ার্ড মুজিব আর্থিক সাহায্যের জন্য ১নং সাক্ষী মোহসিনের কাছে আবেদন জানান। ১১নং আসামি স্টুয়ার্ড মুজিব জানান যে, অস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহের জন্য ৩ থেকে ৪ লাখ টাকা প্রয়োজন। ১১নং সাক্ষী মোহসিন এতে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এবং ৩নং আসামি স্টুয়ার্ড মুজিবকে তক্ষুণি তাঁর বাড়ি থেকে বের করে দেন।

৬৫। ১৯৬৭ সালের ২৩ জানুয়ারিতে অথবা তার কাছাকাছি সময়ে ১২নং আসামি মানিক চৌধুরীকে আটক অবস্থা থেকে মুক্তি দেওয়া হয়।

৬৬। ১৯৬৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে ৭নং আসামি মাহফিজুল্লাহও ঢাকায় পৌঁছেন এবং ঢাকার আওলাদ হোসেন মার্কেটে ১৬নং আসামি এম, এ রাজ্জাকের দোকানে দলভুক্ত বিমানবাহিনীর কর্মচারীদের নিয়ে এক বৈঠক করেন। বৈঠকে নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা যোগদান করেন : (১) মাহফিজুল্লাহ ৭নং আসামি; (২) এম, এ রাজ্জাক ১৬নং আসামি; (৩) সার্জেন্ট শামসুল হক ২৩নং আসামি; (৪) সিরাজ ১৫নং সাক্ষী। এই বৈঠকে আরও কয়েকজন যোগদান করেছিলেন, কিন্তু তাঁদের সন্ধান পাওয়া যায়নি। বৈঠকে ষড়যন্ত্রের সাধারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আলোচনা করা হয়।

৬৭। ১৯৬৭ সালের মার্চে ২নং আসামি মোয়াজ্জেমকে পূর্ব পাকিস্তান অভ্যন্তরীণ নৌ-পরবহন কর্তৃপক্ষের অধীনে চাকরি দেয়া হয় এবং বরিশালে নিযুক্ত করা হয়।

৬৮। ১৯৬৭ সালের মার্চে ১৫নং সাক্ষী সিরাজ ও ৭নং আসামি মাহফিজুল্লাহ উভয়েই করাচি প্রত্যাবর্তন করেন।

৬৯। একই মাসে (১৯৬৭ সালের মার্চ) ২নং আসামি মোয়াজ্জেম ১২নং আসামি মানিক চৌধুরীর মাধ্যমে পি, এন ওঝার সাথে তার ঢাকার বাসভবনে চতুর্থ বৈঠকে মিলিত হন। ১৯৬৭ সালের ১০ মার্চ ২নং আসামি মোয়াজ্জেম ১২নং আসামি মানিক চৌধুরী ও ৭নং সাক্ষী সায়েদুর রহমান পি, এন ওঝার সাথে দেখা করলে তিনি জানান যে, ভারতের প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহের তারিখ ধার্য করা যেতে পারে না। পি, এন ওঝা তাঁদের অগ্রগতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। বৈঠক শেষে পি, এন ওঝা তাঁদের নগদ ৫ হাজার টাকা দেন।

৭০। ১৯৬৭ সালের ৩১ মার্চ ২নং আসামি মোয়াজ্জেম, ১২নং আসামি মানিক চৌধুরী ও ৭নং সাক্ষী সায়েদুর রহমানের সঙ্গে পি, এন ওঝার ঢাকার বাসভবনে গিয়ে ৫ম

বারের মতো পি, এন ওঝার সাথে দেখা করেন। সেই বৈঠকে পি, এন ওঝা এই তথ্য প্রকাশ করেন যে, ভারত সরকার মনে করেন, অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহের আগে ষড়যন্ত্রকারী দলের প্রতিনিধি এবং ভারতের কয়েকজন সরকারি কর্মচারীর মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠানের প্রয়োজন। পি, এন ওঝা পাকিস্তান সীমান্তের অদূরে আগরতলায় (ভারত) বৈঠক অনুষ্ঠানের প্রস্তাব করেন। তিনি ২নং আসামি মোয়াজ্জেমকে তিনজন প্রতিনিধির নাম প্রস্তাব করার আহ্বান জানান। এ সময় পি, এন ওঝা তাঁদের ১০ হাজার টাকা দেন।

৭১। একই মাসে (১৯৬৭ সালের মার্চ) ২নং আসামি মোয়াজ্জম, ৩নং আসামি স্টুয়ার্ড মুজিব ও ১২নং সাক্ষী রমিজ ঢাকার মোহাম্মদপুর হাউজিং এস্টেটে ১২নং সাক্ষী রমিজের ফ্ল্যাটে সমবেত হন। ২নং আসামি মোয়াজ্জেম ১২নং সাক্ষী রমিজকে বলেন যে, তারা ১০নং আসামি রুহুল কুদ্দুসের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পাচ্ছেন এবং ৬নং আসামি এ, এফ রহমান ও ৩নং আসামি স্টুয়ার্ড মুজিব এসব বিষয়ে সমর্থন করেন। সেই বৈঠকে ষড়যন্ত্রকারী বৈঠক অনুষ্ঠান এবং পূর্ণকালীন কর্মীদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করার জন্য আরো একটি বাড়িভাড়া করার সিদ্ধান্ত নেন। ষড়যন্ত্রকারীদের কার্যকলাপ গোপন রাখার উদ্দেশ্যে একটি লোক দেখানো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত কিছু অর্থ সংস্থানের সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা হয়। ১২নং সাক্ষী রমিজ এটা প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর বন্ধু ১৬নং সাক্ষী আবু শামস লুৎফুল হুদার নাম সুপারিশ করেন।

৭২। একই মাসে (১৯৬৭ সালের মার্চ) উল্লেখিত ফ্ল্যাটে দলের অপর একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা বৈঠকে যোগদান করেন : (১) মোয়াজ্জেম ২নং আসামি; (২) স্টুয়ার্ড মুজিব ৩নং আসামি; (৩) সামাদ ৮নং আসামি; (৪) শামসুর রহমান ১৯নং আসামি; (৫) মোতালিব ২৫নং আসামি; (৬) রমিজ ১২নং সাক্ষী এবং (৭) লুৎফুল হুদা ১৬নং সাক্ষী।

সেই বৈঠকে ট্রান্সমিটার সেট সংগ্রহ ও অপারেটরদের ট্রেনিং দান সংক্রান্ত বিষয় আলোচনা করা হয়। এই সিদ্ধান্তও নেয়া হয় যে, ১৬নং সাক্ষী লুৎফুল হুদার তত্ত্বাবধানে দলের লোক দেখানো ব্যবসায় পরিচালনার জন্য ১২নং সাক্ষী রমিজের কাছে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ দেওয়া হবে।

৭৩। কয়েকদিন পর (১৯৬৭ সালের মার্চ) ১২নং সাক্ষী রমিজ ৩নং আসামি স্টুয়ার্ড মুজিবের মারফত ২নং আসামি মোয়াজ্জেমের কাছ থেকে ২৫ হাজার টাকা পান। ওই অর্থ থেকে ১২নং সাক্ষী রমিজ ব্যবসা পরিচালনার জন্য ১৬নং সাক্ষী লুৎফুল হুদাকে নগদ ৫ হাজার টাকা দেন। অবশিষ্ট ২০ হাজার টাকার মধ্যে ১২নং সাক্ষী রমিজ ষড়যন্ত্রকারীদের বিবিধ ব্যয় বাবদ ১৮,৬৮৯ টাকা খরচ করেন।

৭৪। ১৯৬৭ সালের ১৪ মার্চ ৩নং আসামি স্টুয়ার্ড মুজিব ষড়যন্ত্রমূলক কাজে সর্বক্ষণ আত্মনিয়োগের জন্য পাকিস্তান নৌবাহিনী ত্যাগ করেন।

৭৫। ওই মাসেই প্রায় এক পক্ষকাল পরে (১৯৬৭ সালের মার্চ) ১৯নং আসামি শামসুর রহমান 'তার বন্ধু মি. মুজিবুর রহমানকে' সাহায্য করার অনুরোধ জানিয়ে ফরিদপুরের ডেপুটি কমিশনার জনাব সিদ্দিকুর রহমানকে একটি চিঠি লিখে ৩নং আসামি স্টুয়ার্ড মুজিব ১৬নং সাক্ষী লুৎফুল হুদার সাথে ফরিদপুর গিয়ে জনাব সিদ্দিকুর রহমানকে পত্রটি প্রদান করেন।

৭৬। ১৯৬৭ সালের এপ্রিলে ঢাকার গ্রীন স্কোয়ারের ১৩নং বাড়ি দলের জন্য ভাড়া নেয়া হয়। এই বাড়ির দখল নেওয়া হয় ১৯৬৭ সালের ১ মে। নিম্নলিখিত কর্মীরা এতে বসবাস করেন : (১) স্টুয়ার্ড মুজিব ৩নং আসামি; (২) সামাদ ৮নং আসামি; (৩) দলিলুদ্দিন ৯নং আসামি; (৪) প্রাক্তন সুবেদার জালালুদ্দিন আহমদ ১৭নং সাক্ষী; (৫) জনাব মোহাম্মদ গোলাম আহমদ ১৮নং সাক্ষী। ২নং আসামি মোয়াজ্জেম তাঁর ইবিএ-৯৫৯১নং হিলম্যান মোটর গাড়িটা দলের কাজের জন্য ৩নং আসামি স্টুয়ার্ড মুজিবের কাছে ১৩নং গ্রীন স্কোয়ারে রেখে দেন।

৭৭। ১৯৬৭ সালের এপ্রিল মাসে কোনো এক সময়ে ৭নং আসামি মাহফিজুল্লাহ ১৯নং সাক্ষী কর্পোরাল হাই, এ, কে, এম এ-র সাথে করাচির কোরঙ্গী ক্রিকে পি, এফ, ডমেস্টিক এরিয়ায় তার কোয়ার্টারে দেখা করেন। ৭নং আসামি মাহফিজুল্লাহ সেখানে ঘর-সজ্জার জন্য রক্ষিত একটি নকল হাতবোমা দেখতে পেয়ে ১৯নং সাক্ষী হাই-এর কাছ থেকে ওই হাত বোমা নিয়ে যান।

৭৮। ১৯৬৭ সালের মে মাসে ৭নং আসামি মাহফিজুল্লাহ করাচির ১৪। ৪-জি ক্রেটন কোয়ার্টার্সে ২৯নং আসামি সার্জেন্ট জলিলের বাড়িতে এক বৈঠক আহ্বান করেন। বৈঠকে নিম্নলিখিত সদস্যরা যোগদান করেন : (১) মাহফিজুল্লাহ ৭নং আসামি; (২) বারী ২২নং আসামি; (৩) সার্জেন্ট শামসুল হক ২৩নং আসামি; (৪) সার্জেন্ট আবদুল জলিল ২৯নং আসামি; (৫) মোহাম্মদ মাহবুবুউদ্দিন চৌধুরী ৩০নং আসামি; (৬) সামসুদ্দিন ৬নং সাক্ষী; (৭) কর্পোরাল জামাল ১৪নং সাক্ষী এবং (৮) সিরাজ ১৫নং সাক্ষী। সেই বৈঠকে সম্প্রতি পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রত্যাবর্তনকারী এবং দলের অন্যতম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ২৩নং আসামি সার্জেন্ট শামসুল হক উপস্থিত ব্যক্তিদের জানান যে, ২নং আসামি মোয়াজ্জেম ষড়যন্ত্রের জন্য অস্ত্র ও অর্থ সাহায্যের নিমিত্ত ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে রাজি করানোর ব্যাপারে সফল হয়েছেন। তিনি ষড়যন্ত্রকারীদের বিশেষভাবে বলেন যে, 'সংগ্রাম দিবসে' পূর্ব পাকিস্তানের সমগ্র জনসাধারণ সশস্ত্র বিদ্রোহের প্রতি সমর্থন জানাবে। বৈঠক শেষে ৭নং আসামি মাহফিজুল্লাহ তাঁর পকেট থেকে নকল হাতবোমা বের করেন এবং কিভাবে ছুড়তে হয় তা দেখান। তিনি দলের সদস্যদের এটা অনুশীলন করতে বলেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি হাতবোমাটা ২৯নং আসামি জলিলের বাড়িতে রেখে যান। তিনি বলেন, ক্ষুদ্র অস্ত্রশস্ত্র পাওয়ার পর সেগুলোর ব্যবহার সম্পর্কে ট্রেনিং প্রদানের কাজ শুরু করবেন।

৭৯। ১৯৬৭ সালের মে মাসের কোনো এক সময় ৭নং আসামি মাহফিজুল্লাহ ১৫নং সাক্ষী সিরাজের কাছে প্রকাশ করেন যে, ৬নং সাক্ষী শামসুদ্দিন ও তাদের সংঘের একজন সদস্য এবং ৩১নং আসামি লে. এম এম, এম রহমান বিমানবাহিনীর কর্মচারীদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। ৭নং আসামি মাহফিজুল্লাহ করাচির কারসাজে অফিসার্স কোয়ার্টারে ৩১নং আসামি লে. রহমানের বাসভবনে আয়োজিত বৈঠকে যোগদানের উদ্দেশ্যে ৬নং সাক্ষী শামসুদ্দিন ও ৩০নং আসামি মাহবুবুদ্দিনকে নিয়ে আসার জন্য ১৫নং সাক্ষী সিরাজকে নির্দেশ দেন।

৮০। ওই মাসে (১৯৬৭ সালের মে) নির্ধারিত তারিখে নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা ৩১নং আসামি লে. রহমানের গৃহে সমবেত হন : (১) মাহফিজুল্লাহ ৭নং আসামি; (২) লে. রহমান ৩১নং আসামি; (৩) মাহবুবুদ্দিন ৩০নং আসামি; (৪) শামসুদ্দিন ৬নং সাক্ষী; (৫) সিরাজ ১৫নং সাক্ষী এবং আরো কয়েকজন যাঁদের সন্ধান পাওয়া যায়নি।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের কথা পুনরুল্লেখের পর ৩১নং আসামি লে. রহমান উপস্থিত ব্যক্তিদের সেনাবাহিনীতে কর্মরত ও প্রাক্তন বাঙালি সৈনিকদের আরো বেশি করে দলভুক্ত করা এবং পূর্ব পাকিস্তানে উপযুক্ত কর্মী প্রেরণের পন্থা উদ্ভাবনের আহ্বান জানান।

৮১। ১৯৬৭ সালে জুনের শেষ নাগাদ কোনো এক সময়ে ২নং আসামি মোয়াজ্জেম ১৭নং সাক্ষী জালাল ও ৮নং আসামি সামাদকে সদস্য সংগ্রহ সফরে পাঠান। সেই উপলক্ষে পূর্বোল্লেখিত সাক্ষী ও আসামি কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও যশোরে পাঠান। খুলনায় তাঁরা ৩২নং আসামি প্রাক্তন সুবেদার এ, কে, এম তাজুল ইসলামের সাথে দেখা করেন এবং সেই এলাকায় দলের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। ৩২নং আসামি তাজুল ইসলাম যে সকল ষড়যন্ত্রকারীকে দলভুক্ত করেছেন, সফরকারী দলের সাথে তাঁদের পরিচয় করিয়ে দেন।

৮২। ১৯৬৭ সালের জুন মাসের দ্বিতীয় বা তৃতীয় সপ্তাহে পূর্বোক্ত দলের অন্যতম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ৩১নং আসামি লে. রহমান তাঁর বাসভবনে এক বৈঠকের ব্যবস্থা করেন। তাঁর এই বাড়িটি ছিল করাচির কারসাজের কাছে অফিসার্স কোয়ার্টারে ই/১৬নং বাংলোয়।

বৈঠকে নিম্নলিখিত ষড়যন্ত্রকারীরা যোগদান করেন : (১) মাহফিজুল্লাহ ৭নং আসামি; (২) বারী ২২নং আসামি; (৩) মাহবুবুদ্দিন ৩০৯নং আসামি; (৪) লে. রহমান ৩১নং আসামি; (৫) সার্জেন্ট শামসুদ্দিন ৬নং সাক্ষী ও (৬) সিরাজ ১৫নং সাক্ষী এবং আরও কয়েক ব্যক্তি, যাদের সন্ধান পাওয়া যায়নি।

৩১নং আসামি লে. রহমান উপস্থিত ব্যক্তিদের বলেন যে, ২নং আসামি মোয়াজ্জেম ষড়যন্ত্রকারীদের দলে লোকভর্তি বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। ৩০নং আসামি মাহবুবুদ্দিন ও ২নং আসামি বারীর পরামর্শক্রমে ৩২নং আসামি লে. রহমান ৬নং

সাক্ষী শামসুদ্দিন যে ঢাকায় বদলি হয়ে যাচ্ছিলেন তাকে ঢাকায় ২নং আসামি মোয়াজ্জেমের সাথে যোগাযোগ করার নির্দেশ দেন এবং তিনি ঢাকায় তার (লে. রহমানের) উপস্থিতি কামনা করেন কিনা জানতে বলেন। যদি তাঁকে ঢাকায় যেতে হয় তবে ৬নং সাক্ষী শামসুদ্দিন 'বজলুর অবস্থা মারাত্মক, মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে' এই মর্মে তাকে একটি তারবার্তা পাঠাবেন। ২২নং আসামি বারী ও ৩০নং আসামি মাহবুবুদ্দিনের নির্দেশে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, সদস্যরা আপাতত শুধু করাচির গ্রুপের জন্য অর্থ সংগ্রহ করবেন।

৮৩। ১৯৬৭ সালের জুনে ২নং আসামি মোয়াজ্জম ঢাকার ১৩নং গ্রীন স্কোয়ারে আরো কয়েকটি বৈঠক আহ্বান করেন যেগুলোতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা যোগদান করেন : (১) মোয়াজ্জেম ২নং আসামি; (২) স্টুয়ার্ড মুজিব ৩নং আসামি; (৩) সুলতান ৪নং আসামি; (৪) দলিলুদ্দিন ৯নং আসামি; (৫) রিসালদার সামসুল হক ২০নং আসামি; (৬) জনাব এম, আলী রেজা ৩৩নং আসামি; (৭) ক্যাপটেন খুরশিদ উদ্দিন আহাম্মদ এ, এম, সি, ৩৪নং আসামি; (৮) রমিজ ১২নং সাক্ষী; (৯) জালালুদ্দিন ১৯নং সাক্ষী ও (১০) জনাব আনোয়ার হোসেন ২০নং সাক্ষী।

এসব বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতে যাওয়ার জন্য কয়েকজন প্রতিনিধি নির্বাচন করা। এই উদ্দেশ্যে ১৯নং আসামি শামসুর রহমানকে জাকার্তায় এবং ২৫নং আসামি মোতালিবকে পেশোয়ারে তারবার্তা পাঠানো হয়, কিন্তু তারা আসেননি। ৩৪নং আসামি খুরশিদ সম্প্রতি করাচি থেকে ঢাকায় আসেন। ৩৪নং আসামি খুরশিদ আগরতলায় (ভারত) প্রতিনিধি প্রেরণের পরিকল্পনাটির বিস্তারিত বিষয় আলোচনা করেন। পূর্বোক্ত বৈঠকগুলোতে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

(ক) ৩৩নং আসামি রেজা ৩নং আসামি স্টুয়ার্ড মুজিবের সাথে সীমান্তের ওপারে ভারতীয় কর্মচারীদের সঙ্গে আসন্ন বৈঠকে দলের প্রতিনিধিত্ব করবেন; (খ) ৩৩নং আসামি রেজা প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করবেন; (গ) প্রয়োজনীয় অস্ত্র ও গোলাবারুদের একটি তালিকা যা ষড়যন্ত্রকারীদের দেখানো হয়েছে এবং ৩৩নং আসামি রেজাকে দেওয়া হয়েছে সেটা ভারতীয় কর্মচারীদের হাতে প্রদান করতে হবে; (ঘ) আগরতলা বৈঠকে অস্ত্র-চুক্তি চূড়ান্ত করা হবে এবং আর্থিক সাহায্য বৃদ্ধির আহ্বান জানানো হবে; (ঙ) প্রতিনিধিরা ফেনী সীমান্তপথে গোপনে আগরতলা (ভারত) যাবেন এবং (চ) ১৭নং সাক্ষী জালালুদ্দিন সীমান্তে অতিক্রমের ব্যাপারে তদারক করবেন এবং প্রতিনিধিরা যাতে নিরাপদে সীমান্ত পাড়ি দিতে পারেন সেটা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর প্রভাব খাটাবেন আর প্রয়োজন হলে সীমান্ত ফাঁড়িতে কর্তব্যরত ইপিআর বাহিনীর লোকদের ঘুষ দিবেন।

৮৪। ১৯৬৭ সালের জুনের তৃতীয় বা চতুর্থ সপ্তাহে ২নং আসামি মোয়াজ্জেম ১২নং আসামি মানিক চৌধুরীকে ঢাকায় ডেকে পাঠান এবং পি, এন ওঝাকে দেয়ার জন্য

তাঁকে একটি এনভেলাপ দেন। ১২নং আসামি মানিক চৌধুরী সেইদিন সন্ধ্যায় এনভেলাটি দেন। এনভেলাটিতে সাংকেতিক শব্দ, সীমান্ত অতিক্রম করার বিভিন্ন জায়গার নাম ও পূর্বোক্ত প্রতিনিধিদের নাম দেওয়া ছিল।

৮৫। ১৯৬৭ সালের ১১ জুলাই পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে আগরতলার 'ভারত' পথে প্রতিনিধিদের সীমান্ত পার করে দেয়ার উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত ষড়যন্ত্রকারীরা, দু'জন প্রতিনিধি– ৩৩নং আসামি রেজা ও ৩নং আসামি স্টুয়ার্ড মুজিবের সাথে ফেনী (নোয়াখালী জেলা) পৌঁছেন : (১) স্টুয়ার্ড মুজিব ৩নং আসামি; (২) সামাদ ৮নং আসামি; (৩) দলিল উদ্দিন ৯নং আসামি; (৪) রেজা ৩৩নং আসামি ও (৫) জালাল ১৭নং সাক্ষী।

উপরোল্লেখিত ষড়যন্ত্রকারীরা ফেনী রেল স্টেশনের কাছে হোটেল ডিনোফায় অবস্থান করেন। ওই সন্ধ্যায় ৩নং আসামি স্টুয়ার্ড মুজিব ১২নং সাক্ষী রমিজকে ফেনী আসার জন্য টেলিফোন করেন। টেলিফোন বার্তার জবাবে ওই রাতেই তিনি ২০নং সাক্ষী আনোয়ার হোসেনকে সঙ্গে করে পি, আই, এ'র একটি স্টাফ কার-এ ফেনী পৌঁছেন।

৮৭। ১৯৬৭ সালের ১৩ জুলাই রাতের কোনো এক সময় দু'জন প্রতিনিধি ৩৩নং আসামি রেজা ও ৩নং আসামি স্টুয়ার্ড মুজিব একটি ট্রাকযোগে আগরতলা থেকে ডিনোফা হোটেলে প্রত্যাবর্তন করেন।

৮৮। ১৯৬৭ সালের ১৫ জুলাই পূর্বোক্ত বৈঠকের ফলাফল ২নং আসামি মোয়াজ্জেমকে অবহিত করার জন্য তাঁরা বরিশাল রওনা হন।

৮৯। পরে একই মাসে অর্থাৎ ১৯৬৭ সালের জুলাই মাসে ১২নং আসামি মানিক চৌধুরী ও ৭নং সাক্ষী সায়েদুর রহমানকে সঙ্গে নিয়ে ২নং আসামি মোয়াজ্জেম পি, এন ওঝার সাথে শেষোক্ত ব্যক্তির ঢাকার ধানমন্ডিস্থ বাসভবনে ষষ্ঠবারের মতো দেখা করেন। পি, এন ওঝা ২নং আসামি মোয়াজ্জেমের কাছে ভান করেন যে, আগরতলা বৈঠকের ফল সম্পর্কে তিনি কখনো তাঁর সরকারের কাছ থেকে কোনো খবর পাননি। তবে তিনি শান্তভাবে গোনে ১২নং আসামি মানিক চৌধুরীকে জানান যে, ভারতীয় কর্মচারীরা প্রতিনিধিদের শক্তি ও মর্যাদার ব্যাপারে সন্তুষ্ট হতে পারেননি।

৯০। ওই মাসে (১৯৬৭ সালের জুলাই) ৪নং আসামি সুলতান করাচি সফর করেন। করাচির মার্টিন কোয়ার্টারের ৩০নং আসামি মাহবুবুদ্দিনের ১৪।৪ জি, নং বাড়িতে করাচিতে কার্যরত ষড়যন্ত্রকারীদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা বেঠকে যোগদান করেন : (১) সুলতান ৪নং আসামি, (২) মাহফিজুল্লাহ ৭নং আসামি; (৩) জহুরুল হক ১৭নং আসামি; (৪) সার্জেন্ট শামসুল হক ২৩নং আসামি; (৫) লে. রহমান ৩১নং আসামি ও (৬) সিরাজ ১৫নং সাক্ষী।

আরো তিন ব্যক্তি যাদের নাম দেওয়া হয়েছিল পাইলট অফিসার মির্জা, এস, এম, আলী ও চৌধুরী জয়নুল আবেদীন, তারাও এই বৈঠকে যোগদান করেন। শেষোক্ত দুই ব্যক্তিকে শনাক্ত করা যায়নি, ওদিকে আবার প্রথম ব্যক্তি হাসপাতালে থাকায় তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার অনুমতি দেয়া হয়নি।

৪নং আসামি সুলতান বলেন যে, তিনি কিউবার বিপ্লব প্রত্যক্ষ করেছেন এবং সে কারণে সশস্ত্র বিপ্লব ঘটানোর জন্য প্রয়োজনীয় আত্মোৎসর্গ সম্পর্কে তিনি সচেতন। প্রধান প্রধান কর্মীদের মধ্যে বৈপ্লবিক মনোভাবের অভাব দেখে তিনি তাঁর হতাশা প্রকাশ করেন। এই উদ্দেশ্যে নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার শপথ গ্রহণের জন্য উপস্থিত ব্যক্তিদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

৯১। এর প্রায় ১৫ দিন পর ১৯৬৭ সালের জুলাই-আগস্টে ৩১নং আসামি লে. রহমান করাচির মার্টিন কোয়ার্টারে ৩০নং আসামি মাহবুবুদ্দিনের ১৪। জি নং বাসভবনে অপর এক দলীয় বেঠক আহ্বান করেন। নিম্নলিখিত ষড়যন্ত্রকারীরা এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন : (১) লে. রহমান ৩১নং আসামি; (২) লে. আবদুর রউফ ৩৫নং আসামি; (৩) জহুরুল হক ১৭নং আসামি; (৪) সুলতান ৪নং আসামি; (৫) মাহফিজুল্লাহ ৭নং আসামি; (৬) বারী ২২নং আসামি; (৭) সিরাজ ১৫নং সাক্ষী। অপর দুই ব্যক্তি যাদের নাম চৌধুরী জয়নুল আবেদীন ও এস, এম আলী বলে উল্লেখ করা হয়েছে তাঁরাও এই বৈঠকে যোগদান করেন। কিন্তু তাঁদের সঠিকভাবে শনাক্ত করা যায়নি। এছাড়া আরও যে কয়েকজন বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তাঁদের নাম নিশ্চিতরূপে জানা যায়নি।

ওই বৈঠকে ৩১নং আসামি লে. রহমান দলের সদস্যদের ২নং আসামি মোয়াজ্জেমের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানে কার্যরত মূল সংঘের সাথে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা রক্ষা করে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেন। এরপর লে. আবদুর রউফ বাংলায় উপস্থিত ব্যক্তিদের শপথ গ্রহণ পরিচালনা করেন। একই বৈঠকে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত নেয়া হয় :

(ক) ১৫নং আসামি সিরাজুল ইসলাম মৌরীপুর এলাকা থেকে অর্থ সংগ্রহ এবং সদস্য দলভুক্ত করবেন। (খ) ৭নং আসামি মাহফিজুল্লাহ ড্রিগ রোড এলাকা থেকে অর্থ সংগ্রহ এবং সদস্য দলভুক্ত করবেন। (গ) ১৭নং আসামি জহুরুল হক কোরঙ্গী এলাকা থেকে অর্থ সংগ্রহ ও সদস্য দলভুক্ত করবেন এবং একই উদ্দেশ্যে চাকলালা, পেশোয়ার, কোহাট ও সারগোদা সফর করবেন।

৯২। ১৯৬৭ সালের আগস্ট মাসে ১২নং আসামি মানিক চৌধুরী ও ৭নং সাক্ষী সায়েদুর রহমান ঢাকায় যান এবং ৩নং আসামি স্টুয়ার্ড মুজিবের সাথে দেখা করেন। শেষোক্ত ব্যক্তি তাঁদের জানান যে, তিনি ও ৩৩নং আসামি রেজা আগরতলা গিয়েছিলেন।

৯৩। ১৯৬৭ সালের আগস্টে ৩৫নং আসামি লে. রউফ ক্লেটন কোয়ার্টার্সে ২৯নং আসামি জলিলের বাড়িতে এক জরুরি বৈঠক আহ্বান করেন। বৈঠকে নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন : (১) মাহফিজুল্লাহ ৭নং আসামি; (২) বারী ২২নং আসামি; (৩) জলিল ২৯নং আসামি; (৪) লে. রহমান ৩১নং আসামি; (৫) লে. রউফ ৩৫নং আসামি; (৬) শাহাবুদ্দিন ৬নং সাক্ষী; (৭) সিরাজ ১৫নং সাক্ষী। অপর তিন ব্যক্তি যাদের নাম দেয়া হয়েছে কর্পোরাল আফতাব, চৌধুরী জয়নুল আবেদীন ও সিদ্দিকুর রহমান তাঁদের সঠিকভাবে শনাক্ত করা যায়নি। ৩৫নং আসামি লে. রউফ ও ৩১নং আসামি লে. রহমানকে কিছুটা চিন্তিত মনে হয়। তাঁরা সন্দেহ করেন যে, তাঁদের ওপর নজর রাখা হচ্ছে। ৩৫নং আসামি লে. রউফ নতুন সদস্য ভর্তি বন্ধ রাখার জন্য বৈঠকে যোগদানকারীদের নির্দেশ দেন। ৩৫নং আসামি লে. রউফ সদস্যদের ছুটি নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে যাওয়ার আহ্বান জানান। তদানুসারে সদস্যরা ছুটি নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে তাদের নিজ নিজ শহরে যাওয়া শুরু করেন।

৯৪। ২৩নং আসামি সার্জেন্ট শামসুল হকের নির্দেশক্রমে ১৯৬৭ সালের সেপ্টেম্বরের কোনো এক সময়ে ১৭নং আসামি জহুরুল হক চাকলালা পি, এ, এফ স্টেশনে গিয়ে ২১নং আসামি জহুরুল হক ২১নং সাক্ষী রজবকে জানান যে, সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার উদ্দেশ্যে একটি দল গঠন করা হয়েছে এবং এই ষড়যন্ত্রে যোগদানের জন্য ২১নং সাক্ষী রজবকে আমন্ত্রণ জানান। তবে ২১নং সাক্ষী রজব এই কার্যকলাপের সাথে নিজেকে জড়িত করতে অস্বীকার করেন।

৯৫। ১৯৬৭ সালের অক্টোবরের ৩৩নং আসামি রেজা ১২নং সাক্ষী রমিজের কাছ থেকে পি, আই, এ'র একটি টিকিট নেন এবং লাহোর ও পেশোয়ারে গমন করেন। ইতিমধ্যে ১০নং আসামি রুহুল কুদ্দুসকে লাহোরে ও ২৫নং আসামি ক্যাপ্টেন মোতালিবকে পেশোয়ারে বদলি করা হয়। ২নং আসামি মোয়াজ্জেম তহবিল তসরূপ করেছেন বলে তার মনে সন্দেহ হওয়ায় তিনি তা এই দুই ব্যক্তিকে জানাবার উদ্দেশেই লাহোর ও পেশোয়ার যান।

৯৬। ১৯৬৭ সালের নভেম্বরে ১৫নং সাক্ষী সিরাজ প্রিভিলেজ ছুটিতে ঢাকায় পৌঁছেন। সে সময় ৩০নং আসামি শাহবুবুদ্দিন ৩৫নং আসামি লে. রউফ ও ৩১নং আসামি লে. রহমান আগেই ছুটি নিয়ে ঢাকায় পৌঁছেছিলেন।

৯৭। ১৯৬৭ সালের নভেম্বর ২৪নং সাক্ষী প্রাক্তন স্কোয়াড্রন লিডার মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরীর বাসভবনে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা যোগদান করেন : (১) ফজলুল হক ১১নং সাক্ষী; (২) এম, এ রাজ্জাক ১৬নং আসামি; (৩) কর্পোরাল জামাল ১৪নং সাক্ষী; (৪) জাকির আহমদ ২২নং সাক্ষী; (৫) সার্জেন্ট এম, আবদুল হালিম ২৩নং সাক্ষী ও (৬) চৌধুরী ২৪নং সাক্ষী।

এই বৈঠকে উপলব্ধি করা হয় যে, ২নং আসামি মোয়াজ্জেম ও তার আশ্রিত ব্যক্তিদের স্বার্থপরতার দরুন দল নিস্তেজ হয়ে পড়ায় এতে নতুন করে প্রাণসঞ্চার করা উচিত।

৯৮। ১৯৬৭ সালের নভেম্বরে ২২নং সাক্ষী জাকির ২৫নং সাক্ষী উয়িং কমান্ডার আশফাক মিয়ার কাছে এই মর্মে রিপোর্ট দেন যে, কয়েকদিন পূর্বে ২৩নং সাক্ষী হালিম তাঁকে ২৪নং সাক্ষী চৌধুরীর বাড়িতে নিয়ে গেলে সেখানে তিনি নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের সমাবেশ দেখেন : (১) ফজলুল হক ১১নং আসামি; (২) এম. এ. রাজ্জাক ১৬নং আসামি; (৩) চৌধুরী ২৪নং সাক্ষী; (৪) কর্পোরাল জামাল ১৪নং সাক্ষী ও (৫) হালিম ২৩নং সাক্ষী।

২২নং সাক্ষী জাকির ২৫নং সাক্ষী আশফাকের কাছে অভিযোগ করেন যে, পূর্বোক্ত ব্যক্তিরা কেন্দ্র থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করা সম্পর্কে আলাপ করছিলেন।

৯৯। ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা ঢাকার শুকরাবাদে অবস্থিত ১৫নং সাক্ষী সিরাজের বন্ধু জনাব মালিক নামে একব্যক্তির গৃহে এক বৈঠকে মিলিত হন : (১) লে. রউফ ৩৫নং আসামি' (২) মাহবুবুদ্দিন ৩০নং আসামি; (৩) সিরাজ ১৫নং সাক্ষী এবং আরো কয়েক ব্যক্তি যাদের সন্ধান পাওয়া যায়নি।

দলের কার্যকলাপ গোপন রাখার উদ্দেশ্যে ঢাকায় একটি কারিগরি স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব আলোচনা করা হয়। ৩৫নং আসামি লে. রউফ দলের কার্যকালে নতুন করে প্রাণসঞ্চারের জন্য ২নং আসামি মোয়াজ্জেম ও কর্নেল এম, এ, জি ওসমানীর সাথে যোগাযোগ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

১০০। এর কিছুদিন পরেই ষড়যন্ত্রের উদ্যোক্তাদের গ্রেফতার করা শুরু হয় এবং এভাবে তাদের কার্যকলাপের অবসান ঘটে।

যথাবিধি সম্মান পুরঃসর নিবেদন এই যে, আসামিদের বিরুদ্ধে আনীত ও একসঙ্গে পেশকৃত অভিযোগ অনুযায়ী তাঁদের বিচার করা হোক।

পরিশিষ্ট–১

(৫নং অনুচ্ছেদ উল্লেখ্য)

১। তদন্ত অনুষ্ঠানকালে পাকিস্তানের যে সকল নাগরিককে এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে দেখা গেছে তাদের নাম ও বিবরণ হয় 'অভিযুক্ত ব্যক্তিদের তালিকা' শীর্ষক তালিকায়, নতুবা 'ক–তালিকা' শীর্ষক তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২। ষড়যন্ত্রের বিস্তারিত বিবরণ সম্পর্কে হলফ করে সাক্ষ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে যে সকল ব্যক্তিকে ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়েছে তাদের নাম ও বিবরণ 'ক'-তালিকায় আছে। যেসব ব্যক্তিকে তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অনুযায়ী বিচারে জন্য হাজির করা হবে তাদের নাম ও বিবরণ অভিযুক্ত ব্যক্তিদের তালিকায় দেখানো হয়েছে।

৩। বিচারের সময় যে সকল ব্যক্তিকে সাক্ষী হিসেবে হাজির করার ইচ্ছা আছে তাদের নাম ও বিবরণ ক্রমিক সংখ্যানুসারে 'সাক্ষীদের তালিকা' শিরোনামযুক্ত তালিকায় রাখা হয়েছে। যেসব ব্যক্তিকে ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়েছে তাদের নাম ও বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে 'সাক্ষীদের তালিকায়'।

৪। প্রমাণ হিসেবে যেসব দলিলপত্র ও দ্রব্য উপস্থাপিত করার ইচ্ছা আছে সেগুলো যথাক্রমে 'দলিলপত্রের তালিকা' ও 'দ্রব্যের তালিকায়' অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৫। প্রয়োজনবোধে পরে অতিরিক্ত তালিকা পেশ করা হবে।

পরিশিষ্ট-২

(৫ ও ১৯নং অনুচ্ছেদ)

ক্রমিক	সাংকেতিক নাম	যাদের জন্য দেওয়া হয়েছিল
১	২	৩
১।	আলো	লেফেটেন্যান্ট কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন ২নং আসামি।
২।	উল্কা	মোহাম্মদ আমির হোসেন মিয়া ৩নং সাক্ষী।
৩।	তুহিন	ক্যাটারিং লেফটেন্যান্ট মোজাম্মেল হোসেন ১নং সাক্ষী।
৪।	কমল	প্রাক্তন এল, এস সুলতানউদ্দীন আহমদ ৪নং আসামি।
৫।	মুরাদ	স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান ৩নং আসামি।
৬।	পরশ	শেখ মুজিবুর রহমান ১নং আসামি।
৭।	তুষার	এ, এফ রহমান, সি-এস-পি ৬নং আসামি।
৮।	সবুজ	এল, এস, নূর মোহাম্মদ ৫নং আসামি।
৯।	শেখর	রুহুল কুদ্দুস সি-এস-পি, ১০নং আসামি।

অভিযুক্ত ব্যক্তিদের তালিকা

(৫নং অনুচ্ছেদ ও পরিশিষ্ট উল্লেখ্য)

১। শেখ মুজিবুর রহমান পিতা মৌলবী শেখ লুৎফর রহমান; (ক) গ্রাম : টুঙ্গিপাড়া, থানা : গোপালগঞ্জ, জেলা : ফরিদপুর। (খ) ৬৭৭নং ধানমন্ডি, আবাসিক এলাকা, রোড নং ৩২, ঢাকা।

২। পি, নং ৫৭৪ লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন, পিতা : মৌলবী মোফাজ্জল আলী; গ্রাম : ধুনুরিতার, থানা : পিরোজপুর, জেলা : বরিশাল।

৩। ও, নং ৬৬৫০৮ স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান, পিতা : মুন্সী আবদুল লতিফ; গ্রাম : ঘাটমাঝি, থানা : মাদারীপুর, জেলা : ফরিদপুর।

৪। প্রাক্তন এল, এস সুলতান উদ্দিন আহামদ, পিতা : মৌলভী শামসুদ্দীন আহমদ, গ্রাম : উত্তরখামার, থানা : কাপাসিয়া, জেলা : ঢাকা।

৫। ও, নং ৬৪৬৭২ এল, এস সিডি আইনুর মোহাম্মদ, পিতা : জনাব তমিজউদ্দিন আখন্দ; গ্রাম : কুমারবাউ, থানা : লৌহজং, পো: লৌহজং, তহশিল হালিদিয়া, জেলা : ঢাকা।

৬। জনাব আহমদ ফজলুর রহমান, সি-এস-পি, পিতা : জনাব ইমামউদ্দিন আহমদ; (ক) গ্রাম : কচিসরা, থানা দেবীদ্বার, কুমিল্লা।
(খ) ৭০৮নং ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, রোড নং ৩০, ঢাকা।

৭। পাক/৫১৩০১, এফ/সার্জেন্ট হাফিজুল্লাহ, পিতা : হাজী মোহাম্মদ ইসমাইল; গ্রাম: মুরাদপুর, পোঃ নয়াহাট, থানা : বেগমগঞ্জ, জেলা : নোয়াখালী।

৮। প্রাক্তন কর্পোরাল আবুল বাসার মোহাম্মদ আবদুস সামাদ, পিতা : জনাব ইন্তে আলী মৃধা; গ্রাম : মিঠাখালি, থানা : মঠবাড়িয়া, জেলা : বরিশাল।

৯। প্রাক্তন হাবিলদার দলিল উদ্দিন পিতা : আফিজউদ্দিন; গ্রাম ও পোঃ শ্যামপুর, থানা : বাকেরগঞ্জ, জেলা : বরিশাল।

১৯। জনাব রুহুল কুদ্দুস, সি-এস-পি, পিতা : জনাব রইসউদ্দিন আহমদ;
(ক) গ্রাম : পাঁচরখি, পোঃ কাকডাঙ্গা, সাতক্ষীরা, জেলা : খুলনা।
(খ) ৬১৮-এ, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, রোড নং ১৮, ঢাকা।

১১। পাক/৭২৮৭০, এফ/সার্জেন্ট মোহাম্মদ ফজলুল হক, পিতা : মৌলবী সৈয়দ আলী তালুকদার; গ্রাম ও পোঃ শায়েস্তাবাদ, থানা : কোতোয়ালি, জেলা : বরিশাল।

১২। মিঃ ভূপতি ভূষণ চৌধুরী ওরফে মানিক চৌধুরী, পিতা : মি. ধীরেন্দ্রলাল চৌধুরী; গ্রাম : হবিলাশদ্বীপ, পোঃ বোয়ালখালি, থানা : পটিয়া, তহশিল ও জেলা : চট্টগ্রাম এবং ৪১নং রামজয় মহাজন লেন, চট্টগ্রাম শহর, থানা কোতোয়ালি।

১৩। মিঃ বিধানকৃষ্ণ সেন, পিতা : মিঃ রাজেন্দ্র নারায়ণ সেন; গ্রাম : সারুয়াতলা, থানা : বোয়ালখালি, জেলা : চট্টগ্রাম।

১৪। পিজেও-২০৬৮ সুবেদার আবদুর রাজ্জাক, পিতা : জনাব সিতু সরকার; (ক) গ্রাম ও পোঃ দক্ষিণ বরষারচর, থানা : মতলবগঞ্জ, তহশিল চাঁদপুর, জেলা : কুমিল্লা। (খ) গ্রাম ও পোঃ চোট গোবিন্দপুর, থানা : কোতোয়ালি, জেলা : যশোর।

১৫। প্রাক্তন হাবিলদার/ক্লার্ক মুজিবুর রহমান, ইপিআরসি, পিতা : জনাব আবদুর রহমান; গ্রাম ও পোঃ গোপালপুর, থানা : নবীনর, জেলা : কুমিল্লা।

১৬। প্রাক্তন এফ/সার্জেন্ট মোহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক, পিতা : মুন্সী আসকার আলী; গ্রাম : বান্দরামপুর, পোঃ দাউদকান্দি, থানা : দাউদকান্দি, জেলা : কুমিল্লা।

১৭। পাক/৭২৩২৪ সার্জেন্ট জহুরুল হক, পিতা : কাজী মুজিবুল হক; গ্রাম সোনাপুর, পোঃ সোনাপুর, থানা : সুধারাম, জেলা : নোয়াখালী।

১৮। প্রাক্তন এ,বি মোহাম্মদ খুরশীদ, পিতা : জনাব আবদুল জব্বার; গ্রাম সাবের কটেজ, পোঃ ফরিদপুর শহর, থানা : কোতোয়ালি, জেলা : ফরিদপুর।

১৯। খান এম. শামসুর রহমান সি-এস-পি, পিতা : জনাব ইমতিয়াজ উদ্দিন খান; গ্রাম-পোঃ লামুবাড়ী, থানা : মানিকগঞ্জ, তহশিল মানিকগঞ্জ, জেলা : ঢাকা।

২০। পিজেও-৭৬৮ রিসালদার এ, কে, এম শামসুল হক, এসি, পিতা জনাব আবদুল সামাদ; গ্রাম : পোতাল, পোঃ লামুবাড়ী, থানা: মানিকগঞ্জ, তহশিল মানিকগঞ্জ, জেলা : ঢাকা।

২১। নং ৩০৩১০১৮ হাবিলদার আজিজুল হক, এসএসজি, পিতা : জনাব সিরাজুল হক; গ্রাম : কচিয়া, পোঃ ও থানা : বড়নদী, জেলা : বরিশাল।

২২। পাক/৭৩০৪০/এস সি মাহফুজুল বারী, পিতা : মওলানা এ, কে, মোমাজ্জাদ, গ্রাম: চরলক্ষ্মী, পোঃ রামগতি হাট, থানা : রামগতি, জেলা : নোয়াখালী।

২৩। পাক/৭০৪১৫/সার্জেন্ট শামসুল হক, পিতা হাজী সাদেক আলী; গ্রাম : নৈরাজপুর, পোঃ কে, এন হাট, থানা : ফেনী, জেলা : নোয়াখালী।

২৪। পিএসএল-১০০৫২০ মেজর শামসুল আলম, এএমসি, পিতা : জনাব শামসুজ্জোহা; ১৬নং খাজে দেওয়ান সেকেন্ড লেন, ঢাকা।

২৫। পি এস এস-৬১০০ ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ আবদুল মোতালিব, পিতা : জনাব হাফিজউদ্দিন; গ্রাম : দরুদবাই রতি, থানা : পূর্বধলা, পোঃ শামগঞ্জ, তহশিল নেত্রকোনা, জেলা : ময়মনসিংহ।

২৫। পিটিসি-৫৭২৭, ক্যাপ্টেন এম শওকত আলী মিয়া, পিতা : মুন্সী মোবারক আলী; গ্রাম : চাকদা, পোঃ লনসিং, থানা : নড়িয়া, জেলা : ফরিদপুর।

২৭। পিএ-৬৫৬১ ক্যাপ্টেন খোন্দকার নজমুল হুদা, এএসসি, পিতা : মরহুম খোন্দকার মোয়াজ্জেম হোসেন; গ্রাম : বরিশাল শহর, পশ্চিম বগরা রোড, জেলা : বরিশাল।

২৮। ক্যাপ্টেন এ এন এম নুরুজ্জামান, ইবিআর, পিতা মৌলবী আবু আহমদ; গ্রাম ও পোঃ সাইদাবাদ, থানা : রায়পুরা, জেলা : ঢাকা।

২৯। পাক/৭০৭০৪, সার্জেন্ট আবদুল জলিল, পিতা : মৌলবী আবদুল কাদের; গ্রাম : সাররাবাদ (হাজীবাড়ি), পোঃ নারায়ণপুর, জেলা : ঢাকা।

৩০। জনাব মোহাম্মদ মাহবুবুদ্দিন চৌধুরী, পিতা : আলহাজ মৌলবী আজিজ উদ্দিন মোহাম্মদ চৌধুরী; গ্রাম : পাইয়াম, পোঃ চৈতিয়ান, জেলা : সিলেট।

৩১। পি নং ৯৫৮, ফার্স্ট লেফটেন্যান্ট এম, এম, এম, রহমান, পিতা : মোল্লা মোহাম্মদ সোলায়মান; গ্রাম ও পোঃ মাকরাইল, থানা : লোহাগড়া, জেলা : যশোর।

৩২। প্রাক্তন সুবেদার এ কে এম তাজুল ইসলাম, পিতা : মৌলবী দলিলুদ্দিন আহমদ; গ্রাম : শ্রীপুর, থানা : ভাণ্ডারিয়া, জেলা : বরিশাল।

৩৩। জনাব মোহাম্মদ আলী রেজা, পিতা : মৌলবী জহুর আলী আহমদ; গ্রাম : লাহিরী, পোঃ কুষ্টিয়া, থানা : কোতোয়ালি, জেলা : কুষ্টিয়া।

৩৪। পিএসএস ২০০৪৭১, ক্যাপ্টেন খুরশীদ উদ্দিন আহমদ এএমসি, পিতা : মৌলবী আব্দুর রহমান; গ্রাম ও পোঃ বাশিয়া, থানা : গফরগাঁ, জেলা : ময়মনসিংহ।

৩৫। পি নং ৯৪৪ ফার্স্ট লেফটেন্যান্ট আবদুর রউফ, পিতা আলহাজ আবদুল লতিফ; পাকিস্তান হাউস, পোঃ ও থানা : ভৈরব, জেলা : ময়মনসিংহ।

'ক' তালিকা

(ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩৩৭ ধারা মোতাবেক যাদের ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়েছে)।

(৫নং অনুচ্ছেদ উল্লেখ্য)

১। লেফটেন্যান্ট মোজ্জাম্মেল হোসেন, পিতা মরহুম মেনহাজউদ্দিন মিয়া; গ্রাম পশ্চিম ফুলকী; থানা : বাসাইল, জেলা : ময়মনসিংহ।

২। প্রাক্তন কর্পোরাল মোহাম্মদ আমীর হোসেন মিয়া, পিতা মৌলবী ফাজিল মোল্লা; গ্রাম : রূপবাবুরচর, দাড়িকান্দি, থানা : জাজিরা, জেলা : ফরিদপুর।

৩। সার্জেন্ট পাক ৫/৪২৭২ শামসুদ্দীন আহম্মদ, পিতা : মোহাম্মদ আফতাব উদ্দীন; গ্রাম : নিজকল্লা, থানা: কোতোয়ালি, জেলা : ময়মনসিংহ।

৪। ডা. সায়েদুর রহমান, পিতা : মৌলবী আবুল খায়ের চৌধুরী; গ্রাম এনায়েত বাজার, থানা : কোতোয়ালি, জেলা চট্টগ্রাম।

৫। ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মীর্জা মোহাম্মদ রমিজ, পিতা : এম এম সিরাজ; গ্রাম : ধানুন, থানা : রূপগঞ্জ, ঢাকা, বর্তমানে ৬০ পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম।

৬। ক্যাপ্টেন পিএ/৬৬৩২ মোহাম্মদ আলিম ভুঁইয়া, পিতা : আলহাজ মজমউদ্দীন ভুঁইয়া; গ্রাম : পরমতলা, থানা : মুরাদনগর, কুমিল্লা।

৭। কর্পোরাল জামালউদ্দীন আহমদ, পিতা : বশিরউদ্দীন; গ্রাম : বিরামপর, থানা : শুজানগর, পাবনা।

৮। পাক কর্পোরাল সিরাজুল ইসলাম, পিতা : মৌলবী আমিনউদ্দীন; গ্রাম : শিলাই, থানা : বুড়িচং, জেলা : কুমিল্লা।

৯। জনাব মোহাম্মদ গোলাম আহমদ, পিতা : আব্দুল জব্বার; গ্রাম : জাফরাবাদ, থানা : মাদারীপুর, জেলা : ফরিদপুর।

১০। আবুল বাশার মোহাম্মদ ইউসুফ, পিতা : মুন্সী মোহাম্মদ আলী হাওলাদার; গ্রাম : দক্ষিণ মিঠাখালি, থানা : মঠবাড়িয়া, জেলা : বরিশাল।

১১। সার্জেন্ট মোহাম্মদ আব্দুল হালিম, পিতা : মরহুম মুন্সী আব্দুল আজিজ; গ্রাম : শোহিলপুর, থানা : চৌদিনা, জেলা : কুমিল্লা।

শেখ মুজিবের জবানবন্দি

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রথম আসামি ও পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৯ সালের ২৮ জানুয়ারি ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে বিশেষ ট্রাইব্যুনালের নিকট নিম্নলিখিত জবানবন্দি প্রদান করেন :

ছাত্রজীবন হইতেই আমি পাকিস্তান হাসিলের জন্য অবিরাম কাজ করিয়া আসিয়াছি। আজাদীর পূর্বে আমি ভারত ও বাংলাদেশে মুসলিম লীগের একজন অত্যন্ত সক্রিয় সদস্য ছিলাম এবং এমনকি পড়াশোনা ছাড়িয়াও আমি পাকিস্তান দাবি আদায়ের জন্য কাজ করিয়াছি।

আজাদী লাভের পর মুসলিম লীগ যখন পাকিস্তানের জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে, তখন আমরা মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ গঠন করি। আওয়ামী লীগ পূর্বের ন্যায় এখনও একটি শাসনতন্ত্রসম্মত গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান।

১৯৫৪ সালে আমি প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হই এবং পরে জাতীয় পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হই। দু'বার আমি পূর্ব পাকিস্তান সরকারের উজির হই। আমি গণচীনে প্রেরিত পাকিস্তান পার্লামেন্টারি প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করি। জনগণের কল্যাণের জন্য একটি শাসনতন্ত্রসম্মত বিরোধী দল গঠনের জন্য ইতিমধ্যেই আমি কয়েক বছর কারাযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি।

দেশে সামরিক আইন জারি হওয়ার পর বর্তমান সরকার আমার ওপর নির্যাতন শুরু করেন। ১৯৫৮ সালের ১২ অক্টোবর আমাকে পূর্ব পাকিস্তান জননিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করা হয় এবং বিনা বিচারে প্রায় দেড় বছর যাবৎ আটক রাখা হয়। এই আটক থাকার সময়ই আমার বিরুদ্ধে ছয়টি ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়; কিন্তু সবগুলো মামলাতেই আমি সসম্মানে খালাস পাই। ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বর অথবা ১৯৬০ সালের জানুয়ারি মাসে আমি এই আটক হতে মুক্তি পাই।

মুক্তির সময় আমার ওপর নিম্নবর্ণিত বিধিনিষেধ আরোপ করা হয় : আমি যদি ঢাকার বাহিরে যাইতে চাহিতাম, তাহা হইলে কোথায় যাইতেছি, তাহার বিবরণসহ উহা লিখিতভাবে পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চকে জানাইতে হইত। অনুরূপভাবে ঢাকায় প্রত্যাবর্তনের পরও উহা লিখিতভাবে স্পেশাল ব্রাঞ্চকে জানাইতে হইত। গোয়েন্দা বিভাগের লোকজন সর্বদা ছায়ার মতো আমাকে অনুসরণ করিত।

অতঃপর ১৯৬২ সালে বর্তমান শাসনতন্ত্র জারি হওয়ার পূর্বে আমার নেতা মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে যখন গ্রেফতার করা হয় তখন আমাকেও জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্স বলে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয় এবং প্রায় ছয় মাসকাল বিনাবিচারে আটক রাখা হয়।

জনাব সোহরাওয়ার্দী ইন্তেকালের পর ১৯৬৪ সালের জানুয়ারি মাসে পাকিস্তানের উভয় অংশে আওয়ামী লীগ পুনরুজ্জীবিত করা হয় এবং সম্মিলিত বিরোধী দলের অঙ্গ হিসেবে আমরা প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। জনাব আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য সম্মিলিত বিরোধী দলের পক্ষ হইতে মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নাহকে মনোনয়ন দান করা হয় এবং আমরা নির্বাচনী অভিযান শুরু করি। এ সময় সরকার আমার বক্তৃতার ভিত্তিতে একাধিক মামলা দায়ের করিয়া আমার ওপর নির্যাতন ও হয়রানি চালাইতে থাকেন।

১৯৬৫ সালে ভারতের সহিত যুদ্ধের সময় যে সকল রাজনৈতিক নেতা ভারতীয় হামলার নিন্দা করেন, আমি তাহাদের মধ্যে অন্যতম ছিলাম এবং সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাইবার জন্য আমার দল ও জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছিলাম। আমার দল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের তরফ হইতে বিজ্ঞপ্তি জারি করিয়া সকল ইউনিটকে সম্ভাব্য সকল প্রকারে যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সহায়তা করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল।

এই যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তান গভর্নর হাউসে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় সম্মেলনে প্রদেশের অন্যান্য রাজনৈতিক নেতার সহিত এক যুক্ত বিবৃতি প্রচার করিয়া আমি ভারতীয় হামলার নিন্দা করিয়াছিলাম এবং জনগণের প্রতি সমবেতভাবে কাজ করিয়া দেশের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সহায়তা করার আবেদন জানাইয়াছিলাম। যুদ্ধের পর প্রেসিডেন্ট আউয়ুব খান পূর্ব পাকিস্তান সফরে আসিলে তাঁহার আমন্ত্রণক্রমে অন্য সকল রাজনৈতিক নেতার সহিত আমিও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি। এই সময় পূর্ব পাকিস্তানকে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দেওয়া এবং এই প্রদেশকে দেশরক্ষার ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য আমি তাঁহার নিকট আবেদন জানাই। আমি তাঁহাকে বলি যে, যুদ্ধের সময়কার বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে যে, পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানেও বিশ্বের অবশিষ্টাংশ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে এবং এই কারণেই দেশরক্ষার ব্যাপারে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়া তোলা বিশেষভাবে প্রয়োজন।

আমি তাসখন্দ ঘোষণার প্রতিও সমর্থন জানাইয়াছিলাম। কারণ, আমি ও আমার দল বিশ্বাস করি যে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে সকল আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান হওয়া উচিত এবং সমৃদ্ধির জন্য বিশ্বশান্তি অপরিহার্য।

১৯৬৬ সালে প্রথম দিকে লাহোরে একটি সর্বদলীয় জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সমস্যাবলীর শাসনতান্ত্রিক সমাধান হিসেবে এই সম্মেলনের বিষয় কমিটির নিকট আমি একটি ছয় দফা কর্মসূচি পেশ করি। ইহাতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য পূর্ণাঙ্গ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের সুপারিশ করা হয়।

অতঃপর আমার দল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ এই ছয় দফা কর্মসূচি গ্রহণ করে এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিদ্যমান অর্থনৈতিক ও অন্যান্য বৈষম্য যাহাতে দূরীভূত হইতে পারে সেইজন্য ছয়দফা কর্মসূচির অনুকূলে জনমত গড়িয়া তোলার উদ্দেশ্যে আমরা জনসভা করিতে শুরু করি।

ইহার ফলে সরকারি শাসনযন্ত্র এবং প্রেসিডেন্টসহ সরকারি দলের নেতৃবৃন্দ আমাকে "অস্ত্রের ভাষা" ও "গৃহযুদ্ধের" ভয় দেখান এবং আমার বিরুদ্ধে বারটিরও অধিক মামলা দায়ের করিয়া আমাকে হয়রানি করতে শুরু করেন। ১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাসে প্রথমে আমাকে যশোরে গ্রেফতার করা হয়। খুলনার এক জনসভায় বক্তৃতা করার পর যশোর হইয়া আমি ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিতেছিলাম। যশোরে আমাকে বাধা দেওয়া হয় এবং আপত্তিকর বক্তৃতা দেওয়ার অভিযোগে ঢাকা হইতে প্রদত্ত এক পরোয়ানা বলে আমাকে গ্রেফতার করা হয়।

আমাকে যশোরের মহকুমা হাকিমের নিকট হাজির করা হয় এবং তিনি আমার অন্তর্বর্তীকালীন জামিন মঞ্জুর করেন। ঢাকায় প্রত্যাবর্তনের পর ঢাকার সদর মহকুমা হাকিমের নিকট হাজির হইলে তিনি আমার জামিনের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন; কিন্তু ওই দিনই মাননীয় দায়রা জজ আমার জামিন মঞ্জুর করায় আমি মুক্তি পাই। সন্ধ্যা সাতটায় আমি বাড়ি পৌঁছাই। একঘণ্টা পর রাত্রি আটটার সময় পুলিশ আরো একখানি গ্রেফতারি পরোয়ানা লইয়া আমার বাড়িতে গিয়া হাজির হয়। সিলেটে আপত্তিকর বক্তৃতা দেওয়ার অভিযোগে এই পরোয়ানা সেখান হইতে প্রদান করা হয়। আমাকে গ্রেফতার করা হয় এবং সেইদিন রাত্রেই পুলিশ প্রহরাধীন আমাকে সিলেট লইয়া যাওয়া হয়। পরদিন সকালে সিলেটের মহকুমা হাকিম আমার জামিনের আবেদন নামঞ্জুর করিয়া আমাকে হাজতে প্রেরণ করেন। ইহার পরের দিন সিলেটের মাননীয় দায়রা জজ মেহেরবানী করিয়া আমার জামিন মঞ্জুর করেন এবং আমি মুক্তি পাই। কিন্তু জেলগেট হইতেই এক নুতন পরোয়ানা বলে আমাকে পুনরায় গ্রেফতার করা হয়। মোমেনশাহীর এক জনসভায় আপত্তিকর বক্তৃতা দেওয়ার অভিযোগে সেখান হইতে এই পরোয়ানা জারি করা হয়। সেইদিন রাত্রেই পুলিশ প্রহরাধীনে আমাকে সিলেট হইতে মোমেনশাহী লইয়া যাওয়া হয়। পরদিন মোমেনশাহীর মহকুমা হাকিমের নিকট আমাকে হাজির করা হইলে তিনি আমার জামিনের আবেদন প্রত্যাখ্যান করিয়া আমাকে হাজতে প্রেরণ করেন। ১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাসেই এই ধারাবাহিক গ্রেফতার ও হয়রানি করা হয়। পরদিন মোমেনশাহীর মাননীয় দায়রা জজ আমার জামিন মঞ্জুর করেন এবং হাজত হইতে মুক্তি পাইয়া আমি ঢাকায় ফিরিয়া আসি।

১৯৬৬ সালের মে মাসের প্রথম সপ্তাহে, সম্ভবত ৮ মে, নারায়ণগঞ্জের এক জনসভায় বক্তৃতা করিয়া রাত্রে আমি আমার ঢাকার বাড়িতে ফিরিয়া আসি। সেই রাত্রেই প্রায় একটার সময় পুলিশ আমাকে দেশরক্ষা আইনের ৩২ বিধি অনুসারে গ্রেফতার করে। ইহার পর আমার দলের বহুসংখ্যক নেতাকে একযোগে গ্রেফতার করা হয়। এই

গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের মধ্যে নিম্নলিখিত নেতৃবৃন্দ ছিলেন : পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দীন আহমেদ, পূর্ব পকিস্তান আওয়ামী লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট খোন্দকার মোশতাক আহমদ, সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব মুজিবর রহমান, চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি জনাব এম, এ আজিজ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাবেক কোষাধ্যক্ষ জনাব নুরুল ইসলাম চৌধুরী, পূর্ব পকিস্তান আওয়ামী লীগের শ্রম সম্পাদক জনাব জহুর আহামদ চৌধুরী এবং অন্য বহু লোক। কয়েকদিন পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে দেশরক্ষা আইনের ৩২ বিধি অনুসারে গ্রেফতার করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করা হয় : পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সংগঠন সম্পাদক জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরী এমএনএ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক এডভোকেট জনাব এ মোমেন, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সমাজসেবা সম্পাদক জনাব ওবায়দুর রহমান, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট জনাব শামসুল হক, ঢাকা শহর আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট জনাব হাফিজ মোহাম্মদ মুসা, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য মোল্লা জালালুদ্দীন আহমদ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট সাবেক উজির ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, সাবেক এমএনএ জনাব আমজাদ হোসেন, এডভোকেট জনাব আমিনুদ্দীন আহমদ, পাবনার এডভোকেট জনাব আমজাদ হোসেন, নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট জনাব মোস্তফা সরোয়ার, নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি জনাব মহিউদ্দীন আহমদ, পূর্ব পকিস্তান আওয়ামী লীগের দফতর সম্পাদক জনাব মোহাম্মদুল্লাহ, এডভোকেট শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক দফতর সম্পাদক জনাব বজলুর রহমান, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের দফতর সম্পাদক জনাব সিরাজুদ্দীন আহম্মদ, রাজারবাগ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব হারুনুর রশিদ, তেজগাঁও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট জনাব শাহাবুদ্দীন চৌধুরী, ঢাকা সদর উত্তর আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি জনাব আবদুল হাকিম, ধানমন্ডি আওয়ামী লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব রশিদ মোশারফ, শহর আওয়ামী লীগের দফতর সম্পাদক জনাব সুলতান আহমদ, বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ কর্মী জনাব নুরুল ইসলাম, চট্টগ্রাম শহর আওয়ামী লীগের অস্থায়ী সম্পাদক জনাব আবদুল মান্নান, পাবনার এডভোকেট জনাব হাসনায়েন, মোমেনশাহী বিশিষ্ট কর্মী জনাব রহমান সিদ্দিকী এবং আরও বহুসংখ্যক ছাত্র ও শ্রমিক নেতা। আর দুই ভ্রাতুষ্পুত্র পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক শেখ ফজলুল হক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শহিদুল ইসলামকেও কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। এছাড়া সরকার পূর্ব পাকিস্তানের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় বাংলা দৈনিক পত্রিকা ইত্তেফাক বন্ধ করিয়া দেন। পত্রিকাটির একমাত্র অপরাধ ছিল এই যে, ইহাতে কখনও কখনও আরো দলের মতামত সমর্থন করা হইত। পত্রিকাটির ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং উহার সম্পাদক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সাংবাদিক জনাব তোফাজ্জল হোসেন ওরফে মানিক মিয়াকে

দীর্ঘদিন কারাগারে আটক রাখা হয় এবং তাঁহার বিরুদ্ধে কয়েকটি ফৌজদারি মামলাও দায়ের করা হয়। চট্টগ্রামের বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা, চট্টগ্রাম মুসলিম বণিক সমিতির সাবেক প্রেসিডেন্ট ও চট্টগ্রাম পোর্টট্রাস্টের সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব ইদরিসকেও দেশরক্ষা আইনে গ্রেফতার করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়।

আমাদের গ্রেফতারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে আমার দল ১৯৬৬ সালের ৭ জুন ধর্মঘট আরম্ভ করে। এই ধর্মঘটের দিন ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে পুলিশের গুলিতে ১১ জন নিহত হয়, প্রায় ৮০০ কর্মীকে গ্রেফতার করা হয় এবং বহুসংখ্যক লোকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়।

পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর জনাব আবদুল মোনেম খান কিছুসংখ্যক অফিসার ও অন্যান্যের নিকট প্রায় প্রকাশ্যেই বলেন যে, যতদিন তিনি ক্ষমতায় থাকিবেন ততদিন শেখ মুজিবুর রহমানকে কারাগারে থাকিতে হইবে। ইহা প্রায় সকলেই অবগত আছেন।

আটকের পর হইতেই আমাকে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে বহুসংখ্যক মামলায় বিচারের সম্মুখীন হইতে হয়। এই সময় ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের মধ্যেই আদালতের অধিবেশন বসিত। প্রায় একুশ মাসকাল আটক থাকার পর ১৯৬৮ সালের ১৭ জানুয়ারি দিবাগত রাত্রি একটার সময় আমাকে মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু জেলগেট হইতে কয়েকজন সামরিক ব্যক্তি বলপূর্বক আমাকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে লইয়া আসে এবং একটি বন্ধ কামরায় আমাকে আটক রাখে। আমাকে পৃথকভাবে নির্জন অবস্থায় আটক রাখা হয় এবং কাহারও সহিত দেখা করিতে দেওয়া হয় না। প্রকৃতপক্ষে সুদীর্ঘ পাঁচ মাস যাবৎ আমাকে দুনিয়া হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখা হইয়াছিল। এই সময় আমার উপর অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয় এবং আমাকে সকল প্রকার দৈহিক সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত রাখা হয়। উহু, কি মানসিক নির্যাতন! এ সম্পর্কে যত কম বলা যায়, ততই ভালো।

এই মামলায় বিচার শুরু হওয়ার মাত্র একদিন পূর্বে ১৯৬৮ সালের ১৮ জুন আমি সর্বপ্রথম এডভোকেট জনাব আবদুস সালাম খানের সাক্ষাৎ পাই। তাঁহাকে আমি এই মামলার আমার অন্যতম উকিল নিয়োগ করি। আমার উপর নির্যাতন, আমাকে ও আমার দলকে হেয় প্রতিপন্ন করা ও বদনাম করার উদ্দেশ্যে, ছয়দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায়সঙ্গত দাবি অর্থাৎ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি দমন করার উদ্দেশ্যে, এবং সকল ক্ষেত্রে, বিশেষত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক এবং সামরিক চাকুরির ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায়সঙ্গত সমতার দাবি নস্যাৎ করার উদ্দেশ্যেই আমাকে এই তথাকথিত ষড়যন্ত্র মামলায় জড়ানো হইয়াছে।

এই আদালতে আসিবার পূর্বে আমি লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন, লেফটেন্যান্ট মোজাম্মেল হোসেন, সাবেক কর্পোরাল আমির হোসেন, লিডিং সিম্যান সুলতানুদ্দীন আহমদ, কামালুদ্দীন আহমদ, স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান, ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজুল্লাহ এবং এই মামলায় জড়িত ছিল, নৌ ও বিমানবাহিনীর অপর কাহাকেও

কখনও দেখি নাই। তিনজন সি-এস-পি অফিসার জনাব আহমদ ফজলুর রহমান, জনাব রুহুল কুদ্দুস ও জনাব কে এম শামসুর রহমানকে আমি চিনি; কারণ তাঁহারা যখন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের অধীনে চাকুরিরত ছিলেন, তখন আমি উজির ছিলাম বলিয়া সরকারিভাবে তাঁহাদের চিনিবার সুযোগ হইয়াছিল। কিন্তু আমি তাহাদের সহিত কখনই রাজনীতি বা কোনও ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা করি নাই। আমি কখনই করাচিতে লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের বাড়িতে বা কামালুদ্দীন আহমদের বাড়িতে কোনও বৈঠক হয় নাই; এবং এই তথাকথিত ষড়যন্ত্রের কাহারও সহিত আমার বাড়িতে বা তাজউদ্দীন আহমেদের বাড়িতেও কোনও বৈঠক হয় নাই। এই সকল লোক কখনই আমার বাড়িতে যায় নাই এবং এই তথাকথিত ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে আমি কখনই কাহাকেও কোনও টাকা দিই নাই। আমি কখনই ডা. সায়েদুর রহমান বা মানিক চৌধুরীকে এই তথাকথিত ষড়যন্ত্রে সাহায্য করিতে বলি নাই। তাহারা চট্টগ্রামে আমার দলের অন্য শত শত কর্মীর ন্যায় সাধারণ কর্মী মাত্র। কেন্দ্র ও প্রদেশের বহু সাবেক উজির, সাবেক এমএনএ ও সাবেক এম-পি-এসহ পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের তিনজন ভাইস প্রেসিডেন্ট, ৪৪ জন কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য, একজন সাধারণ সম্পাদক ও ৮ জন সেক্রেটারি রহিয়াছেন। বর্তমানে আমার দলে ৫ জন এম-এন-এ ও ১০ জন এমপিএ রহিয়াছে। চট্টগ্রামেও আওয়ামী লীগের জেলা ও শহর কমিটির প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারি রহিয়াছেন, সাবেক এমএনএ ও এমপিএ রহিয়াছেন এবং বহু ধনবান ও প্রভাবশালী ব্যক্তি রহিয়াছেন। আমি তাহাদের কাহাকেও বলি নাই। অথচ মানিক চৌধুরীর ন্যায় একজন সাধারণ ব্যবসায়ী বা ডা. সাহেদুর রহমানের ন্যায় একজন সাধারণ এলএমএফ ডাক্তারকে বলিয়াছি ইহা একেবারেই অসম্ভব। ১৯৬৫ সালে জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী জনাব জহুর আহমদ চৌধুরীর বিরোধিতা করার জন্য ডা. সায়েদুর রহমানকে আওয়ামী লীগ হইতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়। আমি কখনই ডা. সায়েদুর রহমানের বাড়িতে যাই নাই।

আমি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট। ইহা একটি শাসনতন্ত্র সম্মত রাজনৈতিক দল এবং দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য ইহার সুস্পষ্ট ও গঠনমূলক বিশ্বাস করি না। ছয়দফা কর্মসূচির বর্ণনা অনুসারে আমি পাকিস্তানের উভয় অংশের জন্য সুবিচার চাহিয়াছি। আমি দেশের জন্য যাহা বালো মনে করি, তাহা সর্বদাই শাসনতন্ত্রের সীমারেখার মধ্যে থাকিয়া প্রকাশ্যে প্রচার করিয়া থাকি; কিন্তু তথাপি আমি শাসকগোষ্ঠী ও কায়েমি স্বার্থবাদী মহলের হাতে নির্যাতিত হইয়াছি; কারণ, তাহারা আমাকে ও আমার দলকে দলন করিয়া পাকিস্তানি এবং বিশেষত পূর্ব পাকিস্তানি জনসাধারণের ওপর তাহাদের শোষণনীতি অব্যাহত রাখিতে চায়।

আমাকে যে এই মামলায় প্রতিহিংসার বশবর্তী হইয়া সম্পূর্ণ মিথ্যাভাবে জড়ানো হইয়াছে, আমার এই দাবির সমর্থনে আমি আপনাদের নিকট একটি সরকারি দলিল পেশ করতে চাই। ১৯৬৮ সালের ৬ জানুয়ারি পাকিস্তান সরকারের স্বরাষ্ট্র দফতর যে প্রেস-

বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেন, তাহাতে এই মামলার ২৮ জন আসামির একটি তালিকা প্রকাশিত হয়। এই তালিকায় আমার নাম ছিল না। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছিল যে, সমস্ত আসামিই স্বীকারোক্তি করিয়াছে, তদন্তকার্য প্রায় সমাপ্ত হইয়াছে এবং শীঘ্রই বিচার শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

কোনও সরকারি দফতর হইতে সংবাদপত্রে কোনও বিবৃতি প্রকাশের ব্যাপারে আমি উজির হিসাবে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি যে, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সেক্রেটারি কর্তৃক ব্যক্তিগতভাবে প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র পরীক্ষা করিয়া এবং ঘটনা সম্পর্কে সুনিশ্চিত হইয়া অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত কোনও দফতর হইতে কোনও প্রেস-বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইতে পারে না। এই মামলার ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ব্যাপারে প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পূর্বে উজিরে আজম বা প্রেসিডেন্টের অনুমোদন গ্রহণ করা আবশ্যক।

বর্তমান মামলা পূর্বে বর্ণিত অত্যাচার-নির্যাতনের চরম পর্যায় এবং কায়েমি স্বার্থবাদী মহলের শোষণ অব্যাহত রাখার জন্য বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রের পরিণতি ছাড়া আর কিছুই নহে। পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান হইতে বিচ্ছিন্ন করার জন্য আমি কখনই কিছু করি নাই; এবং পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান হইতে বিচ্ছিন্ন করার জন্য আমি কখনই স্থল, নৌ বা বিমানবাহিনীর কোনও লোকের সহিত, অথবা অপর কাহারও সহিত কখনও কোনও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হই নাই।

আমি দোষী নই এবং সম্পূর্ণরূপে নির্দোষ। আমি কথিত ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আদৌ কিছু জানি না।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার— শেখ মুজিবের মুক্তিলাভ

বাংলার জনসাধারণ আগরতলা মিথ্যা ষড়যন্ত্র মামলা হতে তাদের প্রিয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্ত করবার জন্য শুধু মুজিব তহবিলে অর্থ সাহায্য করে বিলেত থেকে ব্যারিস্টার উইলিয়ামসকে এনে নীরব রইলেন না, ১৯৬৯ সালের ১৭ জানুয়ারি তৎকালীন ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমদের বীর নেতৃত্বে বাংলাদেশে আবার দ্বিতীয় পর্যায়ে গণবিপ্লবের অভ্যুত্থান হলো। সংগ্রামী ছাত্রসমাজ একত্রিত হয়ে শেখ মুজিবের ৬ দফাসহ ১১ দফা দাবি রচনা করল সেদিন। সে আন্দোলন এমন তীব্রভাবে ধারণ করল যে, তাকে গণ-আন্দোলন না বলে গণবিপ্লব বললেও ভুল হবে না। বের হতে শুরু করলো দিনের পর দিন সুদীর্ঘ বিক্ষোভ ও মশাল মিছিল। বাংলাদেশে বাঙালি যুবক-শ্রমিকের বিশাল জনসমুদ্রে উঠল স্লোগান :

'জেলের তালা ভাঙব
শেখ মুজিবকে আনব।'

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় মুজিব যখন বন্দিশালায়, শুধু তিনি একা নন, আরো বহু রাজনৈতিক নেতা, তখন রাজ্যের নেতৃত্ব গ্রহণ করলো পূর্ব বাংলার ছাত্র সংগ্রামী পরিষদ। তাদের ১১ দফা, ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের রচিত ২১ দফা আর শেখ মুজিবের ৬ দফা সম্মিলিত রূপ নিল ছাত্র আন্দোলনে।

৬ জানুয়ারি যেদিন বিচার কক্ষে মুজিব তাঁর বিবৃতি পাঠ করেন, সেদিন বাংলাদেশের সংগ্রামী জনতা বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলো মুজিবের মুক্তির জন্য আমরণ অগ্নিশপথ। ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে জনসভায় নবীন নেতা তোফায়েল আহমদের নেতৃত্বে এদেশের প্রিয় নেতা শেখ মুজিবকে মুক্ত করে আনার সংগ্রামকে আরো জোরদার করার দৃঢ়সংকল্প ঘোষণা করলো ছাত্রসমাজ।

জনগণের তখন একমাত্র স্লোগান– 'জেলের তালা ভাঙব, শেখ মুজিবকে আনব।' 'আইয়ুবশাহী ধ্বংস হোক'– ইত্যাদি।

দেশের এই সংকটময় মুহূর্তেও আইয়ুব এবং তাঁর সমর্থকরা কুখ্যাত ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করতে অনাগ্রহী– কারণ, তাতে যে তাদের পরাজয়! অথচ দেশের জনমত কি, তা জেনেও আইয়ুব এক বেতার বক্তৃতায় দেশের বহু তরুণ ও কিশোরের মৃত্যুতে শোকাভিভূত হয়ে কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণপূর্বক ঘোষণা করেন যে, আগামীতে তাঁর আর প্রেসিডেন্ট হবার খায়েশ নাই এবং দেশের রাজনীতিকদের নিয়ে এক গোলটেবিল

বৈঠকের ব্যবস্থা করল। উদ্দেশ্য, দেশের রাজনৈতিক সমস্যাবলীর সমাধান ও আপোষ মীমাংসা। ১৯৬৯ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি দিন ধার্য করা হয়। কিন্তু দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল– আওয়ামী লীগ তাদের নেতা শেখ মুজিবকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসির মঞ্চে ঝুলিয়ে রেখে সরকারি প্রচেষ্টায় গোলটেবিলে যোগদানে ঘোর আপত্তি জানায়। মওলানা ভাসানী হুংকার দিয়ে জানালেন, 'শেখ মুজিব ব্যতীত কোনো গোলটেবিল বৈঠক হতে পারে না।'

আওয়ামী লীগ শর্ত আরোপ করল যে, গোলটেবিলে যোগদানের পূর্বে ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে শেখ মুজিব ও অন্য বন্দিদের মুক্তি দিতে হবে। বহু রাজনৈতিক নেতা মুজিবের সাথে দেখা করে গোলটেবিল বৈঠকে আওয়ামী লীগ সদস্যদের যোগদান করতে বলায়, তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞায় অচল, অটল রইলেন। মামলা প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত আওয়ামী লীগ গোলটেবিলে যোগদান করতে পারে না। কারণ, আওয়ামী লীগ জনগণের প্রতিষ্ঠান এবং জনস্বার্থ আদায় করাই তাঁর লক্ষ্য। তিনি সাক্ষাৎকারীদের সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন যে, ব্যক্তিস্বার্থে দেশবাসীর স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেয়া তাঁর প্রকৃতি বিরুদ্ধ।

শেখ মুজিব যোগদান না করার দরুন ১৭ ফেব্রুয়ারি গোলটেবিল বৈঠক স্থগিত রইল। অপরদিকে আইয়ুবও গর্জন করে উঠলেন। শেখের মুক্তি ও আগরতলা মামলা প্রত্যাহারের সাথে দেশের নিরাপত্তা রক্ষার প্রশ্ন জড়িত। তাই তিনি এ পন্থাকে গ্রহণ করতে পারেন না।

অবশেষে বাংলার অপূর্ব গণসংগ্রামে এবং অবিসম্বাদী নেতা শেখ মুজিবের দুর্জয় সংকল্পের নিকট ক্ষমতাসীন আইয়ুবকে পরাজয় স্বীকার করে ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করতে হলো। ফলে শেখ মুজিব ও অন্য বিচারাধীন সকলেই মুক্তি পেলেন অতি অপ্রত্যাশিত ও অকস্মিকভাবে।

ষড়যন্ত্র মামলা ব্যর্থ হলো। শেখ মুজিব মুক্তি পেলেন আর আইয়ুব খানকে মাথা নিচু করে সেই মুজিবকেই আহ্বান করতে হলো গোলটেবিল বৈঠকে।

মুক্তির পরদিন ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি রমনা রেসকোর্স ময়দানে কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে মুজিবকে ঢাকায় অপূর্ব সংবর্ধনা জানানো হয়। লাখ লাখ জনতা তাঁকে সংবর্ধনা জানায়। এমন বিরাট সংবর্ধনা নাকি ঢাকায় স্মরণাতীতকালের মধ্যে দেখা যায়নি। এই সমাবেশে তাঁকে বঙ্গবন্ধু আখ্যা দেয়া হয়। এই দিন হতে মুজিব হলেন বঙ্গবন্ধু। জনগণ তাঁকে বলল জাতির পিতা– সে এক নতুন জাতি– বাঙালি জাতি। শেখ মুজিবকে রাওয়ালপিণ্ডিতে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের সঙ্গে আলোচনায় যোগ দিতে রাজি করাতে এলেন প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত দূত হিসাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী খাজা সাহাবুদ্দিন। দেশের শত্রু বলে বর্ণিত শেখ মুজিবের ভাষণ ঢাকা বেতারে প্রচারিত করে জনগণকে শান্ত থাকার আবেদন করা হয়েছিল। ৪৯ বছর বয়স্ক শেখ মুজিবের কাছে

পাকিস্তানের লৌহমানব ৬২ বছরের বয়স্ক প্রেসিডেন্টকে জবাবদিহি করতে হয়েছিল।

রেসকোর্স ময়দানে সংবর্ধনার উত্তরে শেখ মুজিবুর রহমান বললেন, 'আপনারা আমায় ভালোবাসেন, আমি যেন সবসময় আপনাদের ভালোবাসার মর্যাদা রক্ষা করতে পারি– এই একমাত্র কামনা। গোলটেবিলে যাচ্ছি ১১ দফা প্রশ্নের দাবি নিয়ে। সে প্রশ্নে কোনো আপোষ নেই।' মুহুর্মুহু করতালির ভেতর দিয়ে ওঠে দাঁড়ালেন মতিয়া চৌধুরী ও অন্যান্য মুক্তিপ্রাপ্ত রাজবন্দি। সভাশেষে বিরাট জনতা চলল জেল গেটের দিকে। কণ্ঠে তাদের সাত সাগর তেরো নদীর গর্জন : 'জেলের তালা ভেঙেছি, রাজবন্দিদের এনেছি, জেলের তালা ভাঙব, রাজবন্দিদের আনব।'

বঙ্গবন্ধুর প্রথম বেতার ও টেলিভিশন ভাষণ

২৮ অক্টোবর, ১৯৭০

প্রিয় দেশবাসী ভাইবোনেরা, আস্‌সালামু আলাইকুম,

জনগণের মুক্তির জন্য যেসব বীর শহীদান রক্ত দিয়েছেন, জীবন দিয়েছেন যেসব বীর সন্তান, তাদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। স্বৈরাচারী শাসনের অত্যাচার, নির্যাতন উপেক্ষা করে নিজেদের জীবন দিয়ে তারা আন্দোলনের পর আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। অগণিত মানুষ সর্বপ্রকার নিষ্পেষণের মুখেও ত্যাগ স্বীকার করেছেন। সেই ত্যাগের মহিমায় মহিমান্বিত আন্দোলন গত বছরের ঐতিহাসিক গণ-অভ্যুত্থানে পরিণত হয়েছিল। সেই একটানা আন্দোলন জনগণের গণতান্ত্রিক সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে এসেছে। বস্তুত আমি আজ জাতীয় বেতার ও টেলিভিশনের মাধ্যমে আপনাদের কাছে আমার বক্তব্য পেশের যে সুযোগ পেয়েছি তাকেও জনগণের সংগ্রামের প্রাথমিক বিজয় বলে বিবেচনা করা যায়। কারণ আজ পর্যন্ত এ সুযোগ ক্ষমতাসীনদের একচেটিয়া ছিল।

আমাদের সংগ্রাম চলবেই। কারণ, আমাদের মূল লক্ষ্যে এখনো আমরা পৌঁছিনি। জনগণকে ক্ষমতা অর্জন করতেই হবে। মানুষের ওপর মানুষের শোষণ, অঞ্চলের ওপর অঞ্চলের শোষণের অবসান ঘটাতেই হবে। যে শক্তিশালী চক্র গত বাইশ বছর ধরে পাকিস্তান শাসন করেছে, জনগণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর প্রতিরোধ করার ব্যাপারে তারা সম্ভাব্য সকল রকমের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। এরা সেইসব গোষ্ঠী যারা সাধারণ নির্বাচন বাঞ্চালের জন্য সক্রিয় ষড়যন্ত্র করছেন। এমনকি নির্বাচনের পরেও তারা শোষণের অবসান ঘটানোর প্রত্যেকটা প্রচেষ্টা নস্যাৎ করার জন্য সক্রিয় থাকবে। এ জন্য প্রয়োজন হলে তারা তাদের বিপুল সম্পদ নিয়োজিত করবে। তাদের অর্থ আছে, প্রভাব আছে, জনসাধারণের বিরুদ্ধে শক্তিপ্রয়োগের ক্ষমতাও তাদের আছে। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, দৃঢ়সংকলপবদ্ধ মানুষ আপোষহীনভাবে সাফল্যের সাথে স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে এবং শেষ পর্যন্ত জনতার জয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠেছে।

পাকিস্তানের জনগণের কাছে আওয়ামী লীগ এ প্রতিশ্রুতি দিতে পারে যে, তারা জনগণের পাশেপাশেই থাকবে। স্বৈরাচারী ও শোষকগোষ্ঠীর মোকাবেলায় সংগ্রামে নেতৃত্ব দেবে। কোনো জাতি কোনো দিনই আত্মাহুতি না দিয়ে মুক্তি ও ন্যায়বিচার

পায়নি। তাই আজ আওয়ামী লীগ তাদের মোকাবেলা অবশ্যই করবে। গণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থা বিঘ্ন করা হলে আওয়ামী লীগ সব শক্তি দিয়ে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে।

প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেই আওয়ামী লীগের জন্ম। আর এই সংকটময় পরিস্থিতির মধ্য দিয়েই আওয়ামী লীগের বিকাশ। তদানীন্তন ক্ষমতাসীন দল সমগ্র দেশকে একদলীয় রাষ্ট্রে পরিণত করার যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিল– সে হীন চেষ্টার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্যই আমাদের মহান নেতা মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। এইভাবে আমরা পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আপোষহীন সংগ্রাম শুরু করি। আমাদের সে সংগ্রাম আজো শেষ হয়নি। ক্ষমতাসীন চক্র সংগ্রামী আওয়ামী লীগকে ধ্বংস করার জন্য হামলার পর হামলা চালিয়েছে। আঘাতের পর আঘাত হেনেছে। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের একের পর এক কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছে। তারা তাদের জীবনের সম্ভাবনাময় দিনগুলো কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে কাটিয়েছেন। সর্বপ্রকারের নির্যাতন-নিপীড়নকে আমরা পরাভূত করেছি– বিজয়ী হয়েছি। এ বিজয়ই আমাদের গণতন্ত্রবিরোধী শক্তিসমূহের মোকাবেলা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে।

যে সংকট আজ জাতিকে গ্রাস করতে চলেছে সে সংকটের অবসান ঘটাতেই হবে। আজকে জাতীয় সংকটের প্রথম কারণ, দেশবাসী রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। দ্বিতীয়, জনগণের এক বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ অর্থনৈতিক বৈষম্যের কবলে পতিত। তৃতীয়, অঞ্চলে অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক বৈষম্যের জন্য সীমাহীন অবিচারের উপলব্ধি জন্মেছে। প্রধানত এইগুলোরই বাঙালিদের ক্ষোভ ও অসন্তোষের কারণ। পশ্চিম পাকিস্তানের অবহেলিত মানুষেরও আজ একই উপলব্ধি।

আওয়ামী লীগের মেনোফেস্টোতে এসব মৌলিক সমস্যা সমাধানের একটা সুস্পষ্ট পথনির্দেশ করা হয়েছে। দেশে প্রকৃত প্রাণবন্ত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সেই গণতন্ত্রে মানুষের মৌলিক স্বীনতা শাসনতান্ত্রিকভাবে নিশ্চিত করা হবে। আমাদের মেনোফেস্টোতে রাজনৈতিক দল, শ্রমিক সংস্থা ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু বিকাশের রূপরেখা নির্দেশ করা হয়েছে। সংবাদপত্র ও শিক্ষার পূর্ণ স্বাধীনতায় আমরা বিশ্বাসী। সমাজে ক্যান্সারের মতো যে দুর্নীতি বিদ্যমান তাকে নির্মূল করতে আমরা দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ।

বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় শোষণ ও অবিচারের যে অসহনীয় কাঠামো সৃষ্টি করা হয়েছে অবশ্যই তার আমূল পরিবর্তন সাধন করতে হবে। জাতীয় শিল্প সম্পদের শতকরা ৬০ ভাগের অধিক আজ দু'ডজন পরিবার করায়ত্ত করেছে। ব্যাংকিং সম্পদের শতকরা ৮০ ভাগ এবং বীমা সম্পদের ৭৫ ভাগ এই দু'ডজন পরিবারের কুক্ষিগত। ব্যাংকের লগ্নীকৃত অর্থের শতকরা ৮২ ভাগ আজ মোট জমাকারীদের মাত্র শতকরা ৩ জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। দেশে যে করপ্রথা কায়েম রয়েছে, তা বিশ্বের সবচেয়ে পশ্চাদমুখী ব্যবস্থা। বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোতে যখন প্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে মোট জাতীয়

উৎপাদনের শতকরা ২ ভাগ অর্থ আদায় হয়, অপরপক্ষে লবণের মতো অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের ওপরও নিপীড়নমূলক পরোক্ষ কর বসানো হয়েছে। সংরক্ষিত বাজার, ট্যাক্স হলিডে, বোনাস ভাউচারের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ সাবসিডি প্রথায় এবং কৃত্রিমভাবে নিম্নহারে বিদেশী মুদ্রায় ঋণ, অর্থ বরাদ্দ প্রভৃতি ব্যবস্থা একচেটিয়া বাদ ও কার্টেল প্রথার সুযোগ করে দিয়েছে।

ছিটেফোঁটা ভূমি সংস্কার সত্ত্বেও সীমান্তপ্রভুরা রাজকীয় ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েছে। তারা সীমাহীন সুখ-সুবিধা ভোগ করেছেন। তাদের সমৃদ্ধি ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। কিন্তু তারই পাশাপাশি অসহায় দরিদ্র কৃষকের অবস্থার দিন দিন অবনতি ঘটেছে। কেবলমাত্র বেঁচে থাকার তাগিদে জনসাধারণ দিনের পর দিন গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসছে। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশের মোট শ্রমশক্তি এক-পঞ্চমাংশ অর্থাৎ ৯০ লাখ শ্রমজীবী মানুষ আজ বেকার। জীবনযাত্রার ব্যয়বৃদ্ধি এবং সম্পূর্ণ চাপ এসে পড়েছে শিল্পশ্রমিক ও মেহনতি সম্প্রদায়ের ওপর। মুদ্রা মজুরি যা বাড়ছে– তার তুলনায় জীবনযাত্রার ব্যয় দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে। জীবনযাত্রার সীমাহীন ব্যয়বৃদ্ধির চাপ স্কুল-কলেজের শিক্ষক, স্বল্প বেতনভোগী কর্মচারী বিশেষ করে চতুর্থ শ্রেণীর সরকারি কর্মচারীরা আজ হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছেন।

অর্থনৈতিক বৈষম্যের ভয়াবহ চিত্রের দিকে তাকালে দেখা যাবে গত ২২ বছরের সরকারি রাজস্ব খাতের মোট ব্যয়ের মাত্র পনরশ' কোটি টাকার মত (মোট ব্যয়ের এক-পঞ্চামাংশ) বাংলাদেশে খরচ করা হয়েছে অথচ এর পাশাপাশি পশ্চিম পাকিস্তানে খরচ করা হয়েছে পাঁচ হাজার কোটি টাকারও বেশি। দেশের সর্বমোট উন্নয়ন ব্যয় খাতে বাংলাদেশে মোট ব্যয়ের এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ মাত্র তিন হাজার কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় হয়েছে ছয় হাজার কোটি টাকারও বেশি। বিশ বছরে পশ্চিম পাকিস্তান মাত্র তেরোশ' কোটি টাকায় বৈদেশিক মুদ্রা আমদানি করেছে। বাংলাদেশের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানে তিনগুণ বেশি দ্রব্য আমদানি করা হয়েছে। নিজস্ব বেশি মুদ্রা আয়ের চেয়েও পশ্চিম পাকিস্তান বাড়তি দু'হাজার কোটি টাকা মূল্যের বিদেশী দ্রব্য আমদানি করতে পেরেছে। তার কারণ বাংলাদেশের অর্জিত পাঁচশ' কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে কুক্ষিগত হয়েছে। তার ওপরও সর্বপ্রকার বিদেশী সাহায্যের শতকরা ৮০ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যবহার করেছে।

সরকার চাকরির ক্ষেত্রের পরিসংখ্যানও ঠিক একই রকমের মর্মান্তিক। স্বাধীনতার ২২ বছর গত হয়েছে; কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকরি চাকরিতে বাঙালির সংখ্যা আজো মাত্র ১৫ ভাগ। দেশরক্ষা সার্ভিসে বাঙালি সংখ্যা মাত্র ১০ ভাগেরও কম। সার্বিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এ প্রকট বৈষম্যের ফলে বাংলার অর্থনীতি আজ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসের মুখে। বাংলার বেশিরভাগ গ্রামাঞ্চলে দুর্ভিক্ষজনিত অবস্থা বিরাজ করছে। জনগণকে শুধু অনাহারের কবল থেকে রক্ষা করার জন্য ১৭ লাখ টন খাদ্যশস্য আমদানি করতে হচ্ছে। দেশে যে মুদ্রাস্ফীতি প্রকটতর থেকে প্রকটতর হচ্ছে, তার শিকারে পরিণত হয়ে চলেছে

বাংলার অসহায় মানুষ। পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় বাংলাদেশে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের মূল্য শতকরা ৫০ থেকে ১০০ ভাগ বেশি। পশ্চিম পাকিস্তানে যে ক্ষেত্রে মোটা চাউলের দাম ২০ থেকে ২৫ টাকা, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশে ঐ একই চাউলের দাম ৪৫ থেকে ৫০ টাকা। বাংলায় যে আটার দাম প্রতি মণ ৩০ থেকে ৩৫ টাকা, পশ্চিম পাকিস্তানে তা ১৫ থেকে ২০ টাকা। পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতি সের সরিশার তেলের দাম মাত্র আড়াই টাকা, কিন্তু বাংলাদেশে প্রতি সের তেলের দাম পাঁচ টাকা। করাচিতে যে সোনার দাম প্রতি ভরি ১৩৫ থেকে ১৪০ টাকা, ঢাকায় সেই সোনার দাম প্রতি ভরি ১৬০ থেকে ১৭০ টাকা। তারপরেও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বাংলায় সোনা আনার ব্যাপারে কাঠামো-এর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

গত ২২ বছরে কেন্দ্রীয় সরকার দেশের অর্থনীতির যে কাঠামো গড়ে তুলেছেন এসব অবিচার তারই পুঞ্জীভূত ফল। এই অবিচার দূর করার সাধ্য কেন্দ্রীয় সরকারের নেই। এ সত্য প্রমাণিত হয়েছে চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায়। কেন্দ্রীয় সরকার যতবড় শক্তিশালী হোক না কেন, অতীতের অন্যায়-অবিচার দূরীকরণে সে যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ– চতুর্থ পরিকল্পনার ব্যয় বরাদ্দে সে ব্যর্থতার স্বীকৃতি লিপিবদ্ধ রয়েছে।

আওয়ামী লীগের ৬ দফা কর্মসূচিতে আঞ্চলিক অন্যায় ও অবিচারের বাস্তব সমাধানের পথনির্দেশ রয়েছে। কেন্দীয় আমলাতন্ত্রে যেখানে বাংলা প্রতিনিধিত্ব মাত্র শতকরা ১৫ ভাগ এবং দেশে যে ধরনের শাসনব্যবস্থা কায়েম রয়েছে তাতে কেন্দ্রীভূত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার কাছ থেকে সুবিচার আশা করা যায় না। বাংলাদেশ ও অন্যান্য অঞ্চলের রাজনৈতিক প্রতিনিধিরা বৃহত্তম ব্যয় বরাদ্দ আদায়ের চেষ্টা করলে আঞ্চলিক উত্তেজনাই বৃদ্ধি পাবে এবং তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে ফেডারেল সরকারের অস্তিত্বই বিপন্ন হবে। এ অবস্থায় সমস্যাসমূহের একমাত্র সমাধান হতে পারে শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর পুনর্বিন্যাস করে এবং ফেডারেশনের ইউনিটগুলোকে আওয়ামী লীগের ৬ দফার ভিত্তিতে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান করে। প্রস্তাবিত এ স্বায়ত্তশাসনকে পুরোপুরি কার্যকর করার জন্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ক্ষমতাও অবশ্য দিতে হবে। এ জন্যই মুদ্রাব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ওপর ফেডারেশনের ইউনিটগুলোর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাদানের ব্যাপারে আমরা সবসময়ই গুরুত্ব দিচ্ছি। এ কারণে আমরা মনে করি যে, বৈদেশিক বাণিজ্য ও ঋণসমূহের ব্যাপারে আলাপ-আলোচনার ক্ষমতাও ফেডারেশনের ইউনিট সরকারগুলোর হাতে অর্পণ করা উচিত। এভাবে আমরা কেন্দ্রকে সন্দেহ, সংশয় ও বিভেদ সৃষ্টির অভিযোগের আওতার ঊর্ধ্বে রাখতে চাই। ফেডারেশনের ইউনিটগুলোকে অর্থনৈতিক ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করে ফেডারেশন সরকারকে পররাষ্ট্র বিষয় ও নিরাপত্তামূলক শর্তসাপেক্ষে মুদ্রাব্যবস্থার দায়িত্ব দিয়ে একটা ন্যায়সঙ্গত ভারসাম্যমূলক ফেডারেল রাষ্ট্র কায়েম হতে পারে বলে আমরা বিশ্বাস করি। আমাদের ফেডারেল সরকার পরিকল্পনায় নিখিল পাকিস্তান সার্ভিস ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করা হবে এবং ফেডারেল সার্ভিস ব্যবস্থা

প্রবর্তন করা হবে। আমরা আরো বিশ্বাস করি যে, ফেডারেশনের ইউনিটগুলো যদি মিলিশিয়া বা প্যারো-মিলিশিয়া বাহিনী গঠন করে তবে তারা কার্যকরভাবে জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় সাহায্য করতে সক্ষম হবে। আমাদের প্রস্তাবিত ফেডারেল পরিকল্পনায় সংশয় ও বিরোধের অবসান ঘটিয়ে শক্তিশালী পাকিস্তানের নিশ্চয়তা বিধান করবে। যে অঞ্চলের মানুষ অপর অঞ্চলকে ঔপনিবেশ বা বাজার হিসেবে ব্যবহার করতে চান- বোধগম্য কারণেই তারা আমাদের এই প্রস্তাবিত পরিকল্পনার বিরোধিতা করবেন। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের পরিকল্পনায় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের পূর্ণ সমর্থন পাব।

আমাদের বিশ্বাস, শাসনতান্ত্রিক এ কাঠামোর মাধ্যমেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশে একটা সামাজিক বিপ্লব ঘটানো সম্ভব এবং অন্যায়-অবিচার ও শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রয়োজন মেটানোর জন্য দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য দেশবাসীর কঠোর পরিশ্রম ও বিপুল ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন। আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে দেশবাসী তখনই সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করবেন যখন ত্যাগ স্বীকারের সাথে সাথে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সকল শ্রেণী ও সকল অঞ্চলে মানুষের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করার আশ্বাস আমরা দিতে পারব। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির অংশ নিশ্চিত করার জন্য অর্থনৈতিক কাঠামোতে অবশ্য আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। জাতীয়করণের মাধ্যমে ব্যাংক ও বীমা কোম্পানিগুলোসহ অর্থনীতির মূল চাবিকাঠিগুলোকে জনগণের মালিকানায় আনা অত্যাবশ্যক বলে আমরা মনে করি। অর্থনীতির সর্ব ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ উন্নয়ন সাধিত হবে সরকারি অর্থাৎ জনগণের মালিকানায়। নতুন ব্যবস্থায় শ্রমিকরা শিল্প কারখানায় ও মূলধন পর্যায়ে অংশীদার হবেন। বেসরকারি পর্যায়ে এর নিজস্ব ভূমিকা পালন করার সুযোগ রয়েছে। একচেটিয়াবাদ ও কার্টেল প্রথার সম্পূর্ণরূপে বিলোপ করতে হবে। সৌখিন দ্রব্যাদির ব্যবহারে কড়া বাধা-নিষেধ আরোপ করতে হবে। ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পকে ব্যাপকভাবে সমর্থক করে তাদের উৎসাহ দিতে হবে। এ সমর্থনের জন্য কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে কাঁচামাল সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। তাঁতীদের ন্যায্যমূল্যে সুতা ও রঙ সরবরাহ করতে হবে। তাদের জন্য অবশ্যই বাজারজাতকরণ ও ঋণদানের সুবিধা দিতে হবে। সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্রাকৃতির শিল্প গড়ে তুলতে হবে। গ্রামে গ্রামে এসব শিল্পকে এমনভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে যার ফলে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে বিভিন্ন প্রকার শিল্প সুযোগ পৌঁছায় এবং গ্রামীণ মানুষের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে। এ যাবৎ বাংলার সোনালি আঁশ পাটের প্রতি ক্ষমাহীন অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয়েছে। বৈষম্যমূলক বিনিয়োগ হার এবং পরগাছা ফড়িয়া ব্যাপারীরা পাটচাষীদের ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত করছে। পাটের মান, উৎপাদনের হার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। পাট ব্যবসা জাতীয়করণ, পাটের গবেষণার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ

এবং পাটের উৎপাদনের হার বৃদ্ধি করা হলে জাতীয় অর্থনীতিতে পাট সম্পদ সঠিক ভূমিকা পালন করতে পারবে। তুলার প্রতিও একই গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। সে জন্য আমরা মনে করি, তুলা ব্যবসাও জাতীয়করণ করা অত্যাবশ্যক। তুলার মান ও উৎপাদন বৃদ্ধি করার প্রয়োজন রয়েছে। বিগত সরকারগুলো আমাদের অন্যতম অর্থকরী ফসল চা, ইক্ষু এবং তামাকের উৎপাদনের ব্যাপারেও যথেষ্ট অবজ্ঞা প্রকাশ করেছেন। এর ফলে এসব অর্থকরী ফসলের উৎপাদন আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে।

একটা স্বল্প সম্পদের দেশে কৃষি পর্যায়ে অনবরত উৎপাদন হ্রাসের পরিস্থিতি অব্যাহত রাখা যেতে পারে না। দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধির সকল প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। চাষীদের ন্যায্য ও স্থিতিশীল মূল্যের নিশ্চয়তা দিতে হবে।

প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের গোটা কৃষিব্যবস্থাতে বিপ্লবের সূচনা অত্যাবশ্যক। পশ্চিম পাকিস্তানের জায়গিরদারি, জমিদারি, সরদারি প্রথার অবশ্যই বিলুপ্তি সাধন করতে হবে। প্রকৃত কৃষকের সাথে গোটা ভূমি ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। ভূমি দখলের সর্বোচ্চ সীমা অবশ্যই নির্ধারণ করে দিতে হবে। কৃষিব্যবস্থাকে অবশ্যই আধুনিকীকরণ করতে হবে। অবিলম্বে চাষীদের বহুমুখী সমবায়ের মাধ্যমে ভূমি সংহতি সাধনে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। সরকার এজন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

ভূমি রাজস্বের চাপে নিষ্পিষ্ট কৃষককুলের ঋণভার লাঘবের জন্য অবিলম্বে আমরা ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা বিলোপ এবং বকেয়া খাজনা মওকুফ করার প্রস্তাব করেছি। আমরা বর্তমান ভূমি রাজস্ব প্রথাও তুলে দেবার কথা বলছি।

প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বাধিক উন্নয়নের জন্য বৈজ্ঞানিক তৎপরতা চালাতে হবে। অগ্রধিকারের ভিত্তিতে আমাদের বনসম্পদ, ফলের চাষ, গোসম্পদ, হাঁস-মুরগির চাষ, দুগ্ধ খামার সর্বোপরি মৎস্য চাষের ব্যবস্থা করতে হবে। পানিসম্পদ সম্পর্কে গবেষণা এবং নৌ-প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার জন্য অবিলম্বে একটি নৌ-গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপন করার প্রয়োজন। অর্থনীতির মূল ভিত্তির যে প্রথম তিনটি স্তর সেগুলোক অবশ্যই অগ্রাধিকার দিতে হবে। বন্যা নিয়ন্ত্রণকে অবশ্যই প্রথম কর্তব্য হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। জরুরি অবস্থার ভিত্তিতে একটা সুসংহত ও সুষ্ঠু বন্যানিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা আশু প্রয়োজন। পশ্চিম পাকিস্তানের জলবদ্ধতা ও লবণাক্ততা দ্রুতগতিতে দূরভীভূত করতে হবে। পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে বিজলি সরবরাহ করতে না পারলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিসাধিত হতে পারে না। একটি সম্প্রসারিত কর্মসূচি বাস্তবায়িত করে গ্রামে গ্রামে বিজলি সরবরাহ করতে হবে। এর দ্বারা পল্লী অঞ্চলে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারে। পাঁচ বছরে আমরা বাংলাদেশে পঁচিশশ' কিলোওয়াটস বিজলি উৎপাদন করতে চাই। রূপপুর আণবিকশক্তি এবং জামালগঞ্জের কয়লা প্রকল্প অবিলম্বে বাস্তবায়িত করতে হবে।

প্রাকৃতিক গ্যাস অবিলম্বে পুরোপুরিভাবে কাজে লাগাতে হবে। তৃতীয় অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা। যমুনা নদীর ওপর সেতু নির্মাণ

করে উত্তরবঙ্গের সাথে সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপনের বিষয়টি আমরা সর্বোচ্চ অধিকার দেই। সিন্ধু ও পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানে সিন্ধু নদের ওপর এবং বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা ও কর্ণফুলির ওপরে সেতু নির্মাণ করতে হবে। অভ্যন্তরীণ নৌ ও সামুদ্রিক বন্দরের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

সড়ক ও রেলব্যবস্থার ওপরও আমরা যথাথ গুরুত্ব দিয়েছি।

সুষ্ঠু সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা খাতে পুঁজি বিনিয়োগের চেয়ে উৎকৃষ্ট বিনিয়াগ আর কিছু হতে পারে না। ১৯৪৭-এর পর বাংলাদেশে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার পরিসংখ্যান একটা ভয়াবহ সত্য। আমাদের জনসংখ্যার শতকরা ৮০ জন অক্ষরজ্ঞানহীন। প্রতিবছর ১০ লাখের অধিক নিরক্ষর লোক বাড়ছে। জাতির অর্ধেকেরও বেশি শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। শতকরা ১৮ জন বালক ও ৬ জন বালিকা প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণ করছে। জাতীয় উৎপাদনের শতকরা কমপক্ষে ৪ ভাগ সম্পদ বিদ্যা খাতে ব্যয় হওয়া প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। কলেজ ও স্কুল, বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে হবে! নিরক্ষরতা অবশ্যই দূর করতে হবে। ৫ বছর বয়সের শিশুদের বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা দানের জন্য একটা ক্রাশ প্রোগ্রাম চালু করতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষার দ্বার সকল শ্রেণীর জন্য খোলা রাখতে হবে। দ্রুত মেডিকেল ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়সহ নয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দারিদ্র্য যাতে উচ্চ শিক্ষার জন্য মেধাবী ছাত্রদের অভিশাপ হয়ে না দাঁড়ায় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

জীবনের সব ক্ষেত্রে বাংলা ও উর্দু যাতে ইংরেজির স্থান দখল করতে পারে– সে ব্যাপারে অবিলম্বে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আঞ্চলিক ভাষা বিকাশ ও উন্নয়নের ব্যাপরে উৎসাহ সৃষ্টি করতে হবে।

নাগরিক জীবনের সমস্যাবলির দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাব নিম্ন আয়ের লোকজন অমানুষিক পরিবেশের মধ্যে বসবাস করছেন। তথাকথিত ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্টগুলো বিত্তবানদের জন্য বিলাসবহুল আবাসিক এলাকা নির্মাণে ব্যস্ত। আর এদিকে বাস্তুহারা ও ভিত্তিহীনের দল এতটুকু আশ্রয়ের সন্ধানে মাথাকুটে ফিরছে। ভবিষ্যৎ নগর-উন্নয়ন পরিকল্পনায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র নগরবাসীর সুযোগ-সুবিধার নিশ্চয়তা থাকতে হবে। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে অল্প খরচে শহরে বাসগৃহ নির্মাণের ব্যবস্থার প্রয়োজন।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে এক করুণ পরিবেশ বিরাজমান। আমাদের মোট জনসংখ্যার ৯০ ভাগ মানুষ সামান্যতম চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। প্রতি ইউনিয়নে একটি করে হাসপাতাল অবিলম্বে স্থাপন করা প্রয়োজন। চিকিৎসা গ্র্যাজুয়েটদের জন্য ন্যাশনাল সার্ভিসের প্রয়োজন। পল্লী এলাকার জন্য বিপুলসংখ্যক প্যারা-মেডিকেল পার্সোনালদের ট্রেনিং দেয়া দরকার।

গণআন্দোলনের মতোই শিল্প শ্রমিকরা অর্থনীতি ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। ট্রেড ইউনিয়ন গঠন, যৌথ দর কষাকষি এবং ধর্মঘটের ব্যাপারে তাদের মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি দিতে হবে। তাদের নিজেদের এবং সন্তানদের জন্য বেঁচে থাকার মতো মজুরি, বাসগৃহ, শিক্ষা ও চিকিৎসা সুযোগর ব্যবস্থা করতে হবে। শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার খর্বকারী সকল শ্রম আইন বাতিল করতে হবে। শিল্প কারখানায় শ্রমিকদের ন্যায্য হিস্যাদানের মাধ্যমেই তাদের কাজ থেকে শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি আশা করা যায়। সমাজের চাহিদা মেটাতে হলে অর্থনীতির সকল খাতে সর্বোচ্চ পরিমাণ উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে।

অর্থনীতির সর্বত্র মজুরি কাঠামো ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে পুনর্বিন্যাস করতে হবে। ক্রমবর্ধমান মদ্রাস্ফীতির গ্রাস থেকে নিম্ন বেতনভুক্ত কর্মচারী ও অল্প উপার্জনশীল ব্যক্তিদের বাঁচাবার জন্য দ্রব্যমূল্যে স্থিতিশীলতা আনতে হবে।

সকল নাগরিকের সমান অধিকারে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যদের নিশ্চয় জানা আছে যে, আমরা সব সময় সাম্প্রদায়িকতার বিরোধিতা করে আসছি। সংখ্যালঘুরাও অন্যান্য নাগরিকের মতোই সমঅধিকার ভোগ করবে। আইনের সমান রক্ষাকবচ সর্বক্ষেত্রেই পাবে। উপজাতীয় এলাকা যাতে অন্যান্য এলাকার সাথে পুরোপুরি সংযোজিত হতে পারে, তারা যাতে জীবনের সর্বক্ষেত্রে অপর নাগরিকদের মতোই সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে এ জন্য উপজাতীয় এলাকা উন্নয়নের ব্যাপারে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম, উপকূলীয় দ্বীপসমূহ এবং উপকূলবর্তী এলাকায় বসবাসকারী যাতে জাতীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে সেজন্য তাদের সম্পদের সদ্ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বিশেষ উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।

জাতীয় জীবনের সাথে মোহাজেরদের একাত্ম হয়ে যাওয়া উচিত। এর ফলে স্থানীয় জনগণের সাথে মিলেমিশে সর্বক্ষেত্রে তারা স্থানীয় জনগণের মতোই সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারবেন।

৬ দফা বা আমাদের অর্থনৈতিক কর্মসূচি ইসলামকে বিপন্ন করে তুলছে বলে যে মিথ্যা প্রচার চালানো হচ্ছে, সে মিথ্যা প্রচারণা থেকে বিরত থাকার জন্য আমি শেষবারের মতো আহ্বান জানাচ্ছি। অঞ্চলে অঞ্চলে এবং মানুষে মানুষে সুবিচারের নিশ্চয়তা প্রত্যাশী কোনোকিছুই ইসলামের পরিপন্থী হতে পারে না।

আমরা এ শাসনতান্ত্রিক নীতির প্রতি অবিচল ওয়াদাবদ্ধ যে, কোরআন ও সুন্নাহর নির্দেশিত ইসলামী নীতির পরিপন্থী কোনো আইন এ দেশে পাস হতে বা চাপিয়ে দেয়া যেতে পারে না।

পররাষ্ট্রনীতির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে– আজ বিশ্বজুড়ে যে ক্ষমতার লড়াই চলছে সে ক্ষমতার লড়াইয়ে আমরা কোনো মতেই জড়িয়ে পড়তে পারি না। এজন্য আমাদের অবশ্যই সত্যিকারের স্বাধীন এবং জোট

নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করতে হবে।

আমরা ইতিমধ্যেই সিয়াটো, সেন্টো ও অন্যান্য সামরিক জোট থেকে সরে আসার দাবি জানিয়ে এসেছি। ভবিষ্যতেও এ ধরনের কোনো জোটে জড়িয়ে না পড়ার ব্যাপারে আমাদের বিঘোষিত সিদ্ধান্ত রয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ এবং বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী নির্যাতিত জনগণের যে সংগ্রাম চলছে সে সংগ্রামে আমাদের সমর্থন জানাচ্ছি।

'কাহারো প্রতি বিদ্বেষ নয়, সকলের প্রতি বন্ধুত্ব'— এই নীতির ভিত্তিতে বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের বিশেষ করে প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে আমরা শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানে বিশ্বাসী। আমরা মনে করি, প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে পাকিস্তানের সম্পর্ক স্বাভাবিক হওয়া উচিত। কারণ, এর মাঝে আমাদের জনগণের বৃহত্তমস্বার্থ নিহিত রয়েছে। সেজন্য প্রতিবেশীদের মধ্যে বর্তমান বিরোধসমূহের নিষ্পত্তির ওপর আমরা সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করছি।

ফারাক্কা বাঁধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতির যে ভয়ঙ্কর ও স্থায়ী সর্বনাশ করা হচ্ছে অনতিবিলম্বে সে সর্বনাশের মোকাবেলা করতে হবে। কালবিলম্ব না করে এই সমস্যার ন্যায়সঙ্গত সমাধানের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে হবে।

দেশবাসী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হলেই এসব কর্মসূচি ও নীতিমালার বাস্তবায়ন সম্ভবপর। আগামী নির্বাচন জাতীয় মৌলিক সমস্যাসমূহ বিশেষ করে ৬ দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে গণভোট নামে আমরা গ্রহণ করছি। একমাত্র জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই দেশকে একত্রে একটা শাসনতন্ত্র রচনার ক্ষমতার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ সম্পর্কিত ধারাসমূহ বাতিলের জন্য পুনরায় প্রেসিডেন্টের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

রাজনৈতিক কারণে রাজনৈতিক কর্মী, ছাত্র, শ্রমিকের বিরুদ্ধে ও বিগত গণঅভ্যুত্থানকালীন দায়েরকৃত মামলা, গ্রেফতারি পরোয়ানা ও দণ্ডাদেশ প্রত্যাহার করা হলে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি হবে। বিনা বিচারে আটক সকল রাজবন্দীকেও মুক্তি দিতে হবে।

জাতীয় নিরাপত্তার খাতিরে বা স্বার্থে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীকে বেসামরিক প্রশাসনের গুরুভার বহন করা কোনো প্রকারেই উচিত নয়। রাজনীতিতেও সশস্ত্রবাহিনীর জড়িয়ে পড়া একেবারেই অনুচিত। উচ্চতর শিক্ষাপ্রাপ্ত পেশাদার সৈনিকদের জাতীয় সীমানা রক্ষার গুরুদায়িত্ব এককভাবে পালন করা বাঞ্ছনীয়।

পরিশেষে আমি বলতে চাই, জাতি হিসেবে আমাদের সামনে যে চ্যালেঞ্জ এসেছে– আমরা সাফল্যের সাথে তার মোকাবেলা করবই। প্রকৃত প্রাণবন্ত গণতন্ত্র দেশে প্রতিষ্ঠিত করতেই হবে। যাদের নিয়ে পাকিস্তান গঠিত তারা শুধু একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যেই একত্রে বসবাস করতে পারে।

গণতন্ত্র ধ্বংসের যে কোনো উদ্যোগ পরিণতিতে পাকিস্তানকেই ধ্বংস করবে।

আমাদের ৬ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে ফেডারেশনের ইউনিটসমূহকে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন মঞ্জুর করে অঞ্চলে অঞ্চলে সুবিচারের নিশ্চয়তা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এ ধরনের ফেডারেল গণতান্ত্রিক কাঠামোর আওতায় দেশে সামাজিক বিপ্লবের সূচনার জন্য প্রগতিশীল অর্থনৈতিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে।

আওয়ামী লীগ এ চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে আজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আওয়ামী লীগ দেশবাসীর যে সমর্থন ও আস্থার অধিকারী হয়েছে তাতে আমরা বিশ্বাস করি যে, ইনশাল্লাহ্ আমরা সাফল্যের সাথে এ চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে সক্ষম হবো।

১২ নভেম্বরের প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও ১৯৭০-এর নির্বাচন

স্মরণকালের ভয়াবহ মহাপ্রলয়ে বিধ্বস্ত হয় বরিশালের গলাচিপা, বরগুনা, পটুয়াখালী, ভোলা, দৌলতখান, লালমোহন, তজুমদ্দিন, চরফ্যাশন, খেপুপাড়াসহ অনেক অঞ্চল। সেই সঙ্গে চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী জেলাসহ বিভিন্ন এলাকায় প্রায় ১০ লাখ লোকের জীবনাবসান ঘটে।

সে সময় দৈনিক ইত্তেফাকের এক রিপোর্টে জানা যায়, বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলার বিভিন্ন এলাকায় হাজার হাজার মানুষ খাদ্যের অভাবে গাছের পাতা, কচুগাছ ও অখাদ্য খেয়ে নামেমাত্র বেঁচে আছেন। কোনো কোনো স্থানে পৌষের তীব্র শীতে বিনা বস্ত্রে অনেক মানুষ দিনরাত্রি যাপন করছেন। ঝড়ের তাণ্ডবলীলায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ছিল বরিশালের ভোলা জেলা। এ জেলায় প্রায় ৩ লাখ মানুষ নিহত হয়েছিল। ছেলেমেয়েদের পরনে কোনো কাপড় ছিল না, বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলা ও পুরুষরা খেজুর পাতার বেষ্টনীর মধ্য থেকে কোনো রকমে লজ্জা নিবারণের বৃথা চেষ্টা করেছেন। সরকারের কাছ থেকে কোনো রকম সহযোগিতা আসেনি।

১২ নভেম্বর ভয়াল দিনে ইয়াহিয়া খান চিনে ছিলেন। সেখান থেকে ফেরার পথে ঢাকায় আসেন। কিন্তু মহাপ্রলয়ের ব্যাপারে কোনো কথা না বলেই পাকিস্তান চলে যান। শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ নেতারা রিলিফ সামগ্রী নিয়ে ছুটেছেন বিভিন্ন অঞ্চলে। প্রায় প্রতিদিনই তিনি বিভিন্ন এলাকায় নিজ হাতে দুস্থদের সাহায্য বিতরণ করেছেন। পূর্ব পাকিস্তানের মহাপ্রলয়ের সংবাদে বিভিন্ন দেশ থেকে সাহায্য আসা শুরু হয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের অবহেলার কারণে তা পৌঁছতে বিলম্ব হয়। যে কারণে জনগণের নিকট কেন্দ্রীয় সরকার আস্থা হারায়।

এদিকে পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর ও ১৭ ডিসেম্বর যথানিয়মে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়। যদিও অনেকেই নির্বাচনের তারিখ পেছানোর দাবি তুলেছিল। কিন্তু শুধু দুর্গত এলাকায় জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের ৩০টি আসনে নির্বাচন ১৯৭১ সালের ১৭ জানুয়ারিতে অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করে বাকি সবগুলো পূর্বঘোষিত সময়েই বলবৎ রাখে।

অবশেষে পূর্ব পাকিস্তানে ৭ ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের ৯টি বাদে ১৫৩টি আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। দুটি আসন ব্যতীত সকল আসনে বিপুল ভোটের ব্যবধানে আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা জয়ী হন। ১৭ ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদে ১৬টি বাদে

অবশিষ্ট আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। অধিকাংশ আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী নির্বাচিত হন।

সর্বশেষ নির্বাচনে জাতীয় পরিষদের বিজয়ী প্রার্থীদের দলগত অবস্থা নিম্নে তুলে ধরা হলো–

জাতীয় পরিষদ আসন	৩১৩
পাকিস্তান আওয়ামী লীগ	১৬৭
পাকিস্তান পিপলস পার্টি	৮৮
কাইয়ুম মুসলিম লীগ	৯
কাউন্সিল মুসলিম লীগ	৭
কনভেনশন মুসলিম লীগ	২
ন্যাপ (ওয়ালী)	৭
জামায়াতে ইসলামী	১
মারকাজি-জমিয়তউল ইসলাম (হাজারভি গ্রুপ)	৭
মারকাজি-জমিয়তউল ইসলাম (থানাভি গ্রুপ)	১৪
সর্বমোট	৩১৩

আওয়ামী লীগের ঘোষণাপত্র

নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অপূর্ব সাফল্য লাভ করে। আওয়ামী লীগ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে তাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ৬ দফাভিত্তিক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করে তা সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে ঘোষণা করা হয়। ঘোষণাটি নিম্নরূপ :

সত্তরের দশকে পৌঁছেই পাকিস্তানের জনগণ যে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে, অন্য কোনো দেশের মানুষকে তারচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হয়নি। স্বাধীনতা অর্জন এবং পাকিস্তান সৃষ্টির ফলে দেশবাসীর যে হৃদয়মন আশা-আকাঙ্ক্ষায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল সে মন নৈরাশ্য এবং বঞ্চনাবোধের কাছে আজ পরাজিত। স্বাধীনতার অঙ্গীকার ছিল নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠা ও সুষ্ঠু সজীব গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার– যেখানে মানুষ স্বাধীনতার স্বাদ অনুভব করবে, ন্যায়বিচার এবং সাম্য বিরাজ করবে। এই অঙ্গীকার আজও অপূর্ণ রয়ে গেছে। গণতন্ত্রকেই শিকড় মেলতে দেওয়া হয়নি এবং একটার পর একটা 'কোটারি' এসে অন্যায়ভাবে জনগণের ক্ষমতা দখল করছে। এসব 'কোটারি' তাদের সংকীর্ণ স্বার্থ উদ্ধারের নগ্ন প্রয়াসে লিপ্ত থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং সম্পদ নিজেদের হাতে সংহত ও পুঞ্জীভূত করেছে এবং পাকিস্তানের কোটি মানুষকে শোষণের শিকারে পরিণত করেছে। এভাবে স্বাধীনতা জনগণের জন্য মুক্তি আনার বদলে আরও বেশি রকম দাসত্ব নিয়ে এসেছে।

আমাদের সমাজ যে বাস্তব অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে তা গুরুতর। দ্রুত বর্ধমান জনসংখ্যার তুলনায় আমাদের সম্পদ যথেষ্ট নয়। দেশের দুটি অংশ সহস্রাধিক মাইলের ব্যবধানে বিচ্ছিন্ন। তাই এখানে একটা সুষ্ঠু সমাজ গঠনের কাজ স্বাভাবিকভাবেই কঠিন। সুদীর্ঘ বাইশ বছরে প্রায় কখনোই এ দায়িত্বকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। পক্ষান্তরে আমরা মুষ্টিমেয় ভাগ্যবানকে ক্ষমতা এবং সম্পদ অর্জনের হীন ও নগ্ন প্রয়াসে লিপ্ত থাকতে দেখেছি। কাজটি তাই আজ জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। শহর এবং গ্রামাঞ্চলের মেহনতি জনতা আজ জেগে উঠেছে এবং তারা আর তাদের অধিকারের বঞ্চনা সহ্য করতে রাজি নয়। বার কোটি মানুষের একটি জাতি সুবিধাভোগী একটা কোটারির হাতে কিছুতেই নিজেকে সমর্পণ করে দিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। এই কোটারির হাত থেকে নিজেদের ন্যায়সঙ্গত ক্ষমতা ছিনিয়ে আনতে তারা বদ্ধপরিকর। মানুষে মানুষে এবং অঞ্চলে অঞ্চলের মধ্যে অনুষ্ঠিত এই অবিচারকে চিরস্থায়ী করার বিরুদ্ধে পাকিস্তানের জনসাধারণ বিদ্রোহ আরম্ভ করেছে। মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগীর হাতে সম্পদ পুঞ্জীভূত করার এবং অবশিষ্ট জনগণের প্রয়োজনের প্রতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা প্রদর্শনের ফলে আজ অর্থনৈতিক কাঠামোর আশু এবং আমূল পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। পাকিস্তানের দুই অংশের

উৎকট বৈষম্য ক্রমাগত আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে যাচ্ছে। পূর্ব পাকিস্তানের সামগ্রিক অর্থনীতি আজ ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

এই ধ্বংসের হাত থেকে আঞ্চলিক অর্থনীতিকে বাঁচানোর জন্য আঞ্চলিক সরকারকে জরুরি ভিত্তিতে কাজ করার এবং অর্থনীতি পরিচালনার ক্ষমতা দিয়ে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে। শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন ছাড়া এটা সম্ভব নয় বলেই আজ শাসনতন্ত্রের এই পরিবর্তনের দাবি অপ্রতিরোধ হয়ে উঠেছে।

জনগণই আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। সমাজকে ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে পুনর্গঠনের সাধারণ প্রচেষ্টায় জনগণকে সক্রিয় এবং সমবেতভাবে আত্মনিয়োগের সুযোগ দেওয়ার জন্য সমাজব্যবস্থার বিধি ও কাঠামোর আমূল পরিবর্তন দরকার। আর এটা করতে হলে আমাদের প্রয়োজন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে একটি সামাজিক বিপ্লব সাধন এবং এ জন্যই আমাদের একটা নতুন শাসনতান্ত্রিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক কাঠামোর প্রয়োজন। এই বিরাট চ্যালেঞ্জের সামনে আজ আমরা এসে দাঁড়িয়েছি। এই চ্যালেঞ্জ আমাদের গ্রহণ করতেই হবে। কারণ এর ওপর আমাদের অস্তিত্ব নির্ভর করছে।

ঔপনিবেশিক শাসনকালের উত্তরাধিকারী হিসেবে আমরা যে প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো লাভ করেছি তাকে ভেঙে ফেলতেই হবে। আজকে দেশের জনগণ ও সমাজের জরুরি প্রয়োজন মিটানোর উপযোগী করে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন সংস্থাগুলোর ডিজাইন (নক্‌শা) করতে হবে।

মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কর্তৃক আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠাই গণতান্ত্রিক সংগ্রামের মাধ্যমে জনগণের অধিকার আদায়ের দৃঢ়সংকল্পের প্রথম বহিঃপ্রকাশ। আজ পর্যন্ত এই সংগ্রাম অব্যাহত রয়েছে। শাসনচক্রের বারংবার আক্রমণের মুখে অগণিত পরিবার ও জীবন ধ্বংস হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী নিজেও জনস্বার্থের জন্যই শহীদ হয়েছেন। স্বাধীনতার শিখা অনির্বাণ রাখার জন্য হাজার হাজার মানুষ জীবন দিয়েছে। এই সংগ্রামে টিকে থাকার জন্য অসংখ্য মানুষকে দীর্ঘকাল কারারুদ্ধ হয়ে স্বাধীনতার স্বাদ থেকে বঞ্চিত থাকতে হয়েছে এবং অনেকেরই পরিবার, সম্পত্তি এবং জীবিকা নির্বাহের উপায় হারাতে হয়েছে।

জনগণের নিরবচ্ছিন্ন, সুকঠিন ও সুপতিজ্ঞ এই সংগ্রামের ঐতিহ্যময় পটভূমিতে আওয়ামী লীগ কর্তৃক আমাদের সম্মুখে সমুপস্থিত চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করার জন্য যে সাহস এবং সংকল্পের প্রয়োজন, জাতির ওপর আমাদের বিশ্বাস, জনগণের ওপর আস্থা এবং সর্বোপরি সর্বশক্তিমানের ওপর আমাদের ভরশা, ঈমানের মাধ্যমেই আমরা তা লাভ করেছি। তাই গণতান্ত্রিক উপায়ে বিপ্লব সাধনের জন্য এবং তা দিয়ে বর্তমানের অন্যায়, অবিচারের ওপরে প্রতিষ্ঠিত কাঠামোর স্থলে অঞ্চলে অঞ্চলে ও মানুষে মানুষে সুবিচার রক্ষাকারী একটি নতুন শাসনতান্ত্রিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগের এই ঘোষণাপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে। পাকিস্তানের প্রতিটি অঞ্চলে প্রতিটি নাগরিকের সুবিচারের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য এই ঘোষণাপত্রে একটি ব্যাপক রূপরেখা পেশ করা হয়েছে।

শাসনতন্ত্রের মৌলিক বৈশিষ্ট্য

যথার্থ সজীব গণতন্ত্র : এমন একটি যথার্থ সজীব গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে যেখানে জনগণ স্বাধীন এবং মর্যাদার সাথে জীবনযাপন করতে পারবে এবং ন্যায় ও সাম্য বিরাজ করবে।

ইসলাম : জনসংখ্যার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের প্রিয় ধর্ম হলো ইসলাম। আওয়ামী লীগ এই মর্মে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, শাসনতন্ত্রে সুস্পষ্ট গ্যারান্টি থাকবে যে পবিত্র কোরআন ও সুন্নায় সন্নিবেশিত ইসলামের নির্দেশাবলীর পরিপন্থী কোনো আইন পাকিস্তানে প্রণয়ন বা বলবৎ করা চলবে না। শাসনতন্ত্রে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের পবিত্রতা রক্ষার গ্যারান্টি সন্নিবেশিত হবে। সর্বস্তরে ধর্মীয় শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য পর্যাপ্ত বিধিব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সংখ্যালঘু : সংখ্যালঘুরা আইনের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ সমান অধিকার ভোগ করবে। নিজেদের ধর্ম পালন ও প্রচার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনায় এবং নিজ নিজ ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় শিক্ষাদানের ব্যাপারে সংখ্যালঘুদের অধিকার শাসনতান্ত্রিকভাবে রক্ষা করা হবে। স্বীয় ধর্ম ব্যতীত অন্য যে কোনো ধর্ম প্রচারের জন্য সংখ্যলঘু সম্প্রদায়ের কোনো ব্যক্তিকে কর দিতে বাধ্য করা হবে না। নিজ ধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না হলে কোনো ব্যক্তিকে ধর্মসম্পর্কীয় কোনো নির্দেশ গ্রহণ অথবা কোনো ধর্মীয় উপাসনা বা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে জোর করা হবে না।

জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণের নিশ্চয়তাদানে রাষ্ট্রের দায়িত্ব : অন্ন-বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা, চিকিৎসা এবং উপযুক্ত পারিশ্রমিকে কর্মসংস্থানের সুযোগসহ প্রতিটি নাগরিকের প্রাথমিক চাহিদা পূরণের মৌলিক দায়িত্ব রাষ্ট্রের–এ কথার স্বীকৃতি শাসনতন্ত্রে থাকবে।

আইনের দৃষ্টিতে সাম্য : প্রত্যেক নাগরিকের শাসনতান্ত্রিকভাবে সাম্য ও আইনের সমান আশ্রয় দেওয়ার গ্যারান্টি দেওয়া হবে। এই গ্যারান্টি কার্যকর করাকে সুনিশ্চিত করার জন্য যাতে প্রত্যেকটি নাগরিক নিজের অধিকার রক্ষার ক্ষেত্র প্রয়োজনীয় আইনগত সাহায্য পায় তার ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব হবে। গির্জা পদ্ধতির বিলোপ এবং বৈষম্যমূলক উপজাতীয় আইন বিভাগ বাতিল করা হবে।

আওয়ামী লীগ প্রত্যেক মানুষের মর্যাদা এবং ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, গোত্র নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সাম্যের নীতির প্রতি বিশ্বাস পুনরায় ঘোষণা করছে এবং সকল নাগরিককে গণতান্ত্রিক সমাজের সর্বক্ষেত্রে পূর্ণ নাগরিক হিসেবে গণ্য করে।

মৌলিক অধিকার : বাক্ ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, জনসভা আহ্বানের স্বাধীনতা, সমিতি গঠনের স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং বিগতকাল থেকে বিনা বিচারে আটক থেকে রক্ষার ব্যবস্থাসহ সকল মৌলিক অধিকার শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে সুরক্ষিত করা হবে। অস্পৃশ্যতা, দাসত্ব এবং বলপূর্বক শ্রম আদায় নিষিদ্ধ করা হবে। প্রত্যেক নাগরিকের জন্য 'সর্বজনীন মানবিক অধিকার ঘোষণার' অন্তর্গত অধিকারসমূহ নিশ্চিত করা হবে। এতদ্ব্যতীত শাসনতন্ত্রের বিধান থাকবে যে,

যুদ্ধকালীন প্রকৃত আক্রমণাদির সময় ছাড়া মৌলিক অধিকার খর্ব করা যাবে না। জাতীয় জরুরি অবস্থার অজুহাতও এই অধিকার খর্ব করতে দেওয়া হবে না।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা : শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান করা হবে। শাসনতন্ত্রে প্রশাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের সম্পূর্ণ পৃথককরণের নিশ্চয়তা থাকবে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বজায় রাখার মতো চরিত্রবান, জ্ঞানবান এবং ন্যায়বান ব্যক্তিরাই যাতে বিচার বিভাগের সদস্য হতে পারেন শাসনতন্ত্রে সেইরূপ বিধান রাখা হবে।

ফেডারেল বিধান : পাকিস্তান হবে অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর প্রত্যেকটি ৬ দফা ভিত্তিতে পূর্ণ স্বায়ত্তশসান প্রদানকারী ফেডারেশন।

১নং দফা : সরকারের ধরন হবে ফেডারেল এবং পার্লামেন্টারি। এতে ফেডারেল আইনসভার এবং ফেডারেশনের অন্তর্গত ইউনিটগুলোর আইনসভার নির্বাচন হবে প্রত্যক্ষ এবং সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে। ফেডারেল আইনসভায় প্রতিনিধিত্ব হবে জনসংখ্যার ভিত্তিতে।

২নং দফা : ফেডারেল সরকারের হাতে থাকবে কেবলমাত্র দেশরক্ষা, পররাষ্ট্রীয় বিষয়। নিচে ৩ দফায় বর্ণিত শর্তাধীন মুদ্রা।

৩নং দফা : দেশের দুটি অংশের জন্য দুটি পৃথক এবং সহজ বিনিময়যোগ্য মুদ্রা থাকবে অথবা ফেডারেল রিজার্ভ ব্যবস্থাসহ দুই অঞ্চলের জন্য একই মুদ্রা থাকবে। এতে আঞ্চলিক রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে। এই ব্যাংগুলো এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে সম্পদ হস্তান্তর এবং মূলধন পাচার বন্ধের ব্যবস্থা করবে।

৪নং দফা : রাজস্ব সম্পর্কিত নীতিনির্ধারণের দায়িত্ব এবং ট্যাক্স ধার্যের ক্ষমতা অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর হাতে থাকবে। দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্র দফতর পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় রাজস্ব ফেডারেল সরকারে দেওয়া হবে। শাসনতন্ত্রে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে নির্ধারিত হারের ভিত্তিতে উক্ত রাজস্ব আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় ফেডারেল সরকারের তহবিলে জমা হবে। করনীতির ওপর অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার অভিলক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ফেডারেল সরকারের রাজস্বের প্রয়োজন মিটাবার নিশ্চয়তা বিধানের ব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে থাকবে।

৫নং দফা : ফেডারেশনের অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর নিয়ন্ত্রণে প্রত্যেকটি ইউনিটের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার পৃথক হিসাব রাখার শাসনতান্ত্রিক বিধান থাকবে। শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী ধার্য হারের ভিত্তিতে অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর ফেডারেল সরকার প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা মেটাবে। ফেডারেল সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পররাষ্ট্রনীতির কাঠামোর মধ্য থেকে আঞ্চলিক সরকারগুলোকে বৈদেশিক বাণিজ্য এবং বৈদেশিক সাহায্য সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা ও চুক্তির ক্ষমতা শাসনতন্ত্রে দেওয়া হবে।

৬নং দফা : কার্যকরভাবে জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় শরিক হওয়ার উদ্দেশ্যে ফেডারেশনের অঙ্গরাষ্ট্রগুলোকে মিলিশিয়া বা প্যারামিলিশিয়া রাখার ক্ষমতা দেওয়া হবে।

এক ইউনিট বাতিল : এক ইউনিট বাতিলের ফলে যদি কোনো সাধারণ বিষয় অমীমাংসিত থেকে যায় তবে তা ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত পশ্চিম পাকিস্তানের ইউনিটগুলোর জনসাধারণের ইচ্ছানুযায়ী মীমাংসা করার জন্য রেখে দেওয়া হবে।

ফেডারেল সরকারের প্রতিনিধিত্ব : ফেডারেল সরকারের সকল শাখায় ও ফেডারেল সার্ভিসে জনসংখ্যার ভিত্তিতে পাকিস্তানের সকল অংশের মানুষের ন্যায় প্রতিনিধিত্ব লাভের নিশ্চয় বিধানের জন্য শাসনতান্ত্রিক সংবিধান থাকতে হবে। স্বল্প প্রতিনিধিত্বশীল অঞ্চলগুলো বিশেষত পূর্ব পাকিস্তান থেকে বর্ধিত হারে লোক নিয়োগের মাধ্যমে যত সত্বর সম্ভব বর্তমানের স্বল্প প্রতিনিধিত্বের অবসান করা হবে। প্রাথমিক সংশোধনমূলক পদক্ষেপ হিসাব বর্তমানে করাচিতে অবস্থিত নৌবাহিনীর সদর দফতর ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে চট্টগ্রামে স্থানান্তরিত করা হবে।

গণতান্ত্রিক প্রশাসন : বর্তমানে প্রশাসন যন্ত্রগুলো একটি ঔপনিবেশিক সরকারের কার্যাবলি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত হয়েছিল। একটি চলমান গণতান্ত্রিক সমাজের বা রাষ্ট্রের চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে এই প্রশাসন যন্ত্রের কাঠামো আমূল পুনর্গঠনের প্রয়োজন। এজন্য যে অত্যাবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্যগুলো নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থায় শাসনতন্ত্রের প্রতিফলিত হবে তা হলো :

(ক) বর্তমান নিখিল পাকিস্তান ও সেন্ট্রাল সুপিরিয়র সার্ভিসের বিলোপ সাধন।

(খ) পররাষ্ট্র ও দেশরক্ষা– এ দুটি ফেডারেল প্রশাসন পরিচালনের জন্য ফেডারেল সার্ভিস প্রবর্তন এবং জনসংখ্যার ভিত্তিতে পাকিস্তানের সকল অংশ থেকে এতে লোক নিয়োগ।

(গ) অঙ্গরাষ্ট্রগুলো কর্তৃক নিযুক্ত ও নিয়ন্ত্রিত কর্মচারীদের সমন্বয়ে কতিপয় বিশেষ পেশাদার ক্যাডার প্রবর্তন। এই ক্যাডার কর্মকুশলতার ও মেধার মূল্যায়নের ভিত্তিতে অধিকতর সচলতা বিধানকারী সার্ভিস রুলের একটি নয়া কাঠামোর অধীনে থাকবে।

(ঘ) জেলা প্রশাসনের দায়িত্ব নির্বাচিত পরিষদের ওপর অর্পণ। বিশেষভাবে শিক্ষিত কর্মচারীরা এই পরিষদকে সাহায্য করবে।

(ঙ) মহকুমাগুলো জেলায় পরিণত করে মৌলিক প্রশাসন ইউনিটের আকার হ্রাস ও অন্যান্য ব্যবস্থার মাধ্যমে স্থানীয় সরকারি সংস্থাগুলোকে শক্তিশালী করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(চ) প্রশাসনিক কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে দুর্নীতি; স্বজনপ্রীতি ও স্বেচ্ছাচার উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে প্রশাসনিক কার্যাবলি তদারক ও নিয়ন্ত্রণের জন্য কার্যকর ব্যবস্থাদি গ্রহণ।

অর্থনৈতিক কর্মসূচির ভিত্তি

শোষণমুক্ত একটা ন্যায় ও সাম্যবাদী সমাজ গঠন করাই এই অর্থনৈতিক কর্মসূচির মূল লক্ষ্য। এটা একটি সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার রূপকল্প– যাতে অর্থনৈতিক

অবিচার দূরীকরণ ও দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করা হবে এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ও সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে এই সমৃদ্ধির ফল যথাযথ বণ্টনের বিধান থাকবে। যে সমাজের অধিকাংশ মানুষ দারিদ্র্যের অতল তলে নিমজ্জিত এবং জীবনের মৌলিক প্রয়োজনগুলো থেকে বঞ্চিত সেখানে দ্রুত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির প্রয়োজন অপরিহার্য। আমাদের সমাজের নবজাতকের সংখ্যার ঊর্ধ্বগতি ও মৌলিক সম্পদের স্বল্পতার সংগ্রাম ও বিপুল ত্যাগ স্বীকারে প্রয়োজন। আমাদের কাজ হলো— গণতান্ত্রিক কাঠামোর আওতায় দেশে একটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লব সাধন। সংগ্রাম ও ত্যাগ ব্যতীত দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন ও ন্যায়পরায়ণ সমাজ বা রাষ্ট্র গঠনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া মিথ্যা অঙ্গীকারের সামিল।

দ্রুত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সাধনে লক্ষ্য অর্জনের অঙ্গীকারে নিজেদের আবদ্ধ করে আমরা দেশবাসীকে প্রকৃতপক্ষে বিরামহীন সংগ্রাম ও সবরকম ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানাচ্ছি। আমাদের বিশ্বাস দেশের সকল স্তরের মানুষ ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চল সমানভাবে ত্যাগের বোঝা বহন করবে এবং অর্থনৈতিক উন্নতির ফলও সমান ভাগে ভোগ করবে। এই নিশ্চয়তা দিতে পারলে আমরা তাদের কাছে এই আহ্বান জানাতে পারি। অতীতে অধিকতর দরিদ্র মানুষ এবং দরিদ্রতর অঞ্চলগুলোকে দিয়ে এই ত্যাগের বোঝা বইয়ে নেওয়া হয়েছে এবং নগণ্যসংখ্যক সুবিধাভোগী অর্থনৈতিক উন্নতির ফসল ঘরে তুলেছে। অর্থনৈতিক উন্নতির এই অন্যায় পন্থাকে আমরা সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করি।

সামাজিক অসাম্যের গোড়ায় এমন একটি ত্রুটিপূর্ণ প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো রয়েছে যা ব্যক্তিগত উদ্যমকে অর্থনৈতিক উন্নতির একমাত্র বাহনে পরিণত করে। ব্যক্তিগত মুনাফার পথ ধরে দেশের সম্পদ অপরিহার্যভাবেই মুষ্টিমেয় কতিপয় ব্যক্তির হাতে পুঞ্জীভূত এবং অর্থনীতির মূল সেক্টরগুলো শক্তিশালী কোটারির হাতে চলে যায়। এটা সামজিক সুবিচার ও সাম্যের লক্ষ্যে পৌঁছা অসম্ভব করে তোলে। তাই জাতীয়করণ সরকারি সেক্টরের সম্প্রসারণ, সমবায় সংগঠনগুলোর উন্নয়ন ও শিল্পকারখানার ব্যবস্থাপনা ও মালিকানায় শ্রমিকের অংশীদারিত্বের নয়া প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো উদ্ভাবনের মতো ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থনীতির বর্তমান প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর পরিবর্তন দরকার। নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপনের জন্য পরিকল্পিত নির্দিষ্ট নীতিগুলো নিম্নরূপ :

সরকারি খাত ও জাতীয়করণ

শুধু ক্রমবর্ধমান ট্যাক্স ধার্য করে এবং নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেই সম্পদ পুঞ্জীভূতকরণ এবং অর্থনৈতিক প্রধান সেক্টরগুলোর নিয়ন্ত্রণ অধিকার থেকে সুবিধাভোগী 'কোটারি' থেকে বিরত থাকা সম্ভব নয়, কার্যকরভাবে এই সমস্যাগুলোর মোকাবিলা করার জন্য অর্থনীতির প্রধান সেক্টরগুলোর জাতীয়করণ এবং ভবিষ্যতে মূল সেক্টরগুলো সরকারি খাতের আওতাভুক্ত করার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। সামাজিক ন্যায়বিচারের

অভিলক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অর্থনৈতিক উন্নতি করতে হলে এ ধরনের জাতীয়করণের কর্মসূচি গ্রহণ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পূর্বশর্ত; অবশ্য অত্যন্ত সুসামঞ্জস্য পরিকল্পনা সহকারে জাতীয়করণ কর্মসূচি রূপায়ণ করতে হবে। প্রশাসনিক কর্মচারীর এবং সর্বোপরি দক্ষতার ওপরে যাতে অতিরিক্ত চাপ না পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রেখে জাতীয়করণের মাত্রাগতি ও গঠন বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা উদ্ভাবিত না হলে মূল্য নির্ধারণ নীতির ত্রুটি এবং আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও নিয়ন্ত্রণের জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত সংগঠনগুলো অদক্ষতায় আক্রান্ত হতে পারে। সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ থাকা উচিত এবং এটা সুস্পস্টই দেখা যায় যে, রাষ্ট্রায়ত্ত সংগঠনগুলোর পরিচালনার জন্য নতুন প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণ ও সবচেয়ে ভালো পেশাদার কর্মচারী নিয়োগ করলে ব্যবস্থাপনা দক্ষতায় সর্বোচ্চ মানে পৌঁছানো যেতে পারে। উপরিউক্ত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখে জাতীয়করণের জন্য অগ্রাধিকারের তালিকাটি নিচে দেওয়া হলো :

(১) ব্যাংকিং, (২) বীমা, (৩) লোহা ও ইস্পাতখনি, মেশিন যন্ত্রপাতি, ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং, পেট্রো-কেমিক্যাল, সার, সিমেন্ট, জ্বালানি ও বিদ্যুৎসহ ভারী শিল্প; (৪) বৈদেশিক বাণিজ্য–বিশেষত নিম্নলিখিত পাট ও তুলা ছাড়াও লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্য, কয়লা, খাদ্যশস্য, সিমেন্ট এবং সারসহ প্রধান প্রধান পণ্যের আমদানি-রফতানি; (৫) পাট ব্যবসা; (৬) তুলা ব্যবসা, (৭) শিপিংসহ প্রধান যোগাযোগ ব্যবস্থা, আন্তঃআঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিবহন, (৮) পরিকল্পনা সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিতব্য অপরাপর মূল শিল্প করখানা।

ক্রমবর্ধমান কর : দেশের বর্তমান করপ্রথায় মুষ্টিমেয় বিশেষ সুবিধাভোগীর প্রতি চিরাচরিত আনুকূল্যই প্রতিফলিত হয়েছে এবং এই করপ্রথা পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা পশ্চাৎমুখী। উচ্চতর উপার্জনকারী শ্রেণীর ওপর ধার্য করের বোঝা আন্তর্জাতিক মানের হিসাবে সবচেয়ে কম। সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠাকল্পে সাধারণ মানুষের স্কন্ধে পরোক্ষ করের মাধ্যমে যে বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে তার জায়গায় প্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে অধিক পরিমাণে অর্থ-আদায়ের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য কর কাঠামোর আমূল রদ-বদল প্রয়োজন। এ জন্য আয় করে একটি সত্যিকারের ক্রমবর্ধমান প্রথা প্রচলন এবং মূলধনের লাভ, মুনাফা, সম্পদ উপহার ও উত্তরাধিকারের ওপর থেকে মোটা পরিমাণের টাকা আদায় করা আবশ্যক। উপরন্তু বর্তমানে প্রচলিত ছাড়, অব্যাহতি এবং ট্যাক্স হলিডে প্রথা সামাজিক অসাম্য আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। এই সকল বিষয় ব্যাপকভাবে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন এবং উপরোল্লিখিত সামাজিক অভিলক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এ ধরনের ছাড়, অব্যাহতি, ট্যাক্স হলিডে প্রথা দূর করতে হবে।

আন্তর্জাতিক ও আন্তঃআঞ্চলিক বৈষম্য : গত ২৩ বছরেরও বেশি সময় ধরে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ক্রমাগত পশ্চিম পাকিস্তানে সম্পদ পাচার, বৈদেশিক মুদ্রা ও সাহায্যের সিংহভাগ পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যবহারের দরুন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে

আন্তর্জাতিক ও আন্তঃআঞ্চলিক বৈষম্য আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে গেছে। পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলেই এবং প্রত্যেক অঞ্চলে বিভিন্ন এলাকার মধ্যে বৈষম্য রয়েছে। ন্যায়বিচারের খাতিরে পাকিস্তানের অধিক উন্নত অঞ্চলগুলো থেকে স্বল্প উন্নত অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সম্পদ হস্তান্তর করা উচিত এবং আন্তর্জাতিক ও আন্তঃআঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস ও পরিশেষে নির্মূল করার উদ্দেশ্যে ফেডারেশনের ইউনিট সরকারগুলোকে নীতিগ্রহণ করতে হবে।

মৌলিক প্রয়োজন মিটানোর ব্যবস্থা : জনগণ তাদের মৌলিক প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যাতে পেতে পারেন তার ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব– এই নীতি অনুসরণ করে বিপুল পরিমাণ পণ্য মওজুদ, বণ্টন ও গুদামজাত করার এবং সর্বোপরি অর্থ সাহায্য করার মাধ্যমে যাতে সবসময় জনগণ ন্যায্যমূল্যে মৌলিক প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো পেতে পারেন তার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। প্রথমেই যেসব প্রধান প্রধান পণ্যকে এই ব্যবস্থার আওতায় আনা হবে তার মধ্যে থাকবে চাল, গম, লবণ, কেরোসিন, খাদ্য হিসাবে ব্যবহার্য তৈল ও মোটা সুতি কাপড়।

মনোপলি ও কার্টেল : মনোপলি ও কার্টেল প্রথা মূলত ন্যায় ও সাম্যনৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় দুশমন এবং সেজন্য অর্থনৈতিক কাঠামোগত যে পরিবর্তন উদ্ভাবন করা হয়েছে তা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে মনোপলি ও কার্টেল প্রথাকে সম্পূর্ণ নির্মূল করার নিশ্চয়তা দেবে।

বিলাসদ্রব্যের ওপর বিধিনিষেধ : দ্রুত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ত্যাগের সমান অংশীদারত্বের মূলনীতি অনুসরণে বিলাসদ্রব্য ব্যবহারের ওপর কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করতে হবে। কতিপয় ভাগ্যবানকে যথেষ্ট পরিমাণ বিলাসদ্রব্য ব্যবহারের প্রশ্রয় দিয়ে মেহনতি মানুষের প্রতি ত্যাগ স্বীকারের আহ্বান জানানো অন্যায়। বিলাসপণ্য ব্যবহার সীমাবদ্ধ করার জন্য যে সমস্ত বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে তাতে থাকবে :

(ক) বিলাসদ্রব্যের আমদানির ওপর পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা, (খ) দেশে বিলাসদ্রব্য উৎপাদনের ওপর কঠোর বিধিনিষেধ, (গ) জনগণের আশ্রয়স্থলের মৌলিক চাহিদা পূরণ না হওয়া পর্যন্ত বিলাসবহুল ও জাঁকালো দালান নির্মাণের ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা।

ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির চাপে গুরুত্বরূপে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের কেবলমাত্র অর্থ মঞ্জুরি নহে, প্রকৃত মজুরির মানরক্ষা ও বৃদ্ধির জন্যই উপরে বর্ণিত মূল্য স্থিতিশীলতার ব্যবস্থা প্রণয়ন করা হয়েছে।

শিক্ষা : অতীতে শিল্পোনয়নের জন্য গৃহীত নীতিগুলো সমাজের প্রয়োজন মেটানোর দিকে বড় একটা নজর দেয়নি। আমাদের সমাজের শিল্পোনয়নের মূল লক্ষ্য হবে :

(ক) উৎপাদনশীল সরঞ্জাম ও ভোগ্যপণ্যের মূল আবশ্যকতা পূরণার্থে একটি শৈল্পিক ভিত্তিস্থাপন। (খ) মৌলিক আবশ্যকীয় দ্রব্যের জন্য বৈদেশিক সূত্রের ওপর বিপজ্জনক নির্ভরশীলতা হ্রাস। (গ) কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।

উপরোক্ত লক্ষ্য অর্জনে আমাদের অতীতের নীতিগুলো শুধু ব্যর্থই হয়নি উপরন্তু বৈদেশিক মুদ্রা ও বৈদেশিক ঋণসহ দুষ্প্রাপ্য সম্পদগুলোর বিপুল অপচয় ঘটেছে। মৌলিক ও সামাজিক লক্ষ্য অর্জন ত্বরান্বিত করার জন্য পরিকল্পিত শিল্পায়নের নয়া বাস্তবায়ন কৌশলের রূপরেখা নিচে দেওয়া হলো :

ভারী ও বৃহদায়তন শিল্প কারখানা

রাষ্ট্রায়ত্ত খাত : ভারী ও বৃহদায়তন শিল্প কারখানার জাতীয়করণের ক্ষেত্রে উপরোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

অরাষ্ট্রায়ত্ত খাত : যেসব বৃহদায়তন শিল্প জাতীয়করণ করা হয়নি সেগুলো নিয়ন্ত্রণ ও পরিকল্পনা সংস্থাগুলো কর্তৃক আরোপিত শৃঙ্খলার অধীনে থাকবে।

ব্যবস্থাপনা ও ইকুইটি মূলধনে শ্রমিকদের অংশীদারত্ব : যে সমস্ত শিল্প কারখানা সত্বর জনগণের মালিকানাধীন আনা হবে না সরকার ক্রমবর্ধমান হারে তাদের ইকুইটি মূলধন দখল করবে। সরকার যেটুকু 'ইকুইটি' মূলধন আয়ত্ত করবে সংশ্লিষ্ট শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকরা যৌথভাবে সেই পরিমাণ অংশের মালিকানা লাভ করবে এবং সেই পরিমাণ অংশের মুনাফার ভাগ পাবে। শ্রমিকরা কেবল ইকুইটি মূলধনের নয় শিল্প কারখানার ব্যবস্থাপনায়ও অংশগ্রহণ করবে।

মাঝারি আয়তন শিল্প কারখানা : বেসরকারি খাতে মধ্যমায়তন শিল্প কারখানার উন্নতির জন্য সরকার উৎসাহ ও প্রয়োজনীয় প্রেরণা জোগাবে। অবশ্য এসব শিল্প কারখানা পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ সংস্থাগুলো কর্তৃক আরোপিত শৃঙ্খলার অধীন থাকবে।

ক্ষুদ্রায়তন ও কুটিরশিল্প : আমাদের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্রায়তন ও কুটিরশিল্পের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ক্ষুদ্রায়তন ও কুটিরশিল্পের উন্নয়নের জন্য সরকার উৎসাহ ও সাহায্য জোগাবে এবং নিয়মিত কাঁচামাল সরবরাহের নিশ্চয়তা বিধান করবে। উদাহরণস্বরূপ, তাঁতীরা ন্যায্যমূল্যে সুতা, প্রচুর পরিমাণে ঋণ ও বাজারের যাবতীয় সুবিধা পাবে। ক্ষুদ্রায়তন শিল্প কারখানা। প্রতিষ্ঠার কর্মসূচির ওপর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। বৃহদায়ন শিল্প কারখানার পরিপূরক হওয়ার মতো করে এসব ক্ষুদ্রায়তন শিল্প কারখানাকে উন্নত করা হবে। সমবায়ের মাধ্যমে এসব ক্ষুদ্রায়তন শিল্প কারখানাকে যতদূর সম্ভব উন্নীতি করা হবে।

কৃষি সমবায়ের মাধ্যমে চাল ও আটার কল, তেল কারখানা, চিনির কল ও অনুরূপ কৃষিজ পণ্যশিল্প যতদূর সম্ভব বেশি করে স্থাপন করা ও চালানো হবে। যাতে গ্রামাঞ্চলের দূর প্রান্তসহ দেশের সর্বত্র ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ছড়িয়ে পড়তে পারে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষ যাতে শিল্পায়নের সুযোগ-সুবিধায় শরিক হতে পারে এবং শহরগুলোর ওপর থেকে মানুষের ভিড় ও চাপ কমে যায় সেটাই এই ব্যবস্থার লক্ষ্য।

কৃষি ও গ্রামের জনগণ : আমাদের জনগণের অধিকাংশই গ্রামাঞ্চলের অধিবাসী। সেজন্য কৃষি ও গ্রামের মানুষের অবস্থা উন্নয়নের ওপর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া না হলে আমাদের জাতীয় অর্থনীতির বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনের সমস্ত পরিকল্পনাই অর্থহীন

হয়ে পড়বে। একদিকে আমাদের গোটা সমাজের সর্বত্র দারিদ্র্য ছড়িয়ে পড়ছে, অন্যদিকে গ্রাম ও শহরের জীবনযাত্রার মানের মধ্যে গুরুতর বৈষম্য রয়েছে। এর পেছনে ঐতিহাসিক কারণ থাকলেও নিকট অতীতে সরকারের বৈষম্যমূলক নীতির জন্য এই বৈষম্য আরো বেড়ে গেছে। ফলে গরিব চাষীর হাত থেকে সম্পদ ধনী পুঁজিপতিদের হাতে ব্যাপকভাবে পাচার হয়ে গেছে। আওয়ামী লীগ অবিলম্বে গ্রামাঞ্চলের জনগণকে এরূপ শোষণের হাত থেকে বাঁচানোর অঙ্গীকার করছে। আর এটা করতে হলে কৃষি খাতে সুদূরপ্রসারী বিপ্লবের প্রয়োজন এবং এ ধরনের বিপ্লব সাধনের পূর্বশর্ত হলো ভূমি ব্যবহারের বর্তমান পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন সাধন এবং বহুমুখী সমবায়ের মতো নয়া প্রতিষ্ঠান স্থাপন।

আমাদের গ্রামাঞ্চলের জনগণের আরো ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন রয়েছে। সেই সঙ্গে এটাও স্বীকার করতে হবে যে, অতীতের শোষণের ফলে সৃষ্ট অবস্থার প্রেক্ষিতে আমাদের কৃষিকে নতুন জীবন দিতে হলে সরকারকে পভূত পরিমাণে সার ও উন্নত বীজ থেকে শুরু করে নলকূপ, পাওয়ার পাম্প ও কীটনাশক ওষুধ ইত্যাদি সাহায্য দিতে হবে। আওয়ামী লীগ আমাদের কৃষিব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অঙ্গীকার করেছে।

জায়গিরদারি, জমিদারি ও সরকারি প্রথা বিলোপ এবং সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্ধারণ : জমির ব্যবহারিক পদ্ধতিতে যে সমস্ত পরিবর্তন সাধন করা হবে বলে স্থির করা হয়েছে তা হলো :

(ক) পশ্চিম পাকিস্তানে বিদ্যমান জায়গিরদারি, জমিদারি ও সরদারি প্রথার সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন। (খ) জমির প্রকৃত চাষীদের স্বার্থ ভূমি ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস। (গ) জমির সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্ধারণ ও নির্ধারিত পরিমাণের অতিরিক্ত জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিতরণ। স্থানীয় জনসাধারণের অবস্থা ও প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর আওয়ামী লীগ জমির এই সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্ধারণ করবে। (ঘ) সরকারি খাস জমি ভূমিহীন কৃষকদের কাছে বন্দোবস্ত দেওয়া হবে।

বহুমুখী কৃষি সমবায় : কৃষি বিপ্লবের আর একটি পূর্বশর্ত হলো, কৃষি ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ। জমি খণ্ড-বিখণ্ড ও উপ-বিভক্তির ফলে যেসব অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে তা দূর করা গেলেই এটা সম্ভব হবে। ভূমির একত্রীকরণের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। তবে সমবায়ের মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন চাষীর প্লটগুলোকে গ্রুপ করে তার যৌথ ব্যবহারের ব্যবস্থা দ্বারা আশু সমাধান করা যাবে। দেশের প্রতিটি অঞ্চলে বহুমুখী সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার জন্য বিরাট পরিকল্পনা নিয়ে তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এরকম সমবায় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কৃষি সেক্টরে বিপুল পরিমাণ সাহায্য দিয়ে সরকার এসব সমবায়ে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে। সেচ, পানি নিষ্কাশন, বাঁধ, গভীর নলকূপ, পাওয়ার পাম্প, উন্নত ধরনের বীজ, ঋণ, আধুনিক কৃষি পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষাদান প্রভৃতির আকারে এই সাহায্য দেওয়া হবে।

ভূমি রাজস্ব : আমাদের বর্তমান জনসাধারণের ওপর ভূমি রাজস্ব একটি বিরাট বোঝা। এর আশু সমাধান হিসেবে পাকিস্তানের সর্বোচ্চ ২৫ বিঘা। (৮ সমস্ত এক বাই তিন একর) পর্যন্ত জমির খাজনা ও বকেয়া মওকুফ করা হবে। আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো বর্তমান ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন। জমি রেকর্ডের ব্যবস্থা সহজ ও উন্নত ধরনের হবে।

পাট : প্রধান অর্থকরী ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী ফসল বলে পাটের ওপর বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন। পরগাছার মতো মধ্যবর্তী শ্রেণী, অসাধু ব্যবসায়ী এবং মিলের পাট ক্রেতাদের জন্যই পাটচাষীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া চাষীদের স্বার্থ বিকিয়ে পাট শিল্পপতিরা বিনিময় হারকে সুকৌশলে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে পাটচাষীদের ক্ষতি করে। অভ্যন্তরীণ বেচাকেনা ও রফতানিসহ সম্পূর্ণ পাট ব্যবসাকে জাতীয়করণ করা হবে। জাতীয়করণের মূল লক্ষ্য হলো পরগাছার মতো এসব দালালের উচ্ছেদ করে পাট উৎপাদনকারীদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যেতে না দেওয়া। এসব ব্যবস্থার দ্বারা বর্তমান মূল্যের চেয়ে উচ্চমূল্যে কাঁচা পাটের সর্বনিম্ন মূল্য নিশ্চিত করা যাবে। পাটের মান এবং একর প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং পাটের নতুন নতুন ব্যবহার উদ্ভাবন করার জন্য সরকার পাট গবেষণাকে খুব বেশি অগ্রাধিকার দেবে। অতীতে পাট গবেষণার প্রতি গুরুতর অবহেলা করা হয়েছে। বর্তমানে অচিন্তিত ও আংশিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি পাট ব্যবসা ও শিল্পের পক্ষে ক্ষতিকর হয়েছে। পাটের মান ও একরপ্রতি পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি, পাট উৎপাদনকারীদের সর্বদা সর্বোচ্চ মূল্য বেশি হয় সেই উদ্দেশ্যে একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

তুলা : তুলাও একটি অর্থকরী ফসল। এর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার জন্য পৃথক ব্যবস্থার প্রয়োজন। তুলা ব্যবসা জাতীয়করণ, তুলা ব্যবসার উন্নয়ন ও গবেষণার ওপর অত্যধিক জোর দেওয়ার মাধ্যমে আমাদের অর্থনীতিতে এই প্রধান অর্থকরী ফসলের অংশ আরো বাড়ানো হবে।

চা : আমাদের চাশিল্পের অবস্থা চরম অদক্ষতার নিদর্শন। প্রতি একরে আমাদের দেশে গড়ে ১২ মণ চা উৎপন্ন হয়। অথচ ঠিক একই রকম অবস্থায় অন্যান্য দেশে একরপ্রতি ৩৫ মণ চা উৎপাদিত হয়। বীজের মান উন্নত করার দিকে প্রায় কোনোরকম নজর দেওয়া হয়নি। কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং মৃত্তিকা পরীক্ষার মাধ্যমে একরপ্রতি উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি করা যেতে পারে। উৎপাদন লক্ষ্যে পৌঁছতে না পারলে ইজারা বাতিলসহ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। চা বোর্ডের ক্ষমতা কার্যকরভাবে প্রয়োগের জন্য চা সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান আছে এমন কর্মচারীদের চা বোর্ডে নিযুক্ত করতে হবে। চায়ের বাজারের বর্তমান গুরুতর স্থিতিহীন অবস্থার অবসান করা দরকার। বর্তমানে মার্কেটিং ইউনিটগুলো শৃঙ্খলার সাথে কাজ না করলে টি মার্কেটিং বোর্ড স্থাপন করতে হবে।

আখ ও তামাক : আখ ও তামাক এই দুটি ফসলের উৎপাদনী সম্ভাবনা প্রচুর। এদের মনে উন্নয়ন, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উৎপাদনকারীদের জন্য স্থিতিশীল ও উপযুক্ত

মূল্য নিশ্চিত করার জন্য স্বতন্ত্র বোর্ড প্রতিষ্ঠা করতে হবে। উন্নত মানের বীজ, সার এবং ঋণ হিসাবে প্রভূত পরিমাণে সরকারি সাহায্য দেওয়া হবে।

ফল চাষ ও আবাদ ও ফলের বাগান : বৃহদাকারে ফলের চাষ আমাদের অর্থনীতিকে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে। সমবায় পদ্ধতির মাধ্যমে ফল চাষ উন্নয়নের এবং আবাদের পরিকল্পনা করা হবে। এর ফলে বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ মান ও একরপ্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি ও বৃহদায়তন শিল্পের সুবিধা পাওয়া যাবে।

বন ও বনজ সম্পদ : নির্বিচারে বন এলাকা ধ্বংস করার ফলে এই মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ দিনের পর দিন নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। অতিসত্বর বন জরিপ ও বন সংরক্ষণে প্রণালী নির্ধারণ করতে হবে। নতুন নতুন বন সৃষ্টি করার পরিকল্পনা অবিলম্বে কার্যকর করতে হবে। নির্বিচারে বনজ সম্পদ আহরণের ফলে যে ক্ষতিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তা এড়াতে হলে এই সম্পদের সদ্ব্যবহারের জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

বন্যা নিয়ন্ত্রণ : পূর্ব পাকিস্তানের কৃষি ব্যবস্থা পুনর্নির্মাণের যে কোনো পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে বন্যানিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। কারণ প্রতি বছর বন্যায় আমাদের অপরিসীম ক্ষতি হয়। অর্থনৈতিক পুনর্বিন্যাসের জন্য বন্যানিয়ন্ত্রণ ও পানি ব্যবস্থার একটি ব্যাপক পরিকল্পনা আওয়ামী লীগের কর্মসূচির মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্ব লাভ করেছে। আওয়ামী লীগ সর্বদাই বন্যানিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। আওয়ামী লীগ অতি অল্পদিন ক্ষমতায় থাকাকালে "ক্রুগ মিশন"কে পরিকল্পনা, কি তার পরের কোনো পরিকল্পনা, কোনোটাই পরবর্তী কোনো সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়নি। এ সমস্যা বর্তমানে অত্যন্ত গুরুতর আকার ধারণ করেছে। বন্যানিয়ন্ত্রণের একটি ব্যাপক পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে আওয়ামী লীগ ওয়াদাবদ্ধ।

জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততা : পশ্চিম পাকিস্তানের কৃষিকে জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষার ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করা হবে। স্বল্পতম সময়ের মধ্যে জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততা আক্রান্ত জমি পুনরুদ্ধার করা হবে।

বিদ্যুৎ শক্তি : আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিদ্যুৎশক্তির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অত্যুক্তি করার অবকাশ নেই। অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করার কাজে বিদ্যুৎশক্তির ব্যবহারের গুরুত্ব অপরিসীম।

পল্লী অঞ্চলে ব্যাপক বিদ্যুতায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে বলে আওয়ামী লীগ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। কারণ এর ফলে কেবল আর্থিক লাভই হবে না অধিকন্তু এর সাহায্যে ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠান, নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও কৃষিব্যবস্থার আধুনিক পদ্ধতি শিক্ষাদানের মতো গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যও অর্জিত হবে এবং আমাদের গ্রামবাসীরা বিংশ শতাব্দীর একটা মৌলিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যও ভোগ করতে পারবে। পল্লী বৈদ্যুতিকরণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ট্রান্সমিশন ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নতি অবশ্যই করতে হবে। সর্বাধিক পরিমাণ বৈদ্যুতিকশক্তি উৎপাদনের উদ্দেশ্যে বৈদ্যুতিকশক্তি উৎপাদনের প্রত্যেকটি উৎসের

সদ্ব্যবহার করা হবে। পূর্ব পাকিস্তানকে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে ন্যূনপক্ষে ২৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনশক্তি ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। অনুরূপভাবে জনসাধারণের প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন ইউনিটের শক্তি উৎপান ক্ষমতাও বাড়ানো হবে। রূপপুর আণবিক শক্তিপ্রকল্প ও জামালগঞ্জ কয়লাখনি প্রকল্প অবিলম্বে বাস্তবায়িত করা হবে। প্রাকৃতিক গ্যাসের পুরোপুরি উন্নয়ন ও সদ্ব্যবহার করা হবে।

প্রাকৃতিক সম্পদ : বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পাকিস্তানের প্রাকৃতিক সম্পদের অনুসন্ধান এবং উন্নয়নের ব্যাপারে ক্ষমাহীন অবহেলা প্রদর্শন করা হয়েছে। এ ব্যাপারে কোনো প্রকার ব্যাপক পানি বা ভূ-তাত্ত্বিক জরিপও চালানো হয়নি। এ ধরনের জরিপের ফলে মূল্যবান খনিজ ও অন্যান্য সম্পদ পাওয়া যেতে পারে। কাজেই এসব প্রাকৃতিক সম্পদ কার্যকরভাবে ব্যবহারের কর্মসূচি প্রণয়নের জন্য অবিলম্বে এ ধরনের জরিপ কাজ আরম্ভ করা হবে।

নদী পরিচর্যা ও উন্নয়ন : পাকিস্তানের বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের অসংখ্য নদ-নদী এবং বিরাট প্রাকৃতিক সম্পদ; তবে অন্যান্য সম্পদের ন্যায় একমাত্র গবেষণা ও ব্যাপক পরিকল্পনার মাধ্যমে এই নদীসম্পদকে সমাজের প্রভূত কাজে লাগানো সম্ভব; কিন্তু এ ধরনের পরিকল্পনার অভাবে ভূমিক্ষয়ের মতো সমস্যাগুলো গুরুতর আকার ধারণ করেছে। এক্ষেত্রে যে ক্ষমাহীন অবহেলা দেখানো হয়েছে অবিলম্বে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট পানি সম্পর্কে মৌলিক গবেষণা এবং নদী ট্রেনিং স্কিম গ্রহণের মাধ্যমে এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ সমাজের প্রয়োজন মিটাবার কাজে লাগাবে।

মৎস্য সম্পদ : যে সমাজে ৭০ শতাংশ লোক প্রোটিন স্বল্পতায় ভোগে সে সমাজে মৎস্য সম্পদের অসীম গুরুত্ব বলে শেষ করা যায় না। কাজেই সামুদ্রিক মৎস্যসহ মৎস্য সম্পদের উন্নয়নের জন্য একটি ব্যাপক পরিকল্পনা অবশ্যই গ্রহণ করা হবে। এই সেক্টর থেকে কেবলমাত্র অতিরিক্ত বৈদেশিক মুদ্রাই আয় হবে তা নয়, এ আমাদের লাখ লাখ ক্ষুধার্ত মানুষের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রোটিনও জোগাবে। এই ব্যাপক পরিকল্পনার মাধ্যমে থাকবে মৎস্য উন্নয়ন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা, মৎস্য বন্দর উন্নয়ন, গভীর সমুদ্রে মৎস্য শিকার, নৌবরণ ও মোটরচালিত অভ্যন্তরীণ মৎস্য শিকার নৌবহরের উন্নতিবিধান, মাছ রাখার জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গুদাম ও বিতরণ ব্যবস্থা এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মৎস্য চাষ উন্নয়ন।

মৎস্য উন্নয়ন স্কিম গ্রহণের ব্যাপারে প্রকৃত জেলেদের দ্বারা পরিচালিত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলোকে সর্বপ্রকার উৎসাহ ও সাহায্য দেওয়া হবে।

গবাদি পশু হাঁস-মুরগি এবং ডেরিং ফার্মিং : গবাদিপশু উন্নয়ন এবং হাস-মুরগি এবং ডেরিং ফার্মিং-এর প্রতিও নিদারুণ অবহেলা করা হয়েছে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গবাদি-পশু, হাঁস-মুরগি ও ডেরিং-এর উন্নয়নকল্পে দেশের সকল অঞ্চলে ব্যাপক পরিকল্পনা গৃহীত হবে।

শ্রমিকদের অধিকার : আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থান ঘোষণা মোতাবেক শ্রমিকদের অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করা হবে। শ্রমিক ইউনিয়ন গঠনের অধিকার, যৌথ দর কষাকষির অধিকার এবং ধর্মঘটের অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করা হবে। শ্রমিকদের এ ধরনের অধিকার খর্ব করার উদ্দেশ্যে প্রণীত সমস্ত আইন বাতিল করা হবে।

সরকার যাতে শ্রমিকদের ন্যায্য স্বার্থ উন্নয়নে গঠনমূলক ও কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ এবং সেই সঙ্গে শিল্প উৎপাদন উন্নয়ন সুনিশ্চিত করার মাধ্যমে মৌলিক সামাজিক লক্ষ্য অর্জন করতে পারে সেজন্য সরকারের শ্রম সংক্রান্ত সমগ্র প্রশাসন যন্ত্রের পুনর্বিন্যাস করা হবে।

সরকার শ্রমিক ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা এবং শ্রমিকদের জন্য ট্রেনিং ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠাকে উৎসাহিত করবে এবং ট্রেনিং ইনস্টিটিউশনে শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পেও তাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য শিক্ষা দেওয়া হবে। শ্রমিকদের জীবন ধারণের উপযোগী মূল বেতন দেওয়া হবে এবং চাকরির নিশ্চয়তা বিধান করা হবে। একই কাজের জন্য পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে সবাই যাতে সমান বেতন পায় তার ব্যবস্থা করা হবে। শ্রমিকদের এবং তাদের পরিবারবর্গকে অবশ্যই নিম্নলিখিত মৌলিক সুবিধার নিশ্চয়তা দেওয়া হবে।

(১) বিনা ভাড়ায় বাসোপযোগী গৃহ, (২) বিনা খরচায় চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা, (৩) অসুস্থতার সময়ে পুরা বেতনে ছুটি, (৪) প্রত্যেক বছরের জন্য পুরো বেতন ও এক মাসের ছুটি, (৫) অক্ষমতা ও অবসর গ্রহণের ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা প্রদান, (৬) ন্যূনপক্ষে মাধ্যমিক স্কুল পর্যন্ত বিনা খরচে শ্রমিকদের ছেলেমেয়েদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা, (৭) মহিলা শ্রমিকদের বেলায় পুরো সুযোগ-সুবিধাসহ মেটারনিটি ছুটি।

উপরোক্ত অধিকার সুনিশ্চিত করা ছাড়াও ন্যায় ও সাম্যপরায়ণ সমাজ গঠনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনার সঙ্গে শ্রমিকরা ক্রমেই বেশি করে সংযুক্ত হয়ে উঠবে। এই একই সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য শ্রমিকরা যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করে তার মুনাফায় তাদের একটা অংশ পাওয়ার অধিকার থাকা উচিত। এতে উৎপাদন বৃদ্ধির অংশ শ্রমিকরাও পাবে।

সরকারি বা আধা-সরকারি সংস্থাগুলোর চাকরিরত শ্রমিকদের জীবন ধারণের উপযোগী বেতন, চাকরির নিরাপত্তা এবং অসুস্থতার ও অবসরকালীন সুবিধাসহ কল্যাণমূলক সুবিধার নিশ্চয়তা দিতে হবে।

কর্মসংস্থান : বেকারত্বই নিকৃষ্টতম সামাজিক অবিচার। প্রত্যেকটি নাগরিকের কর্মসংস্থানের চূড়ান্ত লক্ষ্য হাসিলের জন্য কর্মসংস্থানের সর্বাধিক সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা সমগ্র অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। আমাদের সমাজের বিপুল জনসম্পদকে কাজে লাগাবার জন্য জনশক্তির ব্যাপক পরিকল্পনা অত্যাবশ্যক। সর্বাধিক কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে যেসব মৌলিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে তার কয়েকটি হলো :

(১) সড়ক নির্মাণ, সেচ ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার কাজ, স্কুলভবন নির্মাণ ও এ ধরনের অন্যান্য কাজের জন্য পল্লী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন। (২) শিল্প ও কৃষিতে অধিক উৎপাদন পদ্ধতির প্রবর্তন। (৩) পল্লী এলাকায় কুটির শিল্পগুলোকে ব্যাপক সাহায্যদান।

শিক্ষা : আমাদের সমাজের মৌলিক প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিজেদের সামর্থ অনুযায়ী পাকিস্তানের প্রত্যেকটি নাগরিকের সর্বাধিক উন্নতি সম্ভব করে তোলাই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। এই প্রতিশ্রুতিকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য অনেক বেশি অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজন। মোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা চারভাগ এই খাতে নিয়োজিত করতে হবে।

এই অধিক বরাদ্দ থেকে গৃহাদি নির্মাণ বাবদ অপেক্ষাকৃত কম খরচ করে শিক্ষকদের বেতনের স্কেল বাড়ানোর জন্য বেশি অর্থ ব্যয় করতে হবে। শিক্ষাব্যবস্থায় আমাদের সকল শ্রেণীর জনসাধারণকে সমান সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে। বর্তমানে মিশনারি স্কুল, পাবলিক স্কুল, ক্যাডেট কলেজ ইত্যাদির মতো কতিপয় উন্নত ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্বল্পসংখ্যক সুবিধাভোগী ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা তেমন হবে না। সারাদেশে একই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার জন্য এসব বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে ক্রমান্বয়ে অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হবে।

নিরক্ষরতা দূরীকরণ : সমূলে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য সকল রকম ব্যবস্থা করা হবে। এই উদ্দেশ্যে নয়া কৌশল এবং প্রচলিত নিয়মবহির্ভূত পন্থা অবলম্বনের দরকার হবে। কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিরক্ষরদের শিক্ষাদানের জন্য জাতীয় সার্ভিস প্রোগ্রাম কাজে লাগানোর এ ধরনের একটি পন্থা নেয়া হবে।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা : সকলের জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। আগামী ৫ বছরের মধ্যে এই লক্ষ্যে পৌঁছা যাবে বলে আশা করা যায়। মাধ্যমিক শিক্ষা সকল শ্রেণীর জন্য নাগালের মধ্যে আনা হবে।

কারিগরি ও পেশাগত শিক্ষা : সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাকে সমাজের প্রয়োজনের ছাঁচে ঢালাই করা হবে এবং এ ধরনের প্রয়োজন সম্পর্কে সুষ্ঠু জরিপের পরই কারিগরি ও পেশাগত শিক্ষাদানের জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হবে। পলিটেকনিক ইনস্টিটিউশন সমস্ত দেশে ছড়িয়ে দেওয়া হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় : আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সর্বোচ্চ মান রক্ষা করা এবং মেধার ভিত্তিতে সকল শ্রেণীর জনসাধারণের জন্য শিক্ষার পথ খুলে দেওয়া হবে। মেধাবী ছেলেমেয়েদের পক্ষে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য দারিদ্র্য যেন বাধা হতে না পারে তার ব্যবস্থা করা হবে। সকল ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষার ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে দ্রুততার সাথে সমগ্র পাকিস্তানে মেডিকেল কলেজ ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়সহ অনেক নয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হবে,

বিশিষ্ট্য এবং শ্রদ্ধেয় শিক্ষাবিদদের মধ্য থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর নিয়োগ করা হবে এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন খর্বকারী সমস্ত আইন বাতিল করা হবে।

শিক্ষকতা পেশা : আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যাতে শিক্ষকতা পেশার প্রতি আকৃষ্ট হন সেই পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সবরকম চেষ্টা করা হবে। এজন্য কেবল তাদের বেতনের স্কেল বৃদ্ধি ও বৈষয়িক সুবিধা দিলেই চলবে না– সঙ্গে সঙ্গে কাজ করার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি এবং শিক্ষকদের ন্যায় মর্যাদা ও সম্মান দিতে হবে।

স্বাস্থ্য : সমস্ত সমাজে একটি ব্যাপক স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থা চালু করাই আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য অবিলম্বেই প্রত্যেক ইউনিয়নে একটি করে মেডিকেল কেন্দ্র এবং প্রত্যেক থানা কেন্দ্রে একটি করে হাসপাতাল স্থাপন করা হবে। এ ধরনের মেডিকেল কেন্দ্র ও হাসপাতালের জরুরি ওষুধপত্র পাওয়া যাবে। প্রত্যেকটি নাগরিকের জন্য অধিকসংখ্যক ট্রেনিংপ্রাপ্ত ডাক্তার ছাড়াও মেডিকেল ট্রেনিংপ্রাপ্ত কর্মচারীর প্রয়োজন হবে।

স্বাস্থ্যব্যবস্থা এবং বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য একটি ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। আগামী ৫ বছরের মধ্যে কমপক্ষে প্রত্যেক গ্রামে পর্যাপ্তসংখ্যক নলকূপ স্থাপনের লক্ষ্য থাকবে। বসন্ত, যক্ষ্মা এবং কলেরার ন্যায় প্রতিরোধযোগ্য রোগের টিকা এবং ইনজেকশন দানকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

পরিবহন ও যোগাযোগ : পরিবহন ও যোগাযোগ অর্থনীতির অন্যতম কাঠামো হওয়ায় এর ওপর নজর দেওয়া জরুরি প্রয়োজন রয়েছে। বর্তমান অবস্থার উন্নতি বিধানকল্পে নিম্নলিখিত নির্দিষ্ট লক্ষ্য গ্রহণ করা হবে।

সড়ক

(ক) পূর্ব পাকিস্তান ও পাঞ্জাবের অপেক্ষাকৃত কম উন্নত এলাকা, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং বেলুচিস্তানের পাকা সড়কের ব্যাপক সম্প্রসারণসহ শহর এবং বাজার কেন্দ্রগুলোর সঙ্গে গ্রামাঞ্চলের যোগাযোগ স্থাপনের জন্য বড় রাস্তার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনকারী বহু ছোট রাস্তা নির্মাণ। (খ) ঢাকার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের সমস্ত শহরের যোগাযোগ সাধন করে ঢাকা-দিনাজপুর হাইওয়ে নির্মাণ। (গ) ঢাকা-চট্টগ্রাম হাইওয়ের প্রশস্তকরণ।

সেতু ও সুড়ঙ্গ পথ

(ক) উত্তরবঙ্গের সাথে স্থলপথে প্রদেশের অন্যান্য স্থানের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের জন্য যমুনার ওপর সেতু নির্মাণকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। (খ) পাঞ্জাবের ডুরিয়াখান এবং ডেরাগাজিখানের নিকট সিন্ধু নদীতে এবং সিন্ধুতে সিন্ধু নদীর গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোয়, কর্ণফুলী, বুড়িগঙ্গা এবং শীতলক্ষ্যা নদীর ওপরে সেতু নির্মাণ করা হবে। (গ) যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি বিধানকল্পে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং বেলুচিস্তানের সুড়ঙ্গ পথ নির্মাণ করতে হবে।

রেলওয়ে

রেলওয়ের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন স্কিমে পাকিস্তানের সকল রেলওয়েতে নিম্নশ্রেণীতে ভ্রমণকারী যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির ওপর জোর দেওয়া হবে।

বন্দর

সামুদ্রিক এবং অভ্যন্তরীণ নদী-বন্দর– উভয় প্রকারের বন্দরের উন্নয়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। বেলুচিস্তানের বন্দরগুলোর উন্নতি বিধান করা হবে। করাচি বন্দরের বর্তমান সুযোগ-সুবিধার উন্নতি বিধান করা হবে। চট্টগ্রাম বন্দরের ক্ষমতা দ্বিগুণ করা হবে এবং চালনা বন্দরের ক্ষমতা যথেষ্ট বাড়ানো হবে।

বাসস্থান

আশ্রয় মানুষের জীবনের একটি মৌলিক প্রয়োজন। নিম্ন আয়ের লোক এবং পল্লীবাসীদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শ্রমিকদের জন্য মালিকদের দ্বারা বাসস্থানের ব্যবস্থার স্কিম ছাড়াও সরকার বাসস্থান উন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে :

(ক) শহরগুলোতে নিম্ন আয়ের লোকদের জন্য আবাসিক ইউনিট নির্মাণ। (খ) পল্লী এলাকায় বাসস্থান নির্মাণের জন্য পল্লী উন্নয়ন পরিকল্পনার সদ্ব্যবহার এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পল্লী এলাকায় গৃহ নির্মাণের নয়া মডেল প্রবর্তন।

নারী সমাজ

আমাদের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। প্রধানত শিক্ষার অভাবে তারা সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালনে সমর্থ হচ্ছে না। জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাদের সমান সুবিধা ভোগের সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদের জন্য শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো হবে। নারী সমাজকে পূর্ণ নাগরিক অধিকারের গ্যারান্টি দেওয়া হবে। সমান কাজের জন্য তাদের সমান বেতন দেওয়া হবে। মেধার ভিত্তিতে তাদের জন্য সকল সরকারি চাকরির দ্বার মুক্ত থাকবে।

যুবসমাজ

কর্মক্ষমতা পরিপূর্ণ এবং আদর্শবাদী অনুপ্রেরণায় উদ্দীপ্ত আমাদের যুবসমাজ জাতির একটি বিরাট সম্পদ। তাদের আদর্শবাদী অনুপ্রেরণা এবং কর্মক্ষমতাকে জাতিগঠনমূলক কাজের অভিসারী না করতে পারলে জাতীয় জীবনে চরম হতাশার সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং জাতিগঠনমূলক কার্যসূচির সঙ্গে দেশের যুবসমাজকে জড়িত করার অত্যন্ত জরুরি প্রয়োজন রয়েছে। উদাহরণ হিসাবে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা গঠন এবং সমবায় স্কিমের কথা বলা যেতে পারে। কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নিয়ে একটি সার্ভিস কোর গঠন করে গ্রাম, কলকারখানা এবং শহরের বস্তি অঞ্চলে এ ধরনের সেবার জন্য এদের প্রতি আহ্বান জানানো যেতে পারে।

ভাষা ও সংস্কৃতি

পাকিস্তানের দুটি রাষ্ট্রভাষা বাংলা ও উর্দু যাতে জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইংরেজির স্থলাভিষিক্ত হতে পারে তার জন্য আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পাকিস্তানের সকল এলাকায় ভাষা এবং সাহিত্যের উন্নয়নকে উৎসাহিত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হবে।

মোহাজের

মোহাজেরদের স্থায়ী বসতি এবং অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তারা যাতে অন্যান্য নাগরিকের সাথে সকল ব্যাপারে নিজেদের সমান বলে অনুভব করতে পারে এবং অন্য সকল নাগরিকের সঙ্গে সকল ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে তাদের ক্রমান্বয়ে স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে একীভূত করে নিঃশেষে মিলিয়ে দেওয়াই হলো আমাদের লক্ষ্য। যথা শিগগিরই সম্ভব পুনর্বাসনের ব্যাপারগুলো চূড়ান্ত করা হবে।

উপজাতীয় এলাকা

দেশের অন্যান্য নাগরিকের সঙ্গে সকল ব্যাপারে উপজাতীয় এলাকার জনসাধারণ যাতে সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারে সে উদ্দেশ্যে উপজাতীয় এলাকাগুলোকে দেশের বাকি অংশের সঙ্গে সম-উন্নয়ন পর্যায়ে আনার জন্য সবরকম প্রচেষ্টা চালানো হবে।

বৈদেশিকনীতি

আমাদের রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব এবং জাতীয় স্বাধীনতা সংরক্ষণের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বের ভিত্তিতেই আমাদের বহিঃসীমান্তের নিরাপত্তা রক্ষার প্রশ্নই নয়, আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ প্রতিরোধের প্রশ্নও জড়িত রয়েছে।

স্বাধীন জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি

আমাদের জনসাধরণের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং রাষ্ট্রের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা একটি স্বাধীন জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির জন্য ওয়াদাবদ্ধ। স্বীকার করতে হবে যে, এতদিন যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা অনুসৃত হয়েছে তার সঙ্গে একটি স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতির প্রতিশ্রুতি সমাঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সাবেক নীতির ফলে বৈদেশিক সাহায্য এবং ঋণের ওপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ঋণ ও দেনার বোঝা বেড়ে গেছে। বিদেশের ওপর এ ধরনের নির্ভরশীলতা অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে আপোষমূলক নীতিগ্রহণে মারাত্মকভাবে বাধ্য করে। ফলে জাতীয় স্বাধীনতাই বিপন্ন হয়ে পড়ে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও বৈদেশিক সাহায্যের ক্ষেত্রে নয়া কলা-কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে এই পরস্পরবিরোধী নীতির অবসান ঘটানোই আমাদের লক্ষ্য। এর ফলে আমরা সত্যিকার স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণে সক্ষম হবো।

শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান

'সকলের প্রতি বন্ধুত্ব এবং কারও প্রতি বিদ্বেষ নয়'— এই নীতির অনুসরণের ন্যায় এবং পরস্পরের সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধার ভিত্তিতে আমরা আমাদের প্রতিবেশীদের প্রতিসহ সকল দেশের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানে আগ্রহী, এই উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার জন্য বিশ্বে বর্তমানে যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চলছে তার প্রতি আকৃষ্ট হব না এবং আকৃষ্ট হবার মনোবৃত্তিও আমদের নাই।

বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান

শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের লক্ষ্য অনুযায়ী আমরা সকল বিরোধের শান্তিপূর্ণ এবং ন্যায়সঙ্গত মীমাংসার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দেব।

কাশ্মীর

জাতিসংঘের প্রস্তাবের ভিত্তিতে কাশ্মীর বিরোধটির মীমাংসার ওপর আমরা সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছি। মৌলিক আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার আদায়ের জন্য জম্মু ও কাশ্মীরের জনসাধারণের জন্য ন্যায় সংগ্রামের প্রতি আমাদের সমর্থন অব্যাহত থাকবে।

ফারাক্কা বাঁধ

পূর্বেকার সরকারগুলোর ক্ষমাহীন অবহেলার ফলেই ফারাক্কা বাঁধ বাস্তবে রূপ লাভ করতে সক্ষম হয়েছে এবং পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতির প্রতি মারাত্মক ও স্থায়ী ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ সমস্যার ন্যায়সঙ্গত সমাধানের জন্য অবিলম্বে পররাষ্ট্রনীতির সকল হাতিয়ারকে কাজে লাগাতে হবে।

সিয়াটো, সেন্টো ও অন্যান্য সামরিক চুক্তি ত্যাগ

সিয়াটো, সেন্টো ও অন্যান্য সামরিক চুক্তিতে চির-আবদ্ধ হয়ে থাকাকে আমরা আমাদের জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী বলে বিশ্বাস করি এবং এ কারণেই আমরা সিয়াটো, সেন্টো এবং অন্যান্য সামরিক চুক্তি থেকে অবিলম্বে পাকিস্তানের বেরিয়ে আসার পক্ষপাতী।

জাতিসংঘ সনদ ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা

আমরা জাতিসংঘ সনদে সন্নিবিষ্ট নীতিগুলো বিশেষ করে মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এবং সকল রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও সাম্যের ব্যাপারে আমাদের শর্তহীন সমর্থনের কথা ঘোষণা করছি। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আমরা আন্তর্জাতিক সংস্থার সকল কার্যক্রমের প্রতি সমর্থন জানাব।

সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ এবং বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

আমরা সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ এবং বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের সংগ্রামের প্রতি আমাদের পূর্ণ সমর্থন ঘোষণা করছি।

৩ জানুয়ারি ১৯৭১ রেসকোর্স ময়দানে মুজিবের ভাষণ

[৩ জানুয়ারি, ১৯৭১ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে আনুমানিক ২০ লাখ লোকের এক সমাবেশ জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে নবনির্বাচিত আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যগণ জনগণের সামনে শপথ গ্রহণ করেন। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রতীক নৌকার আকৃতিবিশিষ্ট প্রায় ১২ ফুট উঁচু ও ১২০ ফুট দীর্ঘ মঞ্চে সভার প্রারম্ভে ৬ দফা ও ১১ দফার প্রতীক হিসাবে বঙ্গবন্ধু ৬টি ও ১১টি কবুতর উড়িয়ে দেন। ঢাকায় এ যাবৎকালের বৃহত্তম জনসমাবেশে ১৫১ জন এমএন ও ২৬৭ জন এমপিএকে শপথবাক্য পাঠ করবার পর বঙ্গবন্ধু বিবিধ প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ৫০ মিনিটের একটি নীতিনির্ধারণী ভাষণ দেন। নিচে সে ভাষণের অংশ উদ্ধৃত হলো।]

শুরু করার আগে আমি ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৬-এর ৭ জুনের আন্দোলন এবং ১৯৬৮-৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের সকল শহীদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। আমি আমার সব এমএনএ এবং এমপিএসহ প্রতিজ্ঞা করছি, এসব শহীদের রক্ত বৃথা যাবে না। গত ৭ জুনের পর আপনাদের সামনে রেসকোর্সে এই প্রথম উপস্থিত হয়েছি। নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে এবং বাংলাদেশের জনগণ এই নির্বাচন জয়ের মাধ্যমে তাদের সংগ্রামের প্রথম পর্যায় অতিক্রম করেছে।

আমরা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। শুধু বাংলারই নয়। আমরা সারা পাকিস্তানেরই 'মেজরিটি'। আমরা যে শাসনতন্ত্র রচনা করবো, সেটাই জনগণ গ্রহণ করবে এবং তা বাঞ্চালের অধিকার কারো নেই। মরহুম নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দী বলেছেন, শাসনতন্ত্রের প্রশ্নে জনগণের রায়ই শেষ কথা। আর সে রায় আমরা পেয়েছি। যদি কেউ এ রায়ের বিরোধিতা করে তবে রক্তক্ষয় হবে এবং যে অভ্যুত্থান ঘটবে তা কেউ রোধ করতে পারবে না।

পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র ৬ দফার ভিত্তিতে প্রণীত হবে এবং তাতে ১১ দফার প্রতিফলন থাকবে— কেউ তা রোধ করতে পারবে না। ৬ দফা ও ১১ দফা এখন আর আওয়ামী লীগের সম্পত্তি নয়, বাংলার জনগণ গত নির্বাচনে ৬ দফার পক্ষে রায় দিয়েছেন। ৬ দফা পরিবর্তন আর পরিবর্ধনের কোন ক্ষমতা বা অধিকার এখন আর আওয়ামী লীগ বা আমার নেই।

কিন্তু সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ বলে আমরা পশ্চিম পাকিস্তানের সহযোগিতা নেব না এ ধরনের কথা আমরা বলি না। আমরা অবশ্যই তাদের সহযোগিতা কামনা করি। কিন্তু একটি কথা আমি পরিষ্কার ভাষায় বলে দিতে চাই— নীতির প্রশ্নে কোনো আপোষ নাই।

আমরা দেশের একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবো, কারণ আমরা এই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের প্রতিনিধি। এই প্রক্রিয়ায় যারা বাধা সৃষ্টি করবে তাদের নির্মূল করা হবে।

অতীতে আমাদের হিন্দুদের এজেন্ট হিসাবে আখ্যা দেয়া হয়েছিল এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের মর্যাদা দেয়া হয়। কারণ আমরা বাঙালি। এ দেশের প্রতি আমাদের আনুগত্যের ব্যাপারে প্রশ্ন তোলা হয়। আমরা অনেক অন্যায় সহ্য করেছি। অন্যায়ের শিকার কীভাবে হয় তা আমরা জানি। তাই আমরা পশ্চিম পাকিস্তানিদের প্রতি ন্যায়বিচার করব। যদিও আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, আমরা করাচিকে পাকিস্তানের রাজধানী করতে দিয়েছি। পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানিদের জন্য প্রথম জাতীয় পরিষদের ৬টি আসন ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু প্রতিদানে আমরা কি পেলাম? অবিচার।

কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরিতে তোমরা ৮৫ জন, আমরা ১৫ জন। সামরিক বিভাগে তোমরা ৯০ জন, আমাদের দিয়েছো ১০ জন। বৈদেশিক সাহায্যের তোমরা খরচ করছ ৮০ ভাগ, আমাদের দিয়েছো ২০ ভাগ। মহাপ্রলয়ে দক্ষিণ বাংলার ১০ লাখ লোক মারা গেল। লাখ লাখ লোক অসহায় অবস্থায় রইলো। রিলিফ কাজের জন্য বিদেশ থেকে হেলিকপ্টার এসে কাজ করে গেল— অথচ ঢাকায় একখানা মাত্র সামরিক বাহিনীর হেলিকপ্টার ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আর কোনো হেলিকপ্টার এলো না। আমরা এসব বে-ইনসাফির অবসান করব।

বাংলার গরিব আর পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশের গরিবের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আমাদের সংগ্রাম পশ্চিম পাকিস্তানের দুঃখী মানুষের বিরুদ্ধে নয়, বরং যেসব শোষকের কারণে বাংলার মানুষ গৃহহারা হয়েছে, বাস্তুহারা হয়েছে, সর্বস্বান্ত হয়েছে তাদের বিরুদ্ধেই আমাদের সংগ্রাম। এসব শোষকের সাথে কোনো আপোষ নেই।

আওয়ামী লীগ সরকার যদি গঠন হয় তবে দেশে সমাজতান্ত্রিক-অর্থনীতি গ্রহণ করা হবে। ধনীকে আরও ধনী এবং গরিবকে আর গরিব হতে দেয়া হবে না।

আমি পুনর্ব্যক্ত করছি, যে যাই বলুক না কেন, ব্যাংক, বীমা ও পাট ব্যবসা জাতীয়করণ করা হবে। শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং কলকারখানার শেয়ার শ্রমিকদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। ২৩ বছর দেশের গরিব জনগণকে কায়েমি স্বার্থান্বেষী মহল শোষণ করেছে। আওয়ামী লীগ এই শোষণের শেষ দেখতে চায়। শুধু কয়েক মাস সময় আছে, লুটপাট যা করার করে নেন। এরপর আর সময় পাবেন না।

আমার দল ক্ষমতায় যাওয়ার সাথে সাথেই ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করে দিবে। আর ১০ বছর পর বাংলাদেশের কাউকেই জমির খাজনা দিতে হবে না। পশ্চিম পাকিস্তানের বেলায়ও একই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে। আইয়ুবী আমলে বাস্তুহারা হয়েছে বাংলার মানুষ। সরকারের খাস জমিগুলো বণ্টন করা হয়েছে ভুড়িওয়ালাদের কাছে। তদন্ত করে এদের কাছ থেকে খাস জমি কেড়ে নিয়ে তা বণ্টন

করা হবে বাস্তুহারাদের মধ্যে। ভবিষ্যতেও সকল খাস জমি বাস্তুহারাদের মধ্যে বণ্টন করা হবে এবং চর এলাকাও বাস্তুহারাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে। আমি কৃষক এবং শ্রমিকদের কথা দিচ্ছি, আওয়ামী লীগ তাদের আদর্শের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, কারণ আমি বিশ্বাস করি আওয়ামী লীগের মাথা কেনার মতো ক্ষমতা পুঁজিপতিদের নেই। এরা কেউ এমনকি আমি নিজেও যদি বিশ্বাসঘাতকতা করি তবে আমাদের জীবন্ত কবর দেবেন।

এ বছর প্রদেশের ১৭ লাখ টন খাদ্যশস্যের ঘাটতি ছিল। আমরা আর খাদ্য আমদানির ওপর নির্ভরশীল হতে পারি না। সেচব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে শীতকালীন শস্য চাষের ব্যবস্থা করতে হবে।

গত ২০ বছর ধরে শুনে এসেছি নেই, টাকা নেই। এবার আমি দেখিয়ে দেব বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য টাকা পাওয়া যায় কিনা।

পূর্ব পাকিস্তানের উপকূল এলাকার মানুষদের ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক বানের কবল থেকে রক্ষা করার জন্য '৬২ সাল থেকে শুধু পরিকল্পনার কথাই শুনে আসছি। সাম্প্রতিক মহাপ্লাবনে যেসব এলাকায় বাঁধ ছিল সেখানে লোক ক্ষয় কম হয়েছে আর বাঁধহীন এলাকাগুলোয় জনমানবের চিহ্ন নেই বললেই চলে। মনপুরা দ্বীপ যা বাঁধের আওতায় নাই সেখানে ২৬ হাজার জনসাধারণের মধ্যে মাত্র ৬ হাজার লোক এ বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেয়েছে। '৬২ সাল থেকে সাইক্লোনের হাত থেকে এদের বাঁচানোর জন্য যে টাকা এসেছে তার হিসাব দিতে হবে এবং অবিলম্বে উপদ্রুত এলাকায় দ্রুত পুনর্বাসনের ব্যাপক কর্মসূচি নিতে হবে।

জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে আমরাই চতুর্থ পাঁচশালা পরিকল্পনা তৈরি করব। বর্তমান সরকারের কোনো অধিকার নেই এটা তৈরি করার। আপনাদের চতুর্থ পাঁচশালা পরিকল্পনা বাক্স বন্ধ করে রাখুন। চতুর্থ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের আগে তৃতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনায় পূর্ব পাকিস্তানের প্রাপ্য ১১০০ কোটি টাকা ব্যয় হতে হবে। বাংলাদেশের স্বল্প আয়ের কর্মচারী, ছাত্র এবং শিক্ষকদের প্রয়োজন অনুসারে চতুর্থ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

আমরা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাসী। আওয়ামী লীগ সরকার প্রতিবেশী ভারত, চীন, রাশিয়া, ইরান, আফগানিস্তান, তুরস্ক, সিংহল ও বর্মাসহ সকল দেশের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখবে, কারো সাথে শত্রুতা নয়। কোনো বিরোধ দেখা দিলে শান্তিপূর্ণভাবে তার সমাধান করা হবে। আমরা কাশ্মীর এবং ফারাক্কা সমস্যা শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান করতে চাই। অধিকৃত আরব এলাকা পুনরুদ্ধারের জন্য পাকিস্তানি জনগণ সবসময়ই আরবদের সাহায্য করে যাবে।

আমি বৃহৎ শক্তিবর্গের প্রতি অস্ত্র প্রতিযোগিতা হ্রাস করে সে অর্থ দিয়ে দরিদ্র দেশের সাহায্যে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি। বর্তমানে অস্ত্র প্রতিযোগিতায় ব্যয় করা বিপুল অর্থের এক-দশমাংশও যদি জনগণের জন্য খরচ করা হয় তবে পৃথিবী থেকে

দারিদ্র্য মুছে যাবে এবং তাতে বৃহৎ শক্তিবর্গের মর্যাদাই বৃদ্ধি পাবে। অস্ত্রের মাধ্যমে বিজয়ের দিন অতীত হয়ে গেছে। বর্তমানে শুধু ভালোবাসার মাধ্যমেই অপরকে জয় করা যেতে পারে।

আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে ধন্যবাদ দেব এ জন্য যে, নির্বাচন অনুষ্ঠান করে তিনি ওয়াদা রক্ষা করেছেন। তবে তাঁর কর্মচারীদের একাংশ আজও নির্বাচনের ফলাফল বাঞ্চালের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। এরা সম্প্রতি ঢাকায় একটি গোপন সভায় মিলিত হয়েছে। নির্বাচন ফলাফল বাঞ্চালের ষড়যন্ত্র থেকে এসব কর্মচারীকে বিরত রাখার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। আইয়ুব আমলের এক যুগে পদস্থ সরকারি কর্মচারীদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমি এদের হুঁশিয়ার করে দিতে চাই, জনগণের কর্তা হবার আশা ত্যাগ করুন, জনতার সারিতে নেমে জনগণের খাদেম হোন। না হয় ইয়াহিয়া সাহেব তো ৩০৩ করেছেন, আমরা শুধু জনতাকে বলে দেব—'ভালো লোক নয়, বের করো বাড়ি থেকে'। আমি সবার হাতে লাঠি দেখতে চাই। সবাই লাঠি তৈরি রাখুন। আমি হুকুম করলেই লাঠি ব্যবহার করে তাদের শায়েস্তা করবেন। প্রয়োজন হলে এদের কামান-বন্দুককেও লাঠি হাতে বাংলার মানুষ রুখবে।

ষড়যন্ত্র এখনো শেষ হয়নি। নির্বাচন শেষ না হতেই খুন করা হয়েছে আমার এক সহকর্মীকে। যে যুবক বাংলার জন্য ত্যাগ স্বীকার করেছিল, জেল খেটেছিল সেই আহমদ রফিককে আমি মনোনয়ন দিয়েছিলাম প্রাদেশিক পরিষদে। তাকে চোরের মতো তার বাড়ির সামনে ১৩টি ঘায়ে হত্যা করা হয়েছে। তাদের মনে রাখা উচিত, চুরি করে বিপ্লব করা যায় না। খুলনায় আমার ছোট ভাই সংগ্রামী কর্মী মমতাজকে ডেকে নিয়ে খুন করা হয়েছে। যে কোনো ষড়যন্ত্র বাঙালিরা প্রতিহত করবে। প্রয়োজন হলে বাঁশের আর সুন্দরির লাঠি নিয়ে এসব সন্ত্রাসবাদী তৎপরতাকে নস্যাৎ করে দেবে। অবশ্য আমার নির্দেশের আগে কিছু করতে যাবেন না। আপনারা এমন কিছু করবেন না যাতে শান্তি বিঘ্নিত হয়। বর্তমানে শান্তি রক্ষা করাই গুরুত্বপূর্ণ, আর তাই আমরা আমাদের কর্মী হত্যাও সহ্য করে আছি।

নির্বাচনের পরদিন থেকেই নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম হু হু করে বাড়তে শুরু করেছে। এটাও এক ধরনের ষড়যন্ত্র। কারা এসব করেছে? তারা কি সেসব ভুড়িমোটা পুঁজিপতি নয়, যারা এখনই দাম বাড়িয়ে পরিস্থিতি ঘোলাটে করে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে জনতাকে ক্ষেপিয়ে দেয়ার শেষ চেষ্টা করছে? তারা এখনো লোভের মধ্যে রয়েছে, আমি তাদের হুঁশিয়ার করে দিতে চাই, অনেক খেয়েছেন, এবার মুখ বন্ধ করুন, নচেৎ জিহ্বা কাটা যাবার সম্ভাবনা আছে। এসব পুঁজিপতিরাই যে নির্বাচনের সময় ইসলাম রক্ষার নামে, সংহতির নামে আওয়ামী লীগকে কোনো না কোনো উপায়ে পরাস্ত করার জন্য পূর্ব বাংলায় টাকা ঢেলেছেন— তা আমাদের জানা আছে। একশ্রেণীর লোক নির্বাচনের সময় 'ইসলাম গেল, ইসলাম গেল' বলে চিৎকার করেছেন। নির্বাচনে জয়ের ফন্দি খুঁজেছেন পিডিপি করে, ইসলাম ফ্রন্ট করে, আরো কত কিছু করে। অথচ

নির্বাচনের পর কি কেউ নামাজ পড়তে নিষেধ করেছে, রোজা রাখতে নিষেধ করেছে? যদি না করে থাকে তাহলে এসব অপপ্রচারের জন্য কি তাদের 'কোড়া' মারা উচিত নয়?

এ দেশে ইসলাম, মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান—সবই থাকবে এবং বাংলাদেশও থাকবে। হিন্দু ও বৌদ্ধদের ওপর গত এক দশকে যে অত্যাচার হয়েছে তারও অবসান হবে। মহিলাদের সমান অধিকার প্রদান করা হবে এবং তারা আর দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক থাকবে না। ২৩ বছর পর এ দেশে কোনো মোহাজের নেই। সবাই এখন বাঙালি। মোহাজেরদের আমি বাংলার মাটির সাথে মিলে যাবার আহ্বান জানাই। এখনো যেসব মোহাজের পুনর্বাসিত হননি, তাদের সবারই পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে।

যেসব রাজবন্দি বিনা বিচারে এবং যেসব রাজনৈতিক ও ছাত্রনেতা ও কর্মী বিভিন্ন মেয়াদে কারাগারে রয়েছেন, অবিলম্বে তাদের ছেড়ে দিন এবং রাজনৈতিক ও ছাত্রকর্মী ও নেতাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মামলা ও গ্রেপ্তারি পরোয়ানা রয়েছে এর সবই প্রত্যাহার করুন। নতুবা আমরা কয়েক মাস পরেই ক্ষমতায় যাচ্ছি, তখন সবকিছু করব।

প্রধানমন্ত্রী হবার কোনো ইচ্ছা আমার নেই। প্রধানমন্ত্রী আসে এবং যায়। কিন্তু যে ভালোবাসা ও সম্মান দেশবাসী আমাকে দিয়েছেন, তা আমি সারাজীবন মনে রাখবো। অত্যাচার, নিপীড়ন এবং কারাগারে নির্জন প্রকোষ্ঠকেও আমি ভয় করি না। কিন্তু জনগণের ভালোবাসা যেন আমাকে দুর্বল করে ফেলেছে।

[সূত্র : পূর্বদেশ, সংগ্রাম ও দৈনিক পাকিস্তান, ৪ জানুয়ারি, ১৯৭১]

অসহযোগ আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনামা

মার্চ ১৯৭১। প্রতিদিনই উত্তেজনা। দেশের অবস্থা থমথমে। সারা বাংলাদেশে এক অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের পর সরকারি-বেসরকারি সকল ভবন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়। হঠাৎ করে বিদেশী নাগরিকরা বাংলাদেশ থেকে সরে যেতে থাকে। জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল এবং অন্য রাষ্ট্রগুলো তাদের লোকজনদের সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থায় ব্যতিব্যস্ত। মওলানা ভাসানী ৮ মার্চ পল্টন ময়দানে এক জনসভায় বাংলার মানুষকে অনুরোধ জানান, তারা যেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কথায় কাজ করে যায়। বাংলার ছাত্রসমাজ স্বাধীনতাযুদ্ধে বিরাট ভূমিকা রাখে। যাদের নেতৃত্বে ছাত্রসমাজ বজ্রকঠিন শপথ নিয়ে রণক্ষেত্রে যোগ দিয়েছিল। তাদের কথা ইতিহাসের পাতায় আজীবন লেখা থাকবে। তারা হলেন– আসম আবদুর রব, আব্দুল কুদ্দুস মাখন, নূরে আলম সিদ্দিকী ও শাহজাহান সিরাজ।

বঙ্গবন্ধু বেতার কেন্দ্র থেকে বিবৃতি দেন ১১ মার্চ। তিনি জোরালো কণ্ঠে বলেন, 'কোনো রকম হুমকির সামনে বাংলাদেশের মানুষ মাথা নত করবে না।' অপর এক বিবৃতিতে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, 'যতদিন না বাংলাদেশের মানুষ তাদের স্বাধিকার অর্জন করছেন, ততদিন পর্যন্ত তাদের আন্দোলন চলবে।'

১৪ মার্চ বঙ্গবন্ধু ৩৫টি নির্দেশ জারি করেন। এক অর্থে বলা যায় এই ৩৫টি নির্দেশ করে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের প্রশাসনের ভার গ্রহণ করেন।

এক কথায় বলা যায়, পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ শাসনভার তিনি স্বহস্তে গ্রহণ করলেন। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশাবলী যখন সংবাদপত্রে দেওয়া হয়, তখন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঢাকার পথে। সকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ঘোষণা প্রচার হলো। বিকেলে ইয়াহিয়া এলো। কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার মাধ্যমে ঢাকা বিমানবন্দর থেকে তাকে প্রেসিডেন্ট ভবনে আনা হয়।

১৫ মার্চ সংবাদপত্রে প্রকাশিত ৩৫টি নির্দেশবলী কার্যকর হওয়ার সাথে সাথে পূর্ব ঘোষিত সকল নির্দেশ, অব্যাহতি ও ব্যাখ্যাসমূহ বাতিল বলে বিবেচিত হয়। নিম্নে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনামা দেওয়া হলো।

১নং নির্দেশ

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সেক্রেটারিয়েট, সরকারি ও আধা-সরকারি অফিসসমূহ, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহ, হাইকোর্ট ও সমগ্র বাংলাদেশের অন্যান্য আদালত হরতাল

পালন করবে। নিচে যে বিশেষ নির্দেশাবলি হরতালের আওতামুক্তি ও ব্যাখ্যা প্রদান করা হলো, তার এবং বিভিন্ন সময়ে যেসব নির্দেশনাবলি ও ব্যাখ্যা দেওয়া হবে তার পরিপ্রেক্ষিতে এই হরতাল পালন করতে হবে।

২নং নির্দেশ

বাংলাদেশের সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে।

৩নং নির্দেশ

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা :

(ক) ডেপুটি কমিশনার ও সাবডিভিশনাল অফিসাররা অফিস না খুলে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে তাদের যে দায়িত্ব রয়েছে তা পালন করবেন এবং উন্নয়ন কর্মসূচিসহ বর্ণিত নির্দেশাবলি বাস্তবায়নের জন যা যা দরকার, সেসব দায়িত্ব পালন করবেন।

নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাদের নিজ নিজ পর্যায়ে আওয়ামী লীগ সংগ্রাম পরিষদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করবেন ও পরিষদের সহযোগিতায় কাজ করবেন।

(খ) পুলিশ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করবে এবং প্রয়োজন হলে আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সহায়তা গ্রহণ করবে।

(গ) জেল ওয়ার্ডার ও জেলের অফিসসমূহে কাজ চলবে।

(ঘ) আনসার বাহিনী তাদের দায়িত্ব পালন করে যাবে।

৪নং নির্দেশ

বন্দরসমূহ (অভ্যন্তরীণ নৌ-বন্দরসহ) :

নৌযান চলাচল অব্যাহত রাখাসহ বন্দর কর্তৃপক্ষ সকল পর্যায়েই কাজ চালু রাখবে, তবে জনগণের ওপর নির্যাতন চালানোর জন্য ব্যবহৃত হতে পারে এমন সব দ্রব্যাদি বা সেনাবাহিনী মোতায়েনের কাজে সহযোগিতা সম্প্রসারণ ব্যতীত জাহাজসমূহের বন্দর ভিড়া ও বন্দর ছাড়ার কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনে বন্দর কর্তৃপক্ষের অফিসের শুধু তেমন বিভাগই চালু থাকবে। সকল জাহাজ বিশেষ করে বাংলাদেশের জনগণের জন্য যে সকল জাহাজ খাদ্যশস্য বহন করে আনছে, সেসব দ্রুত খালাস করতে সার্বিক চেষ্টা রাখতে হবে। বন্দর কর্তৃপক্ষ বন্দরের ন্যায্য পাওনা ও মাল খালাস চার্জ আদায় করবে। অভ্যন্তরীণ নৌ-বন্দরসমূহ বন্দর ও অপরাপর চার্জ আদায় করবে।

৫নং নির্দেশ

মাল আমদানি :

আমদানিকৃত সকল মাল খালাস করতে হবে। শুল্ক বিভাগের প্রয়োজনীয় সেকশনসমূহ কাজ চালু রাখবে এবং নিরূপিত শুল্কের পুরো অর্থ জমা দেয়া হলে তার

ভিত্তিতে মাল খালাসের অনুমোদন দান করবে। এতদুদ্দেশ্যে ইস্টার্ন ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিমিটেড শুল্ক কালেক্টর কর্তৃক পরিচালিত বিশেষ একাউন্টে ওই অর্থ জমা দিতে হবে। শুল্ক কালেক্টর আওয়ামী লীগের নির্দেশ মোতাবেক এসব একাউন্টস পরিচালনা করবে। আওয়ামী লীগ সময়ে সময়ে এ সম্পর্কে নির্দেশ দেবে। এভাবে সংগৃহীত অর্থ কেন্দ্রীয় সরকারের হিসাবে জমা হবে না।

৬নং নির্দেশ

রেলওয়ে :

রেলওয়ে চালু থাকবে। তবে রেলওয়ে চালু রাখার জন্য রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের যে যে সেকশন খোলা থাকা দরকার, কেবলমাত্র সেই সেকশনই কাজ করবে। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের ওপর নির্যাতন চালানোর কাজে ব্যবহৃত হতে পারে এমন সব ক্ষেত্রে সৈন্য মোতায়েন কিংবা রসদ পরিবহনের কাজে সহযোগিতা করা যাবে না। বন্দরসমূহ থেকে অভ্যন্তরে খাদ্যশস্য পরিবহনের বেলায় অগ্রাদিকারের ভিত্তিতে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে ওয়াগনসমূহ বরাদ্দ করতে হবে।

৭নং নির্দেশ

সড়ক পরিবহন :

বাংলাদেশের সর্বত্র ইপিআরটিসি চলাচল করবে।

৮নং নির্দেশ

অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন :

অভ্যন্তরীণ নদীবন্দরগুলোর সঠিকভাবে কাজ চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় আইডব্লিউটিএ'র স্বল্পসংখ্যক কর্মচারী, ইপিএসসি এবং অভ্যন্তরীণ নৌপরিহন কাজ করবে। কিন্তু জনগণের ওপর নির্যাতন চালানোর কাজে ব্যবহৃত হতে পারে এরূপ বাহিনী অথবা সরঞ্জামাদি সমাবেশ করার ব্যাপারে কোনোরূপ সহযোগিতা করা যাবে না।

৯নং নির্দেশ : ডাক ও টেলিগ্রাম :

বাংলাদেশের মধ্যে চিঠি, টেলিগ্রাম ও মানিঅর্ডার পাঠানোর জন্য কেবল ডাক ও টেলিগ্রাফ অফিস কাজ করবে। তবে সকল শ্রেণীর বিদেশী মেল সার্ভিস ও বিদেশী টেলিগ্রাম সরাসরি সংশ্লিষ্ট দেশগুলোতে প্রেরণ করা যেতে পারে। ২৫ নম্বর নির্দেশে যে সমস্ত বার্তা আদান-প্রদানের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, ব্যাংকগুলোকে কেবল সে ধরনের বার্তা টেলিপ্রিন্টারে আদান-প্রদান করতে দেওয়ার জন্য সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার ও বৃহস্পতিবার বিকাল ৩টা থেকে ৪টা পর্যন্ত একঘণ্টার জন্য আন্তঃপ্রাদেশিক টেলিপ্রিন্টার চ্যানেল খোলা থাকবে।

পোস্টাল, সেভিংস ব্যাংক ও জীবন বীমা চালু থাকবে।

১০নং নির্দেশ

টেলিফোন :

বাংলাদেশের মধ্যে কেবল স্থানীয় ও আন্তঃজেলা ট্রাংক টেলিফোন চালু থাকবে। টেলিফোন ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় সেকশনগুলো কাজ করবে।

১১নং নির্দেশ

বেতার, টেলিভিশন এবং সংবাদপত্র

বেতার, টেলিভিশন ও সংবাদপত্র চালু থাকবে এবং এগুলোতে জনগণের আন্দোলন সংক্রান্ত সকল খবর ও বিবৃতির পূর্ণ বিবরণ প্রচার করতে হবে। অন্যথায় এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত ব্যক্তিরা সহযোগিতা করবে না।

১২নং নির্দেশ

স্বাস্থ্য ও সেনিটেশন সার্ভিসেস :

জেল হাসপাতাল, যক্ষ্মা ক্লিনিক ও কলেরা গবেষণা কেন্দ্রসহ সকল হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং স্বাস্থ্য ও সেনিটেশন সার্ভিস চালু থাকবে। সেন্ট্রাল, মেডিকেল স্টোরস চালু থাকবে এবং সকল হাসপাতাল, মফস্বল শহরের হাসপাতাল, গ্রামাঞ্চলের হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ওষুধপত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ অব্যাহত থাকবে।

১৩নং নির্দেশ

বিজলি সরবরাহ :

মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগসহ বিদ্যুৎ সরবরাহ অব্যাহত রাখার কাজের সাথে সম্পর্কিত ইপি ওয়াপদার সমস্ত বিভাগ কাজ করবে।

১৪নং নির্দেশ

পানি ও গ্যাস :

গ্যাস ও পানি সরবরাহ চালু থাকবে। এর সাথে সংশ্লিষ্ট মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাও চালু থাকবে।

১৫নং নির্দেশ

কয়লা :

ইটের ভাটা এবং অন্যান্য কাজের জন্য কয়লা সরবরাহ অব্যাহত থাকবে।

১৬নং নির্দেশ

খাদ্য সরবরাহ :

খাদ্য সরবরাহ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে খাদ্যশস্যের আমদানি, বণ্টন,

গুদামজাতকরণ এবং স্থানান্তরে চালান অব্যাহত থাকবে। এ কাজের জন্য ওয়াগন, বার্জ, ট্রাক ইত্যাদিসহ সবরকম যানবাহনের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

১৭নং নির্দেশ

কৃষি তৎপরতা :

(ক) ধান ও পাটের বীজ, সার এবং কীটনাশক ওষুধ সংগ্রহ, চলাচল এবং বণ্টন অব্যাহত থাকবে। কৃষি খামার, চাল গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং এগুলোর সকল প্রকল্পের কাজ চলবে।

(খ) পাম্প এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের চলাচল, বণ্টন, স্থাপন (ফিল্ডিং) এবং চালানোর কাজ চলবে। এগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় তেল (জ্বালানি) যন্ত্রপাতির সরবরাহ অব্যাহত থাকবে। এগুলোর মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থাও রাখতে হবে।

(গ) নলকূপ খনন, পরিচালনা এবং খালের সেচসহ সবরকম পানি সেচব্যবস্থা চালু থাকবে।

(ঘ) পূর্ব পাকিস্তান সমবায় ব্যাংক, সেন্ট্রাল ব্যাংক ও এদের অনুমোদিত সংস্থা, থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি ও অন্যান্য সব সমবায় প্রতিষ্ঠান চালু থাকবে।

(ঙ) এতদুদ্দেশ্যে ইপিএডিসির প্রয়োজনীয় সেকশন চালু থাকতে পারে।

(চ) কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ও অন্যান্য ব্যাংক কর্তৃক ঘূর্ণিঝড় দুর্গত এলাকাসমূহে সুদমুক্ত ঋণ প্রদান অব্যাহত থাকবে।

(ছ) গুদামে রাখার উদ্দেশ্যে গোলআলু কেনার জন্য এডিবিপি দ্রুত অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা করবে।

১৮নং নির্দেশ

বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও শহর সংরক্ষণ :

বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজ শহর সংরক্ষণ এবং নদী খনন ও যন্ত্রপাতি স্থাপনসহ ইপি ওয়াপদা ও অন্যান্য সংস্থার পানি উন্নয়ন কাজ, মালপত্র খালাস ও চলাচল এবং সংশ্লিষ্ট জরুরি কাজ সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে যাওয়া হবে। সরকারি সংস্থা বা সংশ্লিষ্ট স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা স্বাভাবিক নিয়মে কন্ট্রাক্টরদের পাওনা মিটিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করবে।

১৯নং নির্দেশ

উন্নয়ন ও নির্মাণ কাজ :

বৈদেশিক সাহায্যে তৈরি সড়ক ও সেতু প্রকল্পসহ সরকারি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ও আধা-সরকারি সংস্থার সব উন্নয়ন ও নির্মাণ কাজের বাস্তবায়ন সুচারুরূপে চলবে। সরকারি সংস্থা বা সংশ্লিষ্ট স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা যথারীতি কন্ট্রাক্টরদের পাওনা মিটিয়ে দেবে। চুক্তি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় মালমসলা সরবরাহের নিশ্চয়তাও বিধান করবে।

২০নং নির্দেশ

সাহায্য ও পুনর্বাসন :

ঘূর্ণিবাত্যা দুর্গত এলাকাগুলোতে বাঁধনির্মাণ ও উন্নয়ন কাজসহ সবরকম সাহায্য, পুনর্বাসন ও পুনঃনির্মাণ কাজ অব্যাহত থাকবে। সরকারি সংস্থা কন্ট্রাক্টরদের পাওনা যথারীতি মিটিয়ে দেবে।

২১নং নির্দেশ

ইপিআইডিসি, ইপসিক কারখানা ও ইস্টার্ন রিফাইনারি :

ইপিআইডিসি ও ইপসিকের সব কারখানায় কাজ চলবে এবং যত বেশি সম্ভব উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টা করবে। এসব কারখানা চালু রাখার জন্য অর্থ সরবরাহ ও ক্রয়ের জন্য ইপিআইডিসি ও ইপসিকের যেসব বিভাগ খোলা রাখা দরকার হবে সেগুলোতে কাজ চলবে।

ইস্টার্ন রিফাইনারি লিমিটেডেও যথারীতি কাজ চলবে।

২২নং নির্দেশ

বেতন দান :

সরকারি ও আধা-সরকারি সংস্থার কর্মচারী ও শ্রমিক এবং প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকদের বেতন তা দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক বা মাসিক যে ভিত্তিতেই দেয়া হোক না কেন তা পাওনা হলে সেভাবেই দিতে হবে। সব সরকারি কর্মচারীর যাদের বন্যা সাহায্য মঞ্জুর করা হয়েছে এবং বকেয়া বেতন রয়েছে তা দিতে হবে। বেতনের বিল তৈরি ও বেতন দানের জন্য সরকারি ও আধা-সরকারি অফিসের সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোতে কাজ চলবে।

২৩নং নির্দেশ

পেনশন :

সামরিক বিভাগে অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদেরসহ সব পেনশনপ্রাপ্তদের নির্ধারিত তারিখে পেনশন দিতে হবে।

২৪নং নির্দেশ

এজি (ইপি) ও ট্রেজারি :

বেতনের বিল তৈরি এবং এসব নির্দেশ অনুমোদিত লেনদেনের জন্য এজি (ইপি) ও ট্রেজারিতে সামান্যসংখ্যক কর্মচারী কাজ চালিয়ে যাবেন।

২৫নং নির্দেশ

ব্যাংক :

(ক) ব্যাংকিং কাজের জন্য সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত এবং প্রশাসনিক কাজের জন্য বিকাল ৪টা পর্যন্ত (বিরতির সময়সহ) সব ব্যাংক খোলা থাকবে।

তবে শুক্র ও শনিবার ব্যাংকিং কাজের জন্য সকাল ৯টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত এবং প্রশাসনিক কাজের জন্য দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। অনুমোদিত লেনদেনের ক্ষেত্রে ব্যালেন্সিং ও সব স্বাভাবিক কাজ নিয়মিতভাবে চলবে।

(খ) নিম্নলিখিত বিধিনিষেধ ছাড়া ব্যাংকগুলো যে কোনো পরিমাণ জমা গ্রহণ, বাংলাদেশের ভেতর যে কোনো পরিমাণ আন্তঃব্যাংক ক্লিয়ারেন্স, বাংলাদেশের ভেতর আন্তঃব্যাংক ট্রান্সফার এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে টিটি বা মেল ট্রান্সফার ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থ ড্র করার কাজ চালিয়ে যাবে। বিধিবিধানগুলো হচ্ছে :

১. চেকের সাথে যদি সংশ্লিষ্ট শ্রমিক সংস্থার প্রতিনিধির বা বেতন রেজিস্ট্রারের সার্টিফিকেট থাকে তাহলে বেতন ও মঞ্জুরি পরিশোধ করা।

২. সপ্তাহে ১ হাজার টাকা পর্যন্ত বোনাফাইড ব্যক্তিগত ড্রইংস।

৩. চিনিকল, পাটকল ইত্যাদির জন্য আখ ও পাটসহ শিল্পের কাঁচামাল ক্রয়ের জন্য অর্থ দান।

৪. বাংলাদেশের ক্রেতাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয়সহ যে কোনো বোনাফাইড বাণিজ্যিক প্রয়োজনে সপ্তাহে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত প্রদান। এই অর্থ নগদ অর্থে বা ক্যাশ ড্রাফট মারফত উঠানো যাবে। তবে উপরে উল্লেখিত ৩ ও ৪ নম্বর শর্তে কোনো অর্থ দেয়ার পূর্বে অতীত রেকর্ড দেখে ব্যাংককে সন্তুষ্ট হতে হবে যে, অর্থগ্রহণকারী একজন বোনাফাইড শিল্প অথবা বাণিজ্যিক সংস্থা বা ব্যবসায়ী এবং যে পরিমাণ অর্থ উঠানো হচ্ছে তা গত এক বছরে সপ্তাহে গড়ে উঠানো অর্থের চেয়ে বেশি নয়।

৫. উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজে নিযুক্ত তালিকাভুক্ত কন্ট্রাক্টরদের অর্থ দান। তবে যে কর্তৃপক্ষের অধীনে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে তার কাছ থেকে চেকে একটি সার্টিফিকেট আনতে হবে যে, যে টাকা উঠানো হচ্ছে তা উল্লিখিত কাজের জন্য প্রয়োজন।

(গ) বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যে কোনো একাউন্টে ক্রস চেক ও ক্রস ডিমান্ড ড্রাফট প্রদান করা ও জমা নেয়া যাবে।

(ঘ) স্টেট ব্যাংক ও ন্যাশনাল ব্যাংক ঢাকা থেকে অর্থ প্রদানের ভিত্তিতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে চিঠি পাঠাতে পারবে। যেসব ব্যাংকের সদর দফতর পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত সেগুলো ঢাকাস্থ ব্যাংক ও ন্যাশনাল ব্যাংকের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পাওনা গ্রহণ করবে।

(ঙ) অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ের জন্য সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার ও বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টা থেকে ৪টা পর্যন্ত ১ ঘণ্টা আন্তঃশাখা টেলিপ্রিন্টার সার্ভিস চালু থাকবে।

১. প্রত্যেকটি বাণিজ্যিক ব্যাংককে সোমবার ও বুধবার বিকেল ৩টা থেকে ৪টার মধ্যে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে একটি খবর পাঠাতে পারে।

২. প্রত্যেকটি ব্যাংক অর্থ পাঠানোর ব্যাপারে মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টা থেকে ৪টার মধ্যে খবর পেতে পারে।

(চ) বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাংক পদ্ধতির জন্য টেলিপ্রিন্টার সার্ভিসের কাজ অব্যাহত থাকবে।

(ছ) বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিল সংগ্রহের অনুমতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু ক্রস চেক বা ক্রস ড্রাফটের মাধ্যমে অর্থ প্রদান করতে হবে।

(জ) অনুমোদিত ডিলারের সাহায্যে ফরেন ট্রাভেলার্স চেক ভাঙানো যাবে।

(ঝ) কূটনীতিকরা অবাধে তাদের একাউন্টের কাজ পরিচালনা করতে পারবেন ও বিদেশী নাগরিকরা বৈদেশিক মুদ্রা একাউন্ট পরিচালনা করতে পারবেন এবং বৈদেশিক মুদ্রা গ্রহণ করতে পারবেন।

(ঞ) লকার্স পরিচালনার কাজ বন্ধ থাকবে।

(ট) স্টেট ব্যাংকের মাধ্যমে বা অন্য কোনো উপায়ে বাংলাদেশের বাইরে টাকা পাঠানো যাবে না।

(ঠ) বিদেশী রাষ্ট্র থেকে লাইসেন্সের মাধ্যমে দ্রব্যাদি আমদানির জন্য ঋণপত্র খোলা যাবে।

(ড) পণ্য বিনিময়ের চুক্তি (যেসব দ্রব্য ইতিমধ্যেই পাঠানো হয়েছে) অনুযায়ী প্রেরিত দ্রব্যাদি ছাড় করতে হবে।

(ঢ) ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড ও ইস্টার্ন ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিমিটেডের মারফত বকেয়া রফতানি বিল সংগ্রহ করা হবে। এ ব্যাপারে ব্যাংকগুলোর প্রতি প্রদত্ত নির্দেশ অনুযায়ী কাজ পরিচালিত হবে।

২৬নং নির্দেশ

স্টেট ব্যাংক :

স্টেট ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকের মতোই কাজ করবে এবং সেখানে একই অফিস সময় চলবে। বাংলাদেশের ব্যাংকিং পদ্ধতি কাজ করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যও অনুরূপভাবে খোলা থাকবে। উল্লিখিত কাঠামো ও বিধিনিষেধ এ ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। 'পি' ফর্ম বরাদ্দ করা যেতে পারে এবং বিদেশে অবস্থানরত ছাত্র ও অন্যান্য অনুমোদিত প্রাপকের জন্য বিদেশে প্রেরণের টাকাও গৃহীত হতে পারবে।

২৭নং নির্দেশ

আমদানি ও রফতানি কন্ট্রোলার :

বাংলাদেশের জন্য আমদানি লাইসেন্স ইস্যুকরণ ও আমদানিকৃত দ্রব্যাদি চলাচলের বিধি ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য আমদানি-রফতানি কন্ট্রোলারের অফিস নিয়মিতভাবে চলবে।

২৮নং নির্দেশ

ট্রাভেল এজেন্ট ও বিদেশী এয়ারলাইন্স :

সব ট্রাভেল এজেন্ট অফিস ও বিদেশী বিমান পরিবহন অফিস চালু থাকতে পারে। তবে তাদের বিক্রয়লব্ধ অর্থ বাংলাদেশের ব্যাংকে জমা রাখতে হবে।

২৯নং নির্দেশ

ফায়ার সার্ভিস

বাংলাদেশের সব অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা চালু থাকবে।

৩০নং নির্দেশ

পৌরসভা :

পৌরসভার ময়লাবাহী ট্রাক, রাস্তার বাতি জ্বালানো, সুইপার সার্ভিস এবং জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত অন্যান্য ব্যবস্থা চালু থাকবে।

৩১নং নির্দেশ

করদান বন্ধ রাখা অভিযান :

(ক) পুনরায় নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত– (১) সব ভূমি রাজস্ব আদায় বন্ধ থাকবে, (২) বাংলাদেশের কোথাও কোনো লবণ কর আদায় করা যাবে না, (৩) বাংলাদেশের কোথাও কোনো তামাক কর আদায় হবে না ও (৪) তাঁতীরা আবগারী শুল্ক ছাড়াই বাংলার সুতা কিনবেন। মিল মালিক ও ডিলাররা তাদের কাছ থেকে কোনো আবগারী শুল্ক আদায় করতে পারবে না।

(খ) এছাড়া প্রাদেশিক সরকারের সব কর যেমন– প্রমোদ কর, হাট-বাজার, সেতু ও পুকুরের ওপর ধার্যকৃত কর আদায় করা যাবে এবং বাংলাদেশের সরকারের একাউন্টে জমা দিতে হবে।

(গ) অকট্রয়সহ সব স্থানীয় কর আদায় করা যাবে।

(ঘ) কেন্দ্রীয় সরকারের সব পরোক্ষ কর যেমন– আবগারী শুল্ক কর, বিক্রয় কর এখন থেকে আদায়কারী প্রতিষ্ঠান দ্বারা আদায় হবে। তবে তা কেন্দ্রীয় খাতে জমা করা যাবে না বা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে হস্তান্তর করা যাবে না। এসব আদায়কৃত কর ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক বা ইস্টার্ন ব্যাংকিং কর্পোরেশনে 'বিশেষ একাউন্ট' খুলে জমা রাখতে হবে এবং ব্যাংক দুটিও তাদের প্রতি প্রদত্ত নির্দেশ অনুযায়ী এগুলো গ্রহণ করবে। সব আদায়কারী প্রতিষ্ঠানকে এ নির্দেশ ও বিভিন্ন সময় তাদের প্রতি যে নির্দেশ দেয়া হবে তা মানতে হবে।

(চ) কেন্দ্রীয় সরকারের সব প্রত্যক্ষ কর যেমন আয়কর আয় ইত্যাদি পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বন্দ থাকবে।

৩২নং নির্দেশ :

পাকিস্তান বীমা কর্পোরেশন চালু থাকবে এবং পোস্টাল লাইফ ইন্স্যুরেন্সসহ বীমা কোম্পানিতে কাজ চলবে।

৩৩নং নির্দেশ

সব ব্যবসা ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং দোকানপাট নিয়মিতভাবে চলবে।

৩৪নং নির্দেশ :

সব বাড়ির ওপর কালো পতাকা উড়া অব্যাহত থাকবে।

৩৫নং নির্দেশ :

সংগ্রাম পরিষদগুলো সর্বস্তরে তাদের কাজ চালু রাখবে এবং এসব নির্দেশ যথাযথভাবে বাস্তবায়িত করে যাবে।

২ মার্চ ১৯৭১ বঙ্গবন্ধুর বিবৃতির পূর্ণ বিবরণ

[১৯৭১ সালের ২ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ডাকে ঢাকায় সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। ঢাকায় বিক্ষোভ মিছিলে সয়লাব হয়ে যায়। রাতে সান্ধ্য আইন উপেক্ষা করে অন্তহীন মানুষের ঢল নামে। জনগণের 'জয়বাংলা' ধ্বনি ঢাকাকে প্রকম্পিত করে তোলে। সেনাবাহিনী জনগণকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য গুলি ছোড়ে। এতে কয়েকজন নিরস্ত্র মানুষ নিহত ও অসংখ্য আহত হন। মধ্যরাত পর্যন্ত অন্তত তিনজনের লাশ এবং আহত ব্যক্তিদের হাসপাতালে আনা হয়। ২ মার্চ এক বিবৃতিতে বঙ্গবন্ধু গুলিবর্ষণের ঘটনার নিন্দা করেন। তাঁর বিবৃতির পূর্ণ বিবরণ দেয়া হলো।]

আজ এখানে নিরস্ত্র বালকের ওপর গুলি চালানো হয়েছে। এতে কমপক্ষে ২ ব্যক্তি নিহত ও আরো কয়েকজন আহত হন। তাদের ওপর গুলি চালানো হয়েছে, কারণ তারা বাংলাশেরই প্রতি এক চরম অবমাননার বিরুদ্ধে সারা বাংলারই অপরাপর জনমানুষের সাথে একাত্ম হয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। সে যে কোনো অবমাননা করুন না কেন।

আমি এই গুলিবর্ষণের তীব্র নিন্দা জানাই এবং যারা শক্তি দিয়ে জনগণ মোকাবিলা করতে চান, তাদের এই ধরনের বেপরোয়া পথ থেকে বিরত থাকার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। তাদের খেয়াল রাখা উচিত যে, নিরস্ত্র জনগণের ওপর গুলিবর্ষণ গণহত্যার শামিল এবং সেটা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধও বটে।

তাদের জানা উচিত, বাংলাদেশে যদি আগুন জ্বলে ওঠে তবে তারা এর শিখা এড়াতে পারবেন না। এ ধরনের সংঘাত অব্যাহত থাকলে আগুন জ্বলবেও। আমরা বাংলাদেশের ৭ কোটি লোকের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য পশ্চিমাঞ্চলের প্রতিনিধিদের সাথে ৩ মার্চ অধিবেশনে বসতে রাজি ছিলাম। প্রকৃতপক্ষে পশ্চিম পাকিস্তানের কিছু প্রতিনিধি এর মধ্যেই এ ব্যাপারে ঢাকা এসে পৌঁছেছিলেন।

কিন্তু এক আকস্মিত হস্তক্ষেপের ফলে এই অধিবেশন স্থগিত হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমি স্বার্থবাদী দলের ত্রাণকারীরূপে একটি সংখ্যালঘু দল এই হস্তক্ষেপে উৎসাহ দেয়। তারা জানায় যে, একমাত্র তাদের আরোপিত শর্ত ছাড়া অধিবেশন হতে পারে না। এমনকি তারা পশ্চিম পাকিস্তানের কোনো প্রতিনিধি এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গেলে তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণের ভয় দেখায়।

একটি অগণতান্ত্রিক সংখ্যালঘু দলের নির্দেশক্রমে সংখ্যাগুরু প্রতিনিধি দলের অধিকার অস্বীকার জনগণের প্রতি দুঃসহ অপমান ছাড়া আর কিছুই না।

বাংলাদেশের মানুষ এ ধরনের নির্দেশ কিংবা ভীতির কাছে নতি স্বীকার করতে রাজি নয় বলে বর্তমানে শক্তি দিয়ে তাদের মোকাবিলার চেষ্টা করা হচ্ছে।

এটা মর্মান্তিক যে, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বহনের জন্য যে বিমানগুলো ব্যবহার হতে পারত তা এখন সামরিক অফিসার ও সেনাবাহিনীর লোকদের অস্ত্রশস্ত্র বহন করার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

সাত কোটি বাঙালিকে দমনের উদ্দেশ্যে এসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকলে জনগণ গতকাল থেকে সারা বাংলাদেশে স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ প্রদর্শনের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর সামনে প্রমাণ করে দিয়েছে যে, বাঙালিরা আর নির্যাতিত হতে রাজি নয় এবং তারা একটি স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হতে প্রস্তুত নয়। এই সঙ্কটাপন্ন মুহূর্তে সরকারি কর্মচারীসহ সব শ্রেণীর বাঙালির পবিত্র দায়িত্ব হচ্ছে গণবিরোধী শক্তিকে কোনোভাবে সহযোগিতা না করা এবং বস্তুত বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করার জন্য তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করা। এখন যেহেতু প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হয়েছেন তাঁরাই সব কর্তৃত্বের একমাত্র উৎসাহ। সব কর্তৃপক্ষই এই সত্যটির প্রতি লক্ষ্য রাখবেন আশা করি।

এরকম পরিস্থিতিতে সামরিক শাসন বা সামরিক আইন আর অব্যাহত রাখার যৌক্তিকতা থাকতে পারে না। আমি তাই অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার, সংঘাতের আশু অবসান ও জনপ্রতিনিধিদের ক্ষমতা প্রয়োগের বাধা অপসারণের দাবি জানাচ্ছি।

উপরোক্ত দাবি পূরণ না হওয়া এবং বাংলাদেশের মানুষ মুক্তি হাসিল না হওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।

আমি আগামী ৭ মার্চ পর্যন্ত আমাদের কর্মসূচি ঘোষণা করছি এবং আমাদের জনগণকে নিম্নোক্ত নির্দেশ দিচ্ছি :

(ক) কাল ৩ মার্চ থেকে আগামী ৬ মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ৬টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত সরকারি অফিস, সেক্রেটারিয়েট, হাইকোর্ট ও অন্যান্য কোর্ট-কাচারি, স্বায়ত্তশাসিত কর্পোরেশন, পিআইএ, রেলওয়ে ও অন্যান্য যোগাযোগ সংস্থা, পরিবহন, সরকারি ও বেসরকারি কলকারখানা, ফ্যাক্টরি, শিল্প ও বাণিজ্যিক সংস্থা ও বাজারসহ সর্বত্র হরতাল। যা যা হরতালের আওতার বাইরে থাকবে সেগুলো হলো : এম্বুলেন্স, সংবাদপত্রের গাড়ি, হাসপাতাল, ওষুধের দোকান, বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ সংস্থা।

শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলাভাবে হরতাল পালন এবং লুট, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি অবাঞ্ছিত ঘটনা যাতে না ঘটে তার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য সকলের প্রতি আবেদন জানানো হচ্ছে। বিশেষ করে জনগণকে উস্কানিদাতাদের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে হবে। স্মরণ রাখতে হবে বাংলাদেশে বসবাসকারী প্রত্যেকে, তা তাঁরা যেখানকারই হোন না কেন বা যে ভাষায়ই কথা বলুন না কেন, তাঁরা আমাদের কাছে বাঙালি। তাঁরা নিজেরা, তাঁদের সম্পত্তি ও ইজ্জত আমাদের পবিত্র আমানত এবং এসব অবশ্যই রক্ষা করতে হবে।

(খ) ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের কথা ছিল। এই দিন এখন জাতীয়

শোক দিবস হিসেবে পালন করা হবে। এই উপলক্ষে বিকেল ৪টায় ছাত্রলীগের জনসভার অব্যবহিত পর পল্টন ময়দান থেকে এক মিছিলের আমি নেতৃত্ব করব।

(গ) রেডিও-টেলিভিশন বা সংবাদপত্রসমূহ ঘটনাবলি সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য বা বিবৃতি পেশ না করলে এসব প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত সকল বাঙালি বাংলাদেশের ৭ কোটি মানুষের কণ্ঠরোধের অপচেষ্টার সাথে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করবেন।

(ঘ) ৭ মার্চ বিকেল দু'টায় রেসকোর্স ময়দানে এক জনসমাবেশে আমি বক্তৃতা করব। তখন পরবর্তী কর্মপন্থা জানানো হবে।

(ঙ) আমি শান্তিপূর্ণ সুশৃঙ্খলভাবে আমাদের সাধারণ সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য জনগণের প্রতি আবেদন জানাচ্ছি। আমি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, কোনো প্রকার শৃঙ্খলা ভঙ্গ আমাদের আন্দোলনের স্বার্থের পরিপন্থী হবে এবং উস্কানিদাতা ও গণবিরোধী চক্রের স্বার্থের অনুকূল হবে।

[সূত্র : আজাদ ও দৈনিক পাকিস্তান ৩ মার্চ, ১৯৭১]

৬ মার্চ দৈনিক পাকিস্তান-এর সম্পাদকীয়

১৯৭১ সালের ১ মার্চ থেকে ৬ মার্চ পর্যন্ত সারা বাংলায় যে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন চলতে থাকল তার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না। তৎকালীন পত্রিকা দৈনিক পাকিস্তানের ৭ মার্চ ১৯৭১-এর সংখ্যার সে সম্পাদকীয়টি লেখা হয় তার উল্লেখ এখানে একান্ত প্রয়োজন।

'গত ছয়দিনের বাংলাদেশব্যাপী বিক্ষোভ ও হরতাল এক অনন্য ইতিহাস রচনা করিয়াছে। আপামর বাঙালির এ কয়দিনের আচরণে যে নিশ্ছিদ ঐক্য এবং সংকল্পের দৃঢ়তা প্রতিভাত হইয়াছে, উহার তুলনা হয় না। সারা বাংলার আপামর জনসাধরণ যে একটি মানুষে পরিণত হইয়াছে– একটি সিদ্ধান্তে একটি বিবেকে রূপান্তরিত হইয়াছে। বাঙালির মনোভাবে এমন অভিন্নতা আর কখনো দেখা যায় নাই। পক্ষান্তরে বিগত ছয়দিনের হরতাল ও বিক্ষোভে বঞ্চিত মানুষের অগ্নিক্ষরা ক্রোধ ঝরিয়া পড়িয়াছে বটে, আপোষহীন দৃপ্ত স্লোগান বাংলার আকাশ-বাতাস আলোড়িত করিয়াছে সত্য কিন্তু এত প্রবল আবেগের মুখেও শৃঙ্খলা ও শান্তি কোথাও বিপন্ন হয় নাই। নেতৃবর্গের প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হইয়াছে। আইন-শৃঙ্খলার প্রতি যে আস্থা প্রদর্শিত হইয়াছে এই সংগ্রামমুখর বিক্ষুব্ধ আন্দোলনের প্রতিটি পদক্ষেপে উহার প্রশংসার ভাষাও আমাদের জানা নাই। একদিকে নির্ভুলভাবে হরতালের সময়সীমা রহিয়াছে সংরক্ষিত অন্যদিকে নাগরিকদের জীবনযাত্রার ধারা অব্যাহত রাখার জন্য যে কর্মকাল অফিস-আদালত-ব্যাংকে নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, উহাও সামান্যতম প্রতিবন্ধকতার মুখে আক্রান্ত হয় নাই। সহযোগিতার এই দৃষ্টান্তও নজিরবিহীন। কর্মতৎপরতা ও হরতাল-বিক্ষোভ পাশাপাশি অক্ষুণ্ন রাখিয়া সারা বাংলার জনসাধারণ যে সংঘবদ্ধতা, সাংগঠনিক সমঝোতা এবং সংগ্রামী মূল্যবোধের ঐতিহ্য সংস্থাপিত করিলেন, উহা গণঐক্যের এক চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ হিসেবে পরিকীর্তিত হইবে। ইহা গণশক্তির এক অজেয় ঐশ্বর্য উদ্ভাসিত করিয়াছে। ইহা আমাদের সম্মুখ সংগ্রামের এক অনিঃশেষ এবং অপরাজেয় পাথেয় হইয়া থাকিবে।

বিশেষত গণপরিষদের নির্ধারিত বৈঠক স্থগিত করার পরিপ্রেক্ষিতে হতাশা বিক্ষুব্ধ জনসাধারণের মনে নানা কারণে সংশয় ও সন্দেহ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। এ সন্দেহ ও সংশয় কোনো রাজনৈতিক দলবিশেষের সদস্য ও সমর্থকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। বিগত ২৩ বছরের ধারাবাহিক প্রতারণা ও শাসন-শোষণে নির্যাতিত ও বঞ্চিত

বাঙালি মাত্রেরই মনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই সংশয় সন্দেহের দোলা ত্বরিত বিক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটাইয়াছে। কোনো নেতাকে এই বিক্ষোভ প্রকাশের জন্য ডাক দিতে হয় নাই, নির্দেশ প্রদান করিতে হয় নাই, সময় ধার্য করিতে হয় নাই। পরিষদের বৈঠক স্থগিত হওয়ার খবর শোনার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি মানুষ পথে নামিয়া আসিয়াছে প্রতিবাদের বজ্রকঠোর আওয়াজ তুলিয়া। শ্রমিক কারখানা ছাড়িয়াছে, অফিসের কর্মচারীরা অফিসঘর হইতে মুহূর্তে বাহির হইয়া আসিয়াছে। খেলোয়াড়রা খেলার মাঠ হইতে দৌড়াইয়া মিছিলে নামিয়াছে। দর্শকরা স্টেডিয়াম পরিত্যাগ করিয়াছে, ছাত্র-শিক্ষক সকল স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় মুহূর্তে খালি করিয়া দলে দলে রাস্তায় নামিয়া আসিয়াছে। বৈঠক স্থগিতের ঘোষণা বেতার কণ্ঠে মিলাইয়া যাইতে না যাইতেই বাংলার আকাশ-বাতাস প্রতিবাদের তীব্র ধ্বনিতে বিদীর্ণ হইতে শুরু করিয়াছে। সুতারং এ প্রতিক্রিয়া সারা বাংলার, প্রতিটি বাঙালির, এ প্রদেশের মুক্তিপাগল মানুষের। ২৩ বছরের প্রতারণা-নির্যাতন-লাঞ্ছিত সাত কোটি মানুষের। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনধারণ পরিষদ বৈঠককে স্থগিতকরণ শুধু তাহাদের উন্মুখ প্রত্যাশাকেই পদদলনের শামিল মনে করে নাই, সংখ্যাগরিষ্ঠের মনোভাবের প্রতি চূড়ান্ত অবমাননা এবং অধিকার হরণেরও প্রতীক বলিয়া মনে করিয়াছে। তথাপি এমন বিক্ষুব্ধ অবমাননা জনসাধারণ এই মুহূর্তেও আইন-শৃঙ্খলার মর্যাদা ভুলে নাই। দেশপ্রেমের ইহার চেয়ে উজ্জ্বলতর দৃষ্টান্ত আর কি হতে পারে? অথচ অত্যন্ত ন্যায্য প্রতিক্রিয়ায় আন্দোলিত এই বিক্ষুব্ধ জনগোষ্ঠীর স্বাভাবিক ভাব প্রকাশকে সামান্যতম সহানুভূতির দ্বারাও সহ্য করা হয় নাই। নিরীহ জনসাধারণের ওপর অকারণে বেপরোয়া গুলি চালনা করা হইয়াছে। পাখি শিকারের মতো তাহাদিগকে মেশিনগানের নির্বিকার-নির্বিচার লক্ষ্যে পরিণত করা হইয়াছে। ইহাতেও বাংলার বীর জনসাধারণ ধৈর্য হারায় নাই- এই অমানুষিক পাশব গণহত্যার মুখে সংযমভ্রষ্ট হয় নাই। উহার প্রমাণ অগণিত সংখ্যায় বাংলাদেশের বিক্ষুব্ধ মানুষ মরিয়াছে– এদেশেরই সন্তানের রক্তে এদেশের মাটি ভিজিয়া গিয়াছে। কিন্তু তবুও বিক্ষোভরত একটি বাঙালির হাতও রক্তরঞ্জিত হয় নাই। সত্যই পরিতাপ এবং দুঃখ প্রকাশের ভাষা আমাদের স্তব্ধ হইয়া যায়, যখন এই আইন-শৃঙ্খলাপ্রিয় অথচ মুক্তির জন্য ত্যাগ ও উৎসর্গে অবিচল বীর জনসাধারণের ন্যায্য প্রক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশকে কেবল বিকৃত নয়, নিছক মিথ্যা কুৎসায় লাঞ্ছিত করিয়া নির্দয় দম্ভোক্তি বিকারহীন কণ্ঠে উচ্চারিত হইতে থাকে।

প্রতিপক্ষের বদ্ধমূল দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিকারান্ধ মনোভাবের সাহায্যে বাঙালি চরিত্রের বলিষ্ঠতা, উদারতা এবং ন্যায়-নিষ্ঠাকে আর বিকৃত করা যাইবে না, বাঙালির সংগ্রাম উহার আদ্যোপান্ত ভূমিকা ও তাৎপর্যসহ আজ দিবালোকের মতো প্রতিভাত। এ সংগ্রাম বিগত ছয়দিনের বিক্ষোভ প্রতিবাদমুখর ইতিহাস রচনার মধ্য দিয়া সকল সংকীর্ণতার, স্খলনের এবং বিভ্রান্তির পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়াছে। অবিচ্ছিন্ন, অবিমিশ্র সংঘবদ্ধতা, ঐক্য এবং নির্ভুল লক্ষ্যপথে অগ্রাভিযানের যে হিমালয়সদৃশ দৃঢ়তা ইহা অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছে, উহার সম্মুখপথকে বাধামুক্ত করিবে, প্রতিক্রিয়া চক্রের ষড়যন্ত্র, দূরভিসন্ধি,

পঙ্কিল বেড়াজাল এবং দম্ভান্ধ শাসনের রক্তচক্ষুকে পরাভূত করার শক্তি জোগাইবে। মিথ্যার গ্লানি দিয়া ইহার ন্যায্য অধিকার আন্দোলনের ত্যাগোজ্জ্বল ও সংহত সংগ্রামকে আর খণ্ডিত বিশ্রান্ত ও হীনবল করা যাইবে না।'

৭ মার্চ আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান রেসকোর্স ময়দানে নিযুত জনতার মাঝে দাঁড়িয়ে বজ্রনির্ঘোষে ঘোষণা করেন, 'আমাদের সংগ্রাম চলবেই।' এই জনসমাবেশে শেখ মুজিবুর রহমান ছাড়া আর কেউ বক্তৃতা করেননি। ২২ মিনিট স্থায়ী তাঁর ভাষণ ছিল অত্যন্ত অনলবর্ষী।

বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ

আজ দুঃখভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি, আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়।

কি অন্যায় করেছিলাম? নির্বাচনের পরে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে, আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল এসেম্বলি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করব এবং এদেশকে আমরা গড়ে তুলব। এদেশের মানুষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, ২৩ বছরের করুণ ইতিহাস বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। ২৩ বছরের ইতিহাস, মুমূর্ষু নরনারীর আর্তনাদের ইতিহাস। বাংলার ইতিহাস এ দেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।

১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি, ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান মার্শাল 'ল জারি করে দশ বছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৬ সালে ৬ দফা আন্দোলনে, ৭ জুন আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯ সালের আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকারের দায়িত্বভার নিলেন, তিনি বললেন, দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গণতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম। তারপর অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হলো। আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি। আমি, শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে তাকে অনুরোধ করলাম, ১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না, তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, প্রথম সপ্তাহে, মার্চ মাসে সভা হবে। আমরা বললাম ঠিক আছে, আমরা এসেম্বলিতে বসব। আমি বললাম, এসেম্বলির মধ্যে আলোচনা করব—এমনকি আমি এ পর্যন্ত বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজন যদিও সে হয়, তার ন্যায্য কথা আমরা নেমে নেব।

জনাব ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন, বলে গেলেন যে,

আলোচনার দরজা বন্ধ নয়, আরও আলোচনা হবে। তারপরে অন্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ করলাম— আপনারা আসুন, বসুন, আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈরি করি। তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসে তাহলে কসাইখানা হবে এসেম্বলি। তিনি বললেন, যে যাবে তাকে মেরে ফেলে দেয়া হবে। যদি কেউ এসেম্বলিতে আসে তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত দোকান জোর করে বন্ধ করা হবে। আমি বললাম এসেম্বলি চলবে। তারপরে হঠাৎ এক তারিখে এসেম্বলি বন্ধ করে দেয়া হলো।

ইয়াহিয়া খান সাহেব প্রেসিডেন্ট হিসেবে এসেম্বলি ডেকেছিলেন, আমি বললাম, যে আমি যাব। ভুট্টো সাহেব বললেন, তিনি যাবেন না। পঁয়ত্রিশজন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এখানে আসলেন। তারপরে হঠাৎ বন্ধ করে দেয়া হলো। দোষ দেয়া হলো বাংলার মানুষকে, দোষ দেয়া হলো আমাকে। বন্ধ করে দেয়ার পর এ দেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল।

আমি বললাম, আপনারা কলকারখানা সবকিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিল। আপন ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। তারা শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো।

কি পেলাম আমরা? যে আমরা পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য, আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরিব-দুঃখী-আর্ত মানুষের বিরুদ্ধে। তার বুকের ওপর হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু— আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি, তখনই তারা আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

টেলিফোনে আমার সঙ্গে তার কথা হয়। তাকে আমি বলেছিলাম, জনাব ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কিভাবে আমার গরিবের ওপরে, আমার বাংলার মানুষের বুকের ওপরে গুলি করা হয়েছে। কি করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে। কি করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন। তিনি বললেন, আমি নাকি স্বীকার করেছি যে, ১০ তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স হবে।

আমি তো অনেক আগেই বলেছি, কিসের আরটিসি? কার সঙ্গে বসব? যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে, তাদের সঙ্গে বসব? হঠাৎ আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে পাঁচ ঘণ্টা গোপনে বৈঠক করে যে বক্তৃতা তিনি করেছেন, সমস্ত দোষ তিনি আমার ওপর দিয়েছেন। বাংলার মানুষের ওপর দিয়েছেন।

ভাইয়েরা আমার! ২৫ তারিখে এসেম্বলি কল করেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি দশ তারিখে বলে দিয়েছি যে, ঐ শহীদের রক্তের ওপর দিয়ে, পাড়া দিয়ে আরটিসিতে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না। এসেম্বলি কল করেছেন আমার দাবি মানতে হবে প্রথম। সামরিক আইন মার্শাল ল উইথড্র করতে হবে। সমস্ত সামরিক

বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত নিতে হবে। যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপরে বিবেচনা করে দেখব আমরা এসেম্বলিতে বসতে পারব কি, পারব না। এর পূর্বে এসেম্বলিতে বসতে আমরা পারি না।

আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এ দেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দিবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট, কাচারি, আদালত, ফৌজদারি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে, সে জন্য সমস্ত অন্য জিনিসগুলো আছে, সেগুলোর হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিকশা, ঘোড়ার গাড়ি চলবে, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে। শুধু, সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, জজ কোর্ট, সেমি-গভর্মেন্ট দফতরগুলো— ওয়াপদা, কোনো কিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এরপর যদি বেতন দেয়া না হয়, আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়— তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সব কিছু— আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারব। আমরা পানিতে মারব।

তোমরা আমার ভাই তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের ওপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবে না।

আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগ থেকে যতদূর পারি তাদের সাহায্য করতে চেষ্টা করব। যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিতে সামান্য টাকা-পয়সা পৌঁছিয়ে দেবেন। আর সাত দিন হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইরা যোগদান করেছেন প্রত্যেককে শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছিয়ে দেবেন।

সরকারি কর্মচারীদের বলি : আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এ দেশের মুক্তি না হবে, খাজনা, ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো, কেউ দেবেন না। শোনেন— মনে রাখবেন শত্রু বাহিনী ঢুকেছে নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায় হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি-ননবাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই। তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের ওপর, আমাদের যেন বদনাম না হয়। মনে রাখবেন, রেডিও-টেলিভিশনের কর্মচারীরা, যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে তাহলে কোনো বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশন আমার নিউজ না দেয় কোনো বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না। দুই ঘণ্টা ব্যাংক খোলা থাকবে, যাতে মানুষ তাদের মায়নাপত্র নেবার পারে। কিন্তু পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে

এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাফ আমাদের এই পূর্ব বাংলায় চলবে এবং বিদেশের সঙ্গে নিউজ পাঠাতে হলে আপনারা চালাবেন।

কিন্তু যদি এদেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়— বাঙালিরা বুঝে-সুঝে কাজ করবেন। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায়, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব, এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ।

এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।

৭ মার্চ-এর ভাষণের উত্থাপিত দাবি ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা

আমাদের অহিংস অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত থাকবে

[১৯৭১ সালের ৬ ও ৭ মার্চ তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবনে আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির রুদ্ধদ্বার বৈঠক হয়। দুপুরে সামান্য বিরতি ছাড়া দীর্ঘ সময় ধরে বৈঠক চলে। রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় বঙ্গবন্ধু ভাষণ দিতে যাবার পূর্বে এই বৈঠক শেষ হয়। ছাত্র-জনতার দাবি অনুযায়ী বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা দেয়ার প্রশ্নে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল। শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বঙ্গবন্ধু সভায় চারটি দাবি উত্থাপন করবেন বলে স্থির হয়। সাতই মার্চ সন্ধ্যায় বঙ্গবন্ধু জনসভায় প্রদত্ত ভাষণে উত্থাপিত দাবি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে এবং সমগ্র পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে সংবাদপত্রে এক বিবৃতি প্রদান করেন। সংবাদ মাধ্যমে প্রদত্ত উক্ত বিবৃতির পূর্ণ বয়ান উদ্ধৃত হলো।]

পহেলা মার্চ আকস্মিকভাবে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত গোষণার পর থেকে ৬ মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশের জনসাধরণকে সামরিক বাহিনীর মোকাবিলা করতে হচ্ছে। নিরস্ত্র বেসামরিক জনগণ (শ্রমিক, কৃষক ও ছাত্র) যারা জাতীয় পরিষদ স্থগিত রাখার আকস্মিক ও অনভিপ্রেত ঘোষণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য রুখে দাঁড়িয়েছিল, তাদের ওপর বেপরোয়াভাবে গুলিবর্ষণ করা হয়েছে। গত সপ্তাহে যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন, অনির্দিষ্টকালের জন্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার স্বেচ্ছাচারমূলক ও অযাচিত কাজের বিরুদ্ধে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করতে গিয়েই তাঁরা শহীদ হয়েছেন। এই শহীদদের ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত ব্যক্তি বলে চিত্রিত করা সত্যের অপলাপ মাত্র। সত্যিকারের ত্রাসের রাজত্ব কায়েমের জন্য যারা দায়ী বস্তুতপক্ষে তারাই হচ্ছে আসল দুষ্কৃতকারী। এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, গত সপ্তাহে যে ভয়াবহ অবস্থার অবতারণা করা হয়েছে তা দেখার জন্য প্রেসিডেন্ট ঢাকা আসার একটু সময় করতেও সক্ষম হননি। প্রেসিডেন্ট যাকে 'ক্ষমতার ন্যূনতম প্রয়োগ' বলে অভিহিত করেছেন, তার ফলেই যদি হাজার হাজার লোক হতাহত হয়ে থাকে, তাহলে কি আমাদের এটাই বুঝতে হবে যে, তিনি যাকে 'পর্যাপ্ত ক্ষমতার প্রয়োগ' বলবেন, তার লক্ষ্য হবে সবকিছু নিশ্চিহ্ন করে দেয়া? বাংলাদেশের নিরস্ত্র বেসামরিক জনগণের বিরুদ্ধে ক্ষমতার এই নগ্ন হুমকির আমি নিন্দা করছি। জাতি অনেক অর্থব্যয়ে

সশস্ত্রবাহিনীকে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করেছে বিদেশী হামলা প্রতিহত করার জন্য, বেসামরিক নাগরিকদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য নয়। অপর অঞ্চলের উর্দি পরা সৈনিকরা যে বাড়াবাড়ি করছে, তারা দখলকারী বাহিনীর মতো যে ভূমিকা পালন করছে তার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণের আজ রক্ষা-ব্যবস্থা প্রয়োজন।

বলা হয়েছে যে, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখাকে 'ভুল বোঝা হয়েছে'। আমি প্রেসিডেন্টকে জিজ্ঞেস করতে চাই, পশ্চিম পাকিস্তানের বেশ কিছুসংখ্যক সদস্য এবং একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের ঘোষিত অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে একটি সংখ্যালঘু দলের একক খেয়ালের প্রতি সাড়া দিয়েই কি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখা হয়নি?

আমরা ১৫ ফেব্রুয়ারির জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠানের সুপারিশ করেছিলাম। অপরদিকে ওই সংখ্যালঘু গ্রুপটি চেয়েছিল মার্চের প্রথম সপ্তাহে অধিবেশন হোক। এই সংখ্যালঘু গ্রুপটির মতের কাছেই নতি স্বীকার করা হয়েছে এবং ৩ মার্চ পরিষদের অধিবেশন ডাকা হয়েছে। কিন্তু এরপরও সেই সংখ্যালঘু গ্রুপটি পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে আপত্তি উত্থাপন করেছে। প্রথমত, এই সংখ্যালঘু গ্রুপ একটি অত্যন্ত আপত্তিকর বক্তব্য উত্থাপন করে বলেছে যে, ঢাকা এলে এর সদস্যরা বিপন্ন হয়ে পড়বে এবং তার 'ডবল জিম্মি' হয়ে যাবে। এরপর এই দল থেকে এই মর্মে মতপ্রকাশ করা হয় যে, তারা যেসব শর্ত আরোপ করবে তা মেনে নিলেই শুধু তারা পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করবে। এরপর আরেক পর্যায়ে এই সংখ্যালঘু গ্রুপের সদস্যরা জাতীয় পরিষদ থেকে পদত্যাগেরও সিদ্ধান্ত নেয়। সবচেয়ে যা বিস্ময়কর তা হলো এই যে, ওই গ্রুপের পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেয়ার সাথে সাথেই আইনগত কাঠামো আদেশে আনা হলো একটি সংশোধনী। এতে বলা হলো— পরিষদের অধিবেশন শুরু হওয়ার আগেই সদস্যরা ইচ্ছা করলে পদত্যাগ করতে পারবেন। কিন্তু এরপর ওই সংখ্যালঘু গ্রুপ সিদ্ধান্ত নিলেন পদত্যাগ না করার। এই দলের এই এলোপাতাড়ি ইচ্ছা-অনিচ্ছা চরমে পৌঁছলো ২৭ ফেব্রুয়ারি। সেদিন এই দল থেকে ঘোষণা করা হলো যে, এই দলটির অংশগ্রহণ ছাড়া যদি পরিষদের অধিবেশন বসে তাহলে এই দল এক গণআন্দোলন শুরু করবে। এই দল এতদূর পর্যন্ত বলতে পারল যে, পরিষদের অধিবেশনে যারা যোগদান করবে, তাদের ওপর জনগণ পূর্ণ প্রতিশোধ নেবে এবং জনগণ যদি প্রতিশোধ নিতে ব্যর্থ হয় তাহলে এই দলটিই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এই দলটি থেকে আরো হুমকি দেয়া হয় যে, এই দলের কোনো সদস্য যদি পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করে তাহলে দলীয় কর্মীরাই তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেবে। এ সময়ের মধ্যে আমাদের পার্লামেন্টারি পার্টি ঢাকায় সমবেত হন এবং পশ্চিম অঞ্চলের বিভিন্ন প্রদেশ থেকেও পরিষদ সদস্যরা ঢাকা আসতে শুরু করেন।

প্রধান নির্বাচন কমিশনারও ঢাকা এসে পৌঁছেন এবং ২ মার্চ পরিষদের মহিলা সদস্যদের নির্বাচন হবে বলে ঘোষণা করেন। উদ্বোধনী অধিবেশনের জন্য প্রেসিডেন্টের নিজেরও ১ মার্চ ঢাকা আসার সম্ভাবনা ছিল।

শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ব্যাপারে আমাদের নিজেদের অবস্থানও আমরা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেছিলাম ২৪ ফেব্রুয়ারি তারিখে প্রদত্ত আমাদের বিবৃতিতে। এতে আমরা পাকিস্তানের প্রত্যেক অংশ থেকে জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত প্রতিটি সদস্যকে আবারও আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম এই ঐতিহাসিক কাজে আমাদের সহযোগিতা করার জন্য। গত ২৭ ফেব্রুয়ারি আমরা এই পর্যন্তও বলেছিলাম যে, কোনো সদস্য ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত কিছু পরিষদের উত্থাপন করলে আমরা তা মেনে নেবো। কিন্তু সে প্রস্তাবও উপেক্ষা করা হয় এবং তা করা হয় সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃতভাবেই।

পহেলা মার্চ এক বেতার বিবৃতিতে আকস্মিক ও অহেতুকভাবে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়। এ জন্য অজুহাত দেখানো হয়, সমঝোতা সৃষ্টির জন্য আরো সময়ের প্রয়োজন রয়েছে। এ কথা বলা হয় পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে রাজনৈতিক বিরোধ চলছে। বাংলাদেশের মানুষ কি এর থেকে মনে করতে পারে না যে, একটি অগণতান্ত্রিক সংখ্যালঘু নির্দেশে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন করা হচ্ছে? তারা কি যুক্তিসঙ্গতভাবেই ভাবতে পারে না যে, একটি সংখ্যালঘু গ্রুপ শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতিকে ব্যাহত করা এবং সংখ্যাগুরু জনসাধারণকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে কতিপয় শক্তির সাথে হাত মিলিয়েছে? দ্রুত সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণ থেকে এসব সন্দেহ আরো দৃঢ়তর হয়ে ওঠে। এতে প্রমাণ হয় 'রাজনৈতিক বিরোধ' অচিরেই 'সামরিক বিরোধের' রূপ নিচ্ছে, যদি না সংখ্যাগুরু সংখ্যালঘুর নির্দেশের কাছে মাথানত না করে।

কার্যত ২৪ ফেব্রুয়ারির বিবৃতিতে আরও হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলাম, যখনই আমাদের দেশে জনসাধারণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতা গ্রহণ করতে গেছে, তখনই জঘন্য চক্রান্ত কারীরা তাতে হস্তক্ষেপ করেছে। দেশের পশ্চিমাঞ্চলের কায়েমি স্বার্থের প্রতিভূ গোটা কয় ব্যক্তি গণতন্ত্রকে বাঞ্চাল করে বাংলাদেশে ৭ সাত কোটি মানুষকে বঞ্চনা করেছে, তেমনি পশ্চিমাঞ্চলের সাধারণ মানুষকেও তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। ১৯৫৩ সালে ক্ষমতাসীন পাঞ্জাবি জোটের চক্রান্তে বাঙালি প্রধানমন্ত্রী বরখাস্ত হন। একই চক্র ১৯৫৪ সালে বাংলার নির্বাচিত সরকার এবং খোদ গণপরিষদকেই ভেঙে দেয়। ১৯৫৯ সালের গোড়ার দিকে সাধারণ নির্বাচন হবার কথা ছিল, পাঞ্জাবের কায়েমি স্বার্থ সেখানেও আবার আঘাত হানে এবং ক্ষমতা জবরদখল করে নেয়। কিন্তু তাদের এ কথা জেনে রাখা দরকার, বাংলাদেশের জাগ্রত জনসাধারণ এবং পশ্চিমাঞ্চলের নির্যাতিত জনতা সম্ভাব্য সব উপায়ে তাদের এই হীন চক্রান্ত প্রতিরোধ করবেই।

সত্যের খাতিরে আমি পরিষ্কারভাবে বলে দিতে চাই, গোলটেবিল বৈঠকে জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হোক, এ ধরনের কোনো ধারণাই আমি দিই নাই। আমি প্রেসিডেন্টকে কেবল এ কথাই জানিয়ে দিয়েছিলাম, বাংলাদেশে কি মারাত্মক পরিস্থিতি বিরাজ করছে তা দেখা এবং যথেচ্ছভাবে নিরস্ত্র জনসাধারণকে হত্যা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে তাঁর ঢাকা আসা উচিত। প্রেসিডেন্ট প্রস্তাবিত পূর্ববর্তী বৈঠকের ব্যাপারে ঘটনা হচ্ছে এই যে,

আমরা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, কয়েক সপ্তাহ আগ থেকেই কার্যনির্বাহী কমিটি ও পার্লামেন্টারি বোর্ডের বৈঠক নিয়ে ব্যস্ত থাকায় তখন আমদের পক্ষে রাওয়ালপিণ্ডি যাওয়া সম্ভব ছিল না। অধিকন্তু, আমরা এ কথাও জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, শাসনতান্ত্রিক সমস্যাদি গোপন আলোচনার বদলে জাতীয় পরিষদ ও তার কমিটিসমূহের মাঝেই সমাধান করা উচিত এবং একবার জাতীয় পরিষদ গঠিত হবার পর গোলটেবিল কিংবা গোপন বৈঠকের কোনো যুক্তিই নাই।

আওয়ামী লীগ কোনোভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের পথে বাধা সৃষ্টি করেছে এ অভিযোগের জবাবেই আমি এসব কথা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করলাম। এ ধরনের বাধা সৃষ্টি থেকে যাদের ফায়দা হতে পারে। সংখ্যাগুরু দল তাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। দেশের জনসাধারণ এবং কার্যত সারাবিশ্বের কাছেই আজ একথা পরিষ্কার যে, পশ্চিমাঞ্চলের একটি সংখ্যালঘু গ্রুপ ক্ষমতা হস্তান্তরের পথে বাধা সৃষ্টি করেছে এবং করে চলেছে। দেখা যাচ্ছে প্রেসিডেন্ট নিজে এই সংখ্যালঘু চক্রটির নির্দেশে নতি স্বীকার করাকেই তাঁর নৈতিক কর্তব্য বলে ধরে নিয়েছেন। একটি সংখ্যালঘু চক্র যদি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকেই বাঞ্চাল করার জন্য কায়েমি স্বার্থের সাথে চক্রান্তে লিপ্ত হয়, তবে গণতান্ত্রিক জীবনব্যবস্থা কায়েম কিংবা জনসাধারণের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর অসম্ভব। শেষ পর্যন্ত যদি গণতান্ত্রিক জীবনব্যবস্থাই বাঞ্চাল এবং প্রস্তাবিত ক্ষমতা হস্তান্তর ব্যর্থ হয় তবে তার দায়িত্ব এই সংখ্যালঘু চক্র এবং তার সাথে চক্রান্তকারীদেরই বইতে হবে।

এসব মহলই কি সেই 'গুটিকয়েক লোক' নয়, যারা একত্রে বসবাসের ভিত্তি উদ্ভাবনের জন্য জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রচেষ্টার ওপর মারাত্মক আঘাত হেনেছে? প্রতিটি সুস্থমনা ব্যক্তিই আজ যে প্রশ্নটি উত্থাপন করবেন তা হচ্ছে : বাংলাদেশের সর্বত্র নিরস্ত্র জনতাকে গুলি করে সেনাবাহিনী 'পাকিস্তানের সংহতি, অখণ্ডতা ও নিরাপত্তা' নিশ্চিত করার দায়িত্ব পালন করেছে, না অন্য কিছু? এ ভূমিকা নিয়ে তারা কি কার্যত বিচ্ছিন্নতার প্রধান শক্তি হিসেবে কাজ করছে না? নির্বাচন হয়ে যাবার পর এখন দেশে ক্ষমতার একমাত্র বৈধ উৎস হচ্ছে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা। কোনো ব্যক্তিবিশেষই নিজেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের চেয়ে অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন বলে দাবি করতে পারেন না।

বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে আমরা এটা দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করছি, বাংলাদেশে আমরাই একমাত্র বৈধ উৎস। অবশ্য সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আমরা সমগ্র দেশের জন্যও ক্ষমতার বৈধ উৎস। গত সাত দিনের ঘটনাবলি প্রমাণ করেছে যে, বাংলাদেশের সর্বত্র সরকারের সমস্ত শাখা আমাদের বৈধ ক্ষমতার উৎস হিসেবে মেনে নিয়েছে এবং আমাদের নির্দেশাবলি মেনে চলেছে।

প্রেসিডেন্ট ও ইসলামাবাদস্থ সরকারকে এই মূল সত্য মেনে নিতে হবে। কাজেই জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে কারো হস্তক্ষেপ না করা বাংলাদেশের জনগণের ঘোষিত ইচ্ছার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

এরপর আমাদের আসতে হয় আগামী ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের কথায়। আমরা বহুবার এ অধিবেশন আহ্বানের জরুরি প্রয়োজনীয়তার কথা জোর দিয়ে বলেছি। কিন্তু আজ এক অস্বাভাবিক এবং মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়েছে। বাংলাদেশের বেসামরিক জনগণকে সামরিক শক্তির সাহায্যে মোকাবিলা করার নীতির অনুসরণে প্রকৃতপক্ষে এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা হয়েছে। হাজার হাজার মানুষ হতাহত হয়েছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ ও বিশ্বের সর্বত্র সুবিবেচক জনগণসহ সব দিক থেকে এই গণহত্যা বন্ধ করতে হবে বলে আওয়াজ তোলা হচ্ছে।

জাতীয় পরিষদের সদস্যরা ভীতিপ্রদ পরিবেশে কাজ করবেন এটা আশা করা যায় না। যতক্ষণ পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য ও অস্ত্র আমদানিসহ এই মোকাবিলাজনিত অবস্থা বজায় থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত এই নির্যাতনের পরিবেশ অব্যাহত থাকে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত বাংলাদেশে বিভিন্ন অংশ থেকে বেসামরিক জনতার ওপর প্রতিনিধি সামরিক বাহিনীর গুলিবর্ষণের খবর আসতে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে নির্বাচিত সদস্যরা বন্দুকের মুখে জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের বিষয় বিবেচনা করবেন, এটা আশা করা যায় না।

যদি প্রেসিডেন্ট আন্তরিকভাবে কামনা করেন যে, জাতীয় পরিষদ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সার্বভৌম পরিষদ হিসেবে কাজ করবে, তাহলে অবিলম্বে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে :

(ক) অবিলম্বে সকল সৈন্যকে ছাউনিতে ফিরিয়ে নিতে হবে।

(খ) বেসামরিক জনগণের ওপর গুলিবর্ষণ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে, যাতে এখন থেকে একটা বুলেটও ছোড়া না হয়।

(গ) সামরিক শক্তিবৃদ্ধি এবং দেশের পশ্চিম অংশ থেকে বিপুলসংখ্যক সৈন্য আমদানি অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।

(ঘ) বাংলাদেশে সরকারের বিভিন্ন শাখায় কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ চলবে না এবং সরকারি অফিসার ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আক্রমণজনিত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিতে হবে।

(ঙ) আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার কাজ কেবলমাত্র পুলিশ ও বাঙালি ইপিআর বাহিনীর হাতে ন্যস্ত করতে হবে। যখনই প্রয়োজন হবে আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবকরা তাঁদের ওই কাজে সহায়তা করবেন।

(চ) অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে।

(ছ) অবিলম্বে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

যদি সামরিক মোকাবিলা চলতে থাকে এবং আমাদের নিরস্ত্র জনগণের ওপর বুলেট নিক্ষেপ অব্যাহত থাকে, তবে সন্দেহের কোনো অবকাশ না রেখে আমি বলতে চাই যে, সে অবস্থায় কোনো জাতীয় পরিষদই কাজ করতে পারবে না।

আমাদের জনগণ ইতিমধ্যেই বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁরা তাঁদের আর উপনিবেশ অথবা বাজার হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেবেন না। তাঁরা একটি স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হবার দৃঢ়সংকল্প প্রকাশ করেছেন। আমাদের অর্থনীতিকে অবশ্যই ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। আমাদের মেহনতি জনগণকে অনাহার, রোগ ও বেকারত্ব থেকে বাঁচাতে হবে। ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত এলাকার লাখ লাখ লোকের পুনর্বাসনের কাজ এখনো বাকি রয়েছে। যদি শাসকগোষ্ঠী এ সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ করে দেয়ার চেষ্টা করে, তাহলে মুক্তির জন্য দীর্ঘ ও নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালাতে জনগণও প্রস্তুত। যে মুক্তির জন্য অনেক শহীদের রক্ত ঝরেছে এবং যার জন্য বহু লোক আত্মত্যাগ স্বীকার করেছেন, জনগনের সেই চরম লক্ষ্যে পৌঁছার সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। শহীদের রক্ত কখনো বৃথা যাবে না।

আমাদের সংগ্রামের প্রথম পর্যায় ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। আমাদের বীর জনগণ অদম্য সাহস ও সংকল্পের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁরা বীরত্বের সাথে বুলেটের মোকাবিলা করেছেন এবং সুপরিকল্পিভাবে সান্ধ্য আইন ভঙ্গ করেছেন। বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং বাঙালি ও তথাকথিত অবাঙালিদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে দালাল, উস্কানিদাতা ও সমাজবিরোধী ব্যক্তিদের দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য আমি আমাদের জনগণ ও আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবকদের প্রতিও অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি আবার বলছি যে, বাংলাদেশে বসবাসকারী প্রতিটি লোকই বাঙালি এবং তার শারীরিক নিরাপত্তা, সম্পদ ও মর্যাদা রক্ষা করা আমাদের পবিত্র দায়িত্ব এবং যে কোনো মূল্যে তা রক্ষা করতে হবে। আমাদের সংগ্রামের বর্তমান পর্যায়ের লক্ষ্য হচ্ছে অবিলম্বে সামরিক শাসনের অবসান ঘটানো এবং জনগণকে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা। যতক্ষণ পর্যন্ত এই লক্ষ্য অর্জিত না হয়, আমাদের অহিংস অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।

আগামী এক সপ্তাহের কর্মসূচি :

১৯৭১ সালের ৮ মার্চ থেকে এক সপ্তাহের জন্য নিম্নলিখিত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে :

(১) খাজনা-ট্যাক্স বর্জন আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।

(২) সেক্রেটারিয়েট, সরকারি ও আধা-সরকারি অফিস, হাইকোর্ট ও বাংলাদেশের অন্যান্য আদালত হরতাল পালন করবে। মাঝে মাঝে প্রয়োজনবোধে এ ব্যাপারে কোনো কোনো অংশকে হরতালের আওতামুক্ত ঘোষণা করা হবে।

(৩) রেলওয়ে ও বন্দরগুলো চালু থাকতে পারে। কিন্তু যদি জনগণের ওপর নির্যাতন চালানোর উদ্দেশ্যে সৈন্য সমাবেশের জন্য রেলওয়ে ও বন্দরগুলোকে ব্যবহার করা হয় তাহলে রেলওয়ে শ্রমিকরা সহযোগিতা করবেন না।

(৪) বেতার, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রগুলোকে আমাদের বিবৃতিসমূহের পূর্ণ বিবরণ প্রচার করতে হবে এবং তারা জনগণের আন্দোলন সম্পর্কে খবর গোপন করতে পারবে না, অন্যথায় এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত বাঙালিরা সহযোগিতা করবেন না।

(৫) কেবল স্থানীয় এবং আন্তঃজেলা ট্রাঙ্ক টেলিফোন যোগাযোগ চালু থাকবে।

(৬) সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে।

(৭) ব্যাংকগুলো স্টেট ব্যাংকের মাধ্যমে অথবা অন্য কোনো উপায়ে দেশের পশ্চিম অংশে অর্থ পাচার করতে পারবে না।

(৮) প্রতিদিন সকল ভবনে কালো পতাকা উত্তোলন করতে হবে।

(৯) অন্য সকল ক্ষেত্র থেকে হরতাল প্রত্যাহার করা হয়েছে। কিন্তু অবস্থা বিশেষে যে কোনো সময় উপরোক্ত ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ অথবা আংশিক হরতাল ঘোষণা করা হতে পারে।

(১০) প্রতি ইউনিয়ন, মহল্লা, থানা, মহকুমা ও জেলায় স্থানীয় আওয়ামী লীগ ইউনিটের নেতৃত্বে একটি করে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করতে হবে।

[সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান, ৮ই মার্চ, ১৯৭১]

অগ্নিঝরা উত্তাল মার্চের দিনগুলো

১ মার্চ, ১৯৭১

মুক্তি সংগ্রামের শেষ ধাপের প্রতিরোধটিই শুরু হয়েছিল ১৯৭১ সালের ১ মার্চ। পাকিস্তানের সামরিক একনায়ক জেনারেল ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করার চক্রান্তমূলক ঘোষণা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপামর বাঙালি সবকিছু বন্ধ করে দিয়ে রাস্তায় নেমে আসে সেদিন। সেই শুরু, স্বাধিকারের দাবিতে গণজোয়ার ওঠে বঙ্গোপসাগর বিধৌত বাংলায়। 'পতাকা শোভিত স্লোগানমুখর ঝাঁঝালো মিছিল'– এ উত্তাল বাংলাদেশ। স্বাধীনতার মহাকাব্যের একেকটি অধ্যায় রচিত হচ্ছে প্রতিদিন। সেই মহাকাব্যের নায়ক এ দেশের আপামর জনসাধারণ।

দুপুরে টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত গর্জে ওঠে বাংলাদেশ। স্বতঃস্ফূর্তভাবে শুরু হয় পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে সর্বাত্মক অসহযোগ। কিন্তু জনতা নেতৃত্বশূন্য ছিল না। নির্বাচিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে দেশ চলছিল ২৫ মার্চ অসহযোগ আন্দোলনের শেষ দিনটি পর্যন্ত। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে তৎকালীন পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ অর্থাৎ তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৬ দফার পক্ষে আওয়ামী লীগকে নিরঙ্কুশ বিজয় এনে দিয়েছিল। তিনি গোটা পাকিস্তানেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেন। পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে তখন চলছিল প্রাসাদ ষড়যন্ত্র। ৩ মার্চ প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকায় পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের পরপরই পশ্চিম পাকিস্তানের নেতা পিপলস পার্টি প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো অধিবেশন বয়কটের ঘোষণা দেন। বাঙালির হাতে পাকিস্তানের শাসনভার ছেড়ে দেয়া যাবে না– এ মনোভাব থেকে ভুট্টো পাকিস্তানের দুই অংশের জন্য দু'জন প্রধানমন্ত্রী দাবি করেন।

আকস্মিক এক বেতার ঘোষণায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ৩ মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠেয় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। প্রেসিডেন্ট বেতার ঘোষণায় বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান দল পিপলস পার্টিসহ কয়েকটি দল ৩ মার্চের জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান না করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। পশ্চিম পাকিস্তানের জনপ্রতিনিধিদের ছাড়া ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশন অনুষ্ঠান করতে গেলে গোটা পরিষদটাই ভেঙে পড়তে পারে।

বেতারে প্রেসিডেন্টের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণার বিবৃতি প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকা প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে

পড়ে। দল-মত-নির্বিশেষে সব শ্রেণীর ক্ষুব্ধ মানুষ রাস্তায় নেমে আসে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে শহরের সব দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। সরকারি-বেসরকারি অফিস ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্র-শিক্ষক, কলকারখানার শ্রমিক ও আদালতের আইনজীবীরা রাস্তায় নেমে আসেন। মিছিলকারীদের ইয়াহিয়া ও ভুট্টোবিরোধী স্লোগানে ঢাকার আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। ঢাকা স্টেডিয়ামে বিসিসিপি ও আন্তর্জাতিক একাদশের মধ্যে অনুষ্ঠানরত ক্রিকেট ম্যাচ ভণ্ডুল হয়ে যায়। দর্শকরা স্টেডিয়াম থেকে বের হয়ে মিছিলে শরিক হন। মিছিলগুলো বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে নির্দেশ লাভের উদ্দেশ্যে মতিঝিলের হোটেল পূর্বাণীর দিকে অগ্রসর হতে থাকে। বেলা ৩টার দিকে হোটেল পূর্বাণীর সামনে লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। বিকেলে হোটেল পূর্বাণীতে আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির বৈঠক শুরু হয়। সেখানে হাজার হাজার মানুষ বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ লাভের আশায় প্রতীক্ষা করতে থাকেন। বঙ্গবন্ধু বৈঠক থেকে উঠে এসে জনতাকে ধৈর্য না হারিয়ে পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান।

এরই মধ্যে পল্টন ময়দান জনসমুদ্রে পরিণত হয়। রাজধানীর বিভিন্ন মহল্লা ও শহরতলী থেকে একের পর এক মিছিল পল্টনের দিকে আসতে থাকে। পল্টনের অনির্ধারিত স্বতঃস্ফূর্ত জনসমাবেশে ছাত্র ও আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ভাষণ দেন।

এদিকে শহরের বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা খণ্ড খণ্ড মিছিল করে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সমবেত হতে থাকে। এসব মিছিল শহীদ মিনারে ক্ষণিক অবস্থানের পর প্রথমে হোটেল পূর্বাণীর সামনে সমবেত হয়ে পরে পল্টন ময়দানে গিয়ে জমায়েত হয়। সেখানে ছাত্র নেতৃবৃন্দ পরদিন ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন।

অধিবেশন স্থগিতের খবর ছড়িয়ে পড়ার পর ঢাকায় বিমান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ঢাকা বিমানবন্দর ও পিআইএর (পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্স) মতিঝিল অফিসের কর্মীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অফিস ছেড়ে চলে যান। গভীর রাত পযন্ত মিছিলের পর মিছিল শহরের রাজপথ-অলিগলি প্রদক্ষিণ করতে থাকে। সন্ধ্যায় ঢাকার সংবাদপত্রগুলো বিশেষ বুলেটিন সংখ্যা বের করে।

প্রদেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সংবাদপত্রে পাঠানো বিবৃতিতে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে প্রেসিডেন্টের ঘোষণাকে জনগণের সার্বভৌম পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর নস্যাৎ করার উদ্যোগ বলে অভিহিত করে।

আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির বেঠক শেষে হোটেল পূর্বাণীতে এক জনাকীর্ণ সংবাদ সম্মেলনে শেখ মুজিবুর রহমান প্রেসিডেন্ট কর্তৃক জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার কঠোর প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, বাংলার জনগণ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার এ সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তিনি এ সিদ্ধান্তর প্রতিবাদে সর্বাত্মক আন্দোলনের

কর্মসূচি হিসেবে ২ মার্চ ঢাকা শহরে ও ৩ মার্চ সারা বাংলায় হরতাল পালন এবং ৭ মার্চ রেসকোর্সে (সোহরাওয়ার্দী) জনসভা অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করেন। ৭ মার্চের জনসভায় বঙ্গবন্ধু সর্বাত্মক আন্দোলনের পূর্ণাঙ্গ কর্মপন্থা ঘোষণা করবেন বলে জানান।

বঙ্গবন্ধু জনগণকে যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, পরিষদ অধিবেশন স্থগিত করার আগে তাকে জানানো হয়নি। তার সঙ্গে কোনো আলোচনা হয়নি। তিনি উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে মওলানা ভাসানী, নূরুল আমীন, আতাউর রহমান খান ও অধ্যাপক মোজাফফর আহমদের সঙ্গে আলোচনা করার সিদ্ধান্ত নেন। বঙ্গবন্ধু বলেন, আমরা যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে প্রস্তুত। জনগণ আমাদের সঙ্গে আছে। আমরা ভালোই আশা করি এবং চরম অবস্থার জন্য প্রস্তুত আছি। তিনি বলেন, ৭ মার্চ পর্যন্ত কর্মসূচি ঘোষণা করেছি। আমার দল আমাকে যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা দিয়েছে।

রাতে প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল এএম ইয়াহিয়া খান 'খ' অঞ্চলের (পূর্ব পাকিস্তান) সামরিক শাসনকর্তা লে. জেনারেল সাহেবজাদা এম ইয়াকুব খানকে প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত করেন। তিনি গভর্নর ভাইস এডমিরাল এমএম আহসানের স্থলাভিষিক্ত হন। গভীর রাতে 'খ' অঞ্চলের সামরিক প্রশাসক এক নতুন আদেশ জারি করে সংবাদপত্রে দেশের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে কোনো খবর বা ছবি প্রকাশ না করার নির্দেশ দেন।

রাতে বঙ্গবন্ধু তার ৩২ নম্বর ধানমণ্ডির বাসভবনে পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে আলোচনা বৈঠকে মিলিত হন। সন্ধ্যার পর তিনি সন্তোষে মওলানা ভাসানীর সঙ্গে আলোচনার জন্য তার প্রতিনিধি পাঠান।

২ মার্চ, ১৯৭১

পাকিস্তানের সামরিক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিতের আকস্মিক ঘোষণা দানের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে ১ মার্চ থেকে শুরু হয় বাঙালি জাতির অসহযোগ আন্দোলন। সেই আন্দোলন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি জনগোষ্ঠীকে দেখিয়েছিল মুক্তি ও স্বাধীনতার পথ। সেদিন পাকিস্তানি শাসকদের রক্তচক্ষু কিংবা মৃত্যুভয় কোনোকিছুই মুক্তিপাগল বাঙালির সংগ্রামী মনোভাবকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। মার্চের দ্বিতীয় দিন রাতে ঢাকায় কারফিউ ভঙ্গকারী জনতার ওপর মেশিনগান দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে পাকিস্তানি সেনারা। রক্তাক্ত হয় রাজপথ। স্বাধীনতার সোপানে প্রথম আত্মাহুতি। সকাল থেকেই সারা ঢাকায় দল-মত-নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষ সর্বাত্মক হরতালে অংশ নিয়ে রাজধানীতে চূড়ান্ত অচলাবস্থা সৃষ্টি করে। হাজার হাজার মানুষ বাঁশের লাঠি ও লোহার রড হাতে রাজপথে নেমে আসে। সারাদেশে মানুষ এক ও অভিন্ন হয়ে স্বাধিকারের দাবিতে উত্তাল হয়ে ওঠে। সভা-সমাবেশ থেকে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা দেয়া হয়, 'স্বাধিকারের প্রশ্নে কোনো আপস নেই।'

বেলা ১১টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের ডাকে এক বিশাল ছাত্র জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ডাকসুর সভাপতি আ স ম আবদুর রব সংগ্রামী ছাত্রসমাজের পক্ষে প্রথম বাংলাদেশের মানচিত্র অংকিত 'স্বাধীন বাংলার পতাকা' উত্তোলন করেন। সবুজ জমিনের মাঝখানে লাল বৃত্তের মধ্যে সোনালি মানচিত্র। ছাত্ররা জীবন দিয়ে স্বাধীনতা আনার শপথ নেন।

বিকেলে বায়তুল মোকাররম ও পল্টন ময়দানে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যার পর সামরিক কর্তৃপক্ষ আকস্মিক পুরো শহরে রাত ৯টা থেকে পরদিন ৩ মার্চ সকাল ৭টা পর্যন্ত কারফিউ জারি করে। রাতে এক ঘোষণায় অনির্দিষ্টকালের জন্য প্রতিদিন সন্ধ্যা ৭টা থেকে সকাল ৭টা পর্যন্ত ঢাকায় কারফিউ জারির ঘোষণা দেয়া হয়। বেতারে কারফিউ জারির ঘোষণা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে শহরের বিভিন্ন এলাকায় স্বতঃস্ফূর্ত জনতা রাস্তায় নেমে ব্যারিকেড দেয়। গভীর রাত পর্যন্ত কারফিউ ভঙ্গ করে মিছিল হয়। 'জয় বাংলা', জয় বঙ্গবন্ধু' স্লোগানে রাতের ঢাকার নিস্তব্ধতা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। রাতে নগরীর বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তানি সেনারা বিক্ষোভকারীদের ওপর মেশিনগান থেকে গুলিবর্ষণ করে। ঘটনাস্থলে ২৩ জন নিহত ও ৩ শতাধিক আহত হন। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নগরীর হাসপাতালগুলোতে বুলেটবিদ্ধ লোকের ভিড় বাড়তে থাকে।

গভীর রাতে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান এক বিবৃতিতে ঢাকায় নিরস্ত্র জনতার ওপর গুলিবর্ষণের কঠোর নিন্দা করে দৃপ্তকণ্ঠে উচ্চারণ করেন, 'বাংলাদেশে আগুন জ্বালাবেন না। যদি জ্বালান, সে দাবানল থেকে আপনারাও রেহাই পাবেন না।' বঙ্গবন্ধু প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার উদ্দেশে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, 'সাবধান, শক্তি দিয়ে জনগণের মোকাবেলা করবেন না।' বিবৃতিতে তিনি উল্লেখ করেন, 'নিরস্ত্র জনতার ওপর গুলিবর্ষণ গণহত্যারই শামিল এবং তা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ। তিনি বলেন, যেসব বিমান পশ্চিমাঞ্চল থেকে গণপ্রতিনিধি বহন করে আনতে পারতো, সেসব বিমানে করে এখন সামরিক বাহিনীর লোকজন ও সামরিক সরঞ্জাম আনা হচ্ছে।

বঙ্গবন্ধু জনতার ওপর গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে ৬ মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত সারাদেশে হরতাল পালনের আহ্বান জানান। ৩ মার্চ জাতীয় 'শোক দিবস' পালনের ডাক দেন। তিনি জাতির উদ্দেশে আহ্বান জানান, 'সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল পালন করুন। লুটতরাজ ও অগ্নিসংযোগের অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে তার প্রতি কড়া নজর রাখুন।

ওদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের করাচিতে এক সংবাদ সম্মেলনে পিপলস পার্টি প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো বলেন, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখা হয়নি। সত্যিকার ফেডারেশনে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পরিষদ গঠিত হওয়া উচিত। লাহোরে এক সংবাদ সম্মেলনে কাউন্সিল লীগ নেতা এয়ার মার্শাল (অব.) নূর খান মার্চ মাসের মধ্যে জাতীয় অধিবেশন ডাকার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, অবিলম্বে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান না করলে দেশ এক ভয়াবহ ক্ষতির মুখোমুখি হবে।

৩ মার্চ, ১৯৭১

সারা দেশ অচল। সর্বত্র অসহযোগ; অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় সব বন্ধ। বন্ধ বিমানবন্দর, নৌবন্দর ও রেল চলাচল। ঢাকায় দ্বিতীয় দিনও দেশব্যাপী প্রথম দিনের মতো পালিত হয় সর্বাত্মক হরতাল। হরতাল পালনকালে চট্টগ্রাম, রংপুর ও সিলেটসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে মিছিলে পাকিস্তানি সেনাদের গুলিবর্ষণে শতাধিক ব্যক্তি নিহত হন। চট্টগ্রাম, রংপুর ও সিলেটে সেনাবাহিনীর সঙ্গে ক্ষুব্ধ জনতার সংঘর্ষ হয়। এ ঘটনায় দুপুরে রংপুরে ও সন্ধ্যায় সিলেটে কারফিউ জারি করা হয়। চট্টগ্রামে অগ্নিকাণ্ড, হামলা, প্রতিহামলা, সংঘর্ষ ও সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণের ঘটনায় নিহত হন ৭৫ জন, আহত কয়েকশ'। ঢাকায় বুলেট, বেয়নেট ও বোমায় আহত ১২০ জনকে বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মালিবাগে জাতীয় পরিষদ সদস্য ও আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির হুইপ আবদুল মান্নান সেনাবাহিনীর অবাঙালি জওয়ানদের হাতে প্রহৃত হন। ঢাকায় হরতালের সময় জনতা আগের রাতে সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহতদের লাশ নিয়ে শোক মিছিল করে। ছাত্র-শ্রমিক-যুবক সারাদিন রাস্তার রাস্তায় লাঠিসোটা নিয়ে মিছিলে অংশ নেন। বিকেলে ছাত্রলীগের উদ্যোগে পল্টন ময়দানে ছাত্র-জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। বিশাল সমাবেশ থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে 'স্বাধীন বাংলার রাষ্ট্রপতি ও সর্বাধিনায়ক' হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়। বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতিতে এ সমাবেশে ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজ 'স্বাধীনতার ইশতেহার' পাঠ করেন। ছাত্রলীগের পক্ষে ঘোষিত ইশতেহারে জাতীয় পতাকা, জাতীয় সঙ্গীত, ভৌগোলিক সীমারেখা ও রাষ্ট্রীয় মূলনীতি নির্দিষ্ট করে স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় রূপরেখা বর্ণনা করা হয়।

পল্টন ময়দানে ছাত্র-জনসভায় বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন, 'বাংলার গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা সমর্পণ করে সেনাবাহিনী ব্যারাকে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত সরকারের সঙ্গে স্বাাধিকারকামী বাংলার মানুষ আর সহযোগিতা করবে না। কোনো কর-খাজনাও দেবে না। বাংলার মানুষ খাজনা দেয়, ট্যাক্স দেয় রাষ্ট্র চালানোর জন্য; গুলি খাওয়ার জন্য নয়। অবিলম্বে সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিন। বাংলার শাসনভার বাংলার নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের হাতে তুলে দিন।'

বঙ্গবন্ধু সমাবেশ থেকে সরকারি-বেসরকারি চাকরিজীবীদের প্রতি নির্দেশ দেন, 'পুনরায় আদেশ না দেয়া পর্যন্ত আপনারা অফিস-আদালতে যাওয়া বন্ধ রাখুন।' তিনি প্রচার মাধ্যমের প্রতি নির্দেশ দিয়ে বলেন, 'যদি আমাদের বক্তব্য-বিবৃতি আমাদের আন্দোলনের খবর প্রকাশ-প্রচারের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়, সে আদেশ আপনারা মানবেন না।' পাকিস্তান পিপলস পার্টি প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টোর উদ্দেশে তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক নিয়মে প্রণীত 'এক সংবিধান' যদি না চান তাহলে আপনাদের সংবিধান আপনারা রচনা করুন। বাংলাদেশের সংবিধান আমরাই রচনা করবো। পল্টনের উত্তাল জনসমুদ্রে বঙ্গবন্ধু আরো ঘোষণা করেন, 'দানবের সঙ্গে সংগ্রামের জন্য

আমরা প্রস্তুত। দেশের মেজরিটি জনগণ আমার পেছনে। ৭ মার্চ রেসকোর্সে আমার বক্তৃতা করার কথা। কিন্তু সে সুযোগ আমাকে নাও দেওয়া হতে পারে। আমি যদি নাও থাকি, আন্দোলন যেন না থামে। আমি থাকি আর না থাকি, আমার সহকর্মীরা আছেন। তারাই নেতৃত্ব দেবেন, যে কোনো মূল্যে বাংলার স্বাধিকার ছিনিয়ে আনতে হবে।'

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১০ মার্চ ঢাকায় পাকিস্তানের উভয় অংশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সম্মেলন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধু প্রেসিডেন্ট আহূত ঢাকা সম্মেলনে যোগদানের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে এক বিবৃতিতে বলেন, 'যখন বহু শহীদের নশ্বর দেহ দাফনের প্রতীক্ষায় পড়ে আছে, শত শত বুলেটবিদ্ধ মানুষ হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ে চলেছে, সে মুহূর্তে এ সম্মেলনের আমন্ত্রণ নিষ্ঠুর তামাশা।' সন্ধ্যায় করাচিতে পিপলস পার্টি ঘোষণা করে, পার্টি প্রধান জেডএ ভুট্টো ১০ মার্চ ঢাকায় সম্মেলনে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

৪ মার্চ, ১৯৭১

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বস্তুত কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে চলে ব্যাংক, রাষ্ট্রীয় প্রচার মাধ্যম, সরকারি অফিস, সংস্থা, সবকিছু– যা ইতিহাসে নজিরবিহীন। কোনো সরকারি প্রজ্ঞাপন নয়, বঙ্গবন্ধু যা নির্দেশ দেন বেতার-টিভি ও খবরের কাগজে সেসব প্রচার করা হতো। অসহযোগ আন্দোলনের মুখে মার্চের প্রথম সপ্তাহেই প্রদেশের বেসরকারি শাসন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে। আজকের দিনে ঢাকার রাজারবাগ পুলিশলাইন ও পিলখানা ইপিআর ব্যারাকে বাঙালি পুলিশ এবং সীমান্তরক্ষীরা 'জয় বাংলা' স্লোগান কণ্ঠে ধারণ করে জনগণের আন্দোলনের একাত্মতা ঘোষণা করে।

সারাদেশে ছাত্র-জনসভা, মিছিল ও শহীদদের জন্য গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকায় সর্বাত্মক হরতাল পালনকালে জনজীবন অচল হয়ে পড়ে। আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সদস্যরা শান্তিরক্ষায় শহরে টহল দেয়। ঢাকার সঙ্গে বাইরের জল, স্থল ও বিমান যোগাযোগ বন্ধ থাকে। টেলিফোন বিভাগের কর্মীরা পশ্চিম পাকিস্তানে ট্রাঙ্কল টেলিগ্রাম পাঠানোয় বিরত থাকেন। ওইদিন ঢাকার কারফিউ তুলে নেয়া হলেও খুলনা ও রংপুরে কারফিউ ছিল। খুলনায় হরতাল চলাকালে সেনাবাহিনীর গুলিতে ছয়জন নিহত হন। চট্টগ্রামেও গুলিবর্ষিত হয়। পাকিস্তানি সেনাদের গুলিতে আহত বীর সংগ্রামীদের প্রাণ রক্ষার্থে শত শত নারী-পুরুষ ও ছাত্রছাত্রী ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

সেনাবাহিনী যানবাহন প্রতিরোধের জন্য পথে পথে রেলবগি স্থাপন করে বাস-ট্রাক উল্টে দিয়ে, গাছ ফেলে, ইটের দেয়াল তুলে ব্যারিকেড তৈরির কাজে নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষ ছাত্রদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। বেতার ও টেলিভিশনে উদ্দীপক দেশাত্মবোধক গান প্রচারিত হতে থাকে। রেডিও পাকিস্তান ঢাকা কেন্দ্রে 'ঢাকা

বেতার কেন্দ্র' এবং রেডিও পাকিস্তান টেলিভিশন 'ঢাকা টেলিভিশন' নাম নিয়ে বাংলার মানুষের কাছে উপস্থিত হয়। বেতার, টেলিভিশন ও চলিচ্চত্র শিল্পীরা 'যতদিন পর্যন্ত দেশের জনগণ ও ছাত্রসমাজ সংগ্রামে লিপ্ত থাকবেন ততদিন পযন্ত' বেতার ও টেলিভিশন অনুষ্ঠানে অংশ না নেয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। সাংবাদিক সমাজ জনগণের মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে সিদ্ধান্ত নেন, সরকার বা মালিকপক্ষ আন্দোলনের বিপক্ষে যায় এমন কোনো নির্দেশ দিলে তা তারা মানবেন না। 'ঢাকা বেতার কেন্দ্র' এদিন থেকে 'স্থানীয়ভাবে তৈরি করা বাংলা সংবাদ' প্রচারে সিদ্ধান্ত নেয়।

অব্যাহতিপ্রাপ্ত প্রাদেশিক গভর্নর ভাইস এডমিরাল এসএম আহসান রাতে বিমানে করাচি রওনার আগে সাংবাদিকদের মাধ্যমে 'বাংলাদেশের জনগণকে শুভেচ্ছা' জানান।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক বিবৃতিতে যে কোন মূল্যে স্বাধিকার আদায়ের সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য জনগণকে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বিশ্ববাসী দেখুক, বাংলাদেশের নিরস্ত্র ছাত্র-শ্রমিক-জনতা বুলেটের মুখেও কি দুর্দান্ত সাহস ও দৃঢ়তা নিয়ে নিজেদের অধিকার হরণের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে।

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ৫ ও ৬ মার্চ সকাল ৬টা থেকে বেলা ২ পর্যন্ত হরতাল পালনের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করে বলেন, যেসব সরকারি ও বেসরকারি অফিসে এখনও বেতন হয়নি, শুধু বেতন দেয়ার জন্য সেগুলো আড়াইটা থেকে সাড়ে ৪টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। শুধু বাংলাদেশের মধ্যে ১৫০০ টাকা পর্যন্ত বেতনের চেক ভাঙানোর জন্য ওই সময় ব্যাংক চালু থাকবে। স্টেট ব্যাংকের মাধ্যমে বা অন্য কোনোভাবে বাংলাদেশের বাইরে টাকা পাঠানো যাবে না। রেশনের দোকান ও খাদ্য সরবরাহকারী সংস্থাগুলো দুপুরের পর সব খোলা থাকবে। হাসপাতাল, ওষুধের দোকান, অ্যাম্বুলেন্স, ডাক্তার ও সাংবাদিকদের গাড়ি, পানি-বিদ্যুৎ-গ্যাস সাপ্লাই, স্থানীয় টেলিফোন ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার মধ্যে টেলিফোন যোগাযোগ, দমকল ও আবর্জনার গাড়ি হরতালের আওতামুক্ত থাকবে।

সন্ধ্যায় পাকিস্তানে করাচি প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে এয়ার মার্শাল (অব.) আসগর খান বলেন, ঘটনা অনেক দূর চলে গেছে। তিনি দেশকে বিচ্ছিন্নতার হাত থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগের কাছে অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানান।

পিডিপি প্রধান নুরুল আমীন ঢাকায় এক বিবৃতিতে ১০ মার্চ ঢাকায় রাজনৈতিক নেতাদের সম্মেলনে যোগদানের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে প্রেসিডেন্টের প্রতি অবিলম্বে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকার আহ্বান জানান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৫ জন শিক্ষক পৃথক বিবৃতিতে ঢাকার 'পাকিস্তান অবজার্ভার' পত্রিকার গণবিরোধী ভূমিকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

কাইয়ুমপন্থী মুসলিম লীগের পদত্যাগী সাধারণ সম্পাদক আবদুস সবুর খান বিকালে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তার ধানমণ্ডির বাসভবনে সাক্ষাৎ করেন। ন্যাপপ্রধান মওলানা

ভাসানী সন্তোষ থেকে ঢাকায় এসে পাকিস্তান ন্যাশনাল লীগপ্রধান আতাউর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক শাহ আজিজুর রহমানের সঙ্গে বৈঠক করেন।

পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো করাচিতে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, দেশের সংহতির জন্য তার দল যতটুকু সম্ভব ছয় দফার কাছাকাছি হওয়ার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। ছয় দফা মেনে নেয়া ও উভয় অঞ্চলের আলাদা হওয়া–এ দুটির মধ্যে যে কোনো একটি যদি বেছে নিতে হয় তাহলে তিনি কোনটি বেছে নেবেন– সাংবাদিকদের এ প্রশ্নের জবাবে ভুট্টো পাল্টা প্রশ্ন করেন, দুটির মধ্যে কোনো মৌল পার্থক্য রয়েছে কি?

৫ মার্চ, ১৯৭১

ক্লাসরুমে তালা, ছাত্র-শিক্ষক রাজপথে। মিলের শ্রমিক, আদালতের উকিল, অফিসের কর্মচারী সবাই রাজপথে। নেতার নির্দেশ, দাবি আদায় না করে কেউ ঘরে ফিরবে না। অসহযোগ আন্দোলন দেশের কোথাও না কোথাও মানুষ আত্মাহুতি দিচ্ছে। তবু বাঙালি মাথা নোয়াবার নয়। ঢাকাসহ সারাদেশে স্বতঃস্ফূর্ত অর্ধদিবস হরতাল, স্বাধীনতাকামী জনতার বিক্ষুব্ধ মিছিল, গণজমায়েত ও বজ্রশপথের মধ্যে পার হয় মুক্তি আন্দোলনের পঞ্চম দিনটি। টঙ্গী, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহীতে পাকিস্তানি সেনারা মিছিলে গুলি চালায়। গুলিবর্ষণে অর্ধশতাধিক মিছিলকারী হতাহত হন। টঙ্গী শিল্পাঞ্চলে সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত হন ৪ শ্রমিক। আহত হন ২৫ জন। টঙ্গীর শ্রমিক মিছিলে গুলির খবর ঢাকায় পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে ওঠে ছাত্র-শ্রমিক-জনতা। টঙ্গীর শহীদদের লাশ ঢাকায় আনা হয়। ছাত্রলীগের নেতৃত্বে ক্ষুব্ধ ছাত্র-শ্রমিক-জনতা লাশ নিয়ে মিছিল বের করে। চট্টগ্রামে গুলিবর্ষণে নিহত হন ৩ জন মিছিলকারী। দিনটি ছিল শুক্রবার। মসজিদে মসজিদে জুমার নামাজের পর শহীদানের আত্মার শান্তি কামনায় অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ মোনাজাত। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে দুপুরের পর সব ব্যাংক খোলা রাখা হয়। বিকেলে সারাদেশে অনুষ্ঠিত হয় প্রতিবাদ সভা ও বিক্ষোভ মিছিল। কবি-সাহিত্যিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা মিছিল নিয়ে রাজপথে নেমে আসেন। ছাত্রলীগ ও ডাকসুর উদ্যোগে বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণ থেকে মিছিল বের হয়। মিছিলকারী ছাত্রছাত্রীদের হাতে ছিল লাঠিসোটা। ছাত্র ইউনিয়নের (মতিয়া গ্রুপ) উদ্যোগে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ছাত্র-গণজমায়েত অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা নগরীতে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে একটি কন্ট্রোল রুম খোলা হয়। ১১ দফা আন্দোলনের অন্যতম নেতা তোফায়েল আহমেদ ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দান থেকে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ সরাসরি রিলে করার জন্য ঢাকা বেতার কেন্দ্রের প্রতি আহ্বান জানান।

এদিকে লাহোরে দেশের পূর্বাঞ্চলে সাম্প্রতিক আন্দোলনে নিহত শহীদদের গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জেডএ ভুট্টো রাওয়ালপিণ্ডির প্রেসিডেন্ট হাউসে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে ৫ ঘণ্টাব্যাপী আলোচনায়

বসেন। বৈঠক শেষে পার্টির মুখপাত্রও আবদুল হাফিজ পীরজাদা মন্তব্য করেন জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগের প্রতিক্রিয়া যেভাবেই বিচার করা হোক না কেন, তা আদৌ যুক্তিযুক্ত নয়। তিনি বলেন, পাকিস্তান এক থাকবে, না দুই পাকিস্তান হবে সে সম্পর্কে এখন আওয়ামী লীগকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। পিপিপি মনে করে, আওয়ামী লীগের শাসনতান্ত্রিক ফর্মুলা হয়তো পাকিস্তানের সংহতি রক্ষা করতে পারবে না।

অবসরপ্রাপ্ত এয়ার মার্শাল আসগর খান বিকেলে করাচি থেকে ঢাকায় পৌঁছেন। তিনি রাতে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ধানমন্ডির বাসভবনে সাক্ষাৎ করেন। রাতে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দিন আহমেদ এক বিবৃতিতে বলেন, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট এবং বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানে মিলিটারির বুলেটে নিরীহ-নিরস্ত্র মানুষ, শ্রমিক, কৃষক ও ছাত্রদের হত্যা করা হচ্ছে। অবিলম্বে এ নরহত্যা বন্ধ করতে হবে। তিনি বলেন, সামরিক শক্তির ক্রমাগত বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে অনুমান হচ্ছে, বাংলাদেশে বেসামরিক জনগণের ওপর নির্যাতনমূলক নীতি আরো জোরদার করা হবে। তাজউদ্দিন আহমেদ বিশ্ববাসীর উদ্দেশে বলেন, আপনারা জেনে রাখুন, বাংলাদেশের জনগণের ওপর আজ যে নির্যাতন নেমে এসেছে, তারা বীরের মতো তা প্রতিরোধ করছে।

৬ মার্চ, ১৯৭১

সংগ্রামী বাংলা বিক্ষোভে উত্তাল। লাগাতার হরতালে অচল গোটা প্রদেশ। ঢাকাসহ সারা বাংলায় পালিত হয় অর্ধদিবস হরতাল। স্বাধীনতাকামী মানুষের অগণিত মিছিলে রাজধানী পরিণত হয় মিছিলের নগরীতে। সব মিছিলে অভিন্ন স্লোগান : 'জয় বাংলা', 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর'– যেন উত্তাল জনসমুদ্রের ক্ষুব্ধ গর্জন। 'পদ্মা-মেঘনা-যমুনা– তোমার আমার ঠিকানা' স্লোগানমুখর সব মিছিল কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির বাসভবন ও পল্টন ময়দান প্রদক্ষিণ করে সারাদিন। সভা-সমাবেশ-মিছিলের পাশাপাশি চলে রেসকোর্স ময়দানে আওয়ামী লীগের জনসভার প্রস্তুতি। শহরজুড়ে ৭ মার্চের জনসভার মাইকিং করা হয়।

প্রদেশে প্রথম কারা বিদ্রোহ ঘটে এই দিন। বেলা ১১টায় ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে গেট ভেঙে ৩৪১ জন কয়েদি পালিয়ে যায়। জেল পালানোর সময় প্রহরীদের গুলিতে ৭ কয়েদি নিহত ও ৩০ জন আহত হয়।

বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে সচিবালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা কাজে যোগদান থেকে বিরত থাকেন। তবে বেলা আড়াইটা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত ব্যাংক ও বেসরকারি অফিস বেতন দেয়ার জন্য খোলা থাকে। সন্ধ্যায় ছাত্রলীগ মশাল মিছিল বের করে। শিল্পী, সাংবাদিক, শিক্ষক, ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া গ্রুপ), গণশিল্পীগোষ্ঠী, উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী, স্বজনী ও ফরোয়ার্ড স্টুডেন্ট ব্লক এবং বাংলা ন্যাশনাল লীগের উদ্যোগে পৃথক সভা-সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মহিলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে কেন্দ্রীয়

শহীদ মিনারে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বাংলার বিক্ষুব্ধ, নারী সমাজ বাঁশের লাঠি, লোহার রড ও কালো পতাকা নিয়ে উপস্থিত হন। পরে তারা জঙ্গি মিছিল বের করেন। বিকেলে বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় সাংবাদিক-জনসমাবেশ। ছাত্রলীগ ও ডাকসু নেতারা এক বিবৃতিতে ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দান থেকে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ সরাসরি বাংলাদেশের সব বেতার কেন্দ্রে সম্প্রচারের দাবি জানান।

প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান এদিন লে. জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত করেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া দুপুরে বেতার ভাষণে ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন। ইয়াহিয়া বলেন, 'জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশন স্থগিতের সিদ্ধান্তে পূর্ব পাকিস্তানি নেতৃত্ব যে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন তাতে ধ্বংসকারী শক্তি রাস্তায় নেমেছে।' তিনি বলেন, 'ব্যাপক শক্তি প্রয়োগে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনা সম্ভব হতো বলে উপলব্ধি করলেও হত্যা, লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ বন্ধ করার জন্য আমি ন্যূনতম শক্তি প্রয়োগের নির্দেশ দিই।' ইয়াহিয়া খানের বেতার ভাষণের পরপরই ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ মিছিল বের হয়।

প্রেসিডেন্টের বেতার ভাষণের পর বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির জরুরি বৈঠক বসে। রাওয়ালপিন্ডিতে পিপলস পার্টি চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ভাষণকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, '৬ দফার ভিত্তিতে সমঝোতার চেষ্টা সহজ কাজ নয়। এ জন্য ৬ দফার রদবদল প্রয়োজন।' পেশোয়ারে পাকিস্তান মুসলিম লীগপ্রধান খান আবদুল কাইয়ুম, পশ্চিম পাকিস্তান পিডিপি প্রধান নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান ও কাউন্সিল মুসলিম লীগপ্রধান মিয়া মমতাজ দৌলতানা প্রেসিডেন্টের ঘোষণাকে স্বাগত জানান। লাহোরে কাউন্সিল মুসলিম লীগ নেতা এয়ার মার্শাল (অব.) নূর খান এক সমাবেশে বলেন, 'শেখ মুজিবুর রহমানের দেশ শাসনের বৈধ অধিকার রয়েছে।' প্রেসিডেন্ট বেতার ভাষণে পরিস্থিতি অবনতির জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর দোষারোপ করায় দুঃখ প্রকাশ করে তিনি বলেন, '৬ দফা নয় বরং ক্ষমতা ভাগাভাগির প্রশ্নই প্রকৃত বিরোধের কারণ।' লাহোরে বিকেলে নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি বিএ সলিমী ও পাঞ্জাব প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হামিদ সরফরাজসহ ১৫ জনকে একটি বিক্ষোভ মিছিল থেকে গ্রেফতার করা হয়।

৭ মার্চ, ১৯৭১

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেদিন তার ঐতিহাসিক ভাষণে বাঙালি জাতিকে পাকিস্তানের শাসন-শোষণের নিষ্পেষণ থেকে মুক্তির দিশা দিয়েছেন। রমনার রেসকোর্সের (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে জানিয়েছেন পরাধীনতার শৃঙ্খল

ভাঙার আহ্বান। দেশমাতৃকার মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার ডাক দিয়ে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অমূল্যগাথা। বাংলার অবিসংবাদিত নেতা তার ভাষণে তুলে ধরেছেন বাঙালির ওপর পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের নির্মম চিত্র। চরম বঞ্চনা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে বাঙালির পুঞ্জীভূত ক্ষোভকে নিজ কণ্ঠে ধারণ করে ঘোষণা করেন, 'বাংলার মানুষ মুক্তি চায়। বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়।' ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু বাঙালির জাতিগত আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নকে মূর্ত করে তোলেন। বিশ্ব মানচিত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধের রূপরেখা ঘোষণার পাশাপাশি স্বাধীনতা অর্জনে জাতিকে চরম ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান।

বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ বাঙালি 'স্বাধীনতা সংগ্রামের রূপরেখা' তথা বাংলাদেশের 'স্বাধীনতার ভাষণ' হিসেবে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত হয়ে আছে। এ ভাষণে জাতির জনক তার জলদগম্ভীর কণ্ঠে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর উদ্দেশে ঘোষণা করেন, 'সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না।' সেদিন রেসকোর্সে ১০ লাখের বেশি মানুষের সমাবেশে শত্রুর আসন্ন হামলা প্রতিরোধের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়ে তিনি নির্দেশ দেন- 'আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।... প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল।'

বিকেল সোয়া ৩টায় বঙ্গবন্ধু সভামঞ্চে উপস্থিত হন। সফেদ পায়জামা-পাঞ্জাবি আর হাতকাটা কালো কোট পরিহিত শেখ মুজিব মঞ্চে এসে দাঁড়ালে বীর জনতা করতালি ও 'জয় বাংলা' 'জয় বঙ্গবন্ধু' স্লোগানের মাধ্যমে নেতাকে অভিনন্দন জানায়। বঙ্গবন্ধু হাত নেড়ে প্রতি অভিনন্দন জানান জনতার সমুদ্রকে। তার চোখে-মুখে তখন সাত কোটি বাঙালির সুযোগ্য সিপাহসালার দুর্লভ তেজোদীপ্ততা, কাঠিন্য আর সংগ্রামী শপথের দীপ্তি।

বঙ্গবন্ধু তার প্রায় ২০ মিনিটের ভাষণে বাংলার স্বাধিকার আন্দোলনের দুর্গম-দুস্তর পথের প্রান্তে বাঙালির হাজার বছরের স্বপ্ন বাস্তবায়নের স্মৃতিফলক বসিয়ে দেন। পৌঁছে দেন সংগ্রামে উন্মুখ জাতির কর্ণকুহরে স্বাধীনতার মন্ত্রণা। রেসকোর্সের মন্ত্রমুগ্ধ লাখ লাখ শ্রোতাকে আহ্বান জানান : 'প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো, ইনশাল্লাহ'।

এদিকে বঙ্গবন্ধুর রেসকোর্সের ভাষণ সরাসরি সম্প্রচার না করার প্রতিবাদে বেতারে কর্মরত বাঙালি কর্মচারীরা তাৎক্ষণিক ধর্মঘট শুরু করায় বিকেল থেকে ঢাকা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান প্রচার বন্ধ হয়ে যায়। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রচারের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বেতার কর্তৃপক্ষ রেসকোর্স থেকে সরাসরি সম্প্রচারের পূর্ব ঘোষণা দিয়ে পরে তা বাতিল করে। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ রিলে করা হবে– এ ঘোষণার পর সারা বাংলার শ্রোতারা অধীর

আগ্রহে রেডিও সেট নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন। বেলা ২টা ১০ মিনিট থেকে ৩টা ২০ মিনিট পর্যন্ত ঢাকা বেতারের দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। রবীন্দ্র সঙ্গীত 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' (পরবর্তীকালে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত) পরিবেশনের পর বঙ্গবন্ধুর ভাষণ রিলে করার পূর্ব মুহূর্তে আকস্মিকভাবেই ঢাকা বেতারে তৃতীয় অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। সামরিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ রিলে করতে না দেয়ার প্রতিবাদে ঢাকা বেতারের কর্মীরা কাজ করতে অস্বীকার করলে কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়েই অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধুর রেসকোর্সের পূর্ণ ভাষণ ঢাকা বেতারে প্রচার করা না হলে বেতার কর্মীরা কাজে যোগদান করবেন না বলে কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেন। গভীর রাতে সামরিক কর্তৃপক্ষ ঢাকা বেতারে বঙ্গবন্ধুর রেসকোর্স ময়দানে প্রদত্ত ভাষণের পূর্ণ বিবরণ প্রচারের অনুমতি দেন। পরদিন সকালে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ দিয়েই ঢাকা বেতার কেন্দ্র পুনরায় চালু হয়।

৮ মার্চ, ১৯৭১

পাকিস্তানের ২৪ বছরের নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলনকে ধাপে ধাপে স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকারের সংগ্রামে রূপদান শেষে বাংলার অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ৭ মার্চের ভাষণে জাতিকে মুক্তির দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। সেই নির্দেশনা স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে সমগ্র দেশবাসীকে। পরদিন ৮ মার্চ সারাদেশে সংগ্রাম পরিষদ গঠনের ব্যাপারে ছাত্র, যুব ও পেশাজীবী সংগঠনের সদস্যদের ব্যাপক তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন পাড়া-মহল্লা, বাসভবন, ছাত্রাবাস, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শীর্ষে কালো পতাকা উড়ানো হয়। সরকারি-বেসরকারি যানবাহন এবং প্রাইভেট মোটর গাড়ি কালো পতাকা লাগিয়ে চলাচল করে। সকাল সাড়ে ৮টায় ঢাকা বেতার কেন্দ্রে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ সম্প্রচার করা হয়।

ছাত্রলীগের সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী ও সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজ এবং ডাকসুর সহ-সভাপতি আসম আবদুর রব ও সাধারণ সম্পাদক আবদুল কুদ্দুস মাখন এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, 'বাংলার বর্তমান মুক্তি আন্দোলনকে 'স্বাধীনতা আন্দোলন' ঘোষণা করে স্বাধীন বাংলার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানের ঐতিহাসিক জনসভায় যে প্রত্যক্ষ কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন, আমরা তার প্রতি সম্পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য বাংলার সংগ্রামী জনতার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।'

ছাত্রনেতারা অন্য এক বিবৃতিতে সশস্ত্র বাহিনীর গুলিতে বাংলাদেশের স্বাধিকার সংগ্রামের নিরস্ত্র বীর শহীদানের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সব সরকারি-বেসরকারি ভবনে অনির্দিষ্টকালের জন্য কালো পতাকা উত্তোলনের আহ্বান জানান।

বাংলার রাজনৈতিক নেতারা পৃথক বিবৃতিতে ৭ মার্চ ঘোষিত বঙ্গবন্ধুর শর্ত মেনে নেয়ার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি আহ্বান জানান। পিডিপি সভাপতি নূরুল আমিন

সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবের সঙ্গে পরামর্শক্রমে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পদ্ধতি বের করার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি আবেদন জানান। মুসলিম লীগ নেতা খান এ সবুর বঙ্গবন্ধুর দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়ে বলেন, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আকস্মিক স্থগিত ঘোষণার পর যা ঘটেছে এবং ভবিষ্যতে যা ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে– এসবের জন্য পশ্চিমাঞ্চলের নেতারাই দায়ী। জাতীয় লীগ প্রধান আতাউর রহমান খান বঙ্গবন্ধু ঘোষিত স্বাধীনতার সংগ্রামের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বলেন, এ সংগ্রামে বাংলাদেশের মানুষ জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ। লক্ষ্য হাসিল না হওয়া পর্যন্ত এ সংগ্রাম চলবে। ওয়ালিপন্থী ন্যাপের প্রাদেশিক সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ বলেন, অবিলম্বে বঙ্গবন্ধুর শর্ত মেনে নিয়ে দেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে সরকারের সহায়তা করা উচিত।

গণঐক্য আন্দোলনের প্রধান এয়ার মার্শাল (অব.) এম আসগর খান বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তার বাসভবনে সাক্ষাৎ করেন। বেতার-টিভি শিল্পীদের একটি প্রতিনিধি দল বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করে মুক্তি আন্দোলনের অনুকূলে অনুষ্ঠান প্রচারের উদ্দেশ্যে ১০ মার্চ থেকে বেতার ও টেলিভিশনে যোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মচারী সমিতি এবং ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ অনুযায়ী কর্মবিরতির সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

রাতে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দিন আহমেদ এক বিবৃতিতে বঙ্গবন্ধু ঘোষিত নির্দেশের ব্যাখ্যা দেন। এতে বলা হয়, ব্যাংকগুলো সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত বাংলাদেশের ভেতরে নগদ জমা, বেতন ও মজুরি প্রদান, এক হাজার টাকা পর্যন্ত প্রদান করতে পারবে। স্টেট ব্যাংক বা অন্য কোনো মাধ্যমে বাংলাদেশের বাইরে টাকা পাঠানো যাবে না। বাংলাদেশের ভেতর চিঠিপত্র, টেলিগ্রাম ও মানি অর্ডারের জন্য ডাক ও তার বিভাগ খোলা থাকবে। বাংলাদেশের বাইরে প্রেস টেলিগ্রাম পাঠানো যাবে। পুলিশ আইনশৃঙ্খলার দায়িত্ব পালন করবে এবং প্রয়োজনে আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবকদের সহযোগিতা নেবে। উল্লিখিত অব্যাহতি ছাড়া অন্য সব আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানে হরতাল অব্যাহত থাকবে।

তাজউদ্দিন আহমেদ আরেকটি বিবৃতিতে সামরিক শাসন কর্তৃপক্ষের প্রেসনোটের প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, 'প্রেসনোটে পুলিশ ও ইপিআর গুলিবর্ষণ করেছে বলে যে প্রচারণা করা হয়েছে তা বাঙালিদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে। সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়া হয়েছে বলা হলেও বিভিন্ন এলাকায় এখনো তাদের দেখা যাচ্ছে। আমরা আবারো দাবি করছি, সব সৈন্যকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে।'

লাহোরে সাবেক তথ্যমন্ত্রী নওয়াবজাদা শের আলী খানও পিডিপির পশ্চিম পাকিস্তান প্রধান নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান অবিলম্বে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে ঢাকা যাওয়ার অনুরোধ জানান। বাওয়ালপুর ইউনাইটেড ফ্রন্টের

নেতা ও জাতীয় পরিষদের সদস্য মিয়া নাজিমুদ্দিন এক বিবৃতিতে পরিষদে যোগদান প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধুর দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়ে অবিলম্বে তা মেনে নেয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

ব্রিটেন প্রবাসী প্রায় ১০ হাজার বাঙালি লন্ডনের পাকিস্তানি হাইকমিশনের সামনে স্বাধীন বাংলার দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

৯ মার্চ, ১৯৭১

যথারীতি সরকারি ও আধা-সরকারি ভবন এবং যানবাহনে কালো পতাকা ওড়ানো হয়।

বঙ্গবন্ধু ঘোষিত আন্দোলনের কর্মসূচি অনুযায়ী সচিবালয়সহ সারাদেশে সব সরকারি ও আধা-সরকারি অফিস, হাইকোর্ট এবং জেলা কোর্টে সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। বঙ্গবন্ধু যেসব সরকারি অফিস খুলে রাখার নির্দেশ দেন কেবল সেসব চালু থাকে। ট্রেন, লঞ্চ, বাস, ট্যাক্সি, রিকশা ও অন্যান্য যানবাহন চলাচল করে। দোকানপাট ও হাটবাজার খোলা থাকে। অভ্যন্তরীণ রুটে বিমান চলাচল বন্ধ থাকে। সারাদেশে ব্যাংকিং কাজকর্ম চলে।

সকালে ন্যাপপ্রধান মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী সন্তোষ থেকে ঢাকায় পৌঁছানোর পরপর বঙ্গবন্ধু তাকে ফোন করেন। টেলিফোনে দুই নেতা আলোচনার পর আওয়ামী লীগ ও ন্যাপ কেন্দ্রীয় নেতারা প্রায় আড়াই ঘণ্টা বৈঠক করেন।

রাজধানীতে দিনের উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে– পল্টন ময়দানে 'স্বাধীন বাংলা আন্দোলন সমন্বয় কমিটি'র উদ্যোগে জনসভা। জনসভায় ন্যাপপ্রধান মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও বাংলা লীগপ্রধান আতাউর রহমান খান বক্তৃতা করেন। মওলানা ভাসানী বাংলাদেশের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয়ার জন্য পাকিস্তানের সামরিক প্রেসিডেন্টের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন– 'পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হবে। পাকিস্তান অখণ্ড থাকবে না। অখণ্ড রাখবো না। ইয়াহিয়া, তোমার বাপেরও ক্ষমতা নেই, ঠেকায়। যদি পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষের ভালো চাও, তাহলে কালই বাংলার স্বাধীনতা স্বীকার করে নাও। অনেক হয়েছে, আর নয়। তিক্ততা বাড়িয়ে আর লাভ নেই। 'লাকুম দ্বীনুকুম অলইয়াদ্বীন' নিয়মে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা স্বীকার করে নাও।'

আতাউর রহমান খান বলেন, 'বঙ্গবন্ধু, আপনি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। আপনি স্বাধীন বাংলার জাতীয় সরকার ঘোষণা করুন।'

সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্জেন্ট জহুরুল হক হল ক্যান্টিনে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সংসদের জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় 'বাঙালি জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বাংলাদেশ 'জাতীয় সরকার' গঠনের জন্য অনুরোধ জানানো হয় এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের ওপর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

ইসলামাবাদে সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়, আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসবেন। সামরিক কর্তৃপক্ষ রাত ৯টা থেকে রাজশাহী শহরে প্রতিদিন ৮ ঘণ্টার কারফিউ জারি করে। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়, সেনাবাহিনীকে ছাউনিতে ফিরিয়ে নেয়া হয়েছে বলে ঘোষণার পর রাজশাহীতে হঠাৎ সান্ধ্য আইন জারির কারণ বোধগম্য নয়।

করাচিতে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ন্যাপপ্রধান ওয়ালী খান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনার জন্য ঢাকায় আসার কথা ঘোষণা করেন। জামায়াতে ইসলামীর প্রাদেশিক আমির অধ্যাপক গোলাম আযম এক বিবৃতিতে দেশকে চরম বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষার জন্য সামরিক শাসক জেনারেল ইয়াহিয়ার প্রতি আবেদন জানান।

ইসলামাবাদে লে. জেনারেল টিক্কা খানকে 'খ' অঞ্চলের (বাংলাদেশ) সামরিক শাসক নিয়োগের ঘোষণা দেয়া হয়। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতিরা নবনিযুক্ত সামরিক গভর্নর জেনারেল টিক্কা খানের শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা না করার সিদ্ধান্ত নেন।

জাতিসংঘের মহাসচিব উথান্ট প্রয়োজনে ঢাকা থেকে জাতিসংঘের স্টাফ ও তাদের পরিবারদের প্রত্যাহারের জন্য ঢাকার জাতিসংঘ উপ-আবাসিক প্রতিনিধিকে নির্দেশ দেন। জাপানের পররাষ্ট্র দফতর ঢাকায় অবস্থিত তার নাগরিকদেরও প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেয়। পশ্চিম জার্মানি সরকার তার দেশের নাগরিকদের ফিরিয়ে নেয়ার জন্য সামরিক বিমান পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়।

১০ মার্চ, ১৯৭১

চারদিকে অসহযোগ। বস্তুত একমাত্র সেনা ছাউনিগুলো ছাড়া কোথাও পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের কোনো আদেশ-নির্দেশ কেউ মানছে না। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে চলছে সমগ্র বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধুর ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর সড়কের বাসভবন পরিণত হয়েছে বিকল্প রাষ্ট্রপ্রধানের দফতরে।

শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে সারাদেশে সরকারি ও আধা-সরকারি অফিসের কর্মচারীরা কাজে যোগদানে বিরত রয়েছেন। বেসরকারি অফিস, ব্যাংক ও ব্যবসা কেন্দ্র খোলা রাখা হয়েছে, তা তারই নির্দেশে।

সরকারি-বেসরকারি ভবন, ব্যবসা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শীর্ষে, রাজারবাগ পুলিশ লাইন, থানা ও হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির বাসভবনে কালো পতাকা উড়ছে। সরকারি-বেসরকারি যানবাহনের পাশাপাশি পুলিশ বাহিনীর গাড়ি কালো পতাকা লাগিয়ে রাজপথে চলাচল করছে। অসহযোগ আন্দোলনের এই দিনে নারায়ণগঞ্জ জেলখানা ভেঙে ৪০ জন কয়েদি পালিয়ে যায়। জেল পালানোর সময় কারারক্ষী ও কয়েদিদের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধে ২৭ জন আহত হয়। সামরিক কর্তৃপক্ষ রাজশাহী শহরে অনির্দিষ্টকাল-ব্যাপী জারি করা ৮ ঘণ্টার নৈশ্য কারফিউ প্রত্যাহার করে।

কে উলফ বাংলাদেশের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে তার ধানমন্ডির বাসভবনে পৃথক বৈঠকে মিলিত হন।

রাতে এক সামরিক নির্দেশে বলা হয়, কেউ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সরকারি সম্পত্তির ক্ষতিসাধন করলে অথবা সেনাবাহিনীর রক্ষণাবেক্ষণে বা গতিবিধিতে অন্তরায় সৃষ্টি করলে তাদের সংশ্লিষ্ট সামরিক বিধি অনুযায়ী বিচার করা হবে।

দেশের বিভিন্ন স্থানে সেনাবাহিনীর রসদ সরবরাহের সময় জনতা বাধা সৃষ্টি করে। সিলেট ও যশোরে রেশন নেয়ার সময় সেনাবাহিনীর একটি কনভয়কে বাধা দেয়া হয়।

স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে দুটি বিবৃতি দেয়া হয়। পরিষদ নেতা নূরে আলম সিদ্দিকী, শাজাহান সিরাজ, আসম আবদুর রব ও আবদুল কুদ্দুস মাখন যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, গত ১০ মার্চ ভোরে চট্টগ্রাম বন্দরের ১৭ নম্বর জেটিতে এমএন সোয়াত নামে একটি অস্ত্রবাহী জাহাজ নোঙর করেছে। বন্দর শ্রমিকরা সে জাহাজ থেকে সমরাস্ত্র খালাসের নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করেছেন। স্বাধীন বাংলার নিরস্ত্র জনগণের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্যই এ সমরাস্ত্র বাংলাদেশে আনা হয়েছে। এ ব্যাপারে আমরা বাংলাদেশের জনসাধারণকে সজাগ করে দিচ্ছি। স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ অপর এক যুক্ত বিবৃতিতে সরকার প্রদত্ত যাবতীয় খেতাব ও পদক বর্জনের জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। রাতে আওয়ামী লীগের পক্ষে জনগণের উদ্দেশে প্রশাসনিক ও ব্যাংকিং সংক্রান্ত কিছু নির্দেশনামা ঘোষণা করা হয়।

সামরিক কর্তৃপক্ষ রংপুর শহরে আরোপিত রাত্রিকালীন কারফিউ প্রত্যাহার করে নেয়। টাঙ্গাইলে বিন্দুবাসিনী হাইস্কুল ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় ন্যাপপ্রধান মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী বঙ্গবন্ধু ঘোষিত স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ঘোষণা করে বলেন, 'শেখ মুজিবুর রহমান সাত কোটি বাঙালির নেতা। নেতার নির্দেশ পালন করুন।' জাতীয় লীগ প্রধান আতাউর রহমান খান এক বিবৃতিতে পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের উদ্দেশে বলেন, 'ভাবাবেগে বিহ্বল না হয়ে বাস্তব সত্যকে উপলব্ধি করুন। আসুন আমরা ভাই ও বন্ধুর মতো কোলাকুলি করে পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিই।' পিপলস পার্টি চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো করাচি থেকে বঙ্গবন্ধুর কাছে তারবার্তা পাঠান। তারবার্তায় ভুট্টো বলেন, 'আমি শিগগির আবার ঢাকায় গিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করে উদ্ভূত সমস্যার একটি সমাধান বের করার জন্যও তৈরি আছি।' করাচিতে গণঐক্য আন্দোলনের নেতা এয়ার মার্শাল (অব.) আগসর খান সংবাদ সম্মেলনে বলেন, 'প্রেসিডেন্টের এখন উচিত আওয়ামী লীগ প্রধানের দেয়া শর্ত মেনে নিয়ে ক্ষমতা হস্তান্তর করা। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে অবিলম্বে ক্ষমতা ছাড়া না হলে দেশের দুই অংশকে এক রাখা কোনোভাবেই সম্ভব হবে না।'

১২ মার্চ, ১৯৭১

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার ধানমন্ডির বাসভবনে স্থানীয় এবং পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে সিরিজ বৈঠক করেন। সকাল-সন্ধ্যা বৈঠকের

ফাঁকে ফাঁকে তিনি বাসভবনের দোতলায় এসে ৩২নং সড়কে সমবেত মিছিলকারীদের উদ্দেশে হাত নেড়ে সংগ্রামী শুভেচ্ছা জানান। প্রত্যেককে যার যার এলাকায় গিয়ে সংগ্রাম পরিষদ গঠনের নির্দেশ দেন। জাতীয় লীগ প্রধান আতাউর রহমান খান ও পাঞ্জাবের কাউন্সিল মুসলিম লীগ নেতা পীর সাইফুদ্দিন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে পৃথক বৈঠকে মিলিত হন। সারাদেশে এলাকাও প্রতিষ্ঠানভিত্তিক সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ছাত্র, শ্রমিক পেশাজীবী সংগঠনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সভা-সমাবেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য দুর্জয় শপথ নেয়া হয়। বগুড়া জেলখানা ভেঙে ২৭ জন কয়েদি পালিয়ে যায়। চলচ্চিত্র প্রদর্শকরা অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে সারাদেশে অনির্দিষ্টকাল প্রেক্ষাগৃহ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেন।

পূর্ব রেলওয়ে কর্মচারী এবং চারু ও কারুশিল্পীরা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করেন। জাতীয় শ্রমিক লীগের জরুরি সভায় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ঢাকা নগর আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটির সভায় সব ইউনিট ও ইউনিয়নকে সংগ্রাম পরিষদ গঠনের নির্দেশ দেয়া হয়।

জাতীয় পরিষদ সদস্য মোহাম্মদ জহিরউদ্দিন পাকিস্তান সরকারের খেতাব বর্জন করেন। রাওয়ালপিন্ডিতে এক সরকারি ঘোষণায় আগামী ২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবসের নির্ধারিত সম্মিলিত সশস্ত্রবাহিনীর কুচকাওয়াজ, খেতাব বিতরণ অন্যান্য অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়।

ময়মনসিংহে জনসভায় ন্যাপপ্রধান মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী বলেন, আমি জানি শেখ মুজিবুর রহমান কখনোই জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে না। আপনারা শেখ মুজিবের ওপর সম্পূর্ণ ভরসা রাখুন।

লাহোরে সংবাদ সম্মেলনে গণঐক্য আন্দোলনের প্রধান এয়ার মার্শাল (অব.) আসগর আলী খান বলেন, 'পাকিস্তানকে রক্ষা করার জন্য এখন একটি মাত্র পথ খোলা রয়েছে তা হচ্ছে শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর।' তিনি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে প্রথম ফ্লাইটে ঢাকা যাওয়ার পরামর্শ দিয়ে বলেন, 'হাতে সময় খুব কম। আপনি ঢাকা গিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে বৈঠকে বসুন।'

লারকানা থেকে লাহোর যাওয়ার পথে মুলতান বিমানবন্দরে পিপলস পার্টি চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো বলেন, 'পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও সংহতি রক্ষার জন্য আমার দল সব ধরনের সাহায্যে প্রস্তুত।'

লাহোর ন্যাপের মহাসচিব সি আর আসলাম এক বিবৃতিতে বলেন, শক্তি প্রয়োগের নীতি অব্যাহত থাকলে পূর্ব পাকিস্তানে বিচ্ছিন্নতার মনোভাব শক্তিশালী হবে। প্রেসিডেন্টের অবিলম্বে শেখ মুজিবুর রহমানের চার দফা মেনে নেয়া উচিত।

লাহোর স্থানীয় বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিকসহ ছাত্র, শ্রমিক ও পেশাজীবী সংগঠনের নেতারা এক যুক্ত বিবৃতিতে অবিলম্বে বঙ্গবন্ধুর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানান।

করাচিতে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক খলিল আহমদ তিরমিজি এক বিবৃতিতে পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনীতিকদের প্রতি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য বঙ্গবন্ধু আহূত গণআন্দোলনের শরিক হওয়ার আহ্বান জানান।

রেডিও পাকিস্তান করাচি কেন্দ্রের খ্যাতনামা বাংলা খবর পাঠক সরকার কবীর উদ্দিন বেতারে বঙ্গবন্ধুর খবর প্রচারের নিয়ন্ত্রণ আরোপের প্রতিবাদে রেডিও পাকিস্তান বর্জন করেন।

প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ দলের নেতা ক্যাপ্টেন মনসুর আলী এক বিবৃতিতে বাংলাদেশের জন্য পাঠানো খাদ্য বোঝাই মার্কিন জাহাজের গতি বদল করে করাচি নেয়ার ঘটনায় উৎকণ্ঠা ও নিন্দা প্রকাশ করেন।

১৩ মার্চ, ১৯৭১

একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলনে অন্যান্যের সঙ্গে প্রতিরক্ষা বিভাগের বেসামরিক কর্মচারীরাও শরিক হয়েছেন। তারা কর্মবিরতি পালন করে প্রতিদিন মিছিল-মিটিং করেন। সামরিক শাসন কর্তৃপক্ষ ১৫ মার্চ সকাল ১০টার মধ্যে প্রতিরক্ষা বিভাগের বেসামরিক কর্মচারীদের কাজে যোগদানের নির্দেশ দেয়। সামরিক নির্দেশে বলা হয়, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজে যোগদানে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্টদের চাকরিচ্যুত ও পলাতক ঘোষণা করে সামরিক আদালতে বিচার করা হবে। নির্দেশ অমান্যকারীদের সর্বোচ্চ ১০ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হবে।

সামরিক নির্দেশ জারির পরপরই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক বিবৃতিতে বলেন, 'যখন খোদ সামরিক শাসন প্রত্যাহারের জন্য আমরা বাংলার জনগণের দাবির কথা ঘোষণা করেছি, ঠিক তখনই নতুন করে এ ধরনের সামরিক নির্দেশ জারি করা পক্ষান্তরে জনসাধারণকে উস্কানিরই শামিল।' বঙ্গবন্ধু সামরিক কর্তৃপক্ষের প্রতি উস্কানিমূলক তৎপরতা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'জনগণকে যত ভয় দেখানো হোক না কেন, তারা তাদের সংগ্রাম চালিয়ে যাবে।'

ঢাকার জাতিসংঘ ও পশ্চিম জার্মানি দূতাবাসের কর্মচারী, তাদের পরিবারবর্গ এবং ইতালি, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও কানাডার ২৬৫ জন নাগরিক বিশেষ বিমানে বাংলাদেশ ত্যাগ করেন। বিশিষ্ট শিল্পী জয়নুল আবেদিন ও সাবেক জাতীয় পরিষদ সদস্য আবদুল হাকিম পাকিস্তান সরকারের দেয়া খেতাব ও পদক বর্জন করেন।

সাবেক জাতীয় পরিষদ সদস্য আফাজউদ্দিন ফকির এক বিবৃতিতে অবিলম্বে বাংলাদেশে প্রতিরক্ষা বাহিনী পরিচালনার দায়িত্ব একজন বাঙালি জেনারেলের কাছে হস্তান্তর, বেঙ্গল রেজিমেন্টের সবক'টি ব্যাটালিয়নের পরিচালনা কর্তৃত্ব বাঙালি অফিসারদের হাতে অর্পণ এবং বিগত এক মাসে যে অতিরিক্ত পাকিস্তানি সৈন্য আনা হয়েছে তাদের বাংলাদেশ থেকে প্রত্যাহারের দাবি জানান।

ভৈরবে এক জনসভায় ন্যাপপ্রধান মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী বলেন,

বর্তমানে পূর্ব বাংলা আসলে স্বাধীন। আমরা একটি পূর্ণাঙ্গ সরকার গঠনের অপেক্ষায় আছি।

স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সদস্য নূরে আলম সিদ্দিকী, শাজাহান সিরাজ, আসম আবদুর রব ও আবদুল কুদ্দুস মাখন এক যুক্ত বিবৃতিতে বাংলাদেশ ত্যাগকারীদের বাড়ি-গাড়ি-সম্পদ কিনে বাংলার অর্থ পশ্চিম পাকিস্তানে পাচারে সহযোগিতা না করার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান।

সকালে রমনা পার্কে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ জনসভা করে। শীতলক্ষ্যায় অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের উদ্যোগে দীর্ঘ নৌ-মিছিল বের করা হয়। চট্টগ্রামে বেগম উমরতুল ফজলের সভানেত্রীত্বে অনুষ্ঠিত মহিলাদের এক সমাবেশে বাংলাদেশের জনগণের পরিপূর্ণ মুক্তি অর্জন না হওয়া পর্যন্ত বিলাসদ্রব্য বর্জন ও কালো ব্যাজ ধারণের জন্য নারী-পুরুষ সবার প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

ন্যাপের সভাপতি খান, আবদুল ওয়ালী খান ও ন্যাপ নেতা গাউস বক্স বেজেঞ্জো সকালে করাচি থেকে বিমানে ঢাকায় আসেন। ঢাকা বিমানবন্দরে ন্যাপপ্রধান সাংবাদিকদের বলেন, 'বর্তমান সংকট উত্তরণের লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আলোচনার জন্য আমি খোলা মন নিয়ে ঢাকায় এসেছি। সামরিক শাসন প্রতাহার ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কিত শেখ মুজিবুর রহমানের দাবির প্রশ্নে আমি তার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।'

লাহোর জাতীয় পরিষদের সংখ্যালঘিষ্ঠ ৫টি দলের পার্লামেন্টারি পার্টির নেতারা এক সভায় মিলিত হয়ে অবিলম্বে সামরিক শাসন প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানান। সভায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে অবিলম্বে বাংলাদেশে গিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আলোচনা করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের অনুরোধ জানানো হয়। সভায় কাউন্সিল মুসলিম লীগ, কনভেনশন লীগ, জামায়াতে ইসলামী, তমিয়তে ইসলাম ও জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের নেতাসহ কয়েকজন স্বতন্ত্র সাংসদ অংশ নেন।

১৪ মার্চ, ১৯৭১

টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া, সর্বত্র বেসামরিক প্রশাসন চলছে আওয়ামী লীগের জনপ্রতিনিধিদের নির্দেশে। একদিকে পাকিস্তান সরকারের নির্দেশ অমান্য, অন্যদিকে আরো বড় ত্যাগের জন্য প্রস্তুতি চলছে। জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে যোগদানের প্রশ্নে বঙ্গবন্ধুর ৪ দফা পূর্বশর্ত মেনে নেয়ার দাবিতে রাজধানী ঢাকায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও ছাত্র, শ্রমিক, যুব মহিলা, পেশাজীবী, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের উদ্যোগে সভা-সমাবেশ-শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ দেশ থেকে সম্পদ পাচার প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে ঢাকায় বিভিন্ন পয়েন্টে চেকপোস্ট স্থাপন করে। জাতীয় শ্রমিক লীগ কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদ প্রতিটি শ্রমিক এলাকায় স্বেচ্ছাসেবক

বাহিনী গঠন করে ট্রেনিং প্রদানের নির্দেশ দেয়। বাংলাদেশের জন্য খাদ্যশস্যবাহী 'মন্টেসেলো ভিক্টরি' নামে একটি জাহাজের গতিপথ পরিবর্তন করে চট্টগ্রাম থেকে করাচি নিয়ে যাওয়া হয়। ওসান এন্ডুরাস রামের সমরাস্ত্রবাহী আরেকটি জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরের ১০ নম্বর জেটিতে নোঙর করে। বন্দরকর্মী ও শ্রমিকদের অসহযোগিতায় চট্টগ্রাম বন্দরের ১৬ নম্বর জেটিতে নোঙর করা অস্ত্রবাহী জাহাজের সোয়াতের সমরাস্ত্র খালাসের চেষ্টা করে কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হয়। ঢাকার নৌবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত লে. কমান্ডার ইমাম হোসেন এক বিবৃতিতে অবিলম্বে বাংলাদেশে অবস্থানরত সব অবাঙালি সৈন্যকে প্রত্যাহার করে বাঙালি সৈন্যদের তাদের স্থলাভিষিক্ত করার আহ্বান জানান। রাতে সংগ্রাম পরিষদের নেতা নূরে আলম সিদ্দিকী, শাজাহান সিরাজ, আসম আবদুর রব ও আবদুল কুদ্দুস মাখন এক যুক্ত বিবৃতিতে বর্তমানে বাংলাদেশে ছুটিতে অবস্থানকারী কেন্দ্রীয় সরকারের বাঙালি কর্মচারীদের পশ্চিম পাকিস্তানে ফেরত না গিয়ে নিজ নিজ এলাকার সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ জানান।

সকালে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ও ন্যাপ নেতা আবদুল ওয়ালী খান আলোচনা বৈঠক করেন। বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে রুদ্ধদ্বার কক্ষে প্রায় দেড় ঘণ্টা আলোচনা চলে। বৈঠকে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও জাতীয় পরিষদের আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির উপনেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এএইচএম কামরুজ্জামান ও ওয়ালী ন্যাপের কেন্দ্রীয় নেতা গাউস বক্স বেজেঞ্জো উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের বঙ্গবন্ধু বলেন, 'প্রেসিডেন্ট ঢাকা এলে আমি তার সঙ্গে কথা বলতে রাজি আছি।'

অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে সংবাদপত্র প্রেস কর্মচারী ফেডারেশনের উদ্যোগে বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে সমাবেশ শেষে প্রেস কর্মচারীরা মিছিল করে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে গেলে তিনি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। বঙ্গবন্ধু বলেন, 'কেউ যদি আমাদের ওপর নির্যাতন চালাতে চেষ্টা করে তাহলে আমরাও তাকে সহজে ছেড়ে দেব না।' বঙ্গবন্ধু নিজেদের মুক্তির জন্য বাংলার প্রতিটি গৃহকে এক একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান।

সামরিক নির্দেশের প্রতিবাদে দেশরক্ষা বিভাগের বেসামরিক কর্মচারীরা নগরীতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। তারা ধানমন্ডিতে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করে আন্দোলনের সঙ্গে সংহতি ও কর্মস্থল বর্জনের কর্মসূচি অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার ঘোষণা করেন। ছাত্রলীগের উদ্যোগে লালবাগ বালুর মাঠে এক ছাত্র-জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ডিআইটি ভবন প্রাঙ্গণে টিভি নাট্যশিল্পীদের এক সমাবেশে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করা হয়। বাংলা একাডেমীতে লেখক সংগ্রাম শিবিরের উদ্যোগে লেখক সমাবেশ শেষে শোভাযাত্রা বের করা হয়। ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া গ্রুপ) বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে জনসভার আয়োজন করে। সদরঘাটে ফরোয়ার্ড স্টুডেন্টস ব্লকের উদ্যোগে জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যায়

পল্টন ময়দানে কথাশিল্পী সম্প্রদায় কবিতা পাঠ ও গণসঙ্গীতের আসর বসায়। বরিশালে এক জনসভায় বাংলা জাতীয় লীগ প্রধান আতাউর রহমান খান শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার গঠন করার আহ্বান জানান।

রাতে বঙ্গবন্ধু এক বিবৃতিতে অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত রাখার আহ্বান জানিয়ে নতুন নির্দেশ ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের জনগণের মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে নির্মূল করা যাবে না। আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধররা যাতে স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে মর্যাদার সঙ্গে বাঁচতে পারে তা নিশ্চিত করতে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।' বঙ্গবন্ধু বলপ্রয়োগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা স্বাধীনতা অর্জন না করবো ততক্ষণ আমাদের সংগ্রাম পূর্ণোদ্যমে চলবে। এ লক্ষ্যে আমি যে কোনো আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকার এবং সম্ভাব্য যে কোনো বলপ্রয়োগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।'

করাচির নিশাত পার্কে পিপলস পার্টির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জনসভায় পিপিপি চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো পাকিস্তানের দুই অংশের দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রস্তাব দেন।

১৫ মার্চ, ১৯৭১

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে সারা বাংলায় অফিস-আদালতে যথারীতি পূর্ণ কর্মবিরতি পালন করা হয়। দিনব্যাপী রাজধানী ঢাকায় সভা ও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। সরকারি ও বেসরকারি ভবনের শীর্ষে এবং যানবাহনে কালো পতাকা ওড়ে। কালো পতাকার পাশাপাশি অনেক ভবনে-শীর্ষে স্বাধীন বাংলার পতাকাও তোলা হয়। সামরিক কর্তৃপক্ষ দেশরক্ষা বিভাগের বেসামরিক কর্মচারীদের কাজে যোগদানের নির্দেশ দিলেও তারা কর্মস্থলে যোগদানে বিরত থাকেন।

পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের অব্যাহত চাপের মুখে জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে বৈঠকের জন্য সামরিক প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান বিকেলে করাচি থেকে ঢাকায় আসেন। কোনো সাংবাদিক ও বাঙালিকে এ সময় বিমানবন্দরে প্রবেশ করতে দেয়া হয়নি।

সকালে বেসামরিক কর্মচারীরা নাখালপাড়ায় সভাশেষে রাজপথে বিক্ষোভ মিছিল করেন। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে চিকিৎসকরা সমাবেশ শেষে বের করেন শোভাযাত্রা। বিকেলে কবি সুফিয়া কামালের সভানেত্রীত্বে তোপখানা রোডে মহিলাদের এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বেতার ও টিভি শিল্পীরা দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করেন। উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর শিল্পীরা ভ্রাম্যমাণ ট্রাকযোগে গণসঙ্গীত ও পথনাটক পরিবেশন করেন নগরীর বিভিন্ন স্থানে।

নয়া সামরিক বিধি জারির প্রতিবাদে বিকেলে স্বাধীন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে ছাত্র জনসভা শেষে বিরাট জঙ্গি

মিছিল বের করা হয়। ছাত্রলীগ সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে জনসভায় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজ, ডাকসুর সহ-সভাপতি আসম আবদুর রব ও সাধারণ সম্পাদক আবদুল কুদ্দুস মাখন প্রমুখ বক্তৃতা করেন। জনসভায় গৃহীত প্রস্তাবে অবিলম্বে বাংলাদেশ থেকে অবাঙালি সৈন্য প্রত্যাহারের জন্য প্রেসিডেন্টের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। প্রস্তাবে বলা হয়, বাংলাদেশ কেবল বাংলার সর্বাধিনায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই নির্দেশ জারি করতে পারেন। বাংলাদেশের জনসাধারণ একমাত্র বঙ্গবন্ধুর নির্দেশই মানবে, অন্য কারো নয়।

খুলনায় শহীদ হাদিস পার্কে এক জনসভায় বাংলা জাতীয় লীগ প্রধান আতাউর রহমান খান অবিলম্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা এবং জাতীয় সরকার গঠনের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ আজ বঙ্গবন্ধুর পেছনে একতাবদ্ধ। রেডিও, ইপিআর ও পুলিশ বাহিনী, সেক্রেটারিয়েট প্রভৃতি আজ আওয়ামী লীগ প্রধানের আজ্ঞাবাহী।'

করাচিতে পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো এক সংবাদ সম্মেলনে নতুন দাবি উত্থাপন করে বলেন, 'কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ ও পিপলস পার্টির সমন্বয়ে কোয়ালিশন সরকার গঠন করতে হবে।' ভুট্টো বলেন, 'পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে ভৌগোলিক দূরত্বের কারণে এ দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন প্রযোজ্য হতে পারে না। তিনি বলেন, কেন্দ্রে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হলে অবশ্যই তা পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানের দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাছে করতে হবে। দেশ শাসনের প্রশ্নে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে অবশ্যই পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের ইচ্ছার মূল্য দিতে হবে।'

ভুট্টো বলেন, 'আমি জাতীয় পরিষদের বিরোধী দলের নেতার ভূমিকা পালন করতে চাই না। কেননা এতে দেশের বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিম পাকিস্তান সব সময়ই পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে বাঙালিদের দ্বারা শাসিত হতে থাকবে।'

আগের দিন অর্থাৎ ১৪ মার্চ করাচির জনসভায় পিপলস পার্টি প্রধান ভুট্টো পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের যে দাবি করেন, বাংলাদেশে ও পশ্চিম পাকিস্তানে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। ঢাকায় পিডিপি প্রধান নূরুল আমিন এ প্রসঙ্গে বলেন, একই পরিষদে দুটি মেজরিটি পার্টি থাকতে পারে না। জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগই একমাত্র মেজরিটি পার্টি। প্রবীণ রাজনীতিক আবুল হাশিম বলেন, ভুট্টো পাকিস্তানের ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী, অন্যথায় পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে চান। কিন্তু জাতীয় পরিষদে তার স্থান বিরোধী দলের আসনে। ভুট্টোর কথামতো প্রেসিডেন্ট চললে পাকিস্তানের বিভক্তি অনিবার্য।

ন্যাপপ্রধান ওয়ালী খান সকালে পিডিপি প্রধান নুরুল আমিনের সঙ্গে তার বাসভবনে বৈঠকে মিলিত হন। করাচিতে জমিয়তে ওলামায়ে মহাসচিব মাওলানা মুফতি মাহমুদ পিপিপি প্রধানের প্রস্তাবের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, দেশে দুটি নয়, একটিমাত্র মেজরিটি পার্টি আছে আর সেটি আওয়ামী লীগ। সুতরাং শেখ মুজিবুর

রহমানের আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা উচিত। দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কে ভুট্টোর দাবি কেবল অযৌক্তিকই নয়, অত্যন্ত অগণতান্ত্রিক।

করাচিতে এক সভায় বেশ কয়েকজন প্রখ্যাত রাজনৈতিক নেতা বলেন, ক্ষমতা লাভের জন্য আওয়ামী লীগই একমাত্র দল। দেশের বর্তমান রাজনৈতিক সংকটের জন্য একমাত্র ভুট্টোই দায়ী। ভুট্টো যদি সত্যিই বর্তমান সমস্যার সমাধান চান তাহলে তার উচিত অবিলম্বে ঢাকায় গিয়ে শেখ সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য প্রার্থনা জানানো।

১৬ মার্চ, ১৯৭১

ঢাকায় একমাত্র প্রেসিডেন্ট হাউস ছাড়া সর্বত্র কালো পতাকা উড়ছে। অসহযোগ আন্দোলনের অংশ হিসেবে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ অনুযায়ী কিছু সরকারি দফতর বাদ দিয়ে সব অফিস-আদালতে কর্মবিরতি পালন করা হচ্ছে। সকালে স্বাধীনতাকামী জনতার সর্বাত্মক অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমিতে ঢাকায় প্রেসিডেন্ট ভবনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও সামরিক প্রেসিডেন্ট জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের মধ্যে দেশ ও দেশবাসীর ভাগ্যনির্ধারণী গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক শুরু হয়। বঙ্গবন্ধু সাদা গাড়িতে শোকের প্রতীক কালো পতাকা উড়িয়ে প্রেসিডেন্ট ভবনে আসেন।

এ সময় প্রেসিডেন্ট ভবনের অদূরে সংরক্ষিত এলাকার বাইরে দাঁড়িয়ে ছাত্র-জনতা 'জয় বাংলা' 'জয় বঙ্গবন্ধু' ধ্বনি দিয়ে প্রিয় নেতাকে অভিবাদন জানান। বেলা ১১টায় রুদ্ধদ্বার কক্ষে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার দণ্ডধারী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ও সংসদীয় ক্ষমতার অধিকারী শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে শুরু হয় একান্ত আলোচনা। বৈঠক চলে আড়াই ঘণ্টা। বৈঠক শেষে বঙ্গবন্ধু প্রেসিডেন্ট ভবনের প্রধান ফটকে দেশী-বিদেশী সাংবাদিকদের জানান, 'আমি রাজনৈতিক ও অন্যান্য সমস্যা সম্পর্কে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলোচনা করেছি। আলোচনা চলবে। কাল সকালে আমরাই আবার বসছি।' প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে সরাসরি ধানমন্ডির বাসভবনে ফিরে বঙ্গবন্ধু দলের শীর্ষস্থানীয় সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। বিকেল পর্যন্ত এ বৈঠক চলে। রাত ৮টায় বঙ্গবন্ধু আবার সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। গভীর রাত পর্যন্ত এ বৈঠক চলে। দু'দফা সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনার ফাঁকে বিকেলে বঙ্গবন্ধু তার বাসভবনে কনভেনশন মুসলিম লীগ প্রধান ফজলুল কাদের চৌধুরীকে সাক্ষাৎ দান করেন।

ঢাকা হাইকোর্ট প্রাঙ্গণে আইনজীবীদের এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে আসাদুজ্জামান খান সভাপতিত্ব করেন। চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকরা শহীদ মিনারে সভা করেন। সভাশেষে মিছিল বের করা হয়। মিছিলে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন ও শিল্পী মুর্তজা বশীর নেতৃত্ব দেন। বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে ব্রতচারী আন্দোলনের অনুশীলন শুরু হয়। বিকেলে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শিল্পী ও সাহিত্যিকরা কবিতা পাঠ ও গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন। বুলবুল ললিতকলা একাডেমীর শিল্পীরা

ধানমন্ডিতে দেশের গান পরিবেশন করেন। বিকেলে ডাক বিভাগের কর্মীরা বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে সমাবেশ শেষে রাজপথে শোভাযাত্রা বের করেন। টঙ্গীতে শ্রমিকরা জঙ্গি মিছিল বের করেন, নারায়ণগঞ্জের শীতলক্ষ্যায় ডকইয়ার্ড শ্রমিকরা নৌ-মিছিল বের করেন। সারাদেশে সভা ও শোভাযাত্রার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামে যে কোনো ত্যাগ স্বীকারের জন্য দৃঢ়সংকল্প ব্যক্ত করা হয়। দু'হাজারেরও বেশি অবাঙালিকে নিয়ে বিশেষ ব্যবস্থায় একটি যাত্রীবাহী জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দর থেকে করাচি রওনা হয়। জাতীয় শিপিং কর্পোরেশনের দু'জন বাঙালি পরিচালক সংস্থার ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের কাছে শেয়ারহোল্ডারদের পক্ষ থেকে পাঠানো এক তারবার্তায় বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সংস্থার জাহাজে করে পূর্ব পাকিস্তানে সৈন্য ও সমরাস্ত্র আনার প্রতিবাদ জানান।

ভারত সরকার তার ভূখণ্ডের ওপর দিয়ে সব বিদেশী বিমানের পূর্ব পাকিস্তান গমন নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিদেশী বিমানের পূর্ব পাকিস্তানে সৈন্য পরিবহন বন্ধ করার জন্যই এ ব্যবস্থা নেয়া হয়। ভারতের সর্বোদয় নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ নয়াদিল্লিতে বলেন, 'জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকারে বিশ্বাসী বিশ্বের প্রতিটি মানুষ ও সরকারের উচিত শেখ মুজিবুর রহমান এবং তার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশকে অকুণ্ঠ সমর্থন দেয়া।'

ময়মনসিংহে এক জনসভায় ন্যাপপ্রধান মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর পদ অলংকৃত করার জন্য শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি আহ্বান জানান। ন্যাপপ্রধান বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু ও পশ্চিম পাকিস্তানে জুলফিকার আলী ভুট্টোর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি আহ্বান জানান।

শাসনতন্ত্র প্রণয়নের আগে আওয়ামী লীগ ও পিপলস পার্টির সমন্বয়ে একটি কোয়ালিশন সরকার গঠন সংক্রান্ত পিপিপি চেয়ারম্যান ভুট্টোর প্রস্তাবের তীব্র সমালোচনা করে পশ্চিম পাকিস্তানি নেতারা পৃথক পৃথক বিবৃতি দেন। লাহোর কাউন্সিল মুসলিম লীগ প্রধান মিয়া মোমতাজ মোহাম্মদ খান দৌলতানা বলেন, 'পাকিস্তান একটি, সুতরাং দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রশ্ন উঠতে পারে না।' বাহাওয়ালপুরে যুক্তফ্রন্টের নেতা মিয়া নিজামউদ্দিন হায়দার বলেন, 'ভুট্টো প্রকৃতপক্ষে দুই শাসনতন্ত্র, দুই সরকার ও দুই দেশ চাচ্ছেন।' করাচিতে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি কাজী ফয়েজ মোহাম্মদ বলেন, 'গণতন্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ দল একটি, অতএব সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে, অন্যের কাছে নয়।'

১৭ মার্চ ১৯৭১

'প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।' বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে

ছাত্রছাত্রী, তরুণ-যুবা স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতি হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ময়দানসহ রাজধানীর বিভিন্ন পাড়া-মহল্লায় কুচকাওয়াজ এবং রাইফেল প্রশিক্ষণ শুরু করে। ঢাকার বাইরেও স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও তরুণরা বাঁশের লাঠি নিয়ে প্রকাশ্যে প্রশিক্ষণে অংশ নেয়। তাদের অবসরপ্রাপ্ত বাঙালি সৈনিক ও পুলিশ সদস্যরা প্রশিক্ষণ দেন।

স্বাধীন বাংলার কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবসকে 'প্রতিরোধ দিবস' হিসেবে পালনের কর্মসূচি ঘোষণা করে। ২৩ মার্চ সকাল ৬টায় সরকারি-বেসরকারি অফিস-আদালত, শিক্ষা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং যানবাহনে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন, প্রভাতফেরি, শহীদদের কবর জিয়ারত, শহীদ মিনারে পুষ্পমাল্য অর্পণ, 'জয়বাংলা' বাহিনীর কুচকাওয়াজ এবং বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বটতলায় ছাত্র-জনসভার কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

রাজধানীতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সভা ও শোভাযাত্রা বের করা হয়। বিভিন্ন অফিস-আদালত ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে। হাজার হাজার মানুষ শহীদ মিনারে গিয়ে বঙ্গবন্ধু ঘোষিত স্বাধীনতা সংগ্রামকে সাফল্যমণ্ডিত করার শপথ নেন। বিকেলে মোহাম্মদপুরে এক জনসভায় ছাত্রলীগ সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী ঐক্যবদ্ধভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে শরিক হওয়ার জন্য স্থানীয় অবাঙালি নাগরিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'আপনারা বাংলার মাটি ও মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান।'

১৮ মার্চ, ১৯৭১

স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরুর আগ পর্যন্ত স্বাধীনতাকামী সংগ্রামী জনতার নির্দেশনার স্থল ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ধানমন্ডির ৩২নং সড়কের বাড়িটি। অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে প্রতিদিন অগণিত মিছিল আসে এই বাড়ির সামনে। ভোর থেকে রাত পর্যন্ত জনতা বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে ভিড় জমায়।

সরকারি-বেসরকারি ভবনের শীর্ষে কালো পতাকা উড়িয়ে অফিস-আদালতে অনুপস্থিত থেকে সব শ্রেণীর কর্মচারী চলমান অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সপ্তদশ দিবসের কর্মসূচি সফল করে তোলেন। ঢাকার রাজপথ ছাত্র-শ্রমিক-জনতার পদচারণায় প্রকম্পিত। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বিভিন্ন সংগঠন ও সমাজের সর্বস্তরের মানুষ স্বাধীনতা সংগ্রামের কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য দৃপ্ত শপথ গ্রহণ করেন।

বিভিন্ন স্তরের মানুষ স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়কের প্রতি তাদের অকুণ্ঠ সমর্থন জানাতে এলে বঙ্গবন্ধু প্রতিটি মিছিলের প্রতি 'জয় বাংলা' ধ্বনি দিয়ে সমবেত জনতার স্লোগান ও করতালির জবাব দেন। সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে তিনি বারবার বৈঠক থেকে উঠে এসে শোভাযাত্রাকারীদের উদ্দেশে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। সমবেত মিছিলকারীদের প্রতি স্বাধীনতা সংগ্রামের সর্বাধিনায়ক বলেন, 'তোমরা চরম

প্রস্তুতি নিয়ে ঘরে ঘরে সংগ্রামী দুর্গ গড়ে তোল। যদি তোমাদের ওপর আঘাত আসে তা প্রতিহত করে শত্রুর ওপর পাল্টা আঘাত হেন। মনে রাখবা, চরম ত্যাগের বিনিময়ে হলেও আমরা মূল লক্ষ্যে পৌঁছবই।'

অনকে সময় মিছিলকারীরা স্বাধীনতার স্বপক্ষে স্লোগান দিতে থাকলে তিনি তাদের উদ্দেশে বলেন, 'তোমরা স্বাধীনতা পাবে, ধৈর্য ধর।'

বঙ্গবন্ধু সমবেত ব্যাংক কর্মচারীদের উদ্দেশে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন, 'প্রয়োজন হলে বাংলাদেশের সমস্ত ব্যাংক জনগণের নিয়ন্ত্রণে আনা হবে।'

সকালে আওয়ামী লীগ প্রধান ও ওয়ালী ন্যাপপ্রধান ওয়ালী খান এক বৈঠকে মিলিত হন। বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে রুদ্ধদ্বার কক্ষে একঘণ্টা স্থায়ী এ বৈঠকে পশ্চিম পাকিস্তান ন্যাপের সভাপতি গাউস বক্স বেজোঞ্জাও উপস্থিত ছিলেন।

রাতে বঙ্গবন্ধু এক বিবৃতিতে সেনাবাহিনী তলব সংক্রান্ত তদন্ত কমিশন প্রসঙ্গে বলেন, 'আমরা এ ধরনের তদন্ত কমিশন চাইনি। আমরা চেয়েছিলাম সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও প্রকাশ্য তদন্ত। তাই আমি এই কমিশন মেনে নিতে পারি না।'

রাতে সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়, ১৯ মার্চ বেলা ১১টায় প্রেসিডেন্ট হাউসে আওয়ামী লীগ প্রধান ও প্রেসিডেন্টের মধ্যে বর্তমান রাজনৈতিক সংকট সম্পর্কে তৃতীয় দফা আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে।

সকালে সেনাবাহিনীর সদস্যরা তেজগাঁও ও মহাখালীতে নিরস্ত্র ট্রাক আরোহীদের নির্মমভাবে প্রহর করে। এ ঘটনায় নগরীতে জনসাধারণের মধ্যে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। জনগণ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

রাতে এ ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির উপনেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম এক বিবৃতিতে বলেন, 'আমাদের বারবার প্রতিবাদ সত্ত্বেও সেনাবাহিনীর দায়িত্বজ্ঞানহীন কার্যকলাপ অব্যাহত রয়েছে। ক্যান্টনমেন্ট এলাকার সৈন্যরা সম্পূর্ণ বিনা অজুহাতে নিরস্ত্র নিরীহ-নিরপরাধ-অসামরিক বাসিন্দাদের অপদস্ত, হয়রানি ও নির্যাতন করছে। ঢাকাসহ সারাদেশে সেনাবাহিনীর উস্কানিমূলক তৎপরতা অব্যাহত থাকায় জনগণ আজ বিক্ষুব্ধ। আমরা পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিতে চাই এ ধরনের উস্কানিমূলক আচরণ তা যে কোনো মহলেই হোক না কেন, আর সহ্য করা হবে না। এর ফলাফলের দায়িত্বও উস্কানিদাতাদের সম্পূর্ণ বহন করতে হবে।'

বাংলাদেশের জন্য খাদ্যশস্যবাহী 'ইরনা এলিজাবেথ' নামে জাহাজের গতিপথ বদল করে চট্টগ্রাম থেকে করাচি নিয়ে যাওয়া হয়।

চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর সাম্প্রতিক গুলিবর্ষণ ও অন্যান্য ঘটনা সম্পর্কে সরেজমিন তদন্তের জন্য বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ৩ সদস্যের একটি দলীয় তদন্ত দল ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম যায়। ঢাকায় বিমান বাহিনীর সাবেক বাঙালি সৈনিকরা স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে সংগ্রাম কমিটি গঠন করেন। সাবেক বিমান সেনারা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে তাদের সর্বশক্তি ও সম্পদ নিয়োগ করে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে যে কোনো ত্যাগ স্বীকারের শপথ নেন।

করাচিতে এক সংবাদ সম্মেলনে পিপলস পার্টি প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো বলেন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নে আলোচনার জন্য তাকে ঢাকায় আসার যে আমন্ত্রণ জানান, তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

১৯ মার্চ ১৯৭১

ঢাকার অদূরে গাজীপুরে পাকিস্তানি সেনার বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধে নামে সংগ্রামী জনতা। সেই জনযুদ্ধে চলমান অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে যোগ করে নতুন মাত্রা। এর আগে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রংপুর, রাজশাহীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পাক সেনা ও জনতার মধ্যে বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষের ঘটনা ঘটলেও এদিনই প্রথম সংগ্রামী বাঙালি তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়। গাজীপুরে সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে কমপক্ষে ৫০ জন স্বাধীনতা সংগ্রামী নিহত ও দুই শতাধিক আহত হন। সন্ধ্যায় শহরে অনির্দিষ্টকালের জন্য সান্ধ্য আইন জারি করা হয়। গাজীপুর রাজবাড়ীতে অবস্থানরত ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সৈনিকদের ঢাকা সেনানিবাসে ফিরিয়ে নেয়ার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে তাদের নিরস্ত্র করার উদ্দেশ্যে সামরিক কর্তৃপক্ষ সকালে এক পাঞ্জাবি ব্রিগেডিয়ারের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর একটি দল পাঠায়। সকাল থেকেই বেসামরিক লোকজন গাজীপুর চৌরাস্তায় ব্যারিকেড রচনা করে। নিরস্ত্র জনতা সেনাবাহিনীর শহরে প্রবেশে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করলে তাদের ওপর নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে। গুলিতে এখানে বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী হতাহত হন। সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণের খবর ছড়িয়ে পড়লে আশপাশের বিভিন্ন এলাকা থেকে দলে দলে মানুষ তীর-ধনুক, বল্লম-টেঁটা, দা-কুড়াল, বন্দুক প্রভৃতি নিয়ে ছুটে আসে। জনতা স্থানে স্থানে অসংখ্য ব্যারিকেড গড়ে তোলে। সৈন্যদের প্রতিরোধের জন্য জয়দেবপুর রেলগেটের ওপর রেলবগি ও গাছের গুঁড়ি দিয়ে সুদৃঢ় ব্যারিকেড তৈরি করে। দুপুরে রেলগেটের ওপর জনতা ও পাকসেনাদের মুখোমুখি বন্দুকযুদ্ধ হয়। রাজবাড়ী এলাকায় বাঙালি সেনা ও পাকিস্তানি সৈন্যদের মধ্যে এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে গুলিবিনিময় হয়। রাজবাড়ীতে প্রবেশে ব্যর্থ হয়ে পশ্চিম পাকিস্তানি সেনা দলটি ঢাকা ফিরে যাওয়ার সময় চৌরাস্তায় জনতা তাদের বাধা দিলে এখানে তুমুল সংঘর্ষ হয়। এ সময় সৈন্যরা আশপাশের গ্রামবাসীদের ওপরও হামলা চালায়। সৈন্যরা ঢাকায় ফেরার পথে টঙ্গী বোর্ডবাজারে জনতার প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়। সন্ধ্যায় সেনাবাহিনী গাজীপুরে সান্ধ্য আইন জারি করে তাদের খোয়া যাওয়া অস্ত্রশস্ত্র অনুসন্ধানের নামে নিরীহ ও নিরপরাধ লোকজনের ওপর পাশবিক অত্যাচার চালায়।

২০ মার্চ ১৯৭১

সারাদিন বীর বাঙালির দৃপ্ত পদচারণায় রাজধানী টালমাটাল। মিছিলের পর মিছিল এগিয়ে চলে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার অভিমুখে। সেখানে শপথ অনুষ্ঠান শেষে একের পর

এক শোভাযাত্রা বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে গিয়ে সমবেত হয়। বিকেলে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে নৌবাহিনীর সাবেক সৈনিকদের সামবেশে স্বাধীনতা সংগ্রামে সার্বিক সহযোগিতার লক্ষ্যে একটি সম্মিলিত মুক্তিবাহিনী কমান্ড গঠনের জন্য সশস্ত্র বাহিনীর সাবেক বাঙালি সৈনিকদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। বক্তারা বাঙালি সৈনিকদের কেবল বাংলাদেশে রাখা এবং অবিলম্বে বাংলাদেশ থেকে অবাঙালি সৈন্য অপসারণের দাবি জানান। সমাবেশ শেষে বাঙালি নৌ-সেনারা কুচকাওয়াজ করে বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির বাসভবনে যান এবং বাংলার মুক্তি সংগ্রামের সর্বাধিনায়কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তার নেতৃত্বে মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য শেষ রক্তবিন্দু দানের প্রতিশ্রুতি দেন। সংক্ষিপ্ত ভাষণদানকালে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন, 'যত বাধাই আসুক বাংলার মানুষের স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রাম চলবে। আপনারা আন্দোলনে ভাটা পড়তে দেবেন না।'

২১ মার্চ, ১৯৭১

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষিত মুক্তি সংগ্রামের বিংশতিতম দিবসে হাজার হাজার মানুষের দৃপ্ত মিছিলে রাজধানী ঢাকা মিছিলের নগরীতে পরিণত হয়। 'জয় বাংলা', 'জয় বঙ্গবন্ধু' স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত প্রতিটি মিছিল দ্রুত পায়ে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার হয়ে বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির বাসভবনে যায়। ব্যস্ততার মাঝেও তিনি বারবার এসে মিছিলকারীদের স্বাগত জানিয়ে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। বঙ্গবন্ধু সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে বক্তৃতাকালে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন, 'মৌলিক প্রশ্নে কোনো আপস হতে পারে না। আপনারা চরম ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত হোন। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চলবে। আমরা অনেক রক্ত দিয়েছি। প্রয়োজন হলে চরম ত্যাগ স্বীকার করবো। তবু দাবি আদায় করে ছাড়বো। জনতার জয় অবধারিত। যত নির্যাতন-বুলেট চালানো হোক না কেন জনতাকে স্তব্ধ করা যাবে না।

সারাদেশে যথারীতি সভা-সমাবেশ, শোভাযাত্রার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর কর্মসূচির প্রতি সমর্থন জানানো হয়। সরকারি অফিস-আদালত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে। সরকারি ও বেসরকারি ভবনের শীর্ষে কালো পতাকা উড়ানো হয়। মগবাজারে মহিলা সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক মহিলা সমাবেশে সেনাবাহিনীর সাবেক বাঙালি সৈনিকদের নিয়ে একটি প্যারা মিলিটারি গঠনের আহ্বান জানানো হয়। নারায়ণগঞ্জে মহিলারা নৌ-মিছিল বের করেন। সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বিক্ষুব্ধ লেখক ও শিল্পীরা সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। ব্রিটিশ সরকার বাংলাদেশে যাতায়াতের জন্য পাকিস্তানি বিমান ও জাহাজকে মালদ্বীপের ব্রিটিশ ঘাঁটি ব্যবহারের অনুমতি দেয়। ১৯ মার্চ গাজীপুরে জারিকৃত কারফিউ দুপুর ১২টায় ৬ ঘণ্টার জন্য প্রত্যাহার করা হয়। পরে সন্ধ্যা ৬টা থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য আবার কারফিউ বলবৎ করা হয়।

ঢাকায় স্বাধীন বাংলাদেশ শ্রমিক সংগ্রাম পরিষদ আগামী ২৩ মার্চ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানি পণ্য বর্জন সপ্তাহ পালনের কর্মসূচি ঘোষণা করে। সকালে প্রেসিডেন্ট হাউসে জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের মধ্যে পঞ্চম দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ছিলেন। এ বৈঠক দেড় ঘণ্টা স্থায়ী হয়। এর আগে বঙ্গবন্ধু তার বাসভবনে বিশিষ্ট আইনজীবী একে ব্রোহির সঙ্গে এক সংক্ষিপ্ত বৈঠকে মিলিত হন।

২২ মার্চ, ১৯৭১

সারাদেশে প্রস্তুতি। প্রতিরোধের প্রস্তুতি। ইয়াহিয়া-মুজিব আলোচনা চলছে। পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা ঢাকায়। বঙ্গবন্ধু একদিকে আলোচনা অন্যদিকে দাবি আদায়ের জন্য অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত রেখেছেন। তার নির্দেশে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে চলছে প্রতিরোধের প্রশিক্ষণ। রাজধানীতে বিভিন্ন সংগঠনের সভা ও শোভাযাত্রার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে শিশু-কিশোর এবং পল্টন ময়দানে সশস্ত্র বাহিনীর সাবেক বাঙালি সৈনিকদের সমাবেশ ও কুচকাওয়াজ।

পল্টনে বাঙালি যোদ্ধাদের সমাবেশে বক্তারা বলেন, 'বাংলার নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যে অভূতপূর্ব ঐক্য গড়ে উঠেছে তাতে সাবেক সৈনিকরা আর সাবেক হিসেবে বসে থাকতে পারে না। আমাদের অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের মূল্যবান সম্পদ। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আমাদের এই সম্পদ কাজে লাগানোর দিন এসেছে। আমরা বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ পালন করার জন্য প্রস্তুত।' সমাবেশ থেকে বিমান, নৌ ও স্থলবাহিনীর সব অবসরপ্রাপ্ত সৈনিককে নিজ নিজ এলাকার আওয়ামী লীগ, সংগ্রাম পরিষদ ও স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে সহযোগিতা করার আহ্বান জানানো হয়। অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল এমআই মজিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় অন্যান্যের মধ্যে কর্নেল এমএজি ওসমানী (পরে জেনারেল) বক্তৃতা করেন। সাবেক সৈনিকদের কথা শোনার জন্য পল্টন ময়দানে বিপুল জনসমাগম ঘটে। উপস্থিত জনতা হর্ষধ্বনি ও হাততালি দিয়ে মুক্তিসংগ্রামে বাঙালি সৈনিকদের আনুষ্ঠানিক সমর্থনদানের ঘোষণাকে অভিনন্দিত করে। সভা শেষে বীর বাঙালি সৈনিকরা কুচকাওয়াজ করে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে যান। সামরিক কায়দায় শহীদ বেদীতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা সংগ্রামকে সর্বাত্মকভাবে সফল করে তোলার শপথ নেন। পরে তারা কুচকাওয়াজ করে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে যান এবং বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত রাজধানী ঢাকার রাজপথে নামে অবিচ্ছিন্ন মিছিলের স্রোতধারা। স্বাধীনতা অর্জনের বলিষ্ঠ শপথের বজ্রনির্ঘোষ জয় বাংলা স্লোগানে মুখরিত শোভযাত্রার গন্তব্যস্থল বঙ্গবন্ধুর বাসভবন। বঙ্গবন্ধু তার বাসভবনে সমবেত জনতার

উদ্দেশে বেশ কয়েকবার সংক্ষিপ্ত ভাষণ দান করেন। বক্তৃতাকালে তিনি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'সাত কোটি মানুষের মুক্তি অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চলবে। এই সংগ্রামে আমরা অবশ্যই জয়ী হবো। বন্দুক, কামান, মেশিনগান কিছুই জনগণের স্বাধীনতা রোধ করতে পারে না।' তিনি জনগণকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে যে কোনো ত্যাগ স্বীকারের জন্য তৈরি থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'জয় আমাদের হবেই ইনশাল্লাহ।'

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সকালে আগামী ২৫ মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠেয় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। প্রেসিডেন্ট হাউসের এক ঘোষণায় বলা হয়: পাকিস্তানের উভয় অংশের নেতৃবৃন্দের মধ্যে আলোচনাক্রমে এবং রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্যের পরিবেশ সম্প্রসারণে সুযোগ সৃষ্টির জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ২৫ মার্চ আহূত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

সকালে রমনার প্রেসিডেন্ট হাউসে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও জুলিফিকার আলী ভুট্টো আলোচনা বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠক প্রায় সোয়া ঘণ্টা স্থায়ী হয়। প্রেসিডেন্ট হাউসের অদূরে দাঁড়িয়ে জনতা বঙ্গবন্ধুর সমর্থনে ও ভুট্টোর বিপক্ষে স্লোগান দেয়। বঙ্গবন্ধু ও ইয়াহিয়ার সঙ্গে আলোচনার প্রায় একঘণ্টা আগে ভুট্টো প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টাদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন। বঙ্গবন্ধু প্রেসিডেন্ট হাউস ত্যাগের পরও ভুট্টো একঘণ্টা সেখানে অবস্থান করেন। ভুট্টো সন্ধ্যায় আবার প্রেসিডেন্ট হাউসে নিজের উপদেষ্টাদের নিয়ে ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হন।

প্রেসিডেন্ট হাউস থেকে নিজ বাসভবনে ফিরে আওয়ামী লীগ প্রধান সাংবাদিকদের বলেন, 'আমরা ৪ দফা পূরণ না হওয়া পর্যন্ত জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে যোগ দিতে পারি না।'

দুপুরে প্রেসিডেন্ট হাউস থেকে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে ফিরেই ভুট্টো তার উপদেষ্টাদের নিয়ে বৈঠকে বসেন। এই বৈঠক শেষে ভুট্টোর নেতৃত্বে পিপলস পার্টির নেতারা সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্ট হাউসে যান। রাতে সেখান থেকে ফিরেই ভুট্টো হোটেল লাউঞ্জে এক অনির্ধারিত সংবাদ সম্মেলন করেন। তিনি বলেন, 'প্রেসিডেন্ট ও আওয়ামী লীগ প্রধান বর্তমান রাজনৈতিক সংকট নিরসনের জন্য একটি সাধারণ ঐকমত্যে পৌঁছেছেন। তবে এই ঐকমত্য অবশ্যই পিপলস পার্টির কাছে গ্রহণযোগ্য হতে হবে। জাতীয় পরিষদ অধিবেশন বসার আগে আওয়ামী লীগ, পিপলস পার্টি ও সেনাবাহিনীর মধ্যে একটি ত্রিপক্ষীয় চুক্তির প্রয়োজন রয়েছে। কেননা, বর্তমান পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনীও একটি পক্ষ। কারণ তারা ক্ষমতায় এবং তারাই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে।'

রাতে কাউন্সিল মুসলিম লীগ প্রধান মিয়া মমতাজ খান মোহাম্মদ দৌলতানা, ওয়ালী ন্যাপপ্রধান খান আবদুল ওয়ালী খান, জমিয়তে উলামায়ে মহাসচিব মওলানা মুফতি মাহমুদ, ন্যাপ নেতা মীল গাউস বক্স বেজেঞ্জো ও সর্দার শওকত হায়াত খান প্রেসিডেন্ট হাউসে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে এক অনির্ধারিত বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠক

দু'ঘণ্টা স্থায়ী হয়। গভীর রাতে পশ্চিম পাকিস্তানের উল্লিখিত নেতারা এক বিবৃতিতে বলেন, তাদের সঙ্গে আলোচনা না করে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেছেন। প্রেসিডেন্ট আলোচনার জন্য মুসলিম লীগ সভাপতি খান আবদুল কাইউম খান ও জমিয়তে উলামায়ে প্রধান মওলানা শাহ আহমদ নুরানীকে ঢাকায় আসার আহ্বান জানান।

২৩ মার্চ, ১৯৭১

পাকিস্তান প্রজাতন্ত্র দিবসে ছাত্রসমাজ ঢাকাসহ সারাদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে 'পূর্ব পাকিস্তান'-এর কবর রচনা এবং বাংলাদেশ নামে স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় অনিবার্য করে তোলে। বিক্ষুব্ধ বাংলায় স্বাধীনতা আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গে আঘাতের 'পাকিস্তান দিবস' পালিত হয় 'ঐতিহাসিক লাহোর দিবস' হিসেবে। মুক্তি সংগ্রামের সর্বাধিনায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আগেই ২৩ মার্চকে 'ঐতিহাসিক লাহোর দিবস' হিসেবে পালনের জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। এ উপলক্ষে তিনি সারা বাংলায় সরকারি ছুটি ঘোষণা করেন।

পাকিস্তান দিবসকে ন্যাপ (ভাসানী) 'স্বাধীন পূর্ববঙ্গ দিবস' এবং স্বাধীন বাংলা ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ 'প্রতিরোধ দিবস' হিসেবে পালন করে। বঙ্গবন্ধু সূর্যোদয়ের সময় ধানমন্ডির ৩২ নম্বর রোডে তার বাসভবনে নিজ হাতে সবুজ জমিনে লাল বৃত্তের মাঝে সোনালি মানচিত্র অংকিত স্বাধীন বাংলার পতাকা তোলেন। এ সময় 'জয় বাংলা, বাংলার জয়' গানটি সমবেত কণ্ঠে পরিবেশিত হয়।

'পাকিস্তান দিবস' উপলক্ষে ঢাকার প্রেসিডেন্ট ভবন ও সেনাবাহিনীর সদর দফতর ছাড়া বাংলাদেশে আর কোথাও পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা ওড়েনি। সারা বাংলায় উড়েছে স্বাধীন বাংলার পতাকা। ঢাকার সেক্রেটারিয়েট, হাইকোর্ট, পরিষদ ভবন, ইপিআর ও রাজারবাগ পুলিশ সদর দফতর, ঢাকা বেতার ও টেলিভিশন ভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রধান বিচারপতি ও মুখ্য সচিবের বাসভবনসহ সব সরকারি-বেসরকারি ভবন এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন বাংলার পতাকা তোলা হয়। জাতীয় পতাকার পাশাপাশি তোলা হয় শোকের কালো পতাকাও।

সারাদিন রাজপথে লাঠি-বর্শা-বন্দুকের মাথায় নতুন জাতি ও নতুন দেশের পতাকা উড়িয়ে হাজার হাজার মানুষ কোটি প্রাণের আমোঘ সঙ্গীত 'জয়বাংলা' মন্ত্রে গর্জে ওঠে। সারাদেশে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে স্বাধীন বাংলার পতাকা বিতরণ করা হয়। দৈনিক পত্রিকাগুলোতে বাংলাদেশের পতাকার নকশা ছাপানো হয়, যা দেখে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে পতাকা তৈরি করে নিজ নিজ বাসগৃহে উত্তোলন করে।

২৪ মার্চ, ১৯৭১

সারাদেশে রাস্তায় রাস্তায় বীর বাঙালির মিছিল আর সেনানিবাসগুলোতে চলে নিরীহ বাঙালির ওপর একযোগে আক্রমণের জন্য পাকিস্তানি সেনাদের 'অপারেশন সার্চলাইট'

প্রস্তুতি। ঢাকার মিরপুর, রংপুর, সৈয়দপুর, চট্টগ্রামে পাকসেনাদের ছত্রছায়ায় অবাঙালি বিহারীরা বাঙালি জনসাধারণের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। রাজশাহী, রংপুর ও দিনাজপুরে সামরিক সরকারের এজেন্টরা বোমাবাজি করে। ঢাকার মিরপুরে উস্কানিমূলক কার্যকলাপ চালানো হয়। চট্টগ্রাম ও রংপুরে জনতা-সেনাবাহিনীর ছত্রছায়ায় অবাঙালিরা বাঙালি নিধনযজ্ঞ চালায়।

আওয়ামী লীগ প্রধানের নির্দেশে সরকারি অফিস-আদালত ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হরতাল পালিত হয়। সারাবাংলার গৃহে গৃহে স্বাধীন বাংলার পতাকার পাশাপাশি কালো পতাকাও উড়ে। চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানে আওয়ামী স্বেচ্চাসেবক বাহিনীর কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়। টিভি কেন্দ্রে পাহারারত সৈন্যরা টিভি কর্মীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করলে সন্ধ্যা থেকে ঢাকা টিভির অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেয়া হয়।

স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ নেতারা এক বিবৃতিতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে সশস্ত্র গণবিপ্লবকে আরো জোরদার করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে অগুনিত মিছিল আসে। সমাগত মিছিলকারীদের উদ্দেশে সংক্ষিপ্ত ভাষণদানকালে বাঙালি জাতির নেতা শেখ মুজিবুর রহমান জনসাধারণকে যে কোনো পরিণতির জন্য প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'আমি চূড়ান্ত সংগ্রামের নির্দেশ দেয়ার জন্য বেঁচে থাকবো কিনা জানি না। স্বাধীনতা আদায়ের জন্য আপনারা আপনাদের সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন।' আপনারা চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকুন। আর আলোচনা নয়, এবার ঘোষণা চাই। আগামীকালের মধ্যে সমস্যার কোনো সমাধান না হলে বাঙালিরা নিজেদের পথ নিজেরা বেছে নেবে। সরকারের প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে তিনি বলেন, 'বাংলার জনগণের ওপর কোনো সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়া হলে তা বরদাশত করা হবে না। কারো চোখ রাঙানির কাছে আমরা মাথানত করবো না।' চট্টগ্রামে পাকসেনারা নৌবন্দরে ১৭নং জেটিতে নোঙর করা এমভি সোয়াত জাহাজ থেকে সমরাস্ত্র খালাস করতে গেলে বীর চট্টলার ৫০ হাজার মানুষ তাদের ঘিরে ফেলে। বিকেলে সেনাবাহিনী অস্ত্র নামানোর জন্য বন্দর শ্রমিকদের নিয়োগ করতে চাইলে শ্রমিকরা তাতে অস্বীকৃতি জানায়। পরে শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে হাজার হাজার ছাত্র-শ্রমিক-জনতা বন্দরে গিয়ে হাজির হয়। জনতা জেটি থেকে কদমতলী পর্যন্ত ৪ মাইল পথের বিভিন্ন স্থানে ব্যারিকেড রচনা করে। সেনাবাহিনীর সদস্যরা জাহাজ থেকে কিছু অস্ত্র নিজেরাই খালাস করে। সেসব অস্ত্রশস্ত্র ১২টি ট্রাকে তুলে নতুনপাড়া সেনানিবাসে আনার চেষ্টা করে। ১৭নং জেটির পাশে ডবলমুরিং রোডের একটি ব্যারিকেডে দাঁড়িয়ে জনতা তাদের পথরোধ করে। রাত সাড়ে ১০টা পর্যন্ত পাকসেনা ও হাজার হাজার লোক ব্যারিকেডের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকার পর সেনাবাহিনী গুলিবর্ষণ শুরু করে। তাদের বেপরোয়া গুলির মুখেও নিরস্ত্র জনতা দুর্ভেদ্য ব্যারিকেড রচনা করে থাকে। এ রাতে সংঘর্ষে কমপক্ষে ২০০ শ্রমিক-জনতা শহীদ হন। ঢাকার মিরপুরে অবাঙালিরা

সন্ধ্যায় সাদা পোশাকধারী পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর লোকদের সহযোগিতায় জোরপূর্বক বাঙালিদের বাড়িঘর থেকে স্বাধীন বাংলার পতাকা ও কালো পতাকা নামিয়ে তাতে অগ্নিসংযোগ করে এবং পাকিস্তানের পতাকা তোলে। রাতে বিহারিরা এখানে ব্যাপক বোমাবাজি করে আতঙ্কের সৃষ্টি করে। কয়েকটি স্থানে বাঙালিদের বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগও করা হয়। গুলি ও ছুরিকাঘাতে বেশ কয়েকজনকে আহত করা হয়।

রেলওয়ে শহর সৈয়দপুরে সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণে কমপক্ষে শতাধিক নিহত হয়। আহত হয় কয়েক হাজার মানুষ। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী সৈয়দপুর সেনানিবাসের পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন গ্রাম ঘেরাও করে এ গণহত্যা চালায়। শহরে কারফিউ দিয়ে সেনাবাহিনী ও অবাঙালিরা সম্মিলিতভাবে বাঙালিদের বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ করে। নিরস্ত্র বাঙালিদের গুলি করে হত্যা করে। রংপুর হাসপাতালে সামনে ক্ষুব্ধ জনতা ও সেনাবাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ হয়। পরে একে কেন্দ্র করে সেনারা রংপুর সেনানিবাস এলাকায় নিরস্ত্র অধিবাসীর ওপর বেপরোয়া গুলিবর্ষণ করে। এতে কমপক্ষে ৫০ জন নিহত ও বহু আহত হয়।

সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্ট হাউসে আওয়ামী লীগ ও সরকারের মধ্যে উপদেষ্টা পর্যায়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে আওয়ামী লীগের পক্ষে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ ও ড. কামাল হোসেন উপস্থিত ছিলেন। দু'ঘণ্টা স্থায়ী এ বৈঠক শেষে তাজউদ্দীন আহমদ সাংবাদিকদের জানান, আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বক্তব্য শেষ হয়েছে। এখন প্রেসিডেন্টের উচিত তার ঘোষণা দেয়া। তিনি বলেন, প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টাদের সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে, আওয়ামী লীগ আলোচনা আর দীর্ঘায়িত করতে প্রস্তুত নয়। রাতে আওয়ামী লীগের এক বিবৃতিতে জানানো হয়, আর আলোচনা করে কালক্ষেপণ করা যাবে না। পরিস্থিতি ক্রমে সংকটতর পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। সরকারকে অবিলম্বে তাদের ঘোষণা জানাতে হবে।

পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা বিকেলে পিআইএ'র একই ফ্লাইটে ঢাকা ত্যাগ করে। করাচি রওনার আগে ন্যাপ নেতা ওয়ালী খান ও গাউস বক্স রেজেঞ্জো বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তার বাসভবনে এক সংক্ষিপ্ত বৈঠকে মিলিত হন। পিপলস পার্টি প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো দুপুরে প্রেসিডেন্ট হাউসে জেনারেল ইয়াহিয়া ও তার উপদেষ্টাদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন।

চট্টগ্রাম, রংপুর, সৈয়দপুর ও মিরপুরের ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে গভীর রাতে আওয়ামী লীগের প্রাদেশিক সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ এক বিবৃতিতে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, একটি রাজনৈতিক সমাধানে পৌঁছানোর প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করার উদ্যোগ নেয়া হলে তার পরিণতি ভয়াবহ হবে।

২৫ মার্চ, ১৯৭১

২৫ মার্চ বিভীষিকাময় কালোরাত। এ রাতের নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পাশবশক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিরস্ত্র বাঙালি জাতির ওপর। হানাদার

পাকসেনার মেশিনগানের গুলি, ট্যাংক-মর্টারের গোলায়, আগুনের লেলিহান শিখায় রাজধানী ঢাকার বুকে নেমে আসে মৃত্যুর ঘনতমসা। আর আক্রান্ত রাতের ওপর উপ্ত হয় নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশের। ২৫ মার্চের কালোরাতের বুক চিরে নবসূর্যোদয়ের মধ্য দিয়ে সূচিত হয় নতুন ইতিহাস, শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ।

স্বাধীনতা সংগ্রামী বাঙালির স্বাধীন স্বদেশের স্বপ্ন গুঁড়িয়ে দিতে সেই কালোরাতে পাকিস্তানি সেনারা রাজধানী ঢাকার বুকে মেশিনগান-মর্টার-ট্যাংক নিয়ে অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে ৫০ হাজারেরও বেশি ঘুমন্ত নাগরিককে। একই সঙ্গে হত্যাযজ্ঞ শুরু হয় দেশের বিভিন্ন স্থানে। রাতে ইয়াহিয়ার বাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রাবাস, শিক্ষক কোয়ার্টার, পুলিশ-ইপিআর ব্যারাকসহ নতুন ও পুরনো ঢাকার আবাসিক এলাকা এবং বস্তিবাসীর ওপর বর্বর আক্রমণ চালিয়ে সূচনা করে ৯ মাসব্যাপী ইতিহাসের নজিরবিহীন গণহত্যা, অত্যাচার, নিপীড়ন, নারী ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ। তারা বিপ্লবী বাংলাদেশকে অগ্নিবলয়ে নিক্ষেপের মাধ্যমে শুরু করে মানবতার বহ্ন্যুৎসব।

সকালে প্রেসিডেন্ট হাউসে ভুট্টো-ইয়াহিয়া বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে তারা বাংলাদেশে গণহত্যার সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বিকেলে সেনানিবাসে গিয়ে নিরপরাধ বাঙালিদের ওপর কাপুরোষিত সশস্ত্র হামলার নির্দেশ দেন। জেনারেল ইয়াহিয়া রাত ৮টায় ঢাকা ত্যাগ করেন, আর সেই সঙ্গে স্বয়ং সমাধি রচনা করে যান অখণ্ড পাকিস্তানের। রাত ৯টায় গোটা ঢাকায় খবর ছড়িয়ে পড়ে ইয়াহিয়া খান ঢাকা ত্যাগ করেছেন। সেনানিবাসে সৈন্যরা যুদ্ধসাজে তৈরি হচ্ছে। এ খবর পেয়ে ছাত্র-জনতা সারা ঢাকা ব্যারিকেড রচনা শুরু করে।

বিকেলে সংবাদপত্রে পাঠানো এক বিবৃতিতে বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন স্থানে সেনাবাহিনীর ব্যাপক গণহত্যার প্রতিবাদে ২৭ মার্চ সারা বাংলায় হরতাল পালনের আহ্বান জানান। সন্ধ্যায় বঙ্গবন্ধু অপর এক বিবৃতিতে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেন, 'রাজনৈতিক সমাধান বাঞ্চালের উদ্দেশ্যে সামরিক মোকাবেলার নীতি অনুসরণ করা হলে এর অবশ্যম্ভাবী ভয়াবহ পরিস্থিতির জন্য সংশ্লিষ্ট মহলই দায়ী হবে।'

রাতে ইয়াহিয়ার ঢাকা ত্যাগের খবর পাওয়ার পর বঙ্গবন্ধু তার বাসভবনে উপস্থিত দলীয় নেতাকর্মী, সমর্থক, ছাত্রনেতা ও সাংবাদিকদের উদ্দেশে বলেন, 'আমরা সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছি। কিন্তু জেনারেল ইয়াহিয়া খান সামরিক ব্যবস্থা, গ্রহণের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে চাচ্ছেন। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট অখণ্ড পাকিস্তানের সমাপ্তি টানতে চলেছেন।'

পাকিস্তান সেনাবাহিনী পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী 'অপারেশন সার্চলাইট' অভিযান শুরুর জন্য রাত সাড়ে ১১টায় ছাউনি থেকে বেরিয়ে আসে। ফার্মগেটের মুখে হানাদার বাহিনী প্রথম প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়। এখানে তারা লাউড স্পিকারে গোটা ঢাকার কারফিউ জারির ঘোষণা দেয়। ছাত্র-জনতা সেনাবাহিনীকে বাধা দিলে তারা

মেশিনগানের সাহায্যে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পাখির মতো গুলি করে হত্যা করে। ডিনামাইট দিয়ে ব্যারিকেড উড়িয়ে দিয়ে শহরে প্রবেশ করে। রাস্তায় রাস্তায় শুরু হয় খণ্ডযুদ্ধ। সেনাবাহিনী প্রতিরোধকারী বাঙালি যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে ট্যাংক-মর্টার-রকেড ব্যবহার করে। চারদিকে গুলি আর গোলার বিস্ফোরণ। মানুষের আর্তচিৎকার। মধ্যরাতেই সেনাবাহিনী পিলখানা, রাজারবাগ, নীলক্ষেত আক্রমণ করে। সেনারা পিলখানাও নীলক্ষেতে প্রচণ্ড প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়। রাত ২টার সময় হানাদার বাহিনী ট্যাংক, বাজুকা, মর্টারের মাধ্যমে নীলক্ষেত বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা দখল করে। প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর পিলখানা ইপিআর ব্যারাকের পতন হয়। ভোরের আগেই রাজারবাগ পুলিশলাইন হামলাকারীদের কব্জায় আসে।

পাকিস্তানি সেনারা নিরস্ত্র বাঙালির বিরুদ্ধে অঘোষিত যুদ্ধ শুরু করলে মধ্যরাতের পর মুক্তিসংগ্রামের সর্বাধিনায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার ধানমন্ডির বাসভবনে থেকে ঘোষণা করেন : 'পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আমাদের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে। ছাত্র-জনতা-পুলিশ-ইপিআর শত্রুর বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রাম শুরু হয়েছে। আমি ঘোষণা করছি, আজ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। সর্বস্তরের নাগরিককে আমি আহ্বান জানাচ্ছি, আপনারা যে যেখানে যে অবস্থাতেই থাকুন, যার যা আছে তাই নিয়ে দখলদার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলুন। সম্মিলিতভাবে শত্রুর মোকাবেলা গড়ে তুলুন। আপনারা শেষ শত্রুটি দেশ থেকে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যান।'

রাত ১২টার পর বঙ্গবন্ধুর স্বকণ্ঠে এ ঘোষণা বেতারে একবার শোনা যায়। পিলখানা ইপিআর ব্যারাক ও অন্যান্য স্থান থেকে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার লিখিত বাণী ওয়্যারলেসের মাধ্যমে সারাদেশে বার্তা আকারে পাঠানো হয়। এ ওয়্যারলেস বার্তা চট্টগ্রাম ইপিআর সদর দফতরে পৌঁছায়। চট্টগ্রাম উপকূলে নোঙর করা একটি বিদেশী জাহাজও এ বার্তা গ্রহণ করে। চট্টগ্রামে অবস্থানকারী আওয়ামী লীগের শ্রম সম্পাদক জহুর আহমেদ চৌধুরী বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার বাণী সাইক্লোস্টাইল করে রাতেই শহরবাসীর মধ্যে বিলির ব্যবস্থা করেন।

রাত ১টার দিকে সেনাবাহিনীর একটি দল ধানমন্ডিতে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের অদূরে শুক্রাবাদে ব্যারিকেডের মুখোমুখি হয়। এখানে প্রতিরোধ ব্যূহ ভেঙে হানাদাররা রাত দেড়টার দিকে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের সামনে আসে। সেনারা বাসভবনে এলোপাতাড়ি গুলি নিক্ষেপ করে ভেতরে ঢোকে। বঙ্গবন্ধুকে বন্দি করে শেরেবাংলা নগরের সামরিক বাহিনীর দফতরে নিয়ে যায়। পরে সেখান থেকে তাকে সেনানিবাসে নিয়ে আটক রাখা হয় আদমজী কলেজের একটি কক্ষে।

২৬ মার্চ, ১৯৭১

২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু ধানমন্ডির বাসভবন থেকে ঘোষণা করেন 'আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন।' তৎকালীন ইপিআরের (বিডিআর) ওয়্যারলেসে পাঠানো

স্বাধীনতা বার্তায় তিনি ঘোষণা করেন : 'পাকিস্তান সেনাবাহিনী অতর্কিতে পিলখানার ইপিআর ঘাঁটি, রাজারবাগ পুলিশলাইন আক্রমণ করেছে এবং শহরের লোকদের হত্যা করছে। ঢাকা, চট্টগ্রামের রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ চলছে। আমি বিশ্বের জাতিগুলোর কাছে সাহায্যের আবেদন করছি। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা বীরত্বের সঙ্গে মাতৃভূমি মুক্ত করার জন্য শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহর নামে আপনাদের কাছে আমার আবেদন ও আদেশ, দেশকে স্বাধীন করার জন্য শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যান। আপনাদের পাশে এসে যুদ্ধ করার জন্য পুলিশ, ইপিআর, বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও আনসারদের সাহায্য চান। কোনো আপস নেই, জয় আমাদের হবেই। আমাদের পবিত্র মাতৃভূমি থেকে শেষ শত্রুকে বিতাড়িত করুন। সব আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী এবং অন্যান্য দেশপ্রেমিক ও স্বাধীনতাপ্রিয় লোকদের এ সংবাদ পৌঁছে দিন। আল্লাহ আপনাদের মঙ্গল করুন। জয়বাংলা।

রাস্তায় রাস্তায় শুরু হয় প্রতিরোধ যুদ্ধ। পুলিশ, ইপিআর, আনসার, সশস্ত্র বাহিনীর বাঙালি সৈনিকসহ ছাত্র-তরুণের সঙ্গে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর সম্মুখসমর। ২৬ মার্চ প্রতিরোধ যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে, সেনা ছাউনিগুলোতে। ২৭ মার্চ সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে অষ্টম বেঙ্গল রেজিমেন্টের উপ-অধিনায়ক মেজর জিয়াউর রহমান (পরবর্তীকালে সেনাপ্রধান এবং রাষ্ট্রপতি) বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা দিলে সারা জাতির মনে সাহস সঞ্চারিত হয়। সামরিক ও অসামরিক যোদ্ধাদের সমন্বয়ে নতুন রূপ নেয় স্বাধীনতার যুদ্ধ।

২৫ মার্চ রাতে শেখ মুজিবুর রহমানের গ্রেফতার প্রসঙ্গ

আওয়ামী লীগ নেতা বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের গ্রেফতার সম্বন্ধে মতদ্বৈধতা ছিল। এমনটি যে ঘটতে পারে প্রথম প্রথম তিনি তা মোটেই গ্রাহ্য করলেন না। পরে ঠিক সন্ধ্যায় ইপিআর বাহিনীর একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর মারফতে সংবাদ পেয়ে তাঁর স্নেহের ছাত্র ও বন্ধু-বান্ধবদের ডেকে যথাকর্তব্য বুঝিয়ে দিলেন। ছাত্ররা তাঁকে বাসা ছেড়ে গা-ঢাকা দিতে অনুরোধ জানালেন। কিন্তু তিনি রাজি হলেন না। তিনি বললেন, 'আমি কোথাও যাব না। আমি যদি আত্মগোপন করি, তবে ঢাকা শহর থাকবে না। তারা তন্নতন্ন করে বাড়ি বাড়ি তালাশ চালাবে। বহু বাড়িঘর ও প্রচুর প্রাণহানি হবে।' তাজউদ্দীনকে বললেন, "তাজউদ্দীন, আমি হয়তো নাও থাকতে পারি। তবে তোমরা কর্তব্যচ্যুত হয়ো না। ইনশাআল্লাহ্, সুফল হবে, জয় তোমরা করবেই। সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী।'

তাজউদ্দীন সাহেব চোখের পানি মুছতে মুছতে বের হয়ে গেলেন। ছাত্ররা সব রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরির কাজে বের হয়ে গেল।

আমরা প্রথমে শুনেছিলাম, রাত ১২টায় একজন উচ্চপদস্থ বাঙালি পুলিশ কর্মচারী এসে শেখ সাহেবকে জোর করে গাড়িতে তুলে বাসা হতে নিয়ে গিয়ে নিরাপদে চট্টগ্রাম পৌঁছে দেয়। চট্টগ্রাম লালদীঘির পাড়ে তিনি সহকর্মীদের মাঝে তাদের কর্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। পরে চট্টগ্রাম 'ফল' করলো। তিনি গ্রেফতার হন।

ছাত্রনেতা শাজাহান সিরাজ ১ মে মুজিবনগরে এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, 'শেখ সাহেবের নিজের নিরাপত্তার প্রশ্ন উঠল।' কিন্তু তিনি বললেন, 'বাসস্থান ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।' তাঁর কথা, 'আমার লাশ পড়ে যায় তো যাক'— তবু তিনি নড়বেন না। কেন না, তাঁকে না পেলে ইয়াহিয়ার সৈন্যরা ঢাকার কাউকে বাঁচতে দেবে না। গোটা শহরটাকেই ধ্বংস করে দেবে। কিন্তু আমরাও ছাড়লাম না। বহু অনুনয় বিনয় করে আমি এবং আমার মতো আরো অনেকে শেষ পর্যন্ত শেখ মুজিবকে রাজি করিয়েছিলাম। রাত এগারোটা নাগাদ বিশ্বস্ত কয়েকজন সহযোদ্ধার পাহারায় তাঁকে বাসস্থান হতে নিরাপদে সরিয়ে দেওয়া হয়।

জনাব শাজাহান সিরাজের সাথে অনেকেরই মতের মিল আছে। কিন্তু গোল পাকালো ইয়াহিয়া খানের ২৭ মার্চের বেতার ভাষণ। 'শেখ মুজিব ২৫ মার্চ গভীর রাতে গ্রেফতার হয়েছে। তিনি নিরাপদে আছেন। তবে অসুস্থ।' আমরা মনে করলাম—

'তাঁকে গ্রেফতার করলে হয়তো অন্যের মতো তাঁরো ভাগ্যে ঘটতো। তাঁকে নিয়েই যখন তাদের সমস্যা তখন তাঁকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে না।' 'কিন্তু রাখে খোদা মারে কে?' আমাদেরই ভুল।

শেখ মুজিব ২৫ মার্চ রাত ১২টায় তাঁর নিজ বাসভবনে স্বেচ্ছায় গ্রেফতার হন। তাঁর বাবা জনাব শেখ লুৎফর রহমানের নিকট এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি সরলভাবেই বললেন, এ 'মুজিব–ও তো চিরকালের পাগল– ভয় তো নেই। ভয় কাকে বলে তা তার জানা নেই। ছোট বেলা হতে সে নির্ভীক। মুজিব জানে সে গ্রেফতার হবে। তাই সে তার বিছানাপত্র গুছিয়ে রেখে মশারি টাঙিয়ে ঘুমিয়েছিল। রাত ১২টায় যখন পাকবাহিনী গুলিবর্ষণ করতে করতে বাসার গেটের মধ্যে প্রবেশ করল, তখন সে ছোট ছেলেটিকে নিয়ে তারই ভয়ের দরুন কয়েক মিনিটের জন্য বাথরুমে গিয়ে দাঁড়ায়। পাকবাহিনী যখন নির্বিবাদে গালি দিতে দিতে ও এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ করতে করতে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠে, তখন সে বের হয়ে তাদের সামনে এসে তাদের দু'ধমকে দেয়। বলে– 'অনর্থক গালি দিচ্ছ কেন? আমার লোকদের হত্যা করো না। আমাকে চাও, আমি হাজির, চলো, কোথায় নিয়ে যাবে।' তখন তারা তাঁকে গাড়িতে তুলে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যায়। পরে ক্যান্টনমেন্ট থেকে করাচি বিমানবন্দর এবং সেখান হতে কোনো অজানা স্থানে তাঁকে নিয়ে আটক রাখে। পরে খোঁজ নিয়ে জানা গেল– তাঁর বাবার কথাই ঠিক। তিনি ২৫ মার্চ রাত ১২টায় তাঁর স্বীয় বাসভবন ধানমন্ডিতে গ্রেফতার হন।

পাকবাহিনী গুলি ছুড়ে তার বাসভবনের চূড়ান্ত স্বাধীন বাংলার পতাকাটি ছিঁড়ে ফেলে। কিন্তু সেই লোহার রডটি আজো আছে।

মোট কথা, গত ২৫ মার্চের কালোরাতে ইয়াহিয়া, টিক্কা, নিয়াজি ও ফরমান আলীর হানাদার বাহিনী সুপরিকল্পিতভাবে বাংলাদেশের সর্বত্র একযোগে গণহত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, নারী ধর্ষণ ও পাইকারিভাবে ধরপাক শুরু করে দিল এবং ঐ রাতেই পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবনেও হামলা চালায়। তাঁর বাসভবনে জিনিসপত্রেরও বিশেষ ক্ষতিসাধন করল। অতঃপর তাঁকে গাড়িতে তুলে নিয়ে কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টে বন্দি করে রাখে। পরে তাঁকে পশ্চিম পাকিস্তানের কোনো এক অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে রাখা হয়।

স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র পাঠ ও একটি জাতির জন্ম

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হন। যাওয়ার আগে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে চট্টগ্রামে লিফলেট আকারে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা রাস্তায় রাস্তায় দেখা যায়। সে সময় মাইকিং করেও তা প্রচার করা হয় বলে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র কর্মী সৈয়দ আবদুস শাকের তার 'স্বাধীনতার সংগ্রাম ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' প্রবন্ধে উল্লেখ করেন। ২৬ মার্চ দুপুরে চট্টগ্রাম কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ হান্নান বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাসংবলিত বাণীর বরাত দিয়ে এক ভাষণ প্রচার করেন। ঐদিন সন্ধ্যায় আবারও এই ঘোষণা বাণীটি পাঠ করেন আবুল কাসেম সন্দ্বীপ। বাণীটির বঙ্গানুবাদ নিম্নরূপ—

'সম্ভবত এটাই আমার শেষ নির্দেশ। আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। বিদেশী শত্রুসেনা বাংলাদেশ আক্রমণ করেছে রাতের আঁধারে। ঢাকায় তারা ঘুমন্ত লোকজনকে হত্যা করেছে। এই বর্বর আক্রমণ এবং অবাধ গণহত্যার কথা বিশ্বের সব রাষ্ট্রকে জানিয়ে দিন। বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের কাছে আমার নির্দেশ, আপনারা যেখানেই থাকুন না কেন এবং আপনাদের হাতে যাই থাকুক তাই নিয়ে দখলদার সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত লড়াই করুন। বাংলাদেশের মাটি থেকে দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যকে বহিষ্কার না করা পর্যন্ত আপনাদের লড়াই অব্যাহত রাখতে হবে।'

২৭ মার্চ বিকেল ৫টায় তিন লরি জোয়ান নিয়ে পটিয়া থেকে কালুরঘাট আসেন মেজর জিয়াউর রহমান। কালুরঘাট ট্রান্সমিটার ভবনের নিরাপত্তা প্রহরার জন্য বেলাল মোহাম্মদ, ফারুক চৌধুরী এবং মা হোসেন গিয়েছিলেন পটিয়ায় মেজরের কাছে। জিয়াউর রহমানের সঙ্গে তারাও ফিরে আসেন। চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ নেতারা সেনাবাহিনীর একজন কর্মকর্তাকে দিয়ে বাণীটি প্রচার করলে ভালো হবে ভেবেই মেজর জিয়াউর রহমানকে দিয়ে বাণীটি পাঠ করান। সেই বিবরণ দিতে গিয়ে জনাব বেলাল মোহাম্মদ বিভিন্ন সময়ে তার বিভিন্ন প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন এভাবে– 'প্রচার ভবনে সার্বক্ষণিক সশস্ত্র প্রহরার ব্যবস্থা করা গেলে সংগঠিত বেতারকর্মীদের টিম স্থায়ীভাবে বেতার ভবনে অবস্থান করতে পারবেন। এ ভাবনায় চন্দনপুরার সোবহান জানান, পটিয়াতে অস্থায়ী ছাউনিতে একজন বাঙালি মেজর (নাম বলতে পারেননি) থাকেন। এ ব্যাপারে তাকে অনুরোধ করা যেতে পারে। সেই পরামর্শ অনুসারে আমি ২৭ মার্চ

সকালবেলা একজন বন্ধুর (মাহমুদ হাসান) সহায়তায় মোটরগাড়িতে পটিয়ায় গিয়ে মেজর জিয়াউর রহমানের সাক্ষাৎ পাই। তার কাছে প্রচার ভবনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার প্রস্তাব করা হলে তিনি সানন্দে সম্মতি দেন। তিনটি লরিতে করে তার সঙ্গী জোয়ানদের নিয়ে তিনি যাত্রা করেন। প্রচার ভবনের অফিসকক্ষে একান্তে আমি মেজর জিয়াকে কথায় কথায় বেতারে স্বকণ্ঠে কিছু বলবার প্রস্তাব দিলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহী হয়ে ওঠেন এবং আমাদের দু'জনের আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একটি ইংরেজি ঘোষণা রচিত হয়। এর মাঝামাঝি সময়ে যোগ দেন ক্যাপ্টেন ওয়ালী আহমদ এবং অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমদ। তারা ঘোষণালিপিতে সহায়তা করেন। প্রকৃত পক্ষে ঘোষণাটি প্রচারের পরিকল্পনা এবং পাণ্ডুলিপি রচনায় মেজর জিয়া এবং আমরা তিনজন ছাড়া আর কেউ ছিল না। এটি ছিল তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত। ঘোষণাটি ছিল এই : 'I Major Zia, On behalf of our great national leader bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman do hereby declare independence of Bangladesh. Khoda hafez, Joy Bangla...'

স্বাধীনতার পর থেকে ঘোষণা বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক ইতিহাস বিকৃতি হয়েছে। অবশ্য যারা সঠিক ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ তারাই এই ইতিহাস বিকৃতি করে থাকেন। মেজর জিয়াউর রহমানকে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিকল্প হিসেবে তৈরি করে স্বাধীনতা ঘোষণা ও অর্জন উভয় কৃতিত্বই তাঁর ওপর বর্তিয়ে দেওয়ার জন্য ইতিহাসকে নানাভাবে বিকৃতি করা হয়েছে। এই বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করতে 'সাপ্তাহিক বিচিত্রা' এবং পরবর্তী সময়ে 'দৈনিক জনকণ্ঠে' প্রকাশিত 'একটি জাতির জন্ম' শিরোনামে জিয়াউর রহমানের প্রবন্ধটি নিম্নে দেওয়া হলো :

'পাকিস্তান সৃষ্টির পরপরই ঐতিহাসিক ঢাকা নগরীতে মি. জিন্নাহ যেদিন ঘোষণা করলেন, 'উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'– আমার মতে, ঠিক সেদিনই বাঙালি হৃদয়ে অঙ্কুরিত হয়েছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদ। জন্ম হয়েছিল বাঙালি জাতির। পাকিস্তানের স্রষ্টা নিজেই ঠিক সেদিনই অস্বাভাবিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের ধ্বংসের বীজটাও বপন করে গিয়েছিলেন এই ঢাকার ময়দানেই। এই ঐতিহাসিক নগরী ঢাকাতেই মি. জিন্নাহ অত্যন্ত নগ্নভাবে পদদলিত করেছিলেন আমাদের জনগণের জন্মগত অধিকার। আর এই ঐতিহাসিক ঢাকা নগরীতেই চূড়ান্তভাবে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে গেল তার সাধের পাকিস্তান। ঢাকা নগরী প্রতিশোধ নিল জিন্নাহ ও তার অনুসারীদের নষ্টামির। প্রতিশোধ নিল যোগ্যতমভাবেই। মহানগরী ঢাকা চিরদিন ছিল মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও মানবিক মুক্তি সাধনের পীঠস্থান। সে এবারও হয়েছে মুক্তি উৎসরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত। সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবার বিশ্বের নির্যাতিত জনতার গর্বের শহর আশার নগররূপে। অতিপ্রিয় মাতৃভূমির মুক্তির আশায় ঢাকা নগরীর বীর জনতা সংগ্রাম করেছে বীরত্বের সাথে। সংগ্রাম করেছে এক হানাদার, দখলদার দস্যু বাহিনীর বিরুদ্ধে। দস্যু বাহিনীর নৃশংসতা আর হত্যার বিরুদ্ধে শির উঁচু করে রুখে দাঁড়িয়েছে ঢাকার মানুষ।

সংগ্রাম করেছে দৃঢ়তার সাথে। বর্বর পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়েছে এই ঢাকা নগরীতেই। এই বীর নগরীর পবিত্র ভূমিতে ফিরে এসেছি আমি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের দিন কয়েকের মধ্যেই। বীর নগরীর পবিত্র মাটিতে দাঁড়িয়ে প্রথমেই আমি এই সংগ্রামী ঢাকা ও ঢাকাবাসীর উদ্দেশে শির নত করেছি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধায়।

পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের সপ্তাহখানেক পরে একজন সাংবাদিক আমাকে বলেছিলেন, সেই দুঃস্বপ্নে ভরা দিনগুলো সম্পর্কে কিছু স্মৃতিকথা লিখতে। আমি একজন সৈনিক। আর লেখা একটি ঈশ্বর প্রদত্ত শিল্প। সৈনিকরা স্বভাবতই সেই বিরল শিল্প ক্ষমতার অধিকারী হয় না। কিন্তু সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তটি ছিল এমনই আবেগধর্মী যে, আমাকে তখন কিছু লিখতে হয়েছিল। কলম তুলে নিতে হয়েছিল হাতে।

ভারত ভেঙে দু'ভাগ হয়ে সৃষ্টি হয়েছিল অস্বাভাবিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের। আর তার অব্যবহিত পরই আমরা চলে গিয়েছিলাম করাচি। সেখানে ১৯৫২ সালে আমি পাস করি ম্যাট্রিক। যোগদান করি পাকিস্তান সামরিক একাডেমিতে অফিসার ক্যাডেটরূপে। সেই থেকে অধিকাংশ সময় বিভিন্ন স্থানে আমি কাজ করেছি পাকিস্তানি বাহিনীতে।

স্কুলজীবন থেকেই পাকিস্তানিদের দৃষ্টিভঙ্গির অস্বচ্ছতা আমার মনকে পীড়া দিতো। আমি জানতাম, অন্তর দিয়ে ওরা আমাদের ঘৃণা করে। স্কুলজীবনেই বহুদিনই শুনেছি আমার স্কুল-বন্ধুদের আলোচনা। তাদের অভিভাবকরা বাড়িতে যা বলতো তাই তারা রোমন্থন করতো স্কুল প্রাঙ্গণে। আমি শুনতাম মাঝে মাঝেই, শুনতাম তাদের আলোচনার প্রধান বিষয় হতো বাংলাদেশ আর বাংলাদেশকে শোষণ করার বিষয়। পাকিস্তানি তরুণ সমাজকেই শেখানো হতো বাঙালিদের ঘৃণা করতে। বাঙালিদের বিরুদ্ধে একটা ঘৃণার বীজ উপ্ত করে দেয়া হতো স্কুলছাত্রদের শিশু মনেই। শিক্ষা দেয়া হতো তাদের বাঙালিকে নিকৃষ্টতম মানবজাতিরূপে বিবেচনা করতে। অনেক সময়ই আমি থাকতাম নীরব শ্রোতা। আবার মাঝেমধ্যে প্রত্যাঘাত হানতাম আমিও। সেই স্কুলজীবন থেকেই মনে আমার একটা আকাঙ্ক্ষাই লালিত হতো, যদি কখনও দিন আসে তাহলে এই পাকিস্তানবাদের অস্তিত্বেই আমি আঘাত হানবো। স্বযত্নে এই ভাবনটাকে আমি লালন করতাম। আমি বড় হলাম। সময়ের সাথে সাথে আমার সেই কিশোর মনের ভাবনাটাও পরিণত হলো। জোরদার হলো। পাকিস্তানি পশুদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরার দুর্বারতম আকাঙ্ক্ষা দুর্বার হয়ে উঠতো মাঝে মাঝেই। উগ্র কামনা জাগতো পাকিস্তানের ভিত্তিভূমিটাকে তছনছ করে দিতে। কিন্তু উপযুক্ত সময় আর উপযুক্ত স্থানের অপেক্ষায় দমন করতাম সেই আকাঙ্ক্ষাকে।

১৯৫২ সালে মশাল জ্বললো আন্দোলনের। ভাষা আন্দোলনের। আমি তখন করাচিতে। দশম শ্রেণীর ছাত্র। তখন পাকিস্তানি সংবাদপত্র, প্রচার মাধ্যম, পাকিস্তানি বুদ্ধিজীবী, সরকারি কর্মচারী, সেনাবাহিনী, আর জনগণ সবাই সমানভাবে তখন নিন্দা করেছিল বাংলাভাষার। নিন্দা করেছিল বাঙালিদের। তারা এটাকে বলতো বাঙালি জাতীয়তাবাদ। তাদের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তারা এটাকে মনে করেছিল এক চক্রান্ত বলে।

এক সুরে তাই তারা চেয়েছিল একে ধ্বংস করে দিতে। আহ্বান জানিয়েছিল এর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের। কেউ বলতো– বাঙালি জাতির মাথা গুঁড়িয়ে দাও। কেউ বলতো ভেঙে দাও এর শিরদাঁড়া। এ থেকেই আমার তখন ধারণা হয়েছিল, পাকিস্তানিরা বাঙালিদের পায়ের তলায় দাবিয়ে রাখতে চায়। জীবনের সর্বক্ষেত্রে তারা চায় বাঙালিদের ওপর ছড়ি ঘোরাতে। কেড়ে নিতে চায় বাঙালিদের সব অধিকার। একটি স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিকরূপে বাঙালিদের মেনে নিতে তারা কুণ্ঠিত।

১৯৫৪ সালে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হলো নির্বাচন। যুক্তফ্রন্টের বিজয়রথের চাকার নিচে পিষ্ট হলো মুসলিম লীগ। বাঙালিদের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্তপ্রতীক যুক্তফ্রন্টের বিজয় কেতন উড়লো বাংলায়। আমি তখন দ্বিতীয় পর্যায়ের ক্যাডেট। আমাদের মনেও জাগলো তখন পুলকের শিহরণ।

যুক্তফ্রন্টের বিরাট সাফল্যে আনন্দে উদ্বেলিত হলাম আমরা সবাই, পর্বতে ঘেরা এবোটাবাদের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আমরা বাঙালি ক্যাডেটরা আনন্দে হলাম আত্মহারা। খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করলাম সেই বাঁধভাঙা আনন্দের তরঙ্গমালা। একাডেমি কাফেটারিয়ায় নির্বাচনী বিজয় উৎসব করলাম আমরা। এ ছিল আমাদের বাংলাভাষার জয়, এ ছিল আমাদের অধিকারের জয়, এ ছিল আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার জয়, এ ছিল আমাদের জনগণের, আমাদের দেশের এক বিরাট সাফল্য।

এ সময়েই একদিন কতকগুলো পাকিস্তানি ক্যাডেট আমাদের জাতীয় নেতা ও জাতীয় বীরদের গালাগাল করলো। আখ্যায়িত করলো তাদের বিশ্বাসঘাতক বলে। আমরা প্রতিবাদ করলাম। অবতীর্ণ হলাম তাদের সাথে এক উষ্ণতম কথা কাটাকাটিতে। মুখের কথা কাটাকাটিতে এই বিরোধের মীমাংসা হলো না, ঠিক হলো এর ফয়সালা হবে মুষ্টিযুদ্ধের দ্বন্দ্বে। বাঙালিদের জন্মগত অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে বক্সিং গ্লোভস হাতে তুলে নিলাম আমি। পাকিস্তানি গোঁয়ার্তুমিরে মান বাঁচাতে এগিয়ে এলো এক পাকিস্তানি ক্যাডেট। নাম তার লতিফ (পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অর্ডিন্যান্স কোরে এখন সে লেফটেন্যান্ট কর্নেল)। লতিফ প্রতিজ্ঞা করলো, আমাকে সে একটু শিক্ষা দেবে। পাকিস্তানের সংহতির বিরুদ্ধে যাতে আর কথা না বলতে পারি সেই ব্যবস্থা নাকি সে করবে।

এই মুষ্টিযুদ্ধ দেখতে সেদিন জমা হয়েছিল অনেক দর্শক। তুমুল করতালির মাঝে শুরু হলো মুষ্টিযুদ্ধ। বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তানের দুই প্রতিনিধির মধ্যে। লতিফ আর তার পরিষদ দল অকথ্য ভাষায় আমাদের গালাগাল করলো। হুমকি দিলো বহুতর। কিন্তু মুষ্টিযুদ্ধ স্থায়ী হলো না ত্রিশ সেকেন্ডের বেশি। পাকিস্তানপন্থী আমার প্রতিপক্ষ ধুলায় লুটিয়ে পড়লো। আবেদন জানালো সব বিতর্কের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য।

এ ঘটনাটি আমার মনে এক গভীর রেখাপাত করেছিল। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতেও বাঙালি অফিসারদের আনুগত্য ছিল না প্রশ্নাতীত। অবশ্যই গুটিকয়েক দালাল ছাড়া। আমাদের ওরা দাবিয়ে রাখতো, অবহেলা করতো, অসম্মান করতো। দক্ষ

ও যোগ্য বাঙালি অফিসার আর সৈনিকদের ভাগ্যে জুটতো না কোনো স্বীকৃতি বা পারিতোষিক। জুটতো শুধু অবহেলা আর অবজ্ঞা। আখ্যায়িত করতো আমাদের আওয়ামী লীগের দালাল বলে। একাডেমির ক্লাসগুলোতেও সব সময় বোঝানো হতো আওয়ামী লীগ হচ্ছে ভারতের দালাল। পাকিস্তানের সংহতি বিনষ্ট করতেই আওয়ামী লীগ সচেষ্ট। এমনকি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই ক্যাডেটদের শেখানো হতো– আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হচ্ছেন ওদের রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় শত্রু।

বাঙালি অফিসার ও সৈনিকরা সব সময়ই পরিণত হতো পাকিস্তানি অফিসারদের রাজনৈতিক শিকারে। সব বড় বড় পদ আর লোভনীয় নিয়োগপত্রের শিকাগুলো বরাবরই ছিঁড়তো পাকিস্তানিদের ভাগ্যে। বিদেশে শিক্ষার জন্য পাঠানো হতো না বাঙালি অফিসারদের। আমাদের বলা হতো ভীরু কাপুরুষ। আমাদের নাকি ক্ষমতা নেই ভালো সৈনিক হওয়ার। ঐতিহ্য নেই যুদ্ধের, সংগ্রামের। এরপর এলো আইয়ুবী দশক। আইয়ুব খানের নেতৃত্বে চালিত এক প্রতারণাপূর্ণ, সামরিক শাসনের কালো দশক। এই তথাকথিত উন্নয়ন দশকে সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল বাঙালি সংস্কৃতিকে বিকৃত করার। আমাদের জাতীয়তা খাটো করার। বাংলাদেশের বীর জনতা অবশ্য বীরত্বের সাথে প্রতিহত করেছে এ হীন প্রচেষ্টা। এ ছিল এক পালাবদলের কাল। এখান থেকেই আমাদের ভাষা, সাহিত্য ও শিল্প গ্রহণ করেছে এক নতুন পথ। আমাদের বুদ্ধিজীবী মহল, ছাত্রজনতা আর প্রচার মাধ্যমগুলো সাংস্কৃতিক বন্ধনকে দৃঢ় করার জন্য পালন করেছে একটি বিরাট ভূমিকা। আমাদের দেশের, বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য আসন্ন সশস্ত্র সংগ্রামের ক্ষেত্র প্রস্তুতিতে জনগণ ও সৈনিকদের মনোভাবকে গড়ে তোলা আর আন্দোলনে দ্রুততর গতি সঞ্চারণে এদের রয়েছে একটি অবদান। জাতীয়তাবাদ গড়ে তোলার একমাত্র উপাদান হচ্ছে এর সংস্কৃতি।

১৯৬৩ সালে আমি ছিলাম সামরিক গোয়েন্দা বিভাগে। সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের তদানীন্তন পরিচালক মেজর জেনারেল নওয়াজেশ আলী মালিক এক সময় আমার এলাকা পরিদর্শন করেন। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হচ্ছিলো একদিন। বাংলাদেশের অর্থনীতিকে কিছুটা উন্নত করার সরকারি অভিপ্সা সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করেছিলেন তিনি। এক পর্যায়ে এ ব্যাপারে তিনি আমার অভিমত জানতে চাইলে আমি বললাম, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যদি ব্যাপক অগ্রগতি সাধন করা না হয়, তাহলে দেশে প্রশাসন ব্যবস্থা চালু রাখা সরকারের পক্ষে কঠিন হবে। এর জবাবে তিনি বলেন, বাংলাদেশ যদি স্বয়ম্ভর হয় তাহলে সে আলাদা হয়ে যাবে। পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় সামরিক কর্তাদের বাংলাদেশ সম্পর্কে এটাই ছিল মনোভাব। অথচ তারাই তখন দেশটা শাসন করছিলেন। তারা চাচ্ছিলেন বাংলাদেশটাকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দেউলিয়া করে রাখতে।

১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হচ্ছে আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। সে সময়ে আমি ছিলাম পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যার নামে গর্ববোধ করতো তেমনি একটা

ব্যাটালিয়নের কোম্পানি কমান্ডার। সেই ব্যাটালিয়ন এখন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীরও গর্বের বস্তু। খেমকারান রণাঙ্গনের বেদিয়ানে তখন আমরা যুদ্ধ করেছিলাম। সেখানে আমাদের ব্যাটালিয়ন বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছিল। এ ব্যাটালিয়নই লাভ করেছিল পাকবাহিনীর মধ্যে দ্বিতীয় সর্বাধিক বীরত্ব পদক। ব্যাটালিয়নের পুরস্কার বিজয় কোম্পানি ছিল আমাদের কোম্পানি আলফা কোম্পানি। এই কোম্পানি যুদ্ধ করেছিল ভারতীয় সপ্তদশ রাজপুত ঊনবিংশ মারাঠা লাইট ইনফ্যান্ট্রি ষোড়শ পাঞ্জাব ও সপ্তম লাইট ক্যাবালরি (সাঁজোয়া বহর) বিরুদ্ধে। এই কোম্পানির জওয়ানরা এককভাবে এবং সম্মিলিতভাবে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছে, ঘায়েল করেছে প্রতিপক্ষকে। বহুসংখ্যক প্রতিপক্ষকে হতাহত করে, যুদ্ধবন্দি হিসেবে আটক করে এই কোম্পানি অর্জন করেছিল সৈনিকসুলভ মর্যাদা, প্রশংসা করেছিল তাদেরও প্রীতি। যুদ্ধবিরতির সময় বিভিন্ন সুযোগে আমি দেখা করেছিলাম বেশকিছু সংখ্যক ভারতীয় অফিসার ও সৈনিকের সাথে। আমি তখন তাদের সাথে কোলাকুলি করেছি, হাত মিলিয়েছি। আমার ভালো লাগতো তাদের সাথে হাত মেলাতে। কেননা আমি তখন দেখেছিলাম, তারাও অত্যন্ত উঁচুমানের সৈনিক। আমরা তখন মতবিনিময় করেছিলাম। সৈনিক হিসেবেই আমাদের মাঝে একটা হৃদ্যতাও গড়ে উঠেছিল, আমরা বন্ধুতে পরিণত হয়েছিলাম। এই প্রীতিই দীর্ঘদিন পর বাংলাদেশে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে পাশাপাশি ভাইয়ের মতো দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করতে উদ্বুদ্ধ করেছে আমাদের।

পাকিস্তানিরা ভাবতো বাঙালিরা ভালো সৈনিক নয়। খেমকারানের যুদ্ধে তাদের এই বদ্ধমূল ধারণা ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। পাকিস্তানি বাহিনীর সবার কাছেই আমরা ছিলাম তখন ঈর্ষার পাত্র। সে যুদ্ধে এমন একটা ঘটনাও ঘটেনি যেখানে বাঙালি জওয়ানরা প্রাণের ভয়ে পালিয়ে গেছে। ভারতের সাথে সেই সংঘর্ষে বহুক্ষেত্রে পাকিস্তানিরাই বরং লেজ গুটিয়ে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বেঁচেছে। সে সময় পাকিস্তানিদের সমন্বয়ে গঠিত পাকবাহিনীর এক প্রথম শ্রেণীর সাঁজোয়া ডিভিশনই নিম্নমানের ট্যাঙ্কের অধিকারী ভারতীয় বাহিনীর হাতে নাস্তানাবুদ হয়েছিল। এসব কিছুতে পাকিস্তানিরা বিচলিত হয়ে পড়েছিল। বাঙালি সৈনিকদের ক্ষমতা উপলব্ধি করে হৃদকম্প জেগেছিল তাদের।

এ যুদ্ধে পাকিস্তান বিমানবাহিনীর বাঙালি পাইলটরাও অর্জন করেছিল প্রচুর সুনাম। এসব কিছুই চোখ খুলে দিয়েছিল বাঙালি জনগণের, তারাও আস্থাশীল হয়ে উঠেছিল তাদের বাঙালি সৈনিকদের বীরত্বের প্রতি। বাঙালি সৈনিকের বীরত্ব ও দক্ষতার প্রশংসা হয়েছিল, তখন বিশ্বের বিভিন্ন সংবাদপত্রে উল্লেখ করা হয়েছিল ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের নাম। এ নাম আজ বাংলাদেশেরও এক পরম প্রিয় সম্পদ।

এসব কিছুর পরিণতিতে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বাহিনী গ্রহণ করলো এক গোপন পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা ঠিক করলো প্রতিরক্ষা বাহিনীতে বাঙালিদের আনুপাতিক হার কমাতে হবে। তারা তাদের এই গোপন পরিকল্পনা পুরোপুরিভাবে কার্যকর করলো। কিন্তু এই গোপন তথ্য আমাদের কাছে গোপন ছিল না।

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ আত্মবিশ্বাস জাগিয়েছিল আমাদের মনে। বাঙালি সৈনিকদের মনে। বিমানবাহিনীর বাঙালি জওয়ানদের মনে। আমরা তখনই বুঝেছিলাম, বিশ্বের যে কোনো বাহিনীর মোকাবিলাই আমরা সক্ষম।

জানুয়ারি মাসে আমি নিযুক্ত হয়েছিলাম পাকিস্তান সামরিক একাডেমিতে প্রশিক্ষকের পদে। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি একদিন শিক্ষক হলাম। মনে রইলো শুধু যুদ্ধের স্মৃতি। সামরিক একাডেমিতে শুরু হলো আমার শিক্ষকতার জীবন। পাকিস্তানিদের আমি সমরবিদ্যায় পারদর্শী করে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করলাম। আর সেই বর্বররা এই বিদ্যাকে কাজে লাগালো আমারই দেশের নিরস্ত্র জনতার বিরুদ্ধে এক পাশবিক যুদ্ধ ঘোষণা করে দিয়ে।

সামরিক একাডেমিতে থাকাকালেও আমি সম্মুখীন হয়েছি শুধু নিকৃষ্ট অভিজ্ঞতার। সেখানে দেখেছি বাঙালি ক্যাডেটদের প্রতি পাকিস্তানিদের একই অজ্ঞতার ঐতিহ্যবাহী প্রতিচ্ছবি। অবৈধ উপায়ে পাকিস্তানিদের দেখেছি বাঙালি ক্যাডেটদের কোণঠাসা করতে। আমরা যখন ছাত্র ছিলাম তখন যেমন, আমি যখন শিক্ষক হলাম তখনও তেমনি স্থানেই বাঙালি ক্যাডেটদের ভাগ্যে জুটতো শুধু অবহেলা, অবজ্ঞা আর ঘৃণা। আন্ত ঃসার্ভিস নির্বাচনী বোর্ডে গ্রহণ করা হতো নিম্নমানের বাঙালি ছেলেদের, ভালো ছেলেদের নেয়া হতো না ক্যাডেটরূপে। রাজনৈতিক মতাদর্শ আর দরিদ্র পরিবারের নামে প্রত্যাখ্যান করা হতো তাদের। এর সবকিছুই আমাকে ব্যথিত করতো। এই সামরিক একাডেমিতেই পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে আমার মন বিদ্রোহ করলো। একাডেমির গ্রন্থাগারে সংগৃহীত ছিল সব বিষয়ের ভালো ভালো বই। আমি জ্ঞানার্জনের এই সুযোগ গ্রহণ করলাম। আমি ব্যাপক পড়াশোনা করলাম। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে, ব্রিটিশ ঐতিহাসিকরা এটাকে আখ্যায়িত করেছিলেন বিদ্রোহ হিসেবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা বিদ্রোহ ছিল না। এটা ছিল এক মুক্তিযুদ্ধ। ভারতের জন্য স্বাধীনতার যুদ্ধ।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর তথাকথিত সামরিক যুদ্ধজীবীদের সাথেও মাঝে মাঝে আমার আলোচনা হতো। তাদের পরিকল্পনা ছিল আরো কয়েক দশক কোটি কোটি জাগ্রত বাঙালিকে দাবিয়ে রাখার। কিন্তু আমি বিশ্বাস করলাম, বাংলাদেশের জনগণ আর ঘুমিয়ে নেই। তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচারের পরিণতিই ছিল এর জ্বলন্ত প্রমাণ। স্বাধীনতার জন্য আমাদের সশস্ত্র সংগ্রামের দিকে এটাও ছিল একটা সুস্পষ্ট অঙ্গুলি সঙ্কেত। এই মামলার পরিণতি এক করে দিলো বাঙালি সৈনিক, নাবিক ও বৈমানিকদের। বাংলাদেশের জনগণের সাথে একাত্ম হয়ে গেল তারা। তাদের ওপর পাকিস্তান সরকারের চাপিয়ে দেয়া সব বিধিনিষেধ ঝেড়ে ফেলা হলো। এক কণ্ঠে সোচ্চার হলো তারা মাতৃভূমির স্বাধীনতার দাবিতে। ইসলামাবাদের যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা এবং অস্ত্র তুলে নেয়ার মধ্যেই যে আমাদের দেশের কল্যাণ নিহিত তাতে কারো কোনো সন্দেহই ছিল না আমাদের মনে। এটাও আমাদের সশস্ত্র সংগ্রামের আরেক দিকদর্শক। এ সময় থেকেই এ ব্যাপারে আমরা মোটামুটিভাবে খোলাখুলি আলোচনাও শুরু করেছিলাম।

১৯৬৯ সালের এপ্রিল মাসে আমাকে নিয়োগ করা হলো জয়দেবপুরে। ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের দ্বিতীয় ব্যাটালিয়নে আমি ছিলাম সেখানে সেকেন্ড ইন-কমান্ড। আমাদের কমান্ডিং অফিসার লে. কর্নেল আবদুল কাইয়ুম ছিল একজন পাকিস্তানি। একদিন ময়মনসিংহের এক ভোজসভায় ধমকের সুরে সে ঘোষণা করলো, বাংলাদেশের জনগণ যদি সদাচরণ না করে তাহলে সামরিক আইনের সত্যিকার ও নির্মম বিকাশ এখানে ঘটানো হবে। আর তাতে হবে প্রচুর রক্তপাত। এই ভোজসভায় কয়েকজন বেসামরিক ভদ্রলোকও উপস্থিত ছিলেন। তাদের মাঝে ছিলেন ময়মনসিংহের তদানীন্তন ডেপুটি কমিশনার জনাব মোকাম্মেল। লেফটেন্যান্ট কর্নেল কাইয়ুমের এই দম্ভোক্তি আমাদের বিস্মিত করলো। এর আগে কাইয়ুম এক গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিল। ইসলামাবাদে পাকিস্তানি নীতিনির্ধারকদের সাথে সংযোগ ছিল তার। তার মুখে তার পুরনো প্রভুদের মনের কথাই ভাষা পেয়েছে কিনা তাই আমি ভাবছিলাম। পরবর্তী সময়ে এ ব্যাপারে আমি তাকে অনেকগুলো প্রশ্ন করি এবং এ কথা থেকে আমার কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সে যা বলেছে তা জেনেশুনেই বলেছে। উপযুক্ত সময়ে কার্যকরী করার জন্য সামরিক ব্যবস্থার এক পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। আর কাইয়ুম সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। আমি এতে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ি। এ সময়ে আমি একদিন চতুর্দশ ডিভিশনের সদর দপ্তরে যাই। জিএসও-১ (গোয়েন্দা) লে. কর্নেল তাজ আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের কয়েকজন সম্পর্কে আমার কাছে অনেক কিছু জানতে চায়। আমি তার এসব তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্য কি জিজ্ঞাসা করি– এসব খুঁটিনাটির প্রয়োজন কি? এই প্রশ্নের জবাবে সে জানায়, ভবিষ্যতে রাজনৈতিক গতিধারায় এগুলো কাজে লাগবে।

গতি যে বেশি সুবিধার নয়, তার সাথে আলোচনা করেই আমি তা বুঝতে পারি। সেই বছরেরই সেপ্টেম্বর মাসে চার মাসের জন্য আমি পশ্চিম জার্মানি যাই। এ সময়ে বাংলাদেশের সর্বত্র এক রাজনৈতিক বিক্ষোভের ঝড় বয়ে যায়।

পশ্চিম জার্মানিতে অবস্থানকালে আমি একদিন দেখি সামরিক অ্যাটাশে কর্নেল জুলফিকার সে সময়ের পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে কারিগরি অ্যাটাশের সাথে কথা বলছিল। এ ব্যক্তিটি ছিল এক সরলমনা পাঠান অফিসার। তাদের সামনে ছিল করাচির দৈনিক পত্রিকা ডনের একটি সংখ্যা। এতে প্রকাশিত হয়েছিল ইয়াহিয়ার ঘোষণা, ১৯৭০ সালেই নির্বাচন হবে। সরলমনা পাঠান অফিসারটি বলছিল– নির্বাচন হলে আওয়ামী লীগ ব্যাপকভাবে জয়ী হবে, আর সেখানেই হবে পাকিস্তানের সমাপ্তি।

এর জবাবে কর্নেল জুলফিকার বললো, আওয়ামী লীগ বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারে। কিন্তু কেন্দ্রে সে ক্ষমতা পাবে না। কেননা অন্য দলগুলো মিলে কেন্দ্রে আওয়ামী লীগকে ছাড়িয়ে যাবে। আমি এটা জেনে বলছি। এ সম্পর্কে আমার কাছে বিশেষ খবর আছে। এরপর আমি বাংলাদেশে ফিরে এলাম। ১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বরে আমাকে নিয়োগ করা হলো চট্টগ্রামে। এবার ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের অষ্টম ব্যাটালিয়নের সেকেন্ড ইন-কমান্ড। এর কয়েকদিন পর আমাকে ঢাকা যেতে হয়।

নির্বাচনের সময়টায় আমি ছিলাম ক্যান্টনমেন্টে। প্রথম থেকেই পাকিস্তানি অফিসাররা মনে করতো চূড়ান্ত বিজয় তাদেরই হবে। কিন্তু নির্বাচনের দ্বিতীয় দিনেই তাদের মুখে আমি দেখলাম হতাশার সুস্পষ্ট ছাপ। ঢাকায় অবস্থানকারী পাকিস্তানি সিনিয়র অফিসারদের মুখে দেখলাম আমি আতঙ্কের ছবি। তাদের এই আতঙ্কের কারণও আমার অজানা ছিল না। শিগগিরই জনগণ গণতন্ত্র ফিরে পাবে, এই আশায় আমরা– বাঙালি অফিসাররা তখন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলাম।

চট্টগ্রামে আমরা ব্যস্ত ছিলাম অষ্টম ব্যাটালিয়নকে গড়ে তোলার কাজে। এটা ছিল রেজিমেন্টের তরুণতম ব্যাটালিয়ন। এটার ঘাঁটি ছিল ষোলশহর বাজারে। ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে এই ব্যাটালিয়নকে পাকিস্তানের খারিয়ানে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। এর জন্য আমাদের সেখানে পাঠাতে হয়েছিল ২শ' জওয়ানের এক অগ্রগামী দল। অন্যরা ছিল একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ের সৈনিক। আমাদের তখন যেসব অস্ত্রশস্ত্র দেয়া হয়েছিল তার মধ্যে ছিল তিনশ' পুরনো ৩০৩ রাইফেল, চারটা এলএমজি ও দুটি তিন ইঞ্চি মর্টার। গোলাবারুদের পরিমাণও ছিল নগণ্য। আমাদের এ্যান্টিট্যাঙ্ক বা ভারি মেশিনগান ছিল না।

ফেব্রুয়ারির শেষদিকে বাংলাদেশে যখন রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিস্ফোরণোন্মুখ হয়ে উঠছিল, তখন আমি একদিন খবর পেলাম, তৃতীয় কমান্ডো ব্যাটালিয়নের সৈনিকরা চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন এলাকায় ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বিহারিদের বাড়িতে বাস করতে শুরু করেছে। খবর নিয়ে আমি আরো জানলাম, কমান্ডোরা বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র আর গোলাবারুদ নিয়ে বিহারি বাড়িগুলোতে জমা করেছে এবং রাতের অন্ধকারে বিপুল সংখ্যায় তরুণ বিহারিদের সামরিক ট্রেনিং দিচ্ছে। এসব কিছু থেকে এরা যে ভয়ানক রকমের অশুভ একটা কিছু করবে তার সুস্পষ্ট আভাসই আমরা পেলাম।

তারপর এলো ১ মার্চ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদাত্ত আহ্বানে সারা দেশে শুরু হলো ব্যাপক অসহযোগ আন্দোলন। এর পরদিন দাঙ্গা হলো। বিহারিরা হামলা করেছিল এক শান্তিপূর্ণ মিছিলে। এর থেকেই ব্যাপক গোলযোগের সূচনা হলো। এ সময়ে আমার ব্যাটালিয়নের এনসিওরা আমাকে জানালো, প্রতিদিন সন্ধ্যায় বিংশতিতম বালুচ রেজিমেন্টের জওয়ানরা বেসামরিক পোশাক পরে বেসামরিক ট্রাকে করে কোথায় যেন যায়। তারা ফিরে আসে আবার শেষ রাতের দিকে। আমি উৎসুক হলাম। লোক লাগালাম খবর নিতে। খবর নিয়ে জানলাম, প্রতি রাতেই তারা যায় কতক নির্দিষ্ট বাঙালি পাড়ায় নির্বিচারে হত্যা করে সেখানে বাঙালিদের। এ সময় প্রতিদিনই ছুরিকাহত বাঙালিকে হাসপাতালে ভর্তি হতেও শোনা যায়।

এ সময়ে আমাদের কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল জানজুয়া আমার গতিবিধির ওপর লক্ষ্য রাখার জন্যও লোক লাগায়। মাঝে মাঝেই তার লোকরা গিয়ে আমার সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে শুরু করে। আমরা তখন আশঙ্কা করছিলাম, আমাদের হয়তো নিরস্ত্র করা হবে। আমি আমার মনোভাব দমন করে কাজ করে যাই এবং তাদের

উদ্যোগ ব্যর্থ করে দেয়ার সম্ভাব্য সব ব্যবস্থা গ্রহণ করি। বাঙালি হত্যা ও বাঙালি দোকানপাটে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ক্রমেই বাড়তে থাকে।

আমাদের নিরস্ত্র করার চেষ্টা করা হলে আমি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবো কর্নেল (তখন মেজর) শওকতও আমার কাছে তা জানতে চান। ক্যাপ্টেন শমসের মবিন এবং মেজর খালেকুজ্জামান আমাকে জানান যে, স্বাধীনতার জন্য আমি যদি অস্ত্র তুলে নেই তাহলে তারাও দেশের মুক্তির জন্য প্রাণ দিতে কুণ্ঠাবোধ করবেন না, ক্যাপ্টেন ওলি আহমদ আমাদের মাঝে খবর আদান-প্রদান করতেন। জেসিও এবং এনজিওরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে আমার কাছে আসতে থাকে। তারাও আমাকে জানায় যে, কিছু একটা না করলে বাঙালি জাতি চিরদিনের জন্য দাসে পরিণত হবে। আমি নীরবে তাদের কথা শুনতাম। কিন্তু আমি ঠিক করেছিলাম, উপযুক্ত সময় এলেই আমি মুখ খুলবো। সম্ভবত ৪ মার্চে আমি ক্যাপ্টেন ওলি আহমদকে ডেকে নেই। আমাদের ছিল সেটা প্রথম বৈঠক। আমি তাকে সোজাসুজি বললাম, সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করার সময় দ্রুত এগিয়ে আসছে। আমাদের সব সময় সতর্ক থাকতে হবে। ক্যাপ্টেন আহমদও আমার সাথে একমত হন। আমরা পরিকল্পনা তৈরি করি এবং প্রতিদিনই আলোচনা বৈঠকে মিলিত হতে শুরু করি।

৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ঘোষণা আমাদের কাছে এক গ্রিন সিগন্যাল বলে মনে হলো। আমরা আমাদের পরিকল্পনার চূড়ান্ত রূপ দিলাম। কিন্তু তৃতীয় কোনো ব্যক্তিকে তা জানালাম না। বাঙালি ও পাকিস্তানি সৈনিকদের মাঝেও উত্তেজনা ক্রমেই চরমে উঠছিল।

১৩ মার্চ শুরু হলো বঙ্গবন্ধুর সাথে ইয়াহিয়ার আলোচনা। আমরা সবাই ক্ষণিকের জন্য স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। আমরা আশা করলাম, পাকিস্তানি নেতারা যুক্তি মানবে এবং পরিস্থিতির উন্নতি হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে পাকিস্তানিদের সামরিক প্রস্তুতি হ্রাস না পেয়ে দিন দিনই বৃদ্ধি পেতে শুরু করলো। প্রতিদিনই পাকিস্তান থেকে সৈন্য আমদানি করা হলো। বিভিন্ন স্থানে জমা হতে থাকলো অস্ত্রশস্ত্র আর গোলাবারুদ। সিনিয়র পাকিস্তানি সামরিক অফিসাররা সন্দেহজনকভাবে বিভিন্ন গ্যারিসনে আসা-যাওয়া শুরু করলো। চট্টগ্রামে নৌবাহিনীরও শক্তি বৃদ্ধি করা হলো।

১৭ মার্চ স্টেডিয়ামে ইবিআরসির লেফটেন্যান্ট কর্নেল এমআর চৌধুরী, আমি, ক্যাপ্টেন ওলি আহমদ ও মেজর আমিন চৌধুরী এক গোপন বৈঠকে মিলিত হলাম। এক চূড়ান্ত যুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করলাম। লে. কর্নেল চৌধুরীকে অনুরোধ করলাম নেতৃত্ব দিতে। দু'দিন পর ইপিআর-এর ক্যাপ্টেন (এখন মেজর) রফিক আমার বাসায় গেলেন এবং ইপিআর বাহিনীকে সাথে নেয়ার প্রস্তাব দিলেন। আমরা ইপিআর বাহিনীকে আমাদের পরিকল্পনাভুক্ত করলাম।

এর মধ্যে পাকিস্তানি বাহিনীও সামরিক তৎপরতা শুরু করার চূড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করলো। ২১ মার্চ জেনারেল আবদুল হামিদ খান গেল চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে। চট্টগ্রামে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের চূড়ান্ত পরিকল্পনা প্রণয়নই তার এই সফরের উদ্দেশ্য। সেদিন

ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট সেন্টারের ভোজসভায় জেনারেল হামিদ ২০তম বালুচ রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফাতমীকে বললো, ফাতমী সংক্ষেপে, ক্ষিপ্রগতিতে আর যতো কম সম্ভব লোক ক্ষয় করে কাজ সারতে হবে। আমি এই কথাগুলো শুনেছিলাম।

২৪ মার্চ ব্রিগেডিয়ার মজুমদার ঢাকা চলে এলেন। সন্ধ্যায় পাকিস্তানি বাহিনী শক্তি প্রয়োগে চট্টগ্রাম বন্দরে যাওয়ার পথ করে নিলো। জাহাজ সোয়াত থেকে অস্ত্র নামানোর জন্যই বন্দরের দিকে ছিল তাদের এই অভিযান।

পথে জনতার সাথে ঘটলো তাদের কয়েকদফা সংঘর্ষ। এতে নিহত হলো বিপুলসংখ্যক বাঙালি। সশস্ত্র সংগ্রাম যে কোনো মুহূর্তে শুরু হতে পারে, এ আমরা ধরেই নিয়েছিলাম। মানসিক দিক দিয়ে আমরা ছিলাম প্রস্তুত। পরদিন আমরা পথের ব্যারিকেড অপসারণের কাজে ব্যস্ত ছিলাম।

তারপর এলো সেই কালোরাত। ২৫ ও ২৬ মার্চের মধ্যবর্তী কালোরাত। রাত ১১টায় আমার কমান্ডিং অফিসার আমাকে নির্দেশ দিলো নৌবাহিনীর ট্রাকে করে চট্টগ্রাম বন্দর গিয়ে জেনারেল আনসারীর কাছে রিপোর্ট করতে। আমার সাথে নৌবাহিনীর (পাকিস্তানি) প্রহরী থাকবে তাও জানানো হলো। আমি ইচ্ছা করলে আমার সাথে তিনজন লোক নিয়ে যেতে পারি। তবে আমার সাথে আমারই ব্যাটালিয়নের একজন পাকিস্তানি অফিসারও থাকবে। অবশ্য কমান্ডিং অফিসারের মতে, সে যাবে আমাকে গার্ড দিতেই। এ আদেশ পালন করা আমার পক্ষে ছিল অসম্ভব। আমি বন্দরে যাচ্ছি কিনা তা দেখার জন্য একজন লোক ছিল। আর বন্দরে শর্বরীর প্রতীক্ষায় ছিল জেনারেল আনসারী। হয়তো বা আমাকে চিরকালের মতোই স্বাগত জানাতে।

আমরা বন্দরের পথে বেরুলাম। আগ্রাবাদে আমাদের থামতে হলো। পথে ছিল ব্যারিকেড। এ সময়ে সেখানে এলো মেজর খালেকুজ্জামান চৌধুরী। ক্যাপ্টেন ওলি আহমদের কাছ থেকে এক বার্তা এসেছে। আমি রাস্তায় হাঁটছিলাম। খালেক আমাকে একটু দূরে নিয়ে গেল। কানে কানে বললো, তারা ক্যান্টনমেন্ট ও শহরে সামরিক তৎপরতা শুরু করেছে। বহু বাঙালিকে হত্যা করেছে।

এটা ছিল একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণের চূড়ান্ত সময়। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আমি বললাম– আমরা বিদ্রোহ করলাম। তুমি ষোলশহর বাজারে যাও। পাকিস্তানি অফিসারদের গ্রেপ্তার করো। ওলি আহমদকে বলো ব্যাটালিয়ন তৈরি রাখতে, আমি আসছি।

আমি নৌবাহিনীর ট্রাকের কাছে ফিরে গেলাম। পাকিস্তানি অফিসার, নৌবাহিনীর চিফ পেটি অফিসার ও ড্রাইভারকে জানালাম যে, আমাদের আর বন্দরে যাওয়ার দরকার নেই।

এতে তাদের মনে কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না দেখে আমি পাঞ্জাবি ড্রাইভারকে ট্রাক ঘুরাতে বললাম। ভাগ্য ভালো, সে আমার আদেশ মানলো। আমরা আবার ফিরে

চললাম। ষোলশহর বাজারে পৌঁছেই আমি গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে একটা রাইফেল তুলে নিলাম। পাকিস্তানি অফিসারটির দিকে তাক করে বললাম, হাত তোলো। আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করলাম। নৌবাহিনীর লোকরা এতে বিভ্রান্ত হয়ে পড়লো। পর মুহূর্তেই আমি নৌবাহিনীর অফিসারের দিকে রাইফেল তাক করলাম। তারা ছিল আটজন। সবাই আমার নির্দেশ মানলো এবং অস্ত্র ফেলে দিলো। আমি কমান্ডিং অফিসারের জিপ নিয়ে তার বাসার দিকে রওনা দিলাম। তার বাসায় পৌঁছে হাত রাখলাম কলিংবেলে। কমান্ডিং অফিসার পাজামা পরেই বেরিয়ে এলো। খুলে দিলো দরজা। ক্ষিপ্রগতিতে আমি ঘরে ঢুকে পড়লাম এবং গলাশুদ্ধ কলার টেনে ধরলাম।

দ্রুতগতিতে আবার দরজা খুলে কর্নেলকে আমি বাইরে টেনে আনলাম। বললাম, বন্দরে পাঠিয়ে আমাকে মারতে চেয়েছিলে? এই আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করলাম। এখন লক্ষ্মী সোনার মতো আমার সাথে এসো।

সে আমার কথা মানলো। আমি তাকে ব্যাটালিয়নে নিয়ে এলাম। অফিসারদের মেসে যাওয়ার পথে আমি কর্নেল শওকতকে (তখন মেজর) ডাকলাম। তাকে জানলাম– আমরা বিদ্রোহ করেছি। শওকত আমার হাতে হাত মিলালো।

ব্যাটালিয়নে ফিরে দেখলাম, সমস্ত পাকিস্তানি অফিসারকে বন্দি করে একটা ঘরে রাখা হয়েছে। আমি অফিসে গেলাম। চেষ্টা করলাম লেফটেন্যান্ট কর্নেল এমআর চৌধুরীর সাথে আর মেজর রফিকের সাথে যোগাযোগ করতে। কিন্তু পারলাম না। সব চেষ্টা ব্যর্থ হলো। তারপর রিং করলাম বেসামরিক বিভাগের টেলিফোন অপারেটরকে। তাকে অনুরোধ জানলাম– ডেপুটি কমিশনার, পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট, কমিশনার, ডিআইজি ও আওয়ামী লীগ নেতাদের জানাতে যে ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের অষ্টম ব্যাটালিয়ন বিদ্রোহ করেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করবে তারা।

এদের সবার সাথেই আমি টেলিফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কাউকেই পাইনি। তাই টেলিফোন অপারেটরের মাধ্যমেই আমি তাদের খবর দিতে চেয়েছিলাম। অপারেটর সানন্দে আমার অনুরোধ রক্ষা করতে রাজি হলো।

সময় ছিল অতি মূল্যবান। আমি ব্যাটালিয়নের অফিসার, জেসিও আর জওয়ানদের ডাকলাম। তাদের উদ্দেশে ভাষণ দিলাম। তারা সবই জানতো। আমি সংক্ষেপে সব বললাম এবং তাদের নির্দেশ দিলাম সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে। তারা সর্বসম্মতিক্রমে হৃষ্টচিত্তে এ আদেশ মেনে নিলো। আমি তাদের একটা সামরিক পরিকল্পনা দিলাম।

তখন রাত ২টা বেজে ১৫ মিনিট। ২৬ মার্চ। ১৯৭১ সাল। রক্ত অক্ষরে বাঙালির হৃদয়ে লেখা একটি দিন। বাংলাদেশের জনগণ চিরদিন স্মরণ রাখবে এই দিনটিকে। স্মরণ রাখতে ভালোবাসবে। এই দিনটিকে তারা কোনোদিন ভুলবে না। কো-নো-দি-ন না।"

তাজউদ্দীন আহমদের ১৭ এপ্রিল ১৯৭১-এর ভাষণ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের ভাষণ :

আমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাংলাদেশের সরকারের পক্ষ থেকে আমাদের সাংবাদিক বন্ধুদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই জন্য যে, তারা আমাদের আমন্ত্রণে স্বাধীন বাংলাদেশের মাটি দেখে যাবার জন্য বহু কষ্ট করে, বহু দূর-দূরান্ত থেকে এখানে উপস্থিত হয়েছেন।

আমি কিছু বলবার আগে প্রথমেই বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সংবাদপত্রসেবী ও নিউজ এজেন্সির প্রতিনিধিদেরকে যে, তারা বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে আগাগোড়া সমর্থন দিয়ে গিয়েছেন এবং সত্য কথা প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছেন। যদিও ইয়াহিয়া সরকার তাদেরকে এবং তার সেই দস্যুবাহিনী বিদেশী সাংবাদিকদেরকে ভেতরে আসতে দেয়নি, যারা ভেতরে ছিলেন তাদেরকেও জবরদস্তি করে ২৫ তারিখ রাতেই বের করে দিয়েছেন। আমি আপনাদেরকে আরও ধন্যবাদ দিচ্ছি, আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এই জন্য যে, আমার বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের যে সংগ্রাম, স্বাধীনতা সংগ্রাম, সেই সংগ্রাম কোন অবস্থাতেই যাতে ব্যাহত না হয় এবং কোন অবস্থাতেই সে সংগ্রামকে ভুল ব্যাখ্যা না দেয়া হয় সে জন্য আপনারা আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন, সঠিক পথ দেখিয়েছেন।

আমি বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষ থেকে আবেদন জানাব ভবিষ্যতেও আপনারা দয়া করে চেষ্টা করবেন যাতে সঠিক সংবাদ পরিবেশিত হয়, যাতে কোন দুষ্কৃতকারী বা কোন শত্রু বা এজেন্ট ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে আমাদের আন্দোলনের কোন রকম ভুল ব্যাখ্যা করতে না পারে, ভুল বোঝাতে না পারে। সেই সাথে আমি আপনাদেরকে আরও অনুরোধ জানাব আমাদের বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে যে হ্যান্ডআউট যাবে সেটাকেই বাংলাদেশ সরকারের সঠিক ভাষ্য বলে ধরে নেবেন, সেটাকেই ভিত্তি হিসেবে ধরে নেবেন। আর আমি আপনাদের আরও একটি অনুরোধ জানাব জানি না কিভাবে সেটা সম্ভব হবে, আমাদের বাংলাদেশের মাটি থেকে আপনারা কিভাবে সংবাদ সংগ্রহ করতে পারবেন, কিভাবে বাংলাদেশ সরকারের সাথে লিয়াজোঁ করতে পারেন সেই ব্যাপারে আপনারা চিন্তা করে দেখবেন এবং সেই ব্যাপারে আপনাদের পরামর্শ আমরা অত্যন্ত সাদরে, আনন্দের সাথে গ্রহণ করব।

এখন আমি বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে আমার ভাষ্য তুলে ধরব।

'বাংলাদেশ এখন যুদ্ধে লিপ্ত। পাকিস্তানের ঔপনিবেশবাদী নিপীড়নের বিরুদ্ধে জাতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে আত্মনিয়ন্ত্রণাধীকার অর্জন ছাড়া আমাদের হাতে আর কোন বিকল্প নেই।

বাংলাদেশ গণহত্যার আসল ঘটনাকে ধামাচাপা দেয়ার লক্ষ্যে পাকিস্তান সরকারের অপপ্রচরের মুখে বিশ্ববাসীকে অবশ্যই জানাতে হবে। কিভাবে বাংলার শান্তিকামী মানুষ সশস্ত্র সংগ্রামের পরিবর্তে সংসদীয় পদ্ধতিকেই বেছে নিয়েছিল। তবেই তারা বাংলাদেশের ন্যায়সঙ্গত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সত্যিকারভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন।

পাকিস্তানের জাতীয় সংহতি রক্ষার শেষ চেষ্টা হিসেবে আওয়ামী লীগ পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে ৬ দফার আলোকে বাংলাদেশের জন্য স্বায়ত্তশাসন চেয়েছিলেন। ১৯৭০-এ আওয়ামী লীগ এই ৬ দফা নির্বাচনী ইশতেহারের ভিত্তিতেই পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের মোট ৩১৩টি আসনের মধ্যে বাংলাদেশের জন্য বরাদ্দ ১৬৯টি আসনের মধ্যে মোট ১৬৭টি আসন লাভ করেছিল। নির্বাচনী বিজয় এতই চূড়ান্ত ছিল যে, আওয়ামী লীগ মোট শতকরা আশিটি ভোট পেয়েছিল। এই বিজয়ের চূড়ান্ত রায়েই আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

স্বভাবতই নির্বাচন পরবর্তী সময়টি ছিল আমাদের জন্য এক আশাময় দিন। কারণ সংসদীয় গণতন্ত্রে জনগণের এমনি চূড়ান্ত রায় ছিল অভূতপূর্ব। দুই প্রদেশের জনগণই বিশ্বাস করেছিলেন যে, এবার ৬ দফার ভিত্তিতে উভয় প্রদেশের জন্য একটি গ্রহণযোগ্য গঠনতন্ত্র প্রণয়ন সম্ভব হবে। তবে সিন্ধু এবং পাঞ্জাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভকারী পাকিস্তান পিপলস পার্টি তাদের নির্বাচন অভিযানে ৬ দফাকে এড়িয়ে গিয়েছিল। কাজেই ৬ দফাকে গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার জন্য জনগণের কাছে এই দলে জবাবদিহি ছিল না। বেলুচিস্তানের নেতৃস্থানীয় দল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ছিল ৬ দফার পূর্ণ সমর্থক। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের প্রভাবশালী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিও ৬ দফার আলোকে পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনে বিশ্বাসী ছিল। কাজেই প্রতিক্রিয়াশীলদের পরাজয় সূচনাকারী ৭০-এর নির্বাচনে পাকিস্তান গণতন্ত্রের আশাপ্রদ ভবিষ্যতেরই ইঙ্গিত বহন করেছিল।

আশা করা গিয়েছিল যে, জাতীয় পরিষদ আহ্বানের প্রস্তুতি হিসেবে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো আলোচনায় বসবে। এমনি আলোচনার প্রস্তাব এবং পাল্টা প্রস্তাবের ওপর গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যা উপস্থাপনের জন্য আওয়ামী লীগ সব সময়ই সম্মত ছিল। তবে এই দল বিশ্বাস করেছে যে, যথার্থ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে জাগ্রত রাখার জন্য গোপনীয় সম্মেলনের পরিবর্তে জাতীয় পরিষদেই গঠনতন্ত্রের ওপর বিতর্ক হওয়া উচিত। এরই প্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগ চেয়েছিল যথাসত্বর জাতীয় পরিষদ আহ্বানের জন্য। আওয়ামী লীগ আসন্ন জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে উপস্থাপনের লক্ষ্যে একটি খসড়া গঠনতন্ত্র প্রণয়নের কাজে লেগে গেলে এবং এ ধরনের একটি গঠনতন্ত্র প্রণয়নের সব আইনগত এবং বাস্তব দিকও তারা পরীক্ষা করে দেখল।

পাকিস্তানের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের ওপর আলোচনার জন্য জেনারেল ইয়াহিয়া

খান এবং শেখ মুজিবের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় জানুয়ারি '৭১-এর মাঝামাঝি সময়ে। এই বৈঠকে জেনারেল ইয়াহিয়া খান আওয়ামী লীগের ৬ দফা ভিত্তিক কর্মসূচিকে বিশ্লেষণ করলেন এবং ফল কি হতে পারে তারও নিশ্চিত ভরসা নিলেন আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে। কিন্তু প্রস্তাবিত গঠনতন্ত্র সম্পর্কে ইয়াহিয়া খান তার নিজস্ব মন্তব্য প্রকাশে বিরত থাকলেন। তিনি এমন এক ভাব দেখালেন যে, ৬ দফায় সাংঘাতিক আপত্তিজনক কিছুই তিনি খুঁজে পাননি। তবে পাকিস্তান পিপলস পার্টির সাথে একটি সমঝোতায় আসার ওপর তিনি জোর দিলেন।

পরবর্তী আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় পাকিস্তান পিপলস পার্টি এবং আওয়ামী লীগের সাথে ঢাকায় ২৭ জানুয়ারি '৭১। জনাব ভুট্টো এবং তার দল আওয়ামী লীগের সাথে গঠনতন্ত্রের ওপর আলোচনার জন্য। এ সময়ে কয়েকটি বৈঠকে মিলিত হন।

ইয়াহিয়ার ন্যায় ভুট্টোও গঠনতন্ত্রের অবকাঠামো সম্পর্কে কোনো সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব আনয়ন করেননি। বরং তিনি এবং তার দল ৬ দফার বাস্তব ফল কি হতে পারে সে সম্পর্কে আলোচনার প্রতিই অধিক ইচ্ছুক ছিলেন। যেহেতু এ ব্যাপারে তাদের প্রতিক্রিয়া ছিল না সূচক এবং যেহেতু এ নিয়ে তাদের কোনো তৈরি বক্তব্যও ছিল না, সেহেতু এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ আপস ফর্মুলায় আসাও সম্ভব ছিল না। অথচ দুই দলের মধ্যে মতানৈক্য দূর করার জন্য প্রচেষ্টার দুয়ার সব সময়ই খোলা ছিল। এই আলোচনা বৈঠক থেকে এটাও স্পষ্ট হয়ে গেল যে, কোন্ পর্যায় থেকে আপস ফর্মুলায় আসা সম্ভব সে সম্পর্কেও জনাব ভুট্টোর নিজস্ব কোনো বক্তব্য ছিল না।

এখানে একটি কথা আরও পরিষ্কারভাবে বলে রাখা দরকার যে, আওয়ামী লীগের সাথে আলোচনায় অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এ ধরনের কোন আভাসও পাকিস্তান পিপলস পার্টি ঢাকা ত্যাগের আগে দিয়ে যাননি। উপরন্তু তারা নিশ্চয়তা দিয়ে গেলেন যে, আলোচনার জন্য সব দরজাই খোলা রয়েছে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অন্য নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ-আলোচনার পর পাকিস্তান পিপলস পার্টি আওয়ামী লীগের সাথে দ্বিতীয় দফায় আরো অধিক ফলপ্রসূ আলোচনায় বসবেন, অথবা জাতীয় পরিষদেও তারা ভিন্ন আলোচনার বসার জন্য অনেক সুযোগ পাবেন।

পরবর্তী পর্যায়ে জনাব ভুট্টোর জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বয়কটের সিদ্ধান্ত সবাইকে বিস্মিত ও হতবাক করে। তার এই সিদ্ধান্ত এ জন্যই সবাইকে আরও বেশি বিস্মিত করে যে, শেখ মুজিবের দাবি মোতাবেক ১৫ ফেব্রুয়ারি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান না করে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ভুট্টোর কথামতোই ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডেকেছিলেন। পরিষদ বয়কটের সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর ভুট্টো পশ্চিম পাকিস্তানের অন্য সমস্ত দলের সদস্যের বিরুদ্ধে ভীতি প্রদর্শনের অভিযান শুরু করেন। এ অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকে পরিষদের অধিবেশনে যোগদান থেকে বিরত রাখা। এ কাজে ভুট্টোর হস্তকে শক্তিশালী করার জন্য জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ইয়াহিয়ার ঘনিষ্ঠ সহচর লে. জেনারেল ওমর ব্যক্তিগতভাবে পশ্চিম

পাকিস্তানি নেতাদের সঙ্গে দেখা করে তাদের ওপর পরিষদের অধিবেশনে যোগদান না করার জন্য চাপ দিতে থাকেন। জনাব ভুট্টো ও লে. জেনারেল ওমরের চাপ সত্ত্বেও পিপিপি ও কাইয়ুম লীগের সদস্যগণ ব্যতীত অপরাপর দলের সমস্ত সদস্যই ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের জন্য বিমানের পূর্ববাংলায় গমনের টিকিট বুক করেন। এমনকি কাইয়ুম লীগের অর্ধেকসংখ্যক সদস্য তাদের আসন বুক করেন। এমনও আশ্বাস পাওয়া যাচ্ছিল যে, পিপিপির বহু সদস্য দলীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ঢাকায় আসতে পারেন। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এভাবে যুক্তফ্রন্ট গঠন করেও যখন কোনো কুলকিনারা পাওয়া যাচ্ছিল না, তখন ১ মার্চ অনির্দিষ্টকালের জন্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মুলতবি ঘোষণা করেন জেনারেল ইয়াহিয়া তার দোস্ত ভুট্টোকে খুশি করার জন্য। শুধু তাই নয়, জেনারেল ইয়াহিয়া পূর্ব বাংলার গভর্নর আহসানকেও বরখাস্ত করলেন। গভর্নর আহসান ইয়াহিয়া প্রশাসনে মধ্যপন্থী বলে পরিচিত ছিলেন। বাঙালীদের সংমিশ্রণে কেন্দ্রে যে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছিল তাও বাতিল করে সরকারের সমস্ত ক্ষমতা পশ্চিম পাকিস্তানি মিলিটারি জান্তার হাতে তুলে দেয়া হলো।

এমতাবস্থায় ইয়াহিয়ার সমস্ত কার্যক্রমকে কোনক্রমেই ভুট্টোর সাথে চক্রান্তে লিপ্ত হয়ে বাংলাদেশের গণরায় বাঞ্চাল করার প্রয়াস ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না। জাতীয় পরিষদই ছিল একমাত্র স্থান যেখানে বাংলাদেশ তার বক্তব্য কার্যকরী করতে পারত এবং রাজনৈতিক শক্তি প্রদর্শন করতে পারত। এটাকে বাঞ্চাল করার চেষ্টা চলতে থাকে। চলতে থাকে জাতীয় পরিষদকে সত্যিকার ক্ষমতার উৎস না করে একটা 'ঠুঁটো জগন্নাথে' পরিণত করার।

জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিতের প্রতিক্রিয়া যা হবে বলে আশঙ্কা করা হয়েছিল তাই হয়েছে। ইয়াহিয়ার এই স্বৈরাচারী কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য সারা বাংলাদেশের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাস্তায় নেমে পড়ে। কেননা বাংলাদেশের মানুষ বুঝতে পেরেছিল যে, ক্ষমতা হস্তান্তরের কোন ইচ্ছাই ইয়াহিয়া খানের নেই এবং তিনি পার্লামেন্টারি রাজনীতির নামে তামাশা করছেন। বাংলাদেশের জনগণ এটা স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিল যে, এক পাকিস্তানের কাঠামো বাংলাদেশের ন্যায়সঙ্গত অধিকার আদায়ের কোন সম্ভাবনা নেই। ইয়াহিয়া নিজেই আহ্বান করে আবার নিজেই যেভাবে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বন্ধ করে দিলেন তা থেকেই বাঙালি শিক্ষা গ্রহণ করেছে। তাই তারা এক বাক্যে পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর চাপ দিতে থাকেন।

শেষ মুজিব এতদসত্ত্বেও সমস্যার একটা রাজনৈতিক সমাধানের জন্য চেষ্টা করতে থাকেন। ৩ মার্চ অসহযোগ কর্মসূচির আহ্বান জানাতে গিয়ে তিনি দখলদার বাহিনীকে মোকাবিলার জন্য শান্তির অস্ত্রই বেছে নিয়েছিলেন। তখনও তিনি আশা করছিলেন যে, সামরিক চক্র তাদের জ্ঞানবুদ্ধি ফিরে পাবে। গত ২ ও ৩ মার্চ ঠাণ্ডা মাথায় সামরিক চক্র

কর্তৃক হাজার হাজার নিরস্ত্র ও নিরীহ মানুষকে গুলি করে হত্যা করার মুখে বঙ্গবন্ধুর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের নজির পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

শেখ সাহেবের অসহযোগ আন্দোলন আজ ইতিহাসের অন্তর্গত। অসহযোগ আন্দোলনের ক্ষেত্রে তিনি সৃষ্টি করলেন এক নতুন ইতিহাস। বাংলাদেশে ১ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত অসহযোগ আন্দোলন যেভাবে এগিয়ে গেছে মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসে তার নজির খুঁজে পাওয়া যাবে না। এত কার্যকর অসহযোগ আন্দোলন কোথাও সাফল্য লাভ করেনি। পূর্ণ অসহযোগ আন্দোলন চলেছে দেশের সর্বত্র। নতুন গভর্নর লে. জেনারেল টিক্কা খানের শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করার জন্য পাওয়া গেল না হাইকোর্টের কোনো বিচারপতি। পুলিশ এবং পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসসহ গণপ্রশাসন বিভাগের কর্মচারীগণ কাজে যোগ দিতে অস্বীকার করেন। জনগণ সেনাবাহিনীর সরবরাহ বন্ধ করে দিল। এমনকি সামরিক দপ্তরের অসামরিক কর্মচারীগণ তাদের অফিস বয়কট করলেন। কেবল কাজে যোগদান থেকে বিরত থেকে তারা ক্ষান্ত হলেন না, অসামরিক প্রশাসন ও পুলিশ বিভাগের লোকেরাও সক্রিয় সমর্থন ও নিজেদের আনুগত্য প্রকাশ করলেন শেখ সাহেবের প্রতি। তারা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করলেন যে, আওয়ামী লীগ প্রশাসনের নির্দেশ ছাড়া তারা অন্য কারও নির্দেশ মেনে চলবেন না।

এ অবস্থায় মুখোমুখি হয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতাসীন না হয়েও অসহযোগের মধ্যে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার দায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণে আওয়ামী লীগ বাধ্য হলো। এ ব্যাপারে শুধু আপামর জনগণই নয়, বাংলাদেশের প্রশাসন ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের দ্ব্যর্থহীন সমর্থন লাভ তারা করেছিলেন। তারা আওয়ামী লীগের নির্দেশাবলী সর্বান্তঃকরণে মাথা পেতে মেনে নিলেন এবং সমস্যাবলীর সমাধানে আওয়ামী লীগকে একমাত্র কর্তৃপক্ষ বলে গ্রহণ করলেন। অসহযোগ আন্দোলনের ফলে বাংলাদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ফাটল ধরলে দেখা দেয় নানাবিধ দুরূহ সমস্যা। কিন্তু এসব সমস্যাবলীর মধ্যেও বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে দেশের অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক দপ্তরের কাজ যথারীতি এগিয়ে যাচ্ছিল। বাংলাদেশের কোনো আইনানুগ কর্তৃপক্ষ না থাকা সত্ত্বেও পুলিশের সহযোগিতায় আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবকগণ আইনশৃঙ্খলা রক্ষার যে আদর্শ স্থাপন করেছিলেন, তা স্বাভাবিক সময়েও অন্যদের অনুকরণীয় হওয়া উচিত। আওয়ামী লীগ ও ঐতিহাসিক অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি জনগণের সর্বাধিক সমর্থন দৃষ্টে জেনারেল ইয়াহিয়া তার কৌশল পাল্টালেন। ৬ মার্চ ইয়াহিয়াকে একটা কনফ্রন্টেশনের জন্য উত্তেজনা সৃষ্টিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বলে মনে হলো। কেননা তার ঐদিনের প্ররোচনামূলক বেতার বক্তৃতায় সঙ্কটের সম্পূর্ণ দায়িত্ব চাপালেন আওয়ামী লীগের ওপর। অথচ যিনি ছিলেন সঙ্কটের স্থপতি সেই ভুট্টো সম্পর্কে তিনি একটি কথাও বললেন না। মনে হয় তিনি ধারণা করেছিলেন যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন। অনুরূপ উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে তা নির্মূল করার জন্য ঢাকার সেনাবাহিনীকে করা হয় পূর্ণ সতর্কীকরণ। লে. জেনারেল ইয়াকুব

খানের স্থলে পাঠানো হলো লে. জেনারেল টিক্কা খানকে। এই রদবদল থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় সামরিক জান্তার ঘৃণ্য মনোভাবের পরিচয়।

কিন্তু ইতোমধ্যেই মুক্তিপাগল মানুষ স্বাধীনতা লাভের জন্য পাগল হয়ে ওঠে। এ সত্ত্বেও শেখ মুজিব রাজনৈতিক সমাধানের পথে অটল থাকেন। জাতীয় পরিষদের যোগদানের ব্যাপারে তিনি যে ৪ দফা প্রস্তাব পেশ করেন তাতে যেমন একদিকে প্রতিফলিত হয়েছে জনগণের ইচ্ছা, অপরদিকে শান্তিপূর্ণ সমাধানে পৌঁছানোর জন্য ইয়াহিয়াকে দেয়া হয় তার শেষ সুযোগ।

বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এটি অবশ্যই সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে পাকিস্তানের রাজনৈতিক সঙ্কট নিরসনের বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ইয়াহিয়া এবং তার জেনারেলদের ছিল না। তাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশে সামরিক শক্তিকে জোরদার করার জন্য কালক্ষেপণ করা। ইয়াহিয়ার ঢাকা সফর ছিল আসলে বাংলাদেশে গণহত্যা পরিচালনার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা। এটা আজ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, অনুরূপ একটি সৃষ্টির পরিকল্পনা বেশ আগেভাগেই নেয়া হয়েছিল।

১ মার্চের ঘটনার সামান্য কিছু আগে রংপুর থেকে সীমান্ত রক্ষার কাজে নিয়োজিত ট্যাঙ্কগুলো ফেরত আনা হয়। ১ মার্চ থেকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পশ্চিম পাকিস্তানি কোটিপতি ব্যবসায়ী পরিবারসমূহের সাথে সেনাবাহিনীর লোকদের পরিবার পরিজনদেরকেও পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠানো হতে থাকে।

১ মার্চের পর থেকে বাংলাদেশের সামরিক শক্তি গড়ে তোলার কাজ ত্বরান্বিত করা হয় এবং তা ২৫ মার্চ পর্যন্ত অব্যাহত গতিতে চলে। সিংহলের পথে পিআইয়ের কমার্শিয়াল ফ্লাইটে সাদা পোশাকে সশস্ত্র বাহিনীর লোকদের বাংলাদেশে আনা হলো। সি ১৩০ পরিবহন বিমানগুলোর সাহায্যে অস্ত্র এবং রসদ এনে বাংলাদেশে স্তূপিকৃত করা হয়।

হিসাব নিয়ে জানা গেছে, ১ মার্চ থেকে ২৫ মার্চের মধ্যে প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জামসহ অতিরিক্ত এক ডিভিশন সৈন্য বাংলাদেশে আমদানি করা হয়। ব্যাপারটা নিরাপদ করার জন্য ঢাকা বিমানবন্দরকে বিমানবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। সমগ্র বিমানবন্দর এলাকায় আর্টিলারি ও মেশিনগানের জাল বিস্তার করা হয়। যাত্রীদের আগমন-নির্গমনের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করা হয়। ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ ও হত্যাকাণ্ড সংগঠনে ট্রেনিংপ্রাপ্ত একদল এসজি কমান্ডো গ্রুপ বাংলাদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে ছেড়ে দেয়া হয়। ২৫ মার্চের পূর্ববর্তী দুই দিনে ঢাকা ও সৈয়দপুরে যেসব কুকাণ্ড ঘটে এরাই সেগুলো সংঘটন করেছিল। সামরিক হস্তক্ষেপের অজুহাত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে স্থানীয় ও অস্থানীয়দের মধ্যে সংঘর্ষ সৃষ্টির মাধ্যমে একটা উত্তেজনার পরিবেশ খাড়া করাই ছিল এসবের উদ্দেশ্য।

প্রতারণা বা ভণ্ডামির এই স্ট্রাটেজি গোপন করার অংশ হিসেবেই ইয়াহিয়া শেখ মুজিবের সাথে তার আলোচনায় আপসমূলক মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন। ১৬ মার্চ আলোচনা শুরু হলে ইয়াহিয়া তৎপূর্বে যা ঘটেছে তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এবং

সমস্যার একটা রাজনৈতিক সমাধানের জন্য আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করেন। শেখ মুজিবের সাথে আলোচনার এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে ইয়াহিয়ার কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল আওয়ামী লীগের ক্ষমতা হস্তান্তরের ৪ দফা শর্তের প্রতি সামরিক জান্তার মনোভাব কি? জবাবে ইয়াহিয়া জানান যে, এ ব্যাপারে তাদের তেমন কোনো আপত্তি নেই। তিনি আশা করেন যে, ৪ দফা শর্ত পূরণের ভিত্তিতে উভয় পক্ষের উপদেষ্টাগণ একটা অন্তবর্তীকালীন শাসনতন্ত্র প্রণয়নে সক্ষম হবেন।

আলোচনাকালে যেসব মৌলিক প্রশ্নে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয় সেগুলো হলো :

১। মার্শাল 'ল বা সামরিক আইন প্রত্যাহার করে প্রেসিডেন্টের একটি ঘোষণার মাধ্যমে একটি বেসামরিক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর।

২। প্রদেশগুলোতে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলসমূহের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর।

৩। ইয়াহিয়া প্রেসিডেন্ট থাকবেন এবং কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনা করবেন।

৪। জাতীয় পরিষদ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানি সদস্যগণ পৃথক পৃথকভাবে বৈঠকে মিলিত হবেন।

আজ ইয়াহিয়া ও ভুট্টো জাতীয় পরিষদের পৃথক পৃথক অধিবেশনের প্রস্তাবের বিকৃত ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। অথচ ইয়াহিয়া নিজেই ভুট্টোর মনোনয়নের জন্য এ প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এ প্রস্তাবের সুবিধা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইয়াহিয়া সেদিন নিজেই বলেছিলেন যে, ৬ দফা হলো বাংলাদেশের এবং কেন্দ্রের মধ্যকার সম্পর্ক নির্ণয়ের এক নির্ভরযোগ্য নীলনকশা। পক্ষান্তরে এটার প্রয়োগ পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য সৃষ্টি করবে নানারূপ অসুবিধা। এমতাবস্থায় পশ্চিম পাকিস্তানি এমএনএদের পৃথকভাবে বসে ৬ দফার ভিত্তিতে রচিত শাসনতন্ত্র এবং এক ইউনিট ব্যবস্থা বিলোপের আলোকে একটা নতুন ধরনের ব্যবস্থা গড়ে তোলার সুযোগ অবশ্যই দিতে হবে।

শেখ মুজিব এবং ইয়াহিয়ার মধ্যকার এই নীতিগত মতৈক্যের পর একটি মাত্র প্রশ্ন থেকে যায় এবং তাহলো অন্তর্বর্তী পর্যায়ে কেন্দ্র ও বাংলাদেশের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন। এক্ষেত্রেও উভয় পক্ষ এই মর্মে একমত হয়েছিলেন যে, ৬ দফার ভিত্তিতে অদূর ভবিষ্যতে যে শাসনতন্ত্র রচিত হতে যাচ্ছে মোটামুটি তার আলোকেই কেন্দ্র বাংলাদেশের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন হবে। অন্তর্বর্তীকালীন মীমাংসার এই সম্পর্কে একটা পরিকল্পনা তৈরির উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্টের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা এমএম আহমদকে বিমানে করে ঢাকা আনা হয়। আওয়ামী লীগ উপদেষ্টাদের সাথে আলাপ-আলোচনায় তিনি স্পষ্টভাবে এ কথা বলেন যে, রাজনৈতিক মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ৬ দফা কার্যকর করার প্রশ্নে দুর্লভ কোনো সমস্যা দেখা দেবে না। এমনকি অন্তর্বর্তী পর্যায়েও না।

আওয়ামী লীগের খসড়ার ওপর তিনি যে তিনটি সংশোধনী পেশ করেছিলেন তাতে এ কথাই প্রমাণিত হয়েছিল যে, সরকার এবং আওয়ামী লীগের মধ্যে তখন যে ব্যবধানটুকু ছিল তা নীতিগত নয়, বরং কোথাও কোন্ শব্দ বসবে তা নিয়ে। ২৪ মার্চের বৈঠকে ভাষার সামান্য রদবদলসহ সংশোধনীগুলো আওয়ামী লীগ গ্রহণ করে। অতঃপর

অন্তর্বর্তীকালীন শাসনতন্ত্র চূড়ান্তকরণের উদ্দেশ্যে ইয়াহিয়া ও মুজিবের উপদেষ্টাদের শেষ দফা বৈঠকে মিলিত হওয়ার পথে আর কোনো বাধাই ছিল না।

এ প্রসঙ্গে একটা জিনিস পরিষ্কার করে বলতে হয়, কোনো পর্যায়েই আলোচনা অচলাবস্থার সম্মুখীন হয়নি। অথচ ইয়াহিয়া বা তার উপদেষ্টারা আভাস-ইঙ্গিতেও এমন কোনো কথা বলেননি যে, তাদের এমন একটা বক্তব্য আছে যা থেকে তারা নড়চড় করতে পারেন না।

গণহত্যাকে ধামাচাপা দেয়ার জন্য ইয়াহিয়া ক্ষমতা হস্তান্তরে আইনগত ছত্রছায়ার প্রশ্নেও আজ জোচ্চুরির আশ্রয় নিয়েছেন। আলোচনায় তিনি এবং তার দলবল একমত হয়েছিলেন যে, ১৯৪৭ সালে ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের মাধ্যমে যেভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়েছিল তিনিও সেভাবে একটা ঘোষণার মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। ক্ষমতা হস্তান্তরের আইনগত ছত্রছায়ার ব্যাপারে ভুট্টো পরবর্তীকালে যে ফ্যাঁকড়া তুলেছেন ইয়াহিয়া তাই অনুমোদন করেছেন। আশ্চর্যের ব্যাপার, ইয়াহিয়া ঘুনাক্ষরেও এ সম্পর্কে কিছু জানাননি। ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য জাতীয় পরিষদের একটা অধিবেশন বসা দরকার, ইয়াহিয়া যদি আভাস-ইঙ্গিতেও এ কথা বলতেন তাহলে আওয়ামী লীগ নিশ্চয়ই তাতে আপত্তি করত না। কেননা এমন একটা সামান্য ব্যাপারকে উপেক্ষা করে আলোচনা বাঞ্চাল করতে দেয়া যায় না। তাছাড়া জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগুরু দল হিসেবে আওয়ামী লীগের ভয় করার কিছুই ছিল না। দেশের দুই অংশের জাতীয় পরিষদের সদস্যদের পৃথক পৃথক বৈঠকের যে প্রস্তাবে আওয়ামী লীগ সম্মতি দিয়েছিল, তা শুধু ভুট্টোকে খুশি করার জন্যই করা হয়েছিল। এটা কোনো সময়ই আওয়ামী লীগের মৌলিক নীতি ছিল না।

২৪ মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া এবং আওয়ামী লীগ উপদেষ্টাদের মধ্যে চূড়ান্ত বৈঠকে এমএম আহমদ তার সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করেন। এ খসড়া প্রস্তাবের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য জেনারেল পীরজাদার আহ্বানে একটা চূড়ান্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। দুঃখের বিষয় কোনো চূড়ান্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়নি। বরং এমএম আহমদ আওয়ামী লীগকে না জানিয়ে ২৫ মার্চ করাচি চলে গেলেন।

২৫ মার্চ রাত ১১টা নাগাদ সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন হয় এবং সেনাবাহিনী শহরে 'পজিশন' গ্রহণ করতে থাকে। মধ্যরাত নাগাদ ঢাকা শহরের শান্তিপ্রিয় জনগণের ওপর পরিচালনা করা হলো গণহত্যার এক পূর্ব নির্দিষ্ট কর্মসূচি। অনুরূপ বিশ্বাসঘাতকতার নজির সমসাময়িক ইতিহাসে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। ইয়াহিয়া আওয়ামী লীগকে দেননি কোনো চরমপত্র। অথবা মেশিনগান, আর্টিলারি সুসজ্জিত ট্যাঙ্কসমূহ যখন মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ও ধ্বংসলীলা শুরু করে দিল তার আগে জারি করা হয়নি কোনো কারফিউ অর্ডার। পরদিন সকালে লে. জেনারেল টিক্কা খান তার প্রথম সামরিক নির্দেশ জারি করলেন বেতার মারফত। কিন্তু ৫০ হাজার লোক তার আগেই প্রাণ হারিয়েছেন বিনা প্রতিরোধে। এদের অধিকাংশই ছিল নারী ও শিশু। ঢাকা শহর পরিণত

হয় নরককুণ্ডে, প্রতিটি অলিগলি ও আনাচে-কানাচে চলতে লাগল নির্বিচারে গুলি। সামরিক বাহিনীর লোকদের নির্বিচারে অগ্নিসংযোগের মুখে অন্ধকারে বিছানা ছেড়ে যেসব মানুষ বের হওয়ার চেষ্টা করল তাদেরকে নির্বিচারে হত্যা করা হয় মেশিনগানের গুলিতে।

আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত আক্রমণের মুখেও পুলিশ ও ইপিআর বীরের মতো লড়ে গেল। কিন্তু দুর্বল, নিরীহ মানুষ কোনো প্রতিরোধ দিতে পারল না। তারা মারা গেল হাজারে হাজারে। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের নির্দেশে সেনাবাহিনী যে ব্যাপক গণহত্যা চালিয়েছে আমরা তার একটা নির্ভরযোগ্য তালিকা প্রস্তুত করছি এবং শিগগিরই তা প্রকাশ করব। মানুষ সভ্যতার ইতিহাসে যেসব বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতার কাহিনী আমরা শুনেছি, এদের বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতা তার সবকিছুকে ম্লান করে দিয়েছে।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে লেলিয়ে দিয়ে ২৫ মার্চ রাতে ইয়াহিয়া ঢাকা ত্যাগ করলেন। যাওয়ার আগে তিনি তাদেরকে দিয়ে গেলেন বাঙালি হত্যার এক অবাধ লাইসেন্স। কেন তিনি এই বর্বরতার আশ্রয় নিয়েছিলেন, পরদিন রাত ৮টার সময় বিশ্ববাসীকে জানানো হলো এর কৈফিয়ত। এই বিবৃতিতে তিনি নরমেধযজ্ঞ সংগঠনের একটা ব্যাখ্যা বিশ্ববাসীকে জানালেন। তার বক্তব্য একদিকে ছিল পরস্পরবিরোধী এবং অন্যদিকে ছিল মিথ্যার বেসাতিতে ভরা। মাত্র ৪৮ ঘণ্টা আগেও যে দলের সাথে তিনি শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছিলেন সে দলের লোকদের দেশদ্রোহী ও দলটিকে অবৈধ ঘোষণার সাথে বাংলাদেশের পরিস্থিতি বা আলাপ-আলোচনায় কোনো সঙ্গতি খুঁজে পেল না বিশ্ববাসী। বাংলাদেশের একমাত্র প্রতিনিধিত্বশীল এবং জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগুরু আসনের অধিকারী আওয়ামী লীগকে বেআইনি ঘোষণা করে গণপ্রতিনিধিদের হাতে তার ক্ষমতা হস্তান্তরের ওয়াদাকে সাড়ে সাত কোটি বাঙালির অবাধ মতপ্রকাশের প্রতি তামাশা ছাড়া মানুষ আর কিছু ভাবতে পারল না। তার বক্তব্য থেকে এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হলো যে, ইয়াহিয়া আর যুক্তি বা নৈতিকতার ছত্রছায়ায় আশ্রয় নিতে চান না এবং বাংলাদেশের মানুষকে নির্মূল করার জন জঙ্গি আইনের আশ্রয় নিতে বদ্ধপরিকর।

পাকিস্তান আজ মৃত এবং অসংখ্য আদম সন্তানের লাশের তলায় তার কবর রচিত হয়েছে। বাংলাদেশে যে শত সহস্র মানুষের মৃত্যু হয়েছে তা পশ্চিম পাকিস্তান এবং পূর্ব-পাকিস্তানের মধ্যে একটা দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর হিসেবে বিরাজ করছে। পূর্ব পরিকল্পিত গণহত্যায় মত্ত হয়ে ওঠার আগে ইয়াহিয়ার ভাবা উচিত ছিল তিনি নিজেই পাকিস্তানের কবর রচনা করছেন। তারই নির্দেশে তার লাইসেন্সধারী কসাইরা জনগণের ওপর যে ধ্বংসলীলা চালিয়েছে তা কোনোমতেই একটা জাতীয় ঐক্যের অনুকূল ছিল না। বর্ণগত বিদ্বেষ এবং একটা জাতিকে ধ্বংস করে দেওয়াই ছিল এর লক্ষ্য। মানবতার লেশমাত্রও এদের মধ্যে নেই। উপরওয়ালাদের নির্দেশে পেশাদারি সৈনিকরা লঙ্ঘন করেছে তাদের সামরিক নীতিমালা এবং ব্যবহার করেছে শিকারি পশুর মতো। তারা চালিয়েছে

হত্যাযজ্ঞ, নারী ধর্ষণ, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও নির্বিচারে ধ্বংসলীলা। বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে এর নজির নেই। এসব কার্যকলাপ থেকে এ কথারই আভাস মেলে যে, ইয়াহিয়া খান ও তার সাঙ্গোপাঙ্গদের মনে দুই পাকিস্তানের ধারণা দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয়ে গেছে। যদি না হতো তাহলে তারা একই দেশের মানুষের ওপর এমন নির্মম বর্বরতা চালাতে পারত না। ইয়াহিয়ার এই নির্বিচারে গণহত্যা আমাদের জন্য রাজনৈতিক দিক থেকে অর্থহীন নয়। তার এ কাজ পাকিস্তানের বিয়োগান্ত এই মর্মান্তিক ইতিহাসের শেষ অধ্যায়, যা ইয়াহিয়া রচনা করেছেন বাঙালির রক্ত দিয়ে। বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত হওয়া বা নির্মূল হওয়ার আগে তারা গণহত্যা ও পোড়ামাটি নীতির মাধ্যমে বাঙালি জাতিকে শেষ করে দিয়ে যেতে চায়। ইত্যবসরে ইয়াহিয়ার লক্ষ্য হলো আমাদের রাজনৈতিক, বুদ্ধিজীবী মহল ও প্রশাসন ব্যবস্থাকে নির্মূল করা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কারখানা, জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ ধ্বংস করা এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে শহরগুলোকে ধূলিসাৎ করা, যাতে একটি জাতি হিসেবে কোনোদিনই আমরা মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারি।

ইতোমধ্যে এ লক্ষ্যপথে সেনাবাহিনী অনেকদূর এগিয়ে গেছে। যে বাংলাদেশকে তারা দীর্ঘ ২৩ বছর নিজেদের স্বার্থে লাগিয়েছে, শোষণ করেছে, তাদেরই বিদায়ী লাথির উপহার হিসেবে সেই বাংলাদেশ সর্বক্ষেত্রে পাকিস্তান থেকে ৫০ বছর পিছিয়ে পড়ল।

বেলসেন এবং অসউহজের পর গণহত্যার এমন জঘন্যতম ঘটনা আর ঘটেনি। অথচ বৃহৎ শক্তিবর্গ বাংলাদেশের ঘটনার ব্যাপারে উটপাখির নীতি অনুসরণ করে চলেছেন। তারা যদি মনে করে থাকেন যে, এতদ্বারা তারা পাকিস্তানের ঐক্য বজায় রাখার ব্যাপারে সহায়তা করেছেন, তাহলে তারা ভুল করেছেন। কেননা, পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ইয়াহিয়া খান নিজেও মোহমুক্ত।

তাদের বোঝা উচিত যে, পাকিস্তান আজ মৃত এবং ইয়াহিয়া নিজেই পাকিস্তানের হত্যাকারী। স্বাধীন বাংলাদেশের আজ একটা বাস্তব সত্য। সাড়ে সাত কোটি বাঙালি অজেয় মনোবল ও সাহসের মাধমে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম দিয়েছে এবং প্রতিদিন হাজার হাজার বাঙালি সন্তান রক্ত দিয়ে এই নতুন শিশু রাষ্ট্রকে লালিত-পালিত করছেন। দুনিয়ার কোনো জাতি এ নতুন শক্তিকে ধ্বংস করতে পারবে না। আজ হোক কাল হোক দুনিয়ার ছোট-বড় প্রতিটি রাষ্ট্রকেই গ্রহণ করতে হবে এ নতুন জাতিকে। স্থান দিতে হবে বিশ্ব রাষ্ট্রপুঞ্জে।

সুতরাং রাজনীতি এবং মানবতার স্বার্থেই আজ বৃহৎ শক্তিবর্গের উচিত ইয়াহিয়ার ওপর চাপ সৃষ্টি করা, তার লাইসেন্সধারী হত্যাকারীদের খাঁচায় আবদ্ধ করা এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য করা। আমাদের সংগ্রামকে সোভিয়েত ইউনিয়ন, ভারত এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশের স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষ যে সমর্থন দিয়েছেন তা আমরা চিরকাল কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করবো। গণচীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, গ্রেট ব্রিটেন ও অন্যান্য দেশের কাছ থেকেও আমরা অনুরূপ সমর্থন আশা করি এবং তা পেলে সে জন্য তাদেরকে অভিনন্দন জানাব। প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের উচিত তাদের নিজ নিজ পর্যায়ে

পাকিস্তানের ওপর চাপ সৃষ্টি করা এবং তারা যদি তা করেন তাহলে ইয়াহিয়ার পক্ষে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আর একদিনও হামলা অব্যাহত রাখা সম্ভব নয়।

জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ হতে বিশ্বের অষ্টম বৃহৎ রাষ্ট্র। আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হবে ইয়াহিয়ার সেনাবাহিনীর সৃষ্ট ভস্ম ও ধ্বংসস্তূপের ওপর একটা নতুন দেশ গড়ে তোলা। এ একটা দুরূহ ও বিরাট দায়িত্ব। কেননা আগে থেকেই আমরা বিশ্বের দরিদ্রতম জাতিসমূহের অন্যতম। এছাড়া একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য মানুষ একটা ঐতিহাসিক সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। তারা প্রাণপণে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। তারা প্রাণ দিচ্ছে অকাতরে। সুতরাং তাদের আশা আমরা ব্যর্থ করতে পারি না। তাদের ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল করতেই হবে।

আমার বিশ্বাস, যে জাতি নিজে প্রাণ ও রক্ত দিতে পারে, এত ত্যাগ স্বীকার করতে পারে, সে জাতি তার দায়িত্ব সম্পাদনে বিফল হবে না। এ জাতির অটুট ঐক্য স্থাপনের ব্যাপারে কোনো বাধাবিপত্তি টিকতে পারে না।

আমাদের এই অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে আমরা কামনা করি বিশ্বের প্রতিটি ছোট-বড় জাতির বন্ধুত্ব। আমরা কোনো শক্তি, ব্লক বা সামরিক জোটভুক্ত হতে চাই না– আমরা আশা করি শুধু শুভেচ্ছার মনোভাব নিয়ে সবাই নিঃসংকোচে আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসবেন। কারও তাঁবেদারে পরিণত হওয়ার জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণের দীর্ঘ সংগ্রামে আমাদের মানুষ এত রক্ত দেয়নি, এত ত্যাগ স্বীকার করছে না।

আমাদের এই জাতীয় সংগ্রামে, তাই আমরা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি এবং বৈষয়িক ও নৈতিক সমর্থনের জন্য বিশ্বের জাতিসমূহের প্রতি আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

এ ব্যাপারে প্রতিটি দিনের বিলম্ব ডেকে আনছে সহস্র মানুষের অকাল মৃত্যু এবং বাংলাদেশের মূল সম্পদের বিরাট ধ্বংস। তাই বিশ্ববাসীর প্রতি আমাদের আবেদন, আর কালবিলম্ব করবেন না, এ মুহূর্তে এগিয়ে আসুন এবং এতদ্বারা বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের চিরন্তন বন্ধুত্ব অর্জন করুন।

বিশ্ববাসীর কাছে আমরা আমাদের বক্তব্য পেশ করলাম, বিশ্বের আর কোনো জাতি আমাদের চেয়ে স্বীকৃতির বেশি দাবিদার হতে পারেন না। কেননা, আর কোনো জাতি আমাদের চেয়ে কঠোরতর সংগ্রাম করেনি, অধিকতর ত্যাগ স্বীকার করেনি। জয়বাংলা।'

১০ জানুয়ারি ১৯৭২ দিল্লির প্যারেড গ্রাউন্ডে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ

ইতিহাসের বহু উত্থান-পতন, জয়-পরাজয়ের সাক্ষী প্রাচীন দিল্লি নগরী বাংলাদেশের নিপীড়িত মানুষের ত্রাণকর্তা শেখ মুজিবুব রহমানকে স্বাগত জানাবার প্রস্তুতি লগ্নে আজো এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করলো। মানব সভ্যতার ইতিহাসে বিদেশে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত এক চিরবিদ্রোহী জননেতা মুক্ত মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই এক মিত্র রাষ্ট্রে পদার্পণ এই বোধহয় প্রথম– এক নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত সেই অতুলনীয় নজিরবিহীন অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহান নেতা। নেতার তাদের হৃদয়ের সবটুকু উত্তাপ আপন হৃদয়ে তুলে নিয়ে স্বদেশের পথে আবার পা বাড়ান। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রয়্যাল এয়ারফোর্সের একখানি 'কমেট' বিমানযোগে লন্ডন থেকে ৮টা ২ মিনিটে নয়াদিল্লি পৌঁছেন। সেখানে পালাম বিমানবন্দরে ভারতীয় রাষ্ট্রপতি ভিভি গিরি, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী এবং ২৪ জনেরও বেশি বিদেশী কূটনৈতিক প্রতিনিধি বঙ্গবন্ধুকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। নয়াদিল্লিতে বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ছাড়া দিল্লির প্যারেড গ্রাউন্ডে এক বিশাল জনসমাবেশে বাংলাভাষায় ভাষণদান করেন।

বিমানবন্দরে ভারত ও বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন এবং কোটি কণ্ঠে জয়ধ্বনি উঠলো : 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, জয় ইন্দিরা গান্ধী, ভারত-বাংলাদেশ ভাই ভাই।' ভারতের পূর্ব প্রান্তে তাঁর নিজ দেশের কথা স্মরণ করে বঙ্গবন্ধু বললেন : আমার দেশের কোটি কোটি মানুষের হাসির প্রস্রবনে অবগাহন করতে আমি ছুটে যাচ্ছি– কিন্তু অন্ধকার থেকে আলোকের পথে যাবার আগে ভারতভূমিতে দাঁড়িয়ে আমার চিরন্তর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে গেলাম ভারতের জনগণের প্রতি, অনন্যা ও অসাধারণ তার প্রধানমন্ত্রীর প্রতি– তার সৈন্যবাহিনী ও সাধারণ মানুষের প্রতি– এদের সকলের প্রতিই বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অপরিসীম কৃতজ্ঞতা। আমাদের মুক্তি সংগ্রামে তারা যে সাহায্য ও সমর্থন দিয়েছেন, সেটা কোনোদিনই ভুলবার নয়। ভাষণটি নিম্নরূপ :

'আমার ভাই ও বোনেরা, 'আপনারা অনেক ইতিহাস জানেন। সাত কোটি বাঙালির ওপর যে নিদারুণ অত্যাচার হয়েছে তা আপনারা জানেন। দুনিয়ার কোনো দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে এত মানুষের জীবন যায় নাই, যা আমার সোনার বাংলার ওপর

দিয়ে চলে গেছে। তিরিশ লক্ষ মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে। এক কোটি লোক মাতৃভূমি ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। শত শত যুবককে, মা-বোনকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। কি চেয়েছিলাম?– বাঁচবার অধিকার চেয়েছিলাম। তার প্রতিদানে পেয়েছিলাম বন্দুক, বুলেট, গুলি। আজ বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। বাংলাদেশ ও ভারত পাশাপাশি ভাই ভাই হয়ে বাস করবে শান্তিপূর্ণভাবে।

আপনাদের প্রধানমন্ত্রী, আপনাদের সরকার, আপনাদের সেনাবাহিনী, আপনাদের জনসাধারণ যে সাহায্য এবং সহানুভূতি আমার দুঃখী মানুষকে দেখিয়েছেন, চিরদিন বাংলার মানুষ তা ভুলতে পারবে না। আপনাদের নমস্কার। ব্যক্তিগতভাবে, আপনারা জানেন, পশ্চিম পাকিস্তানের জেলের মধ্যে বন্দি ছিলাম দু'দিন আগেও। শ্রীমতি গান্ধী আমার জন্য দুনিয়ার এমন কোনো জায়গা নাই, যেখানে তিনি চেষ্টা করেন নাই আমাকে রক্ষা করার জন্য। আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। আমার সাড়ে সাত কোটি মানুষ ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কাছে এবং তাঁর সরকারের কাছে কৃতজ্ঞ। আর যেভাবে এক কোটি লোকের খাওয়ার বন্দোবস্ত এবং থাকার বন্দোবস্ত আপনারা করেছেন, আমি জানি, ভারতবর্ষে অনেক মানুষ দুঃখে আছেন যারা কষ্ট পেয়েছে, তাদেরও অসুবিধা আছে, তা সত্ত্বেও তারা সর্বস্ব দিয়েছে আমার লোককে সাহায্য করার জন্য। চিরদিন মনে রাখবো আমরা, তা ভুলতে পারবো না। আজ আমার বাংলাদেশ শেষ হয়ে গেছে। দুর্দশাগ্রস্ত দেশের জন্য আমি সকল প্রকার সাহায্য সহানুভূতি পাবো বলে আশা করি– এবং এ আশা করি যে, দুনিয়ার শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক দেশ ও মানুষ আছে– তারা এগিয়ে আসবে আমার মানুষকে সাহায্য করার জন্য। আমি বিশ্বাস করি গণতন্ত্রে, আমি বিশ্বাস করি সোশালিজম মন্ত্রে। আমাকে প্রশ্ন করা হয় যে, শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর আদর্শের সঙ্গে আপনার এত মিল কেন? আমি বলি, এটা আদর্শের মিল, এটা নীতির মিল, এটা বিশ্ব শান্তির মিল।

আমি আশা করি আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি কিছুটা ইমোশনাল হয়ে যাই। কারণ আমি কয়েকদিন আগেও যে জানতাম না আমার মাতৃভূমিতে ফিরে যেতে পারবো, সেখানে আমি দেখব আমার মানুষ, আজ স্বাধীন, আমার মানুষ আজ মুক্ত। আপনাদের প্রধানমন্ত্রী, আপনাদের সৈন্যবাহিনী এবং জনসাধারণকে আমার তরফ থেকে এবং যারা আজকে ভারতবর্ষের সাংবাদিক, দুনিয়ার সাংবাদিক, যারা আমাকে আজ মুক্ত করার, যারা আমার মুক্তির জন্য, বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য সাহায্য করেছেন তাদের মোবারকবাদ জানাই।

যাবার আগে স্মরণ করে যাই আমার দুঃখী ভাই-বোনদের, যারা রক্ত দিয়েছে, যাদের আমি আর জীবনে দেখব না, যারা আমার সহকর্মী ছিল, যাদের আমি বেছে নিয়েছিলাম।

আমি লন্ডনে জানতে পেয়েছি, পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী সারেন্ডার করার দু'দিন আগেও আমার ইনটেলেকচুয়ালদের, আমার সহকর্মীদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়ে তাদের

কাপুরুষের মতো হত্যা করেছে। জানিনা আমি তাদের দেখতে পাবো কিনা।

এত বড় কাপুরুষ আমার জীবনে দেখেনি। এত বড় জঘন্য প্রকৃতির মানুষ– জীবনে কোথাও কোনো ইতিহাসে পড়ি নাই। আমি রাজনীতি করি আজ ৩৫ বছর।

আমার যা বলার আজকে ঢাকার রেসকোর্সে বলবো। আমি আজকে কিছুটা ইমোশনাল। আপনারা বুঝতে পারেন, আমাকে ক্ষমা করবেন। আবার আপনাদের ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় নিচ্ছি।

জয় বাংলা। জয় হিন্দ।
জয় ইন্দিরা গান্ধী।'

১০ জানুয়ারি '৭২ ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পূর্ণ বিবরণ

আমি প্রথমে স্মরণ করি বাংলাদেশের যে অগণিত হিন্দু-মুসলমানের ওপর অত্যাচার হয়েছে তাদের। তাদের স্মৃতির জন্য প্রার্থনা করি, তাদের আত্মার মঙ্গল কামনা করি।

আজ আমার বাংলা স্বাধীন। আমার জীবনের সাধ পূর্ণ হয়েছে।

আমি আজ বক্তৃতা করতে পারবো না। বাংলার মেয়েরা, মায়েরা, ছাত্র-কৃষক সবাই আমার দেশের মুক্তির জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করেছে, তার তুলনা নেই।

আমি কারাগারে বন্দি ছিলাম। আপনারা দেশকে মুক্ত করেছেন। আমি জানতাম বাংলাকে কেউ দাবায়ে রাখতে পারবে না। কত লোক শহীদ হয়েছেন, জান দিয়েছেন তবু পিছু হটেননি। ৩০ লক্ষ লোককে মেরে ফেলা হয়েছে। প্রথম এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও এত লোক, এক নাগরিক মৃত্যুবরণ করেননি, শহীদ হননি।

আমি জানতাম না আবার আপনাদের মধ্যে ফিরে আসতে পারবো। আমি ওদের বলেছিলাম, তোমরা আমাকে মারতে চাও, মেরে ফেল। শুধু আমার লাশটা বাংলাদেশে আমার বাঙালিদের কাছে ফিরিয়ে দিও।

আমি আজ মোবারকবাদ জানাই। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী এবং ভারতের জনগণকে। মোবারকবাদ জানাই সেনাবাহিনীকে। মোবারকবাদ জানাই রাশিয়া, ব্রিটেন, জার্মান এবং আমেরিকার জনসাধারণকে।

এক কোটি লোক ঘরবাড়ি ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। শ্রীমতি গান্ধীর ভারত তাদের খাবার-দাবার দিয়েছিল, আশ্রয় দিয়েছিল। এত বড় মানবতা ভোলা যায় না। আজ বাংলাদেশের এক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। বাংলাকে কেউ দাবায়ে রাখতে পারবে না। ষড়যন্ত্র করে লাভ নাই। বাংলাদেশ স্বাধীন থাকবে।

আমি এর আগে এই ময়দানের সভায় আপনাদের বলেছিলাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলুন। আমার সহকর্মীরা অক্ষরে অক্ষরে আমার নির্দেশ মেনে চলেছেন। কত লোক প্রাণ দিয়েছেন। আমার কত লোক পশ্চিম পাকিস্তানের সৈন্যরা খুন করেছে। কত লোককে আর দেখতে পাব না।

আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় বড় ভালোবাসি। দুনিয়ার সব রাষ্ট্রের কাছে

আমার আবেদন, আমার বাংলায় রাস্তা নেই, ঘাট নেই, খাবার নেই, আমার মানুষ গৃহহারা, খাদ্য নেই, আমার মানুষ পথের ভিখারি— তোমাদের সাহায্য চাই।

আবার বলি, বাংলাদেশকে মেনে নাও রেকগনাইজ কর। এ স্বীকৃতি দিতেই হবে। না দিয়ে উপায় নেই। আমরা হারবো না।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলে গিয়েছেন, 'সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধা জননী, রেখেছো বাঙালি করে মানুষ করোনি।' কিন্তু বাঙালি দেখিয়ে দিল কবিগুরুর সে বাণী ভুল। স্বাধীনতার সংগ্রামে এত লোক আত্মাহুতি দিয়েছে, ত্যাগ স্বীকার করেছে, এমন নজির বাংলা ছাড়া দুনিয়ার ইতিহাস আর কোথায়! এত লোক আর কোথায় প্রাণ দেয় নাই। তাই আমি বলি, দাবায়ে রাখতে পারবা না।

আজ থেকে আমার হুকুম প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নয়, ভাই হিসেবে, তোমরা আমার ভাই, আমি তোমাদের ভাই। আমাদের এই স্বাধীনতা পূর্ণ হবে না যদি বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত না পায়। মা-বোন কাপড় না পায়, যুবকরা কাজ না পায়।

মুক্তিবাহিনী, ছাত্রসমাজ তোমাদের সকলকে আমার মোবারকবাদ। তোমরা লড়েছো, গেরিলা হয়েছো, রক্ত দিয়েছো– রক্তদান বৃথা যায় না। দেশকে স্বাধীন করেছো। আজ থেকে বাংলায় যেন চুরি-ডাকাতি না হয়।

পশ্চিম পাকিস্তানের লোক বাংলায় কথা বলে না। আমি বলি, তোমরা বাঙালি হয়ে যাও, কেউ তোমাদের গায়ে হাত তুলবে না। কিন্তু যারা দালালি করেছে, লোকের ঘরে ঢুকে হত্যা করেছে তাদের বিচার হবে। একজনকেও ক্ষমা করা হবে না। আমি চাই স্বাধীন দেশে স্বাধীন নাগরিকের মতো বিচার হয়ে এদের শাস্তি হোক। শান্তি বজায় রাখতে হবে। শান্তির জন্যই বাঙালি রক্ত দিয়েছে। তারা শান্তি বজায় রাখতেও জানে।

আপনারা আমাকে চেয়েছেন, আমি এসেছি। আমার ফাঁসির হুকুম হয়েছিল। কবর খোঁড়া হয়েছিল। জীবন দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে ছিলাম। বলেছিলাম, আমি মানুষ, আমি বাঙালি, আমি মুসলমান, মানুষ একবার মরে, দুবার নয়। হাসতে হাসতে মরবো, তবু ওদের কাছে ক্ষমা চাইবো না। মরার আগেও বলে যাবো আমি বাঙালি, বাংলা আমার ভাষা, জয় বাংলা বলবো, বাংলার মাটি আমার মা। আমি মাথা নত করবো না।

গ্রেফতারের পর তিন মাস ওরা আমাকে ড. কামাল হোসেনকে নিয়ে ইন্টারোগেট (জিজ্ঞাসাবাদ) করেছে। কিন্তু মাথা নামাইনি। ধরাপড়ার আগে তাজউদ্দীনকে বলেছিলাম, আমি চললাম কাজ করে যেও। তখন জানতাম আর ফিরে আসবো না। তাজউদ্দীন এবং অন্য সহকর্মীদের আশীর্বাদ করি; কারণ, তোমারা ঠিকমতো কাজ করেছো।

আজ আমি বক্তৃতা করতে পারছি না। নমো নমো নমঃ সুন্দরী মম জননী জন্মভূমি। সেই ভূমির মাটিতে পা দিয়ে আমি চোখের পানি রাখতে পারছি না। জানতাম না এই মাটিকে, জাতিকে এতো ভালোবাসি ভাবতেই পারছিলাম না, আবার আমি বাংলার মাটিতে ফিরে এসেছি।

বাংলার মানুষ আজ স্বাধীন। সামনে আমাদের অনেক কাজ বাকি। যেখানে তারা রাস্তা ভেঙেছে নিজেরাই তা তৈরি কর একজনও ঘুষ খেয়ো না। মনে রেখ, আমি ক্ষমা করবো না।

পশ্চিম পাকিস্তানি ভাইদের বলি, তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো ঘৃণা নেই। তোমরা আমাদের মা-বোনদের ওপর অত্যাচার করেছে। ৩০ লাখ লোককে মেরেছো। তবু বলি তোমরা সুখে থাকো। কিন্তু তোমাদের সঙ্গে সব শেষ। তোমাদের সঙ্গে আর না। তোমরা স্বাধীন থাক। আমারও স্বাধীন থাকি। দুই স্বাধীন দেশের সঙ্গে পৃথিবীর অন্য দেশের সঙ্গে যে সম্পর্ক থাকে তাই থাকবে। তবে যারা অন্যায় করেছে তাদের ক্ষমা নেই। কারণ তোমরা গ্রামের পর গ্রাম পোড়ায়ে দিয়েছে। এমন কোনো গ্রাম নাই, এমন কোনো ফ্যামিলি নাই, আমার লোককে হত্যা কর নাই।

শেখ মুজিবুর রহমান আর নাই। আমি অসুস্থ। কিছুদিন পরে আবার বক্তৃতা দিব।

কাপুরুষ তোমরা বল মুসলমান। মনে রেখ, ইন্দোনেশিয়ার পর বাংলাদেশ দ্বিতীয় মুসলমান প্রধান রাষ্ট্র। ভারত তৃতীয়। পশ্চিম পাকিস্তান মুসলমানের সংখ্যায় চতুর্থ। তোমরা মুসলমান, মুসলমান মা-বোনদের 'রেপ' করে?

জেনে রাখ, বাংলাদেশ হবে ধর্মনিরপেক্ষ। গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রই আমাদের আদর্শ।

দিল্লিতে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। যারা জানতে চান তাদের খুলেই বলি– ইন্দিরা গান্ধীকে আমি জানি, শ্রদ্ধা করি। তিনি জওহওলাল নেহেরুর মেয়ে, মতিলাল নেহরুর ছেলের মেয়ে। তাঁরা দীর্ঘকাল দেশসেবা করেছেন। যেদিন আমি বলবো সেদিনই তিনি বাংলাদেশের মাটি থেকে ভারতের সৈন্য সরিয়ে নেবেন। কিছু কিছু সরিয়ে নিতে আরম্ভ করেছেন।

সাড়ে সাত কোটি বাঙালির পক্ষ থেকে আমি শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে এবং তাঁর সরকারকে মোবারকবাদ জানাই। পৃথিবীর এমন কোনো রাষ্ট্রপ্রধান নাই যার কাছে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী ব্যক্তিগতভাবে বলেননি, আপনারা ইয়াহিয়াকে বলুন মুজিবকে ছেড়ে দিতে।

এক কোটি লোক মাতৃভূমি ছেড়ে ভারতে স্থান নিয়েছিল। কত অসুস্থ শরনার্থী মারা গিয়েছে। ক্ষমা কর আমার ভাইয়েরা, ক্ষমা কর। পৃথিবীর বহু দেশ আছে যার মোট জনসংখ্যাই দশ বা পনেরো লক্ষ। আর এক কোটি মানব এই বাংলা থেকে শুধু গৃহহারা হয়েছিলেন। তবু বলি ভাইয়েরা, আইন-শৃঙ্খলা তোমাদের হাতে নিও না। মুক্তিবাহিনী যুবকরা তোমরা আমার প্রণাম নাও।

ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক, কর্মচারী, হিন্দু, মুসলমান, ভারতীয় জওয়ান তোমাদের সকলকে ধন্যবাদ। যেসব পুলিশ, ইপিআর, যারা মা-বোন গৃহ সব ত্যাগ করে সংগ্রামে সামিল হয়েছিলেন, যাদের অনেকের মা-বোনকে ওরা ধরে নিয়ে ক্যান্টমেন্টে বন্দি করে রেখেছিল তাদের সকলকে ধন্যবাদ। বাংলার মানুষ মুক্ত হাওয়ায় বাস করবে, ভাত খাবে, সুখে থাকবে এই আমার জীবনের সাধ। এই আশীর্বাদ আমাকে করবেন।

আপনারা প্রাণ দিয়েছিলেন। বলেছেন, মুজিব ভাই বলে দিয়েছেন দেশকে স্বাধীন কর, জান দাও আপনারা জান দিয়েছেন। আল্লা আছেন তাই আমি আপনাদের কাছে ফিরে এসেছি। আমি জানি, আমার সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে কি কষ্ট আপনারা করেছেন।

নয় মাস কোনো কাগজ পাই নাই। কারাগারে আমাকে জানতে দেওয়া হয়নি এখানে কি কষ্ট, কি লাঞ্ছনা। আসার আগে ভুট্টো সাহেব আমাকে বলেছিলেন, শেখ সাব, দেখুন, দুই অংশে কোনো বাঁধন রাখা যদি সম্ভব হয়।

আমি বললাম, ভুট্টো সাহেব, তোমরা সুখে থাকো। কিন্তু বাঁধন টুঁটে গেছে, আর না। তোমাদের সঙ্গে সব শেষ।

ভাইয়েরা আমার চার লক্ষ বাঙালি এখনো পশ্চিম পাকিস্তানে। আপনাদের অনুমতি নিয়ে একটি দাবি আমি রাখতে চাই– রাষ্ট্রসংঘ অথবা আন্তর্জাতিক কোনো সংস্থা থেকে ইনকোয়ারি করতে হবে– কিভাবে পশ্চিম পাকিস্তানিরা আমাদের করেছে। আমি রাষ্ট্রসংঘের আছে এই দাবি রাখতে চাই।

ভাইয়েরা আমার, জানি ষড়যন্ত্র শেষ হয় নাই। সাবধান করে দিচ্ছি– কেউ সে চেষ্টা করো না। সেদিন এই ময়দানের সভায় বলেছিলাম, ঘরে ঘরে দুর্গ তৈরি কর। আজ বলি– ঠিক থাকো, এক থাকো। স্বাধীন হয়েছি; স্বাধীনই থাকবো। ইনশাল্লাহ।

আজ আমি বক্তৃতা করতে পারছি না। আপনারা আমাকে দোয়া করুন। সাবাই মিলে মোনাজাত করুন।

ভারত-বাংলাদেশ ভাই ভাই। শহীদের স্মৃতি অমর হোক।

জয়বাংলা'

১১ জানুয়ারি রাতে বাংলাদেশ অস্থায়ী শাসনতান্ত্রিক আদেশের পূর্ব বিবরণ

'যেহেতু ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা নির্দেশ বলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ পরিচালনা উদ্দেশ্যে অস্থায়ী ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হয়েছিল এবং যেহেতু উক্ত ঘোষণা বলে রাষ্ট্রপ্রধান সকল প্রশাসনিক ও সাংবিধানিক কর্তৃক এবং একজন প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগের ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন এবং যেহেতু উপরোক্ত ঘোষণার উল্লেখিত অন্যায় ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক যুদ্ধের অবসান ঘটিয়েছেন;

'এবং যেহেতু বাংলাদেশের জনগণের অভিব্যক্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা এই যে, দেশে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র বিরাজ করিবে;

'এবং যেহেতু উক্ত লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া উপরোক্ত মর্মে অবিলম্বে কতিপয় ব্যবস্থা জরুরি হইয়া পড়িয়াছে;

'এখন সেমতে, ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল তারিখের স্বাধীনতা ঘোষণা নির্দেশ মোতাবেক এবং উক্ত মর্মে তিনি অন্য সকল ক্ষমতাপ্রাপ্ত হওয়াতে রাষ্ট্রপ্রধান নিম্নলিখিত নির্দেশ জারি করিতেছেন :

(১) এই আদেশ বাংলাদেশের অস্থায়ী শাসনতান্ত্রিক আদেশ ১৯৭২ বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকরী হইবে।

(৪) সংজ্ঞা।

এই আদেশ 'গণপরিষদ' বলিতে ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর, ১৯৭১ সালের জানুয়ারি ও মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচনে নির্বাচিত এবং অন্য কোনোভাবে অযোগ্য ঘোষিত নহেন এরূপ গণপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত সংস্থা বোঝাইবে।

(৫) প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে।

(৬) প্রধানমন্ত্রীর সহিত পরামর্শক্রমে প্রেসিডেন্ট তাঁহার যাবতীয় কার্য সম্পাদন করিবেন।

(৭) প্রেসিডেন্ট গণপরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন একজন সদস্যকে

প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করিবেন। প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া অন্যান্য মন্ত্রী, স্টেট মন্ত্রী ও ডেপুটি মন্ত্রী নিয়োগ করিবেন।

(৮) গণপরিষদ কর্তৃক শাসনতন্ত্র প্রণীত হওয়ার পূর্বে প্রেসিডেন্টের পদ শূন্য হইলে মন্ত্রিসভা বাংলাদেশের একজন নাগরিককে প্রেসিডেন্ট নিয়োগ করিবে। গণপরিষদ কর্তৃক প্রণীত শাসনতন্ত্র অনুযায়ী অপর একজন প্রেসিডেন্ট দায়িত্ব গ্রহণ না করা পর্যন্ত তিনি প্রেসিডেন্ট বহাল থাকিবেন।

(৯) বাংলাদেশে একটি হাইকোর্ট থাকিবে। হাইকোর্টে একজন প্রধান বিচারপতি ও আরো কয়েকজন বিচারপতি থাকিবেন। অন্যান্য বিচারপতিকে সময়ে সময়ে নিয়োগ করা হইবে।

(১০) বাংলাদেশ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি প্রেসিডেন্টকে এবং প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রী, অন্যান্য মন্ত্রী, স্টেট মন্ত্রী ও ডেপুটি মন্ত্রীদের শপথ গ্রহণ করাইবেন। শপথ গ্রহণ পদ্ধতি মন্ত্রিসভা নির্ধারণ করিবে।'

বাংলাদেশের সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ

বাংলাদেশ বিশ্বে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্থান গ্রহণ করেছে। এই আরব্ধ লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য লাখ লাখ লোককে প্রাণ দিতে হয়েছে, সব শ্রেণীর লোককে চরম দুঃখ-কষ্ট ভোগ এবং নির্মম আত্মত্যাগ করতে হয়েছে। আমি প্রাণদানকারী সেই লাখ লাখ শহীদের স্মৃতিকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি এবং সালাম জানাচ্ছি সেই সমস্ত তরুণ ও বৃদ্ধ বীরদের, কৃষক ও শ্রমিক, ছাত্র ও সরকারি এবং বিশেষ করে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর বীর সন্তানদের, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, সাবেক ইপিআর, সাবেক আনসার, সাবেক মোজাহিদ, পুলিশ মুক্তিবাহিনীর সবাইকে যারা অত্যাচারীকে প্রতিরোধ করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন।

পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বরতা আমাদের দেশকে পুরোপুরি বিধ্বস্ত করে দিয়ে গেছে। পরিকল্পিত গণহত্যায় পায় ৩০ লাখ লোক নিহত হয়েছে। লাখ লাখ বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে। যাঁরা বেঁচে গেছেন তাঁদের মধ্যে লাখ লাখ লোক উদ্বাস্তু হয়েছেন, প্রাণ বাঁচানোর জন্য, তাঁদের মহিলাদের ইজ্জত রক্ষার জন্য তাঁদের বাড়িঘর ছেড়ে যেতে হয়েছে। যাঁরা রয়ে গেছেন তাঁদেরকে সহ্য করতে হয়েছে অমানুষিক নির্যাতন এবং অনেকেরই সম্পত্তি লুট হয়ে গেছে।

এর ফলে অর্থনীতি এ বিধ্বস্ত অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। সবচেয়ে জরুরি কাজ হচ্ছে অর্থনীতিকে পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যস্ত করা। অর্থনীতিকে অবশ্যই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। খাদ্য, আশ্রয় এবং বস্ত্র অবশ্যই দিতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে অবশ্যই আবার চালু করতে হবে এবং সকল শ্রেণীর লোক যাতে শিক্ষার সুযোগ পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। জরুরি ভিত্তিতে রিলিফ ও পুনর্বাসনের কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

ইয়াহিয়ার বর্বর বাহিনী পেছনে যে ভস্ম রেখে গেছে একেবারে গোড়া থেকেই এক নয়া সমাজ গড়ে তুলতে হবে। বাংলাদেশের জনগণ সর্বদাই তাদের মাটিতে শোষণমুক্ত ন্যায়বিচারপূর্ণ সমাজ কায়েমের জন্য চেষ্টা করেছে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য বাঙালি জনগণকে অত্যন্ত বেশি মূল্য দিতে হয়েছে। আমাদের সম্পদ এবং বাস্তব অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করে কেবল একটি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ করা সম্ভব। একটি নতুন পরিকল্পনা প্রণয়ন সংস্থা নতুন

অর্থনীতির জন্য একটি ব্যাপক শ্বেতপত্র প্রণয়নের কাজ হাতে নিচ্ছে। এই সংস্থা পেশাগত অত্যন্ত যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়ে গঠন করা হয়েছে। এই শ্বেতপত্রে কৃষি, শিল্প ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠাগত পরিবর্তন সাধনে নতুন প্রতিষ্ঠান বৈষয়িক জনসম্পদকে পুরোপুরি কাজে লাগাবার চেষ্টা করবে। তারা সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসমতা কমিয়ে আনার লক্ষ্য সামনে রেখে উৎপাদন আরো বাড়ানোর চেষ্টা করবে।

শ্বেতপত্র প্রণয়নের কাজ দ্রুত শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে কতগুলো কাজ জরুরি ভিত্তিতে হাতে নেয়া হচ্ছে। তার প্রথমটি হলো সাহায্য ও পুনর্বাসন। এ কাজের জন্য একটি ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

দেশ ও বিদেশ থেকে সম্পদ সংগ্রহের অভিযান অবিলম্বে গৃহীত হবে। এ ব্যাপারে নিজস্ব সম্পদ বাড়িয়ে তোলার জন্য আমাদের জরুরি প্রয়োজন বিদেশী সাহায্য। আমি বিশ্বের সব রাষ্ট্র স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষ ও আন্তর্জাতিক মানবিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সর্বক্ষেত্রে বিশেষ করে অতীব প্রয়োজন নিত্যব্যবহার্য পণ্য সরবরাহ বজায় রাখার জন্য আমাদেরকে উদারভাবে সাহায্য করার আবেদন জানাচ্ছি।

যেসব স্বাধীনতাপ্রিয় রাষ্ট্র আমাদের মুক্তিসংগ্রামে নৈতিক ও বৈষয়িক বৃদ্ধি জুগিয়েছে, আমি সেসব রাষ্ট্রের প্রতি আমার ও বাংলাদেশের জনগণের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমাদের মুক্তি সংগ্রামকে সর্বাত্মকভাবে সমর্থন করায় আমি ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী। তাঁর সরকার ও মহান জনগণকে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। অনুরূপভাবে আমি আমাদের সংগ্রামকে সমর্থন জাতিসংঘে অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করায় সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার জনগণকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমি পোল্যান্ড, বুলগেরিয়া ও অন্যান্য পূর্ব ইউরোপীয় দেশ এবং ফ্রান্স ও ব্রিটেনের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমাদের সংগ্রাম সমর্থন করায় আমি যুক্তরাষ্ট্রসহ সারা বিশ্বের স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষ, সংবাদপত্র ও নেতৃবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ায় ভারত, ভুটান, পূর্ব জার্মানি, বুলগেরিয়া, পোল্যান্ড, মঙ্গোলিয়া ও বর্মাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বাংলাদেশের মানুষ এশিয়া, আফ্রিকা, লাটিন আমেরিকাসহ সারাবিশ্বের মুক্তিসংগ্রামকে সব সময়েই সমর্থন করে আসছে। কাজেই আমি আশা করি, সারা বিশ্বের সব দেশ, বিশেষ করে যারা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছে, তারা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান এবং জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদকে সমর্থন করবে। পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের প্রশ্নে আমি আশা করি যে, জনাব ভুট্টো স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের বাস্তবতা মেনে নেবেন।

আমি আশা করি, গণপ্রজাতন্ত্রী চীন আমাদের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের বীরোচিত সাফল্যকে স্বীকৃতি দেবে। কারণ চীনও যুদ্ধবাজ ও ঔপনিবেশিক শোষকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছে। আমি আশা করি পারস্পরিক সহযোগিতার একটি ভিত্তি যাতে প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে সেই উদ্দেশ্যে স্বাধীন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের বাস্তবতা স্বীকার করে নেয়ার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী চীনও এগিয়ে আসবে।

জনগণ যাতে জাতিগঠনমূলক কাজ শুরু করতে পারে তার জন্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার একটি কাঠামোর আবশ্যকতার সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ সচেতন। পাকিস্তানি বাহিনীর নিষ্ঠুরতায় নির্যাতিত ও তাদের স্থানীয় দালালদের মধ্যে এই মুহূর্তে তিক্ততা সৃষ্টি হওয়াটা স্বাভাবিক। এতদসত্ত্বেও তারা যে সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছে, তা খুবই প্রশংসনীয়। আমি আমাদের জনগণকে আশ্বাস দিচ্ছি যে, নৃশংসতার জন্য দায়ী ও তাদের দালালদের শাস্তি দেয়া হবে। সেই সঙ্গে একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, আমাদের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের অন্যতম মূল লক্ষ্য হলো আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং মৌলিক মানবিক অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাভাজন হওয়া। দুষ্কৃতিকারীদের আইন মোতাবেক যথোপযুক্ত শাস্তি দেয়া হবে। আইন তার গতিধারায় চলবে। কাজেই আমি সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধৈর্য ধারণের আবেদন জানাচ্ছি। আমি হাইকোর্ট ও অধঃস্তন আদালতগুলো যাতে কাজ শুরু করতে পারেন তা নিশ্চিত করার জন্য আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করবো। আমি এ ব্যাপারে সুনিশ্চিত করে দিতে চাই যে, দুর্নীতি ও কালোবাজারি উচ্ছেদ করার প্রেক্ষিতে বিচারব্যবস্থার কতগুলো মৌলিক ত্রুটি সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। প্রশাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথকীকরণের নীতি সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করা হবে।

আমরা সাহায্য, পুনর্বাসন ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জরুরি কাজ শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের খসড়া শাসনতন্ত্র পেশ করবার জন্য গণপরিষদের অধিবেশন ডাকার ব্যাপারে প্রয়োজনের চাইতে এক মুহূর্তও বিলম্ব করবো না।

শাসনতন্ত্রের খসড়া প্রণয়নের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে।

আমাদের ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ জনগণের শক্তি জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে গৌরবজনক অধ্যায়ের সংযোজন করেছে। আমাদের জনগণকে দারিদ্র্য, ক্ষুধা, রোগ নিরক্ষরতা এবং সব রকম শোষণ থেকে মুক্ত করার জন্য আজকে জনগণের সেই সেই শক্তি ও ক্ষমতাকে অবশ্যই কাজে লাগাতে হবে। আমি বিশ্বাস করি যে, জনগণ আমার দল ও আমাকে যে সর্বাত্মক সমর্থন দিয়েছে, তাই নিয়ে আমরা আমাদের অসংখ্য সমস্যা কাটিয়ে শোষণমুক্ত একটি সমাজ গঠনের ভিত্তি রচনা করতে সক্ষম হবো— যে সমাজের জন্য লাখ লাখ মানুষ জীবন বিসর্জন দিয়েছে এবং আরো অসংখ্য লোক অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করছে।

জয় বাংলা।

১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণ

[১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীনতা দিবসে জাতীয়করণের নীতি ঘোষণা উপলক্ষে বেতার-টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশে বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে ভাষণ দান করেন, তার পূর্ণ বিবরণ প্রদত্ত হলো।]

আমার প্রাণপ্রিয় বীর বাঙালি ভাই-বোনেরা, আমরা আজ স্বাধীনতার প্রথম বর্ষপূর্তি উৎসব পালন করছি। এই মহান দিনে স্বাধীনতা অর্জনের পথে যে লক্ষ লক্ষ বীর শহীদ হয়েছেন তাঁদের জন্য গভীর বেদনাপ্লুত মন নিয়ে আমার শোকাতুর দেশবাসীর সাথে পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালার দরবারে মাগফিরাত কামনা করছি। সেই সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামে গৌরবোজ্জ্বল ও অন্যান্য ভূমিকা পালনের জন্য আমি মুক্তিবাহিনীর সকল অঙ্গ দল তথা বাংলাদেশ রাইফেলস্, পুলিশ, বেঙ্গল রেজিমেন্ট, সশস্ত্র বাহিনীর দেশপ্রেমিক সদস্যবৃন্দ, নির্ভীক যুবক, ছাত্র-কৃষক-মজদুর-বুদ্ধিজীবী আর আমার সংগ্রামী জনসাধারণকে অভিনন্দন জানাই। তাঁদের বলিষ্ঠ ভূমিকা ও একনিষ্ঠ আত্মদান অনাগতকালের ভাবি বাঙালিদের জন্য প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। আমাদের মুক্তি সংগ্রামের অভিজ্ঞতা বিশ্বব্যাপী ঔপনিবেশিকতা ও সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত মুক্তিপাগল জনতার চেতনাকে উদ্ভাবিসত করবে।

আমার প্রিয় দেশবাসী, বিগত ২৫ বছর ধরে আপনারা ক্ষুধা, বঞ্চনা, অশিক্ষা এবং মৃত্যুর বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। সাম্রাজ্যবাদী শোষকরা আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে একটা নিকৃষ্টতম উপনিবেশে পরিণত করেছিল। দুঃসহ ও ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে আমরা দিন কাটাচ্ছিলাম শোষণের জগদ্দল পাথরের নিচে চাপা পড়ে। দারিদ্র্যের ও অনাহারের বিষবাষ্পে যখন আমরা আকণ্ঠ নিমজ্জিত, তখন তদানীন্তন পাকিস্তানি শাসকরা আমাদের কষ্টার্জিত ৩ হাজার কোটি টাকার সম্পদ লুটে নিয়ে তাদের পশ্চিম পাকিস্তানকে গড়ে তোলার কাজে মত্ত ছিল। ন্যায়বিচার দাবি করায় মৃত্যুর হিমশীতল স্পর্শ আমাদের ওপর নেমে এসেছিল। সমসাময়িককালে নিষ্ঠুরতম স্বাধীনতাযুদ্ধে আমাদের ৩০ লক্ষ লোক প্রাণ দিয়েছে, আর ৩ কোটি মানুষ সর্বস্বান্ত। এসব কিছুই ঘটেছে আমাদের স্বাধীনতার জন্য। আজ আমি যখন আমার সোনার বাংলার দিকে তাকাই, তখন দেখতে পাই যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ধূসর পাণ্ডুর জমি, ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রাম, ক্ষুধার্ত শিশু, বিবস্ত্র নারী আর হতাশাগ্রস্ত পুরুষ। আমি শুনতে পাই সন্তানহারা মায়ের আর্তনাদ, নির্যাতিত নারীর ক্রন্দন ও পঙ্গু

মুক্তিযোদ্ধার ফরিয়াদ। আমাদের স্বাধীনতা যদি এদেরকে আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব থেকে উদ্ধার করে, এদের মুখে হাসি ফোটাতে না পারে, লাখ লাখ ক্ষুধার্ত শিশুর মুখে তুলে দিতে না পারে এক মুষ্টি অন্ন, মুছে দিতে না পারে মায়ের অশ্রু ও বোনের বেদনা, তা'হলে সে স্বাধীনতা মিথ্যা, সে আত্মত্যাগ বৃথা। আমাদের এই কষ্টার্জিত স্বাধীনতার বর্ষপূর্তি উৎসবের লগ্নে দাঁড়িয়ে, আসুন আজ আমরা এই শপথ গ্রহণ করি, বিধ্বস্ত মুক্ত বাংলাদেশকে আমরা গড়ে তুলবো। গুটিকয়েক সুবিধাবাদী নয়, সাড়ে ৭ কোটি মানুষ তার ফল ভোগ করবে। আমি ভবিষ্যৎ বংশধরদের সুখী ও উন্নততর জীবন প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

আজ আমাদের সামনে পর্বততুল্য সমস্যা উপস্থিত। মহা সঙ্কটের ক্রান্তিলগ্নে আমরা উপস্থিত হয়েছি। বিদেশফেরত ১ কোটি উদ্বাস্তু, স্বদেশের বুকে ২ কোটি গৃহহারা মানুষ, বিধ্বস্ত কর্মহীন চালনা-চট্টগ্রাম পোতাশ্রয়, নিশ্চল কারখানা, নির্বাপিত বিদ্যুৎ সরবরাহ, অসংখ্য বেকার, অপরিমিত অরাজকতা, বিশৃঙ্খল বাণিজ্যিক সরবরাহ ব্যবস্থা, ভগ্ন সড়ক, সেতু ও বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা, দারিদ্র্য, খাদ্যাভাব, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি এবং অকর্ষিত ভূমি—এসবকিছুই আমরা পেয়েছি উত্তরাধিকার সূত্রে। জনগণের গভীর ভালোবাসা, আস্থা, অদম্য সাহস ও অতুলনীয় ঐক্য— এগুলোকে সম্বল করেই আমার সরকার এই মহাসঙ্কট কাটিয়ে উঠার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে।

আমি আশা করবো, অতীতে আপনারা যেভাবে দুর্জয় সাহসে বুক বেঁধে ইয়াহিয়ার সামরিক যন্ত্রকে পরাভূত করেছিলেন, গভীর প্রত্যয় ও সাহস নিয়ে তেমনি বর্তমান সঙ্কটের মোকাবিলা করবেন। আমরা পুরাতন আমলের জীর্ণ ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে নতুন সমাজ গড়ে তুলবো।

ভাই ও বোনেরা, আপনারা জানেন হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী আমাদের বাংলাদেশ রাইফেলস্ ও পুলিশে বিপুল সদস্যকে হত্যা করেছে। আইনের শাসন কায়েম ও শান্তি রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সংগঠনের অবাব বিপ্লবী বাংলাদেশ সরকারের এক বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নতুন নিযুক্তির মাধ্যমে আমরা পুলিশ বিভাগকে সংগঠিত করেছি এবং ইতিমধ্যে যে সকল সমাজবিরোধী দুষ্কৃতকারী স্বাধীনতা-উত্তর সুযোগ-সুবিধাদির অপব্যবহারে লিপ্ত হয়েছিল, তাদের দমন করে জনসাধারণের মনে নিরাপত্তাবোধ ফিরিয়ে আনার কাজে হাত দেয়া হয়েছে। উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা পেয়েছিলাম স্বাধীন জাতির জন্য সম্পূর্ণ অনুপযোগী একটি প্রাদেশিক প্রশাসনিক কাঠামো। এর কিছু কিছু আমলা ঔপনিবেশিক মানসিকতা কাটিয়ে উঠতে পারছিল না। তারা এখনো বনেদী আমলাতান্ত্রিক মনোভাব প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে। আমরা তাদের স্বাধীন জাতীয় সরকারের অর্থ অনুধাবনের জন্য উপদেশ দিচ্ছি এবং আশা করছি, তাদের পশ্চাৎমুখী দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটবে। আমার সরকার নব রাষ্ট্র এবং নতুন সমাজের উপযোগী করে সমগ্র প্রশাসন যন্ত্রকে পুনর্গঠিত করবে। প্রস্তাবিত প্রশাসনিক কাঠামোতে জনগণ ও সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে নৈকট্য

সৃষ্টির পূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। আমরা বাংলাদেশের সমগ্র মহকুমাগুলোকে জেলা পর্যায়ে উন্নীত করার পরিকল্পনা তৈরি করছি।

বিশেষজ্ঞরা খসড়া শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। তাঁদের কাজ অনেকটা অগ্রসর হয়েছে এবং খসড়া শাসনতন্ত্র গণপরিষদের সামনে পেশ করা হবে। এই শাসনতন্ত্রের মূল স্তম্ভ হবে জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। ৫৪টি বন্ধু রাষ্ট্র এ পর্যন্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। বিপুলসংখ্যক বন্ধু রাষ্ট্রের এই স্বীকৃতিদান রাষ্ট্রপুঞ্জের অন্যান্য সদস্যকে বাংলাদেশের বাস্তবতাকে মেনে নেয়ার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করবে।

উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন ও অর্থনীতিকে পুনর্গঠনের জন্য আমরা বন্ধু রাষ্ট্রগুলোর কাছ থেকে উদার সাহায্য ও সহযোগিতা প্রত্যাশা করছি। বিশেষ করে ভারত আমাদের সুদিন ও দুর্দিনের প্রতিবেশী। সম্প্রতি মহান ভারতের মহান নেত্রী প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশ সফর করে গেছেন। এই শুভেচ্ছা সফরের প্রাক্কালে আমরা শান্ত, বন্ধুত্ব ও মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছি। এই চুক্তি দুই দেশের মেহনতি মানুষের শুভেচ্ছা, সহযোগিতা, বন্ধুত্ব এবং সংহতি বন্ধনকে মজবুত করবে। সোভিয়েত রাশিয়া আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের দুর্যোগময় মুহূর্তে পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। আমি সোভিয়েত রাশিয়া সফর করে এসেছি। সেখানে তাদের অকৃত্রিম অতিথেয়তা আমাকে মুগ্ধ করেছে। সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনের কাজে সার্বিক সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আমি পূর্ব ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রপুঞ্জ, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, জাপান, স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলো এবং অন্য বন্ধু রাষ্ট্রসমূহ যাঁরা আমাদের দিকে সাহায্যের হাত নিয়ে এগিয়ে এসেছেন তাঁদের কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। আমাদের পররাষ্ট্রনীতি জোটবহির্ভূত ও সক্রিয় নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে রচিত। বৃহৎ শক্তির আন্তর্জাতিক সংঘাতের বাইরে আমরা শান্তিকামী। আমরা শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান নীতিতে বিশ্বাসী এবং প্রতিবেশীর সাথে সদ্ভাব সৃষ্টিতে আগ্রহী। দেশ গড়ার কাজে কেউ আমাদের সাহায্য করতে চাইলে তা আমরা গ্রহণ করবো। কিন্তু সে সাহায্য অবশ্যই হতে হবে নিষ্কণ্টক ও শর্তহীন। আমরা জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও সব জাতির সমমর্যাদার নীতিতে আস্থাশীল। আমাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কেউ হস্তক্ষেপ করবেন না— এটাই আমাদের কামনা।

দুর্ভাগ্যক্রমে পাকিস্তানের শাসকরা বাংলাদেশের বাস্তবতাকে মেনে নিচ্ছেন না। তারা ৫ লাখ নিরীহ বাঙালিকে সন্ত্রাস ও দুর্দশার মধ্যে আটকে রেখেছেন। আমি বিশ্বব্যাপী বিবেকসম্পন্ন মানুষ, বিশেষ করে মি. ভুট্টোর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, তাঁদের ফিরিয়ে দেয়া হোক। এই ইস্যুকে কোনোক্রমেই যুদ্ধবন্দিদের সমপর্যায়ে ভাবা চলবে না। কারণ তাদের মধ্যে এমন অনেকে আছে যারা শতাব্দীর নৃশংসতম হত্যা অপরাধে অপরাধী। তারা মানবিকতাকে লঙ্ঘন করছে এবং আন্তর্জাতিক নীতিমালার ভিত্তিতে তাদের বিচার হবে। পাকিস্তানের সংবেদনশীল সাধারণ মানুষের কাছে আমার

আবেদন— নুরেমবার্গ মামলার আসামিদের থেকেও নিকৃষ্ট ধরনের এই অপরাধীদের তারা স্বজাতি বলে ডাকবেন না।

যারা উদ্বাস্তু হয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল তারা দেশে ফিরে এসেছে। সাহায্য, পুনর্গঠন ও পুনর্বাসনের জন্য আমরা কার্যকর কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। বিনামূল্যে ও ন্যায্যমূল্যে খাদ্য সরবরাহের জন্য কিছুটা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ছিন্নমূল মানুষের মাথা গুঁজবার ঠাঁই করে দেয়ার জন্য অস্থায়ী বাসগৃহ তৈরির কাজে হাত দেয়া হয়েছে। বিধবা, অনাথ ও নির্যাতিতা মহিলাদের পুনর্বাসন পরিকল্পনাকে সরকার অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিবেচনা করছেন। হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী যেভাবে বাংলাদেশকে ধ্বংস করে গেছে তাতে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা পুনরুদ্ধার করতে ১০ বছর সময় দরকার। আমাদের বিপ্লবী সরকার আশা করছে ৩ বছর সময়ের মধ্যে এ কাজ সমাধা করবে।

বিপুল খাদ্য ঘাটতি আমাদের জন্য এক দুঃসহ অভিশাপ। কিন্তু আমি কাউকে না খেয়ে মরতে দিতে চাই না। আগামী জুলাই মাসের মধ্যে আশা করি ১০ লাখ টন খাদ্যশস্য বিদেশ থেকে আনতে পারবো। ডিসেম্বরের মধ্যে আরো ১০ লাখ টন আমদানি করা যেতে পারে। সামনের কয়েক সপ্তাহ আমাদের জন্য গোর দুর্দিন। আমার প্রাণপ্রিয় দেশবাসী— আপনারা ধৈর্য ধারণ করুন, উচ্চতম অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে খাদ্য ঘাটতি পূরণের চেষ্টা করা হবে। এ প্রসঙ্গে আমি মজুতদার, চোরাকারবারি ও গুজববিলাসীদের হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি তারা যেন নিরন্ন মানুষের মুখের রুটি নিয়ে ছিনিমিনি না খেলে— তাদের কঠোর হস্তে দমন করা হবে।

আমার সরকার অভ্যন্তরীণ সমাজ বিপ্লবে বিশ্বাসী। পুরাতন সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে হবে। অবাস্তব তাত্ত্বিকতা নয়, আমার সরকার ও পার্টি বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রবর্তনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। দেশের বাস্তব প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে পুরাতন সামাজিক কাঠামোকে ভেঙে দিয়ে নতুন সমাজ গড়তে হবে। শোষণ ও অবিচারমুক্ত নতুন সমাজ আমরা গড়ে তুলব এবং জাতির এই মহাক্রান্তিলগ্নে সম্পদের সামাজিকীকরণের পর্যায়ক্রমিক কর্মসূচি শুভ সূচনা হিসেবে আমার সরকার উল্লিখিত বিষয়গুলো জাতীয়করণ করেছে। ১. ব্যাংকসমূহ (বিদেশী ব্যাংকের শাখাগুলো বাদে), ২. সাধারণ ও জীবন বীমা কোম্পানিসহ (বিদেশী বীমা কোম্পানির শাখাসমূহ বাদে), ৩. সকল পাটকল, ৪. সকল বস্ত্র ও সুতাকল, ৫. সকল চিনিকল, ৬. অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় নৌ-বানের বৃহদাংশ, ৭. ১৫ লাখ টাকা মূল্যের তদূর্ধ্ব সকল পরিত্যক্ত ও অনুপস্থিত মালিকানাভুক্ত সম্পত্তি, ৮. বাংলাদেশ বিমান ও বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনকে সরকারি সংস্থা হিসাবে স্থাপন করা হয়েছে এবং ৯. সমগ্র বহির্বাণিজ্য রাষ্ট্রীয়করণের লক্ষ্য নিয়ে সাময়িকভাবে বহির্বাণিজ্যের বৃহদাংশকে এই মুহূর্তে ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। দেশে ও বিদেশে অবস্থানরত বাঙালি প্রতিভাবান ব্যক্তিদের আমি দেশ গড়ার কাজে এগিয়ে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। সরকারি সেক্টরে কাজ করার জন্য তাদের পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা দেয়া হবে।

শিগগিরই যে শিল্পনীতি ঘোষণা করা হচ্ছে, তাতে এসব ব্যবস্থা সম্পর্কে বলা হবে। যে সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে বাঙালিদের মালিকানার স্বার্থ সরাসরি জড়িত, সে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সাবেক মালিক অথবা প্রধান কর্মকর্তাদের প্রতি আমি আহ্বান জানাচ্ছি যে, তাঁরা যেন আমাদের অবশ্যই স্বীকার করে নেন, আমরা যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করছি, সেগুলো সবদিক থেকে বিপ্লবাত্মক এবং জনসাধারণকে অবশ্যই এসব ক্ষেত্রে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে। বেসরকারি ক্ষেত্রে মাজারি ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে আমাদের নীতির সুনির্দিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের মালিকদের সরকারি নীতির কাঠামোর মধ্য থেকে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের কাজ ন্যায্যভাবে চালানোর জন্য উৎসাহ দেয়া হবে।

আমি এমন এক নীতিনির্ধারণ করতে চাই, যাতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় অংশ নিতে পারবেন। এই বলিষ্ঠ শ্রেণীর কর্তব্যবোধের ওপর আমরা অনেকখানি নির্ভর করছি। শ্রম ও পুঁজির মধ্যে আবহমানকাল ধরে যে পরস্পরবিরোধিতা রয়েছে, তা আমাদের নতুন নীতি গ্রহণের ফলে বাংলাদেশ থেকে অনেকখানি বিলুপ্ত হবে। শ্রমিক-কর্মচারীকে আর সর্বদা মালিকের সাথে বিরোধে লিপ্ত থাকতে হবে না। কেননা, বর্তমানে তাদের মালিক হলো সাড়ে ৭ কোটি মানুষ যারা মালিক ও ম্যানেজারদের হাতে বিশ্বাস করে নিজেদের সম্পত্তি জমা রেখেছে।

আমি খুব শিগগিরই শ্রমিক প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সভা করছি। সেই সভায় শ্রমিক সংক্রান্ত সরকারি নীতি এবং আমাদের বিপ্লবী নীতিসমূহ বাস্তবায়িত করতে তাদের যে পূর্ণ সহযোগিতা লাগবে সে বিষয়ে আলোচনা করা হবে। এ ব্যাপারে পূর্ণ মতৈক্যে পৌঁছানোর পরে আমি আশা করবো যে, শ্রমিক নেতারা আমার সরকার ও আমার সাথে একযোগে কাজ করবেন এবং এই বিপ্লবী নীতিসমূহ সরাসরি শিল্প এলাকায় কার্যকর করবেন। তদুপরি শ্রমিকদের গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে।

বাস্তবায়িত করার জন্য তাদের কাজ করে যেতে থাকে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় বিপ্লব সাধনের উদ্দেশ্যে একটি পরিকল্পনা তৈরির নির্দেশসহ আমি একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করতে চলেছি।

আমাদের চাষীরা হলো সবচেয়ে দুঃখী ও নির্যাতিত শ্রেণী এবং তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য আমাদের উদ্যোগের বিরাট অংশ অবশ্যই তাদের পেছনে নিয়োজিত করতে হবে। সম্পদের স্বল্পতা সত্ত্বেও আমরা চাষীদের স্বল্পমেয়াদি সাহায্য দানের জন্য ইতিমধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। ২৫ বিঘার কম জমি যাদের আছে তাদের খাজনা চিরদিনের জন্য মওকুফ করা হয়েছে। ইতিপূর্বে সমস্ত বকেয়া খাজনা মাফ করা হয়েছে। তাকাবি ঋণ বাবদ ১০ কোটি টাকা বিতরণ করা হচ্ছে এবং ১৬ কোটি টাকা টেস্ট রিলিফ হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে। লবণের ওপর থেকে কর তুলে দেয়া হয়েছে।

সারা বছর ধরে সেচের কাজ চালানো, উন্নতমানের বীজ বপন, সার, কীটনাশক এবং প্রতিটি চাষীকে পর্যাপ্ত ঋণদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ভূ-মালিকানার ক্ষেত্রে

পশ্চাতের বৈষম্য দূরীকরণের জন্য পারিবারিক ও ব্যক্তিগত মালিকানার পরিধি কমিয়ে এনে পরিবারপিছু ১০০ বিঘায় আনা হয়েছে। ভবিষ্যতে এই উচ্চসীমা আরো কমিয়ে আনা যায় কিনা সেটা বিবেচনা করে দেখা যাবে। ছোট ছোট চাষীকে অবশ্যই উৎপাদনক্ষম করে তুলতে হবে। একথা মনে রেখে আমরা পল্লী এলাকায় সমবায় ব্যবস্থার ভিত্তিতে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করতে চেষ্টা করছি। এর ফলে চাষীরা কেবলমাত্র আধুনিক ব্যবস্থায় সুফলই পাবে না, বরং সমবায়ের মাধ্যমে সহজশর্তে ও দ্রুত ঋণ পাওয়া সম্ভব হবে। এই সাথে আমাদের উদ্দেশ্য হলো ভূমিহীন স্বল্প জমির অধিকারী চাষীদের জন্য ব্যাপক পল্লী পুনর্গঠনের কর্মসূচি গ্রহণ করা। 'কাজ করলে খাদ্য' এই কর্মসূচির অংশ হিসাবে ১ লাখ ৫০ হাজার টন খাদ্যশস্য বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া টেস্ট রিলিফের অধীনে পল্লীর কর্মসংস্থানের জন্য নগদ ১৬ কোটি টাকা দেয়া হয়ে গেছে।

আমরা আমাদের ক্ষুদ্র কুটিরশিল্পকে বেকার সমস্যা সমাধানের উপযোগী করে গড়ে তুলতে চেষ্টা করছি। জনসাধারণের নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজনের চাহিদার সাথে সমন্বয় রেখে এটা গড়ে তোলা হবে। আমাদের কৃষি ও শিল্পোন্নয়নের এটা হবে সহায়ক। এ সরকার নগরভিত্তিক ও গ্রামীণ জীবনের মধ্যকার বৈষম্য সম্পর্কে সচেতন। সেইসব ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ার যাঁরা পাটচাষীদের উপার্জিত অর্থ দিয়ে মানুষ হয়েছেন তাঁদের গ্রামে ফিরে যেতে হবে। আমি ইতিমধ্যে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে গ্রামে কাজ করার জন্য ৫০০ ডাক্তারকে নিযুক্ত করেছি। বাংলাদেশে মানুষে মানুষে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বৈষম্য থাকবে না। সম্পদের বণ্টন ব্যবস্থায় সমতা আনতে হবে এবং উচ্চতর আয় ও নিম্নতম উপার্জনের ক্ষেত্রে যে আকাশচুম্বী বৈষম্য এতদিন ধরে বিরাজ করছিল সেটা দূর করার ব্যবস্থাদি উদ্ভাবনের জন্য আমি একটি বিশেষ কমিটি গঠন করার কথা বিবেচনা করছি। আজ আমরা বিশ্ব সভ্যতার এক ক্রান্তিলগ্নে উপস্থিত। একটি নতুন বিশ্ব গড়ে তোলার স্বপ্নে আমরা বিভোর, একটি সামাজিক বিপ্লব সফল করার প্রতিশ্রুতিতে আমরা অটল, আমাদের সমস্ত নীতি— আমাদের সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টা এ কাজে নিয়োজিত হবে। আমাদের দুস্তর পথ। এ পথ আমাদের অতিক্রম করতেই হবে। আমার প্রিয় দেশবাসী, লক্ষ লক্ষ শহীদের রক্তের লাল আস্তরণে দাঁড়িয়ে আমি আপনাদের কাছে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেবো না। আমি জীবনেও কোনোদিন কাউকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিইনি। শত্রুরা বাংলাদেশের সবকিছু ধ্বংস করে গেছে। কিছুই রেখে যায়নি। কি করে যে এ দেশ চলবে, সত্যিই চিন্তা করলে আমি শিহরিয়া ওঠি।

শ্মশান বাংলাকে আমরা সোনার বাংলা করে গড়ে তুলতে চাই। সে বাংলায় আগামী দিনের মায়েরা হাসবে— শিশুরা খেলবে। আমরা শোষণমুক্ত সমাজ গড়ে তুলব। আপনারা নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে সহযোগিতা করবেন। ক্ষেত-খামার, কলকারখানায় দেশ গড়ার আন্দোলন গড়ে তুলুন। কাজের মাধ্যমে দেশকে নতুন করে গড়া যায়। আসুন, সকলে মিলে সমবেতভাবে আমরা চেষ্টা করি যাতে সোনার বাংলা আবার হাসে, সোনার বাংলাকে আমরা নতুন করে গড়ে তুলতে পারি।

বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ডেভিড ফ্রস্টের সাক্ষাৎকার

(ঢাকা, জানুয়ারি ১৯৭২)

ডেভিড ফ্রস্ট : সে রাতের কথা আপনি বলুন। সেই রাত, যে রাতে একদিকে আপনার সাথে যখন চলছিল আলোচনা এবং সেই আলোচনার আড়ালে পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ার উদ্যোগ নিচ্ছিল, সেই রাতের কথা বলুন। সেই ২৫ মার্চ, রাত আটটা। আপনি আপনার বাড়িতে ছিলেন। সেই বাড়িতেই পাকিস্তান বাহিনী আপনাকে গ্রেপ্তার করেছিল। আমরা শুনছিলাম, টেলিফোনে আপনাকে সাবধান করা হয়েছিল, সামরিক বাহিনী অগ্রসর হতে শুরু করেছে। কিন্তু তবু আপনি আপনার বাড়ি পরিত্যাগ করলেন না। আপনি গ্রেপ্তার হলেন। কেন আপনি নিজের বাড়ি ছেড়ে অপর কোথাও গেলেন না এবং গ্রেপ্তার বরণ করলেন? কেন এই সিদ্ধান্ত? তার কথা বলুন।

শেখ মুজিবুর রহমান : হ্যাঁ, সে এক কাহিনী। তা বলা প্রয়োজন। সে সন্ধ্যায় আমার বাড়ি পাকিস্তান সামরিক জান্তার কমান্ডো বাহিনী ঘেরাও করেছিল। ওরা আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিল। প্রথমে ওরা ভেবেছিল, আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলে ওরা আমায় হত্যা করবে এবং প্রচার করে দেবে যে, তারা যখন আমার সাথে রাজনৈতিক আপসের আলোচনা করছিল, তখন বাংলাদেশের চরমপন্থীরাই আমাকে হত্যা করেছে। আমি বাড়ি থেকে বেরোনো না বেরোনো নিয়ে চিন্তা করলাম। আমি জানতাম, পাকিস্তান বাহিনী এক বর্বর বাহিনী। আমি জানতাম, আমি আত্মগোপন করলে ওরা দেশের সমস্ত মানুষকেই হত্যা করবে। এক হত্যাযজ্ঞ ওরা সমাধা করবে। আমি স্থির করলাম, আমি মরি, তাও ভালো, তবু আমার প্রিয় দেশবাসী রক্ষা পাক।

ডেভিড ফ্রস্ট : আপনি হয়তো কলকাতা চলে যেতে পারতেন।

শেখ মুজিবুর রহমান : আমি ইচ্ছা করলে যে কোনো জায়গায় যেতে পারতাম। কিন্তু আমার দেশবাসীকে পরিত্যাগ করে আমি কেমন করে যাবো? আমি তাদের নেতা। আমি সংগ্রাম করবো। মৃত্যুবরণ করবো। পালিয়ে কেন যাবো? দেশবাসীর কাছে আমার আহ্বান ছিল, তোমরা প্রতিরোধ গড়ে তোলো।

ডেভিড ফ্রস্ট : আপনার সিদ্ধান্ত অবশ্যই সঠিক ছিল। কারণ এ ঘটনাই বিগত নয় মাস ধরে বাংলাদেশের মানুষের কাছে আপনাকে তাদের একটি বিশ্বাসের প্রতীকে

পরিণত করেছে। আপনি এখন তাদের কাছে প্রায় ঈশ্বরবৎ।

শেখ মুজিবুর রহমান : আমি তা বলিনে। কিন্তু এ কথা সত্য, তারা আমাকে ভালোবাসে। আমি আমার বাংলার মানুষকে ভালোবেসেছিলাম। আমি তাদের জীবনকে রক্ষা করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু হানাদার বর্বর বাহিনী আমাকে সে রাতে আমার বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করল। ওরা আমার নিজের বাড়ি ধ্বংস করে দিল। আমার গ্রামের বাড়ি, যেখানে ৯০ বছরের বৃদ্ধ পিতা এবং ৮০ বছরের বৃদ্ধ জননী ছিলেন, সে বাড়িও ধ্বংস করে দিল। ওরা গ্রামে ফৌজ পাঠিয়ে আমার বাবা-মাকে বাড়ি থেকে বিতাড়িত করে তাদের চোখের সামনে সে বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিল? বাবা-মার আর কোনো আশ্রয় রইল না। ওরা সবকিছুই জ্বালিয়ে দিয়েছিল। আমি ভেবেছিলাম, আমাকে পেলে ওরা আমার হতভাগ্য মানুষদের হত্যা করবে না। কিন্তু আমি জানতাম, আমাদের সংগঠনের শক্তি আছে। আমি একটি শক্তিশালী সংগঠনকে জীবনব্যাপী গড়ে তুলেছিলাম। জনগণ তার ভিত্তি। আমি জানতাম, তারা শেষ পর্যন্ত লড়াই করবে। আমি তাদের বলেছিলাম, প্রতি ইঞ্চিতে তোমরা লড়াই করবে। আমি বলেছিলাম, হয়তো এটাই আমার শেষ নির্দেশ। কিন্তু মুক্তি অর্জন না করা পর্যন্ত তাদের লড়াই করতে হবে। লড়াই তাদের চালিয়ে যেতে হবে।

ডেভিড ফ্রস্ট : আপনাকে ওরা ঠিক কিভাবে গ্রেপ্তার করেছিল? তখন তো রাত ১-৩০ ছিল? তাই নয় কি? তখন কি ঘটলো?

শেখ মুজিবুর রহমান : ওরা প্রথমে আমার বাড়ির ওপর মেশিনগানের গুলি চালিয়েছিল।

ডেভিড ফ্রস্ট : ওরা যখন এলো, তখন আপনি বাড়ির কোনখানটাতে ছিলেন?

শেখ মুজিবুর রহমান : এই যেটা দেখছেন, এটা আমার শোবার ঘর। আমি এই শোবার ঘরেই তখন বসেছিলাম। এদিক থেকে ওরা মেশিনগান চালাতে আরম্ভ করে। তারপর এদিক, ওদিক—সবদিক থেকে গুলি ছুড়তে আরম্ভ করে। জানালার ওপর গুলি চালায়।

ডেভিড ফ্রস্ট : এগুলো সব তখন ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল?

শেখ মুজিবুর রহমান : হ্যাঁ, সব ধ্বংস করেছিল। আমি তখন আমার পরিবার-পরিজনদের সাথে ছিলাম। একটা গুলি আমার শোবার ঘরে এসে পড়ে। আমার ছয় বছরের ছোট ছেলেটি বিছানার ওপর তখন শোয়া ছিল। আমার স্ত্রী এই শোবার ঘরে দুটি সন্তান নিয়ে বসেছিলেন।

ডেভিড ফ্রস্ট : পাকিস্তান বাহিনী কোন দিকে দিয়ে ঢুকেছিল?

শেখ মুজিবুর রহমান : সবদিক দিয়ে। ওরা একবার জানালার মধ্য দিয়ে গুলি ছুড়তে শুরু করে। আমি আমার স্ত্রীকে দুটি সন্তানকে নিয়ে বসে থাকতে বলি। তারপর তার কাছ থেকে উঠে আমি বাইরে বেরিয়ে আসি।

ডেভিড ফ্রস্ট : আপনার স্ত্রী কিছু বলেছিলেন?

শেখ মজিবর রহমান : না, কোনো শব্দ উচ্চারণের তখন অবস্থা নয়। আমি শুধু তাকে একটি বিদায় সম্বোধন জানিয়েছিলাম। আমি দুয়ার খুলে বাইরে বেরিয়ে ওদের গুলি বন্ধ করতে বলেছিলাম। আমি বললাম : 'তোমরা গুলি বন্ধ করো। আমি তো এখানে দাঁড়িয়ে আছি। তোমরা গুলি করছো কেন? কী তোমরা চাও?' তখন চারদিক থেকে ওরা আমার দিকে ছুটে এলো, বেয়নেট উদ্যত করে। ওদের একটা অফিসার আমাকে ধরল। ওই অফিসারই বললো : 'এই! ওকে মেরে ফেলো না।'

ডেভিড ফ্রস্ট : একটা অফিসারই ওদের থামিয়েছিল?

শেখ মজিবর রহমান : হ্যাঁ, ঐ অফিসারটি থামিয়েছিল। ওরা তখন আমাকে এখান থেকে টেনে নামালো। ওরা পেছন থেকে আমার গায়ে, পায়ে বন্দুকের কুদো দিয়ে মারতে লাগল। অফিসারটা আমাকে ধরেছিল। তবু ওরা আমাকে ধাক্কা দিয়ে টেনে নামাতে লাগল। আমি বললাম : 'তোমরা আমাকে টানছ কেন? আমি তো যাচ্ছি।' আমি বললাম, 'আমার তামাকের পাইপটা নিতে দাও।' ওরা একটু থামল। আমি উপরে গিয়ে আমার তামাকের পাইপটা নিয়ে এলাম। আমার স্ত্রী তখন দুটি ছেলে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। আমাকে কিছু কাপড়-চোপড়সহ একটি ছোট স্যুটকেস দিলেন। তাই নিয়ে আমি নেমে এলাম। চারদিকে তখন আগুন জ্বলছিল। আজ এই যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, এখান থেকে ওরা আমায় নিয়ে গেল।

ডেভিড ফ্রস্ট : আপনার ৩২নং ধানমন্ডি বাড়ি থেকে সেদিন যখন আপনি বেরিয়ে এলেন, তখন কি ভেবেছিলেন, আর কোনো দিন আপনি এখানে ফিরে আসতে পারবেন?

শেখ মুজিবুর রহমান : না, আমি তা কল্পনা করতে পারিনি। আমি ভেবেছি, এই-ই শেষ। কিন্তু আমার মনের কথা ছিল : আজ আমি যদি আমার দেশের নেতা হিসেবে মাথা উঁচু রেখে মরতে পারি, তাহলে আমার দেশের মানুষের অন্তত লজ্জার কোনো কারণ থাকবে না। কিন্তু আমি ওদের কাছে আত্মসমর্পণ করলে, আমার দেশবাসী পৃথিবীর সামনে আর মুখ তুলে তাকাতে পারবে না। আমি মরি, তাও ভালো। তবু আমার দেশবাসীর যেন মর্যাদার কোনো হানি না ঘটে।

ডেভিড ফ্রস্ট : শেখ সাহেব, আপনি একবার বলেছিলেন : 'যে মানুষ মরতে রাজি, তুমি তাকে মারতে পারো না।' কথাটি কি এমনি ছিল না?

শেখ মুজিবুর রহমান : হ্যাঁ, আমি তাই মনে করি। যে মানুষ মরতে রাজি, তাকে কেউ মারতে পারে না। আপনি একজন মানুষকে হত্যা করতে পারেন। সে তো তার দেহ। কিন্তু তার আত্মাকে কি আপনি হত্যা করতে পারেন? না, তা কেউ পারে না। এটাই আমার বিশ্বাস। আমি একজন মুসলমান এবং একজন মুসলমান একবারই মরে, দু'বার নয়। আমি মানুষ। আমি মনুষ্যত্বকে ভালোবাসি। আমি আমার জাতির নেতা। আমি আমার দেশের মানুষকে ভালোবাসি। আজ তাদের কাছে আমার আর কিছু দাবি নেই। তারা আমাকে ভালোবেসেছে। সবকিছুকে বিসর্জন দিয়েছে। কারণ, আমি আমার সবকিছুকে তাদের জন্য দিবার অঙ্গীকার করেছি। আজ আমি তাদের মুখে হাসি দেখতে

চাই। আমি যখন আমার প্রতি দেশবাসীর স্নেহ-ভালোবাসার কথা ভাবি, তখন আমি আবেগে আপ্লুত হয়ে যাই।

ডেভিড ফ্রস্ট : পাকিস্তান বাহিনী আপনার বাড়ির সবকিছু লুট করে নিয়েছিল?

শেখ মুজিবুর রহমান : হ্যাঁ, আমার সবকিছুই ওরা লুট করেছে। আমার ঘরের বিছানাপত্র, আলমারি, কাপড়-চোপড়—সবকিছুই লুণ্ঠিত হয়েছে। মি. ফ্রস্ট, আপনি দেখতে পাচ্ছেন, এ বাড়ির কোনো কিছুই আজ নেই।

ডেভিড ফ্রস্ট : আপনার বাড়ি যখন মেরামত হয়, তখন এসব জিনিস লুণ্ঠিত হয়েছে, না পাকিস্তানিরা সব লুণ্ঠন করেছে?

শেখ মুজিবুর রহমান : পাকিস্তানি ফৌজ আমার সবকিছু লুণ্ঠন করেছে। কিন্তু এ বর্বর বাহিনী আমার আসবাবপত্র, কাপড়-চোপড়, আমার সন্তানদের দ্রব্যসামগ্রী লুণ্ঠন করেছে, তাতে আমার দুঃখ নেই। আমার দুঃখ ওরা আমার জীবনের ইতিহাসকে লুণ্ঠন করেছে। আমার ৩৫ বছরের রাজনৈতিক জীবনের দিনলিপি ছিল। আমার একটি সুন্দর লাইব্রেরি ছিল। বর্বররা আমার প্রত্যেকটি বই আর মূল্যবান দলিলপত্র লুণ্ঠন করেছে। সবকিছুই পাকিস্তান হানাদার বাহিনী নিয়ে গেছে।

ডেভিড ফ্রস্ট : তাই আবার সেই প্রশ্নটা আমাদের সামনে আসে—কেন সবকিছু লুণ্ঠন করলো?

শেখ মুজিবুর রহমান : এর কি জবাব দেবো? আসলে ওরা মানুষ নয়। কতগুলো ঠগ, দস্যু, উন্মাদ, অমানুষ আর অসভ্য জানোয়ার। আমার নিজের কথা ছেড়ে দিন। তা নিয়ে আমার কোনো ক্ষোভ নেই। কিন্তু ভেবে দেখুন, ২ বছর, ৫ বছরের শিশু, মেয়েরা—কেউ রেহাই পেল না। সব নিরীহ মানুষকে ওরা হত্যা করেছে। আমি আপনাকে দেখিয়েছি সব জ্বালিয়ে দেয়া, পোড়া বাড়ি, বস্তি। একেবারে গরিব, না-খাওয়া মানুষ সব বাস করতো এই বস্তিতে। বস্তির মানুষ জীবন নিয়ে পালাতে চেয়েছে। আর সেসব মানুষের ওপর চারদিক থেকে মেশিনগান চালিয়ে হাজার হাজার মানুষ হত্যা করা হয়েছে।

ডেভিড ফ্রস্ট : কি আশ্চর্য! আপনি বলছেন, ওদের ঘরে আগুন দিয়ে ঘর থেকে বের করে, খোলা জায়গায় পলায়নমান মানুষকে মেশিনগান চালিয়ে হত্যা করেছে।

শেখ মুজিবুর রহমান : হ্যাঁ, এমনিভাবে গুলি করে তাদের হত্যা করেছে।

ডেভিড ফ্রস্ট : কোন মানুষকে মারলো, তার কোনো পরোয়া করলো না?

শেখ মুজিবুর রহমান : না, তারা বিন্দুমাত্র পরোয়া করেনি।

ডেভিড ফ্রস্ট : কেবল হত্যা করার জন্য হত্যা—যাকে পেয়েছে, তাকেই হত্যা করেছে?

শেখ মুজিবুর রহমান : হ্যাঁ, যাকে পেয়েছে তাকেই হত্যা করেছে। ওরা ভেবেছে প্রত্যেকেই শেখ মুজিবের মানুষ। তাই প্রত্যেককেই হত্যা করতে হবে।

ডেভিড ফ্রস্ট : আপনি যখন দেখেন, মানুষ মানুষকে এমনিভাবে হত্যা করছে,

তখন আপনার কী মনে হয়? আপনি কি মনে করেন, মানুষ আসলে ভালো? কিংবা মনে করেন, মানুষ আসলেই খারাপ?

শেখ মুজিবুর রহমান : ভালো-মন্দ সর্বত্রই আছে। মনুষ্যত্ব আছে, এমন মানুষও আমি দেখেছি। কিন্তু আমি মনে করি, পশ্চিম পাকিস্তানের এই ফৌজ—এগুলো মানুষ নয়। এগুলো পশুরও অধম। মানুষের যে পাশবিক চরিত্র না থাকতে পারে, তা নয়। কিন্তু যে মানুষ, সে পশুর অধম হয় কী প্রকারে? কিন্তু এই বাহিনী তো পশুরও অধম। কারণ একটা পশু আক্রান্ত হলেই মাত্র আক্রমণ করে। তা নইলে নয়। পশু যদি মানুষকে আক্রমণ করে মেরে ফেলে, তবু সে তাকে অত্যাচার করে না। কিন্তু এই বর্বরের দল আমার দেশবাসীকে কেবল হত্যা করেনি। দিনের পর দিন বন্দি মানুষকে অত্যাচার করেছে। ৫ দিন, ৭ দিন, ১৫ দিন নির্মম অত্যাচার করেছে, আর হত্যা করেছে।

ডেভিড ফ্রস্ট : পাকিস্তানে বন্দি থাকাকালে ওরা আপনার বিচার করেছিল। সেই বিচার সম্পর্কে কিছু বলুন।

শেখ মুজিবুর রহমান : ওরা একটা কোর্ট মার্শাল তৈরি করেছিল। তাতে পাঁচজন ছিল সামরিক অফিসার। বাকি কয়েকজন বেসামরিক অফিসার।

ডেভিড ফ্রস্ট : আপনার বিরুদ্ধে কী অভিযোগ আনলো ওরা?

শেখ মুজিবুর রহমান : অভিযোগ—রাষ্ট্রদ্রোহিতা, পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, বাংলাদেশকে স্বাধীন করার ষড়যন্ত্র—আরও কতো কি!

ডেভিড ফ্রস্ট : আপনার পক্ষে কোনো আইনজীবী ছিলেন? আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো উপায় ছিল?

শেখ মুজিবুর রহমান : সরকারের তরফ থেকে গোড়ায় এক উকিল দিয়েছিল। কিন্তু আমি যখন দেখলাম, অবস্থাটা এমনি যে, যুক্তির কোনো দাম নেই; দেখলাম, এ হচ্ছে বিচারের এক প্রহসন মাত্র, তখন আমি কোর্টে নিজে দাঁড়িয়ে বললাম : জনাব বিচারপতি, দয়া করে আমাকে সমর্থনকারী উকিল সাহেবদের যেতে বলুন। আপনারা বিলক্ষণ জানেন, এ হচ্ছে গোপন বিচার। আমি বেসামরিক লোক। আমি সামরিক কোনো লোক নই। আর এরা করছে আমার কোর্ট মার্শাল। ইয়াহিয়া খান কেবল যে প্রেসিডেন্ট, তাই নয়। তিনি প্রধান সামরিক শাসকও। এ বিচারের রায়কে অনুমোদনের কর্তা তিনি। এই আদালতকে গঠন করেছেন তিনি।

ডেভিড ফ্রস্ট : তার মানে, তার হাতেই ছিল সব?

শেখ মুজিবুর রহমান : হ্যাঁ, সে ছিল দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তার ইচ্ছাই ইচ্ছা।

ডেভিড ফ্রস্ট : তার মানে, আপনি আদালতে যাওয়া বন্ধ করেছিলেন?

শেখ মুজিবুর রহমান : তার তো কোনো উপায় ছিল না। আমি তো বন্দি।

ডেভিড ফ্রস্ট : হ্যাঁ, তাতো বটেই। আপনার ইচ্ছা-অনিচ্ছার তো কোনো উপায় ছিল না। ওরা কি বিচার শেষ করে, সরকারিভাবে কোনো রায় তৈরি করেছিল?

শেখ মুজিবুর রহমান : ৪ ডিসেম্বর (১৯৭১) ওরা আদালতের কাজ শেষ করে। সাথে সাথে ইয়াহিয়া খান সব বিচারক, যথা লেফটেন্যান্ট, কর্নেল, ব্রিগেডিয়ার—এদের সব রাওয়ালপিন্ডি ডেকে পাঠালো রায় তৈরি করার জন্য। সেখানে ঠিক করল, ওরা আমাকে ফাঁসি দেবে।

ডেভিড ফ্রস্ট : আর তাই সেলের পাশে কবর খোঁড়া দেখে আপনি বুঝতে পেরেছিলেন, ওরা ওখানেই আপনার কবর দিবে?

শেখ মুজিবুর রহমান : হ্যাঁ, আমার সেলের পাশেই ওরা কবর খুঁড়ল। আমার চোখের সামনে।

ডেভিড ফ্রস্ট : আপনি নিজের চোখে তাই দেখলেন?

শেখ মুজিবুর রহমান : হ্যাঁ, আমি আমার নিজের চোখে দেখলাম ওরা কবর খুঁড়ছে। আমি নিজের কাছে নিজে বললাম : 'আমি জানি, এ কবর আমার কবর। ঠিক আছে। কোনো পরোয়া নেই। আমি তৈরি আছি।'

ডেভিড ফ্রস্ট : ওরা কি আপনাকে বলেছিল : 'এ তো তোমার কবর?'

শেখ মুজিবুর রহমান : না, ওরা তা বলেনি।

ডেভিড ফ্রস্ট : কি বলেছিল ওরা?

শেখ মুজিবুর রহমান : ওরা বললো : 'না, না। তোমার কবর নয়। ধর যদি বোম্বিং হয়, তাহলে তুমি এখানে শেলটার নিতে পারবে।'

ডেভিড ফ্রস্ট : সেই সময়ে আপনার মনের চিন্তা কি ছিল? আপনি কি এই সারাটা সময়, ন'মাস নিজের মৃত্যুর কথা চিন্তা করেছেন?

শেখ মুজিবুর রহমান : আমি জানতাম, যে-কোনো দিন ওরা আমায় শেষ করে দিতে পারে। কারণ ওরা অসভ্য, বর্বর।

ডেভিড ফ্রস্ট : এমনি অবস্থায় আপনার কেমন করে কাটতো? আপনি কি প্রার্থনা করতেন?

শেখ মুজিবুর রহমান : এমন অবস্থায় আমার নির্ভর ছিল আমার বিশ্বাস, আমার নীতি, আমার পৌনে আট কোটি মানুষের প্রতি আমার বিশ্বাস। তারা আমায় ভালোবেসেছে—ভাইয়ের মতো, পিতার মতো। আমাকে তাদের নেতা বানিয়েছে।

ডেভিড ফ্রস্ট : আপনি যখন দেখলেন, ওরা কবর খনন করেছে, তখন আপনার মনে কার কথা আগে জাগল? আপনার দেশের কথা? না, আপনার স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের কথা?

শেখ মুজিবুর রহমান : আমার প্রথম চিন্তা আমার দেশের জন্য। আমার আত্মীয়-স্বজনদের চাইতেও আমার ভালোবাসা আমার দেশের জন্য। আমার যা কিছু দুঃখভোগ, সে তো আমার দেশেরই জন্য। আপনি তো দেখেছেন, আমাকে তারা কী গভীরভাবে ভালোবাসে।

ডেভিড ফ্রস্ট : হ্যাঁ, এ কথা আমি বুঝি। স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধরত বাংলাদেশের

আপনি নেতা। আপনার প্রথম চিন্তা অবশ্যই আপনার দেশের চিন্তা। পারিবারিক চিন্তা পরের চিন্তা।

শেখ মুজিবুর রহমান : হ্যাঁ, জনতার প্রতিই আমার প্রথম ভালোবাসা। আমি তো জানি, আমি অমর নই। আজ, কিংবা কাল, কিংবা পরশু আমাকে মরতে হবে। মানুষ মাত্রকেই মরতে হয়। কাজেই আমার বিশ্বাস, মানুষ মৃত্যুবরণ করবে সাহসের সাথে।

ডেভিড ফ্রস্ট : কিন্তু ওরা আপনাকে কবর দিতে পারেনি। কে আপনাকে রক্ষা করেছিল সেদিন আপনার ভবিতব্য থেকে?

শেখ মুজিবুর রহমান : আমার বিশ্বাস সর্বশক্তিমান আল্লাহই আমাকে রক্ষা করেছেন।

ডেভিড ফ্রস্ট : আমি একটা বিবরণে দেখলাম, আপনাকে নাকি জেলার এক সময়ে সরিয়ে রেখেছিল। ইয়াহিয়া খান যখন আপনাকে হত্যা করার উদ্যোগ নিয়েছিল, তখন আপনাকে স্থানান্তরে নিয়ে গিয়েছিল। একি যথার্থ?

শেখ মুজিবুর রহমান : ওরা জেলখানায় একটা অবস্থা তৈরি করেছিল, মনে হচ্ছিল, কতগুলো কয়েদিকে ওরা সংগঠিত করেছিল, যেন সকালের দিকে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওরা আমাকে হত্যা করে ফেলতে পারে। আমার মনে হয়, আমাকে তত্ত্বাবধানের ভার যে অফিসারের ওপর পড়েছিল, আমার প্রতি তার কিছুটা সহানুভূতি জেগেছিল। হয়তো বা সে অফিসার এমনও বুঝতে পেরেছিল যে, ইয়াহিয়া খানের দিন শেষ হয়ে আসছে। আমি দেখলাম, হঠাৎ রাত তিনটার সময়ে সে এসে আমাকে সেল থেকে সরিয়ে নিয়ে তার নিজের বাংলাতে দুদিন যাবৎ রক্ষা করল। এ দুদিন আমার ওপর কোনো সামরিক পাহারা ছিল না। দুদিন পরেই এই অফিসার আমাকে আবার একটি আবাসিক কোলোনির নির্জন এলাকায় সরিয়ে নিল। সেখানে আমাকে হয়তো চার-পাঁচ কিংবা ছয় দিন রাখা হয়েছিল। এই সময়টাতে আমার অবস্থান সম্পর্কে নিম্নপদস্থ অফিসার বাদে আর কেউ জ্ঞাত ছিল না।

ডেভিড ফ্রস্ট : এ তাদের সাহসেরই কাজ। এখন তাদের কী হয়েছে, তাই ভাবছি।

শেখ মুজিবুর রহমান : আমিও জানি না। ওদের ওপর কোনো আঘাত হানতে ওরা পারবে বলে মনে হয় না। ওদের জন্য যথার্থ শুভ কামনা রয়েছে।

ডেভিড ফ্রস্ট : এমনকি শেষ মুহূর্তে ইয়াহিয়া খান যখন ভুট্টোর হাতে ক্ষমতা তুলে দেয়, তখনো নাকি সে ভুট্টোর কাছে আপনার ফাঁসির কথা বলেছিল? এটা কি ঠিক?

শেখ মুজিবুর রহমান : হ্যাঁ, ঠিক। ভুট্টো আমাকে সে কাহিনীটা বলেছিল। ভুট্টোর হাতে ক্ষমতা তুলে দেয়ার সময়ে ইয়াহিয়া বলেছিল : 'মিস্টার ভুট্টো, আমার জীবনের সবচাইতে বড় ভুল হয়েছে, শেখ মুজিবুর রহমানকে ফাঁসি না দেয়া।'

ডেভিড ফ্রস্ট : ইয়াহিয়া এমন কথা বলেছিল!

শেখ মুজিবুর রহমান : হ্যাঁ, ভুট্টো এ কথা আমায় বলে তার পরে বলেছিল : 'ইয়াহিয়ার দাবি ছিল, ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বে সে পেছনের তারিখ দিয়ে আমাকে ফাঁসি দিবে।' কিন্তু ভুট্টো তার এ প্রস্তাবে রাজি হয়নি।

ডেভিড ফ্রস্ট : ভুট্টো কী জবাব দিয়েছিল? তার জবাবের কথা কি ভুট্টো আপনাকে কিছু বলেছিল?

শেখ মুজিবুর রহমান : হ্যাঁ, বলেছিল।

ডেভিড ফ্রস্ট : কী বলেছিল ভুট্টো।

শেখ মুজিবুর রহমান : ভুট্টো ইয়াহিয়াকে বলেছিল : 'না, আমি তা হতে দিতে পারি না। তাহলে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া ঘটবে। বাংলাদেশে এখন আমাদের এক লাখ তিন হাজার সামরিক বাহিনীর লোক আর বেসামরিক লোক বাংলাদেশ আর ভারতীয় বাহিনীর হাতে বন্দি রয়েছে। তাছাড়া পাঁচ থেকে দশ লাখ অবাঙালি বাংলাদেশে আছে। মিস্টার ইয়াহিয়া, এমন অবস্থায় আপনি যদি শেখ মুজিবকে হত্যা করেন আর আমি ক্ষমতা গ্রহণ করি, তাহলে একটি লোকও আর জীবিত অবস্থায় বাংলাদেশ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে ফেরত আসতে সক্ষম হবে না। তার প্রতিক্রিয়া পশ্চিম পাকিস্তানেও ঘটবে। তখন আমার অবস্থা হবে সংকটজনক।' ভুট্টো এ কথা আমাকে বলেছিল। ভুট্টোর নিকট আমি অবশ্যই এ জন্য কৃতজ্ঞ।

ডেভিড ফ্রস্ট : শেখ সাহেব, আজ যদি ইয়াহিয়া খানের সাথে আপনার সাক্ষাৎ ঘটে, আপনি তাহলে তাকে কি বলবেন?

শেখ মুজিবুর রহমান : ইয়াহিয়া খান একটা জঘন্য খুনি। তার ছবি দেখতেও আমি রাজি নই। তার বর্বর ফৌজ দিয়ে সে আমার ৩০ লাখ বাঙালিকে হত্যা করেছে।

ডেভিড ফ্রস্ট : ভুট্টো এখন তাকে গৃহবন্দি করেছে। ভুট্টো তাকে নিয়ে এখন কী করবে? আপনার কী মনে হয়?

শেখ মুজিবুর রহমান : মিস্টার ফ্রস্ট, আপনি জানেন, আমার বাংলাদেশে কী ঘটেছে? শিশু, মেয়ে, বুদ্ধিজীবী, কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র—সকলকে ওরা হত্যা করেছে। ৩০ লাখ বাঙালিকে ওরা হত্যা করেছে। অন্ততপক্ষে ২৫ থেকে ৩০ ভাগ ঘরবাড়ি ওরা জ্বালিয়ে দিয়েছে এবং তারপর সবকিছুকে ওরা লুট করেছে। খাদ্যের গুদামগুলোকে ওরা ধ্বংস করেছে।

ডেভিড ফ্রস্ট : নিহতদের সংখ্যা ৩০ লাখ, এ কথা আপনি সঠিকভাবে জানেন?

শেখ মুজিবুর রহমান : আমার লোকজন তথ্য সংগ্রহ করে চলেছে। এখনও আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসিনি। সংখ্যা হয়তো একেও ছাড়িয়ে যাবে। ত্রিশ লাখের কম তো নয়ই।

ডেভিড ফ্রস্ট : কিন্তু এমন হত্যাকাণ্ড তো নিরর্থক। মানুষকে ঘর থেকে টেনে এনে হত্যা করা।

শেখ মুজিবুর রহমান : হ্যাঁ, কাদের ওরা হত্যা করেছে? একেবারেই নিরীহ শান্তিপ্রিয় মানুষকে। গ্রামের মানুষকে, যে গ্রামের মানুষ পৃথিবীর কথাই হয়তো কিছু জানত না, সে গ্রামে পাকিস্তানি ফৌজ ঢুকে পাখি মারার মতো গুলি করে এই মানুষকে ওরা হত্যা করেছে।

ডেভিড ফ্রস্ট : আমার মনেরও প্রশ্ন : আহা! কেন এমন হলো?

শেখ মুজিবুর রহমান : না, আমিও জানি না। আমিও বুঝি না। এ রকম পৃথিবীতে আর ঘটেছে বলে আমার জানা নেই।

ডেভিড ফ্রস্ট : আর এতো ছিল মুসলমানের হাতেই মুসলমানের হত্যা?

শেখ মুজিবুর রহমান : ওরা নিজেরা নিজেদের মুসলমান বলে। অথচ ওরা হত্যা করেছে মুসলমান মেয়েদের। আমরা অনেককে উদ্ধার করার চেষ্টা করেছি। আমাদের ত্রাণশিবিরে এখনও অনেকে রয়েছে। এদের স্বামী, পিতা—সকলকে হত্যা করা হয়েছে। মা আর বাবার সামনে ওরা মেয়েকে ধর্ষণ করেছে। পুত্রের সামনে মাকে ধর্ষণ করেছে। আপনি চিন্তা করুন। আমি এ কথা চিন্তা করে চোখের অশ্রুকে রোধ করতে পারি না। এরা নিজেদের মুসলমান বলে দাবি করে কীভাবে? এরা তো পশুরও অধম। মনে করুন, আমার বন্ধু মশিউর রহমানের কথা। আমাদের দলের একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা ছিলেন তিনি। আমাদের সরকারের একজন প্রাক্তন মন্ত্রী ছিলেন তিনি। তাঁকে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়েছে। ২৪ দিন ধরে তার ওপর নির্যাতন চালিয়েছে। প্রথমে তাঁর এক হাত কেটেছে। তারপরে তার আরেকটা হাত কেটেছে। তারপরে তার একটা কানকে কেটেছে। তার পা কেটেছে। ২৪ দিনব্যাপী চলছে এমন নির্যাতন (শেখ মুজিব কান্নায় ভেঙে পড়েন) কিন্তু এতো একটা কাহিনী। আমাদের কতো নেতা আর কর্মীকে, বুদ্ধিজীবী আর সরকারি কর্মচারীকে জেলখানায় আটক করে, সেখান থেকে নিয়ে দিনের পর দিন অত্যাচার করে হত্যা করেছে। এমন অমানুষিক নির্যাতনের কাহিনী আমি ইতিহাসে কোথাও শুনিনি। একটা পশু, একটা বাঘও তো মানুষকে হত্যা করলে এমনভাবে হত্যা করে না।

ডেভিড ফ্রস্ট : ওরা কী চেয়েছিল?

শেখ মুজিবুর রহমান : ওরা চেয়েছিল, আমাদের এই বাংলাদেশকে একেবারে উপনিবেশ করে রাখতে। আপনি তো জানেন, মিস্টার ফ্রস্ট, ওরা বাঙালি পুলিশ বাহিনীর লোককে, বাঙালি সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের হত্যা করেছে। ওরা বাঙালি শিক্ষক, অধ্যাপক, ইঞ্জিনিয়ার, বাঙালি ডাক্তার, যুবক, ছাত্র—সবাইকে হত্যা করেছে।

ডেভিড ফ্রস্ট : আমি শুনেছি, যুদ্ধের শেষ অবস্থাতেও ঢাকাতে ওরা ১৩০ জন বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করেছে।

শেখ মুজিবুর রহমান : হ্যাঁ, সারেন্ডারের মাত্র একদিন আগে। কেবল ঢাকাতেই ১৩০ নয়, ৩০০ মানুষকে ওরা হত্যা করেছে। ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে, মেডিকেল কলেজে, ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটিতে কারফিউ দিয়ে মানুষকে বাড়ির মধ্যে আটক করেছে। আর তারপর বাড়িতে বাড়িতে হানা দিয়ে এসব মানুষকে হত্যা করেছে।

ডেভিড ফ্রস্ট : তার মানে, কারফিউ জারি করে সকল খবরাখবর বন্ধ করে হত্যা করেছে।

শেখ মুজিবুর রহমান : হ্যাঁ, তাই করেছে।

ডেভিড ফ্রস্ট : শেখ সাহেব, আপনার কি মনে হয়? ইয়াহিয়া খান কি দুর্বল চরিত্রের

লোক, যাকে অন্য লোকে খারাপ করেছে, না সে নিজেই একটা দস্তুরমতো খারাপ লোক?

শেখ মুজিবুর রহমান : আমি মনে করি, ও নিজেই একটা নরাধম। ও একটা সাংঘাতিক লোক। ইয়াহিয়া খান যখন প্রেসিডেন্ট, তখন আমার জনসাধারণের নেতা হিসেবে, সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে ইয়াহিয়া খানের সাথে আলোচনার সময়েই আমি দেখেছি।

ডেভিড ফ্রস্ট : আমাদের আজকের এই আলাপে আপনি নেতা এবং নেতৃত্বের কথা তুলেছেন। যথার্থ নেতৃত্বের আপনি সংজ্ঞা দেবেন?

শেখ মুজিবুর রহমান : আমি বলবো, যথার্থ নেতৃত্ব আসে সংগ্রামের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। কেউ আকস্মিকভাবে একদিনে নেতা হতে পারে না। তাকে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আসতে হবে। তাকে মানুষের মঙ্গলের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে হবে। নেতার আদর্শ থাকতে হবে, নীতি থাকতে হবে। এসব গুণ যার থাকে, সেই মাত্র নেতা হতে পারে।

ডেভিড ফ্রস্ট : ইতিহাসের কোনো নেতাদের আপনি স্মরণ করেন, তাঁদের প্রশংসা করেন?

শেখ মুজিবুর রহমান : অনেকেই স্মরণীয়। বর্তমানের নেতাদের কথা বলছি না।...

ডেভিড ফ্রস্ট : না, বর্তমানের নয়। কিন্তু ইতিহাসের কারা আপনাকে অনুপ্রাণিত করেছেন?

শেখ মুজিবুর রহমান : আমি আব্রাহাম লিংকনকে স্মরণ করি। স্মরণ করি মাও সে-তুং, লেনিন, চার্চিলকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট জন কেনেডিকেও আমি শ্রদ্ধা করতাম।

ডেভিড ফ্রস্ট : মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কে আপনার কী ধারণা?

শেখ মুজিবুর রহমান : মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, সোহরাওয়ার্দী, এ কে ফজলুল হক, কামাল আতাতুর্ক—এঁদের জন্য আমার মনে গভীর শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে। আমি ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামী নেতা ড. সুকর্নকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতাম। এ সব নেতাই তো সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নেতা হয়েছিলেন।

ডেভিড ফ্রস্ট : আজ এই মুহূর্তে অতীতের দিকে তাকিয়ে আপনি কোন দিনটিকে আপনার জীবনের সবচাইতে সুখের দিন বলে গণ্য করবেন? কোন মুহূর্তটি আপনাকে সবচাইতে সুখী করেছিল?

শেখ মুজিবুর রহমান : আমি যেদিন শুনলাম, আমার বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, সে দিনটিই ছিল আমার জীবনের সবচাইতে সুখের দিন।

ডেভিড ফ্রস্ট : আপনার জীবনের সবচাইতে সুখের দিন?

শেখ মুজিবুর রহমান : সমগ্র জীবনের সবচাইতে সুখের দিন।

ডেভিড ফ্রস্ট : এমন দিনের স্বপ্ন আপনি কবে থেকে দেখতে শুরু করেন?

শেখ মুজিবুর রহমান : বহুদিন যাবৎ আমি এই স্বপ্ন দেখে আসছি।

ডেভিড ফ্রস্ট : স্বাধীনতার সংগ্রামে কী করে আপনি প্রথম কারাগারে যান?

শেখ মুজিবুর রহমান : আমার জেল গমন শুরু হয়, বোধ হয়, সেই ১৯৪৮ সালে। আমি তারপরে ১৯৪৯ সালে গ্রেপ্তার হয়ে জেলে যাই এবং ১৯৫২ সাল পর্যন্ত জেলে থাকি। ১৯৫৪ সালে আমি একজন মন্ত্রী হই। আবার ১৯৫৪ সালে গ্রেপ্তার হই এবং ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত জেলে থাকি। আবার ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান আমাকে জেলে পাঠায় এবং তখন পাঁচ বছর অন্তরীণ থাকি। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাসহ নানা মামলায় আমাকে সরকার পক্ষ বিচার করেছে। ১৯৬৬ সালে আবার আমাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ৩ বছর যাবৎ আটক রাখা হয়। তারপর আবার ইয়াহিয়া খান গ্রেপ্তার করে। এমন দীর্ঘ সংগ্রাম কেবল ব্যক্তিগতভাবে আমার নয়। আমার বহু সহকর্মীর জীবনই এই ইতিহাস...

ডেভিড ফ্রস্ট : মিস্টার প্রাইম মিনিস্টার, পৃথিবীর মানুষের জন্য কী বাণী আমি আপনার কাছ থেকে বহন করে নিয়ে যেতে পারি?

শেখ মুজিবুর রহমান : আমার একমাত্র প্রার্থনা—বিশ্ব আমার দেশের মানুষের সাহায্যে অগ্রসর হয়ে আসুক। আমার হতভাগ্য স্বদেশবাসীর পাশে এসে বিশ্বের মানুষ দাঁড়াক। আমার দেশের মানুষ স্বাধীনতা লাভের জন্য যেমন দুঃখ ভোগ করেছে, এমন আত্মত্যাগ পৃথিবীর খুব কম দেশের মানুষকেই করতে হয়েছে। মিস্টার ফ্রস্ট, আপনাকে আমি আমার একজন বন্ধু বলে গণ্য করি। আমি আপনাকে বলেছিলাম, আপনি আসুন। নিজের চোখে দেখুন। আপনি নিজের চোখে অনেক দৃশ্য দেখেছেন। আরো দেখুন। আপনি আমার এই বাণী বহন করুন—সকলের জন্যই আমার শুভেচ্ছা। আমি বিশ্বাস করি, আমার দেশের কোটি কোটি ক্ষুধার্থ মানুষের পাশে এসে বিশ্ব দাঁড়াবে। আপনি আমার দেশের বন্ধু। আপনাকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন। জয় বাংলা ॥

ডেভিড ফ্রস্ট : জয় বাংলা ॥ আমিও বিশ্বাস করি, বিশ্ববাসী আপনার পাশে এসে দাঁড়াবে। আপনাদের পাশে এসে আমাদের দাঁড়াতে হবে। নয়তো ঈশ্বর আমাদের কোনো দিন ক্ষমা করবেন না।

[পাকিস্তান থেকে মুক্তি পেয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর ব্রিটিশ সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্ট ঢাকায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এ সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেন। ১৯৭২ সালের ১৮ জানুয়ারি নিউইয়র্ক টেলিভিশনের 'ডেভিড ফ্রস্ট প্রোগ্রাম ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক অনুষ্ঠানে এটি প্রচারিত হয়।]

১৯৭২ সালে মে দিবসে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ

আমার প্রিয় শ্রমজীবী ভাই ও বোনেরা,

স্বাধীন বাংলার মুক্ত মাটিতে এবারই সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক মে দিবস পালিত হচ্ছে। বাংলার মেহনতি মানুষ শৃঙ্খলমুক্ত পরিবেশে এই দিনটিকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করার অধিকার অর্জন করেছে, এজন্য দেশ ও জাতি আজ গর্বিত। মহান মে দিবস শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের এক জ্বলন্ত প্রতীক। সারা বিশ্বের শোষিত-বঞ্চিত-নিপীড়িত মানুষের জন্য আজকের এ দিনটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলার মেহনতি মানুষ, বিশেষ করে শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-যুবক যাঁরা সাম্রাজ্যবাদী শোষণ, প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের জুলুম এবং ঔপনিবেশিক জালেমদের বিরুদ্ধে লড়াই করে স্বাধীনতার ইতিহাস লিখে গেলেন, তাঁদের ত্যাগ ও তিতিক্ষার কথা বাংলাদেশের মানুষ কোনোদিন ভুলবে না। তাঁরা আর কোনোদিন আমাদের কাছে কোনো দাবি-দাওয়া নিয়ে আসবেন না। কিন্তু এই লাখ লাখ শহীদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে এ দেশের ইতিহাসে। যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশের মানুষ দেশ গড়ার সংগ্রামে তাঁদের কাছ থেকে পাবে প্রেরণা। তাই আজকের এই মহান দিনে আমার দেশের শ্রমজীবী মানুষদের আমি শোষণহীন বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য বলিষ্ঠ ভূমিকায় নেমে আসার আহ্বান জানাচ্ছি।

আপনারা অতীতে বারবার আমার ডাকে সাড়া দিয়ে নির্ভীক সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। আমার বিশ্বাস, এবারও আপনারা আমার আহ্বানে মনেপ্রাণে এগিয়ে আসবেন। অতীতে আমরা একটি মর্মান্তিক পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নিগড়ে বাঁধা পড়ে গিয়েছিলাম। গুটিকয়েক সুবিধাবাদী ব্যক্তি ও গোষ্ঠী জাতীয় সম্পদ ও শ্রমজীবী মানুষের উৎপাদন নিজেদের কুক্ষিগত করে রেখেছিল। দেশ আজ স্বাধীন। সম্পদের মালিক জনগণ। তাই কোনো শ্রেণীবিশেষের ভোগ লালসার জন্য এবং লোভ চরিতার্থ করার নিমিত্তে এ সম্পদকে অপচয় করতে দেয়া হবে না। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে সমাজতন্ত্র কায়েম করা। এ ব্যবস্থায় দেশের সমুদয় উৎপাদিত ও প্রাকৃতিক সম্পদ কৃষক-শ্রমিক ও সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে সুষমভাবে বণ্টন করা হবে। যদিও বাধা অনেক, সমস্যার শেষ নেই, তবুও লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদের এগিয়ে যেতেই হবে।

আপনারা জানেন, আমাদের বর্তমান জাতীয় উৎপাদন সাড়ে ৭ কোটি দারিদ্র্য-পীড়িত মানুষের ন্যূনতম চাহিদা মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত নয়। শত শত বছর ধরে আমরা একটা নিকৃষ্ট উপনিবেশ এবং বিদেশীদের বাজার হিসেবে লুণ্ঠিত হয়েছি। বিদেশীরা

দেশের অর্থনীতিকে জনগণের প্রয়োজনের উপযোগী করে গড়ে তোলেনি। এর পরে ইয়াহিয়ার বর্বর সৈন্যরা আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিয়ে গেছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এক ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে এ দেশের অর্থনীতিকে পুনর্গঠনের কাজে হাত দিয়েছে। আমরা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির গোড়াপত্তন করেছি। পাশাপাশি দুঃখী জনগণের অভাব মোচন ও দুর্দশা লাঘবের জন্য আমাদের সাধ্যমতো আশু সাহায্যের ব্যবস্থা করতে হবে। সুদসহ কৃষকদের সমস্ত বকেয়া খাজনা ও ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির কর চিরদিনের জন্য বিলোপ করা হয়েছে। লবণ উৎপাদককে আর আবগারি শুল্ক দিতে হবে না। নির্যাতনমূলক ইজারাদারি প্রথা বিলুপ্ত করা হয়েছে। সরকার প্রায় ১৬ কোটি টাকার টেস্ট রিলিফ জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করেছে। দরিদ্র চাষীদের ১০ কোটি টাকার তকাভি ঋণ, ১ লাখ ৯০ হাজার টন সার, ২ লাখ মণ বীজ ধান দেয়া হয়েছে। সমবায়ের মাধ্যমে ৪ কোটি টাকা বিতরণ করা হবে। যুদ্ধবিধ্বস্ত স্কুলঘর পুনর্নির্মাণ ও ছাত্র-শিক্ষকদের সাহায্যের জন্য প্রায় ১০ কোটি টাকা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মুক্তিসংগ্রামের সময় ক্ষতিগ্রস্ত ২৮৭টি রেল সেতুর মধ্যে ২৬২টি এবং ২৭৪টি সড়ক সেতুর মধ্যে ১৭০টি মেরামত কাজ ইতিমধ্যেই শেষ করা হয়েছে। বাকিগুলোর কাজ বর্ষার আগে শেষ করার জন্য আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা অবিরাম পরিশ্রম করে চলেছেন। স্বাধীনতার প্রাক্কালে ব্যাংক, বীমা এবং শিল্প-ব্যবসায়ের চরম অরাজকতা বিরাজ করছিল। কারখানার উৎপাদন প্রায় থেমে গিয়েছিল। দক্ষ পরিচালকের অভাব, খুচরা যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল এবং ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের টানাটানি শিল্পজীবনে নিশ্চলতা এনে দিয়েছিল। শূন্য হাতে সরকার ব্যাংক, বীমা পুঁজিবিনিয়োগ সংস্থা এবং শিল্প কারখানাগুলোকে সক্রিয় করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। এই পরিস্থিতিতে আমরা বিধ্বস্ত অর্থনীতিকে সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। অতীতে কতিপয় সুবিধাভোগী দেশের সমুদয় সম্পদের সিংহভাগ ভোগ করতো। বর্তমান ব্যবস্থার চূড়ান্ত পর্যায়ে কৃষক, শ্রমিক, দরিদ্র ও বঞ্চিত লোকেরা উপকৃত হবেন। এজন্যই সরকারের ওপর অত্যন্ত গুরুভার সত্ত্বেও আমরা চলতি বছরের ছাব্বিশে মার্চ আমদের অর্থনীতির কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, যেমন ব্যাংক-বীমা, সমগ্র পাট, বস্ত্র ও চিনিশিল্প, অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন বৈদেশিক বাণিজ্যসহ শিল্প কারখানার একটি বিরাট অংশ জাতীয়করণ করেছি। পুরাতন পুঁজিবাদী পদ্ধতির স্থলে সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতি কায়েমের পথে এটা একটা সুস্পষ্ট দুঃসাহসিক পদক্ষেপ। নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি। সমাজান্ত্রিক অর্থনীতি পুরোপুরিভাবে গড়ে তোলার কাজ আমাদের সামনে পড়ে রয়েছে। এখানেই শ্রমজীবীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। এ নয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কায়েমে শ্রমিকদের বিশেষ ভূমিকা পালন করতে হলে, তাঁদের বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে, আমরা এখন আর পুঁজিপতি প্রভুদের ভোগের জন্য সম্পদ উৎপাদন করতে যাচ্ছি না। এখন যা উৎপাদন হবে তা শ্রমিক-কৃষক এবং বাংলাদেশের সব মানুষের কল্যাণে লাগবে। সমাজতন্ত্রের শত্রুরা এই

লক্ষ্য অর্জনে বাধা এবং জাতীয়করণ কর্মসূচির সাফল্যের পথ অন্তরায় সৃষ্টি করতে চায়। শ্রমিকরা সরকারের সঙ্গে একযোগে কাজ করে সমাজতন্ত্রের শত্রুদের ধ্বংস করতে পারেন। কিন্তু এটা করতে হলে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় শ্রমিকরা যে ভূমিকা পালন করেছেন, সে দৃষ্টিভঙ্গিরও আচরণের আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। তাঁদের অবশ্যই উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে এবং সম্পদকে রক্ষা করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, শিল্পোৎপাদনের সুফল সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষ বিশেষ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ চাষী ভাইদের ভোগ করতে দিতে হবে। সুতরাং জাতীয় স্বার্থের প্রতিকূল দাবি-দাওয়া পেশের মনোভাব ত্যাগ করা দরকার। এক কথায় সমাজতান্ত্রিক শৃঙ্খলা ছাড়া সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি কায়েম করা সম্ভব নয়।

শ্রমিকরা যাতে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের পরিচালনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেন সেজন্য আমি ইতিমধ্যেই শ্রমিক নেতাদের সাথে শিল্পকারখানা পরিচালনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণের ব্যাপারে একটি স্কিম প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করেছি। নতুন ভূমিকা পালনের জন্য শ্রমিকদের যেমন তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে হচ্ছে তেমনি সরকারি প্রশাসনযন্ত্রকে নতুন করে ঢেলে সাজানো দরকার। সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রয়োজনীয়তা মেটানোর জন্য সরকারি কর্মচারীদের দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে। সরকারের উচ্চ ও নিম্ন বেতনভোগী কর্মচারীদের বেতনের ক্ষেত্রে যে বিরাট ব্যবধান ছিল তা কমিয়ে আনার জন্য বেতন-কাঠামোর পুনর্বিন্যাস করার উদ্দেশ্যে একটি 'জাতীয় বেতন কমিশন' গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারি চাকরির এই নয়া কাঠামোতে কর্মচারীরা জাতীয় পুনর্গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারবেন বলে আশা করা যাচ্ছে। গত কয়েক মাসে জনসাধারণ যে সাহস ও ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন সেজন্য আমি তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। বেকারত্ব ও অত্যাবশ্যকীয় জিনিসের দুর্মূল্য আমাদের বিপর্যস্ত করে তুলেছে। আমি আপনাদের আশ্বাস দিতে পারি যে আমরা জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা সম্পর্কে সজাগ রয়েছি এবং পরিকল্পিত উপায়ে এ সমস্যার মোকাবিলার জন্য অবিরাম কাজ করে যাচ্ছি।

জনগণের জানা আছে, আমদানি কমে যাওয়ায় এবং উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় বাজারে জিনিসপত্রের অভাব হয়েছে। যুদ্ধে বন্দর যোগাযোগ ব্যবস্থা ও কারখানাগুলো ক্ষতিগ্রস্ত ও বিকল হয়ে যাওয়ার ফলে আমরা বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলাম। কিছুসংখ্যক এজেন্ট অসৎ ব্যবসায়ী ও কালোবাজারিরা পণ্যদ্রব্য গুদামজাত করে বেশ খানিকটা কৃত্রিম সঙ্কট সৃষ্টি করেছিল। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সামগ্রিক চাহিদা মেটানোর জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। ইতিমধ্যে খাদ্যশস্যের আমদানি উল্লেখযোগ্য বিদেশ থেকে আনা হয়েছে। মে মাস নাগাদ আরো তিন লাখ পঁচাশি হাজার টন খাদ্যশস্য আসছে। আমাদের প্রতিবেশী বন্ধুরাষ্ট্র ভারত সাড়ে সাত লাখ টন এবং জাতিসংঘের বিভিন্ন সদস্য ও বন্ধুরাষ্ট্রসমূহ আমাদের প্রায় সাত লাখ টন খাদ্যশস্য দেবার

আশ্বাস দিয়েছেন। এর ফলে খাদ্যশস্যের দাম ক্রমান্বয়ে কমে যাবে বলে আমার বিশ্বাস। খাবার তেল, কেরোসিন প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের আমদানির ব্যবস্থা করা হয়েছে। মোটামুটিভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেই জিনিসপত্রের দাম আরো কমে যাবে।

আমাদের সমগ্র পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ অংশের মধ্যে রয়েছে বণ্টন ও সরবরাহ ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করা। ইতিমধ্যেই বেসরকারি ডিলার, এজেন্ট এবং সংশ্লিষ্ট সকল মহলকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, যদি তারা অসাধু ও সমাজবিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ না করে তাহলে তাদের সকল লাইসেন্স, পারমিট বাতিল করে দেয়া হবে। আশু ব্যবস্থা হিসেবে সরকার প্রতি ইউনিয়নে ও সমস্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানে সমবায় ভিত্তিতে ন্যায্যমূল্যের দোকান খোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এর ফলে বেসরকারি ব্যক্তিদের বণ্টনের ক্ষেত্রে একচেটিয়া কর্তৃত্বের অবসান ঘটবে এবং সরবরাহের ক্ষেত্রে সাময়িক স্বল্পতার সুযোগে যুক্তিহীন মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা রোধ হবে। এ পরিকল্পনা কার্যকর করার সাথে সাথে কম বেতনের লোকদের জন্য আমরা কিছু সাহায্যের ব্যবস্থা করেছি। আপনারা জানেন, জিনিসপত্রের দাম না কমিয়ে কেবল বেতন বাড়িয়ে দিলেই জনসাধারণের অসুবিধা দূর হয় না। কাজেই মূল্যবৃদ্ধি সংক্রান্ত পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য আমরা ইতিপূর্বে বর্ণিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করেছি। সেই সাথে আমরা মনে করি এই দুর্মূল্যের বাজারে টিকে থাকার সংগ্রামে লিপ্ত নিম্ন আয়ের মানুষের কিছু আর্থিক সাহায্য দেয়া দরকার। আপনাদের সরকার স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে দেশের গরিব সরকারি কর্মচারীদের জন্য কিছু আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করেছে। স্বায়ত্তশাসিত ও অর্ধ-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, প্রাথমিক স্কুলশিক্ষক, পুলিশ, জাতীয় রক্ষীবাহিনী, বাংলাদেশ রাইফেলস, দেশরক্ষা বাহিনী, রাষ্ট্রায়াত্ত ও সরকার পরিচালিত শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সদস্য ও শ্রমিকরা এই বাড়তি সাহায্য পাবেন। আজ থেকে এটা কার্যকর হবে এবং আগামী পহেলা জুনের বেতনের সাথে আপনারা এই বাড়তি টাকা পেয়ে যাবেন। যেসব সরকারি কর্মচারী প্রতি মাসে ৩৩৫ টাকা পর্যন্ত মূল বেতন পান তাঁদের সাময়িক ভিত্তিতে সরকার এই হারে সাহায্যদান মঞ্জুর করেছে :

১. মাসিক বেতন ১২৬ টাকা পর্যন্ত—মাসিক ২৫ টাকা।

২. মাসিক বেতন ১২৬ টাকা থেকে ২২৫ টাকা পর্যন্ত—মাসিক ২০ টাকা।

৩. মাসিক বেতন ২২৬ টাকা থেকে ৩৩৫ টাকা পর্যন্ত—মাসিক ৯৫ টাকা।

এই শ্রেণীভুক্ত কর্মচারীরা সর্বনিম্ন মাসিক ১৫০ টাকা পাবেন।

ক. এই শ্রেণীভুক্ত কর্মচারীরা সর্বনিম্ন ২৪৫ টাকা পাবেন।

খ. যে সকল কর্মচারীরা মাসিক ৩৪৯ টাকা পর্যন্ত বেতন পান তাঁদের জন্য মার্জিনাল এডজাস্টমেন্ট করা হবে।

যে সকল বেসামরিক কর্মচারী প্রতিরক্ষা বরাদ্দ হতে বেতন পান বা যাঁরা ওয়ার্ক চার্জড্ এবং কনটিনজেন্ট কর্মচারী, তাঁদের বেলায়ও এই আদেশ প্রযোজ্য হবে। এই সাময়িক সুবিধার কোনো অংশই বেতন হিসেবে গণ্য হবে না।

যে সকল শ্রমিক সরকারি মালিকানাধীন কর্পোরেশন, সংস্থা ও কর্তৃপক্ষ, রাষ্ট্রায়ত্ত ও সরকারি তত্ত্বাবধানের অধীন ব্যবসা ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান ইত্যাদিতে নিযুক্ত আছেন ও মাসিক ৩৩৫ টাকা পর্যন্ত বেতন পাচ্ছেন, তাঁদের সাময়িক ভিত্তিতে এই হারে সাহায্য মঞ্জুর করা হয়েছে :

১. মাসিক মজুরি ১২৫ টাকা পর্যন্ত—মাসিক ২৫ টাকা ।

২. মাসিক মজুরি ১২৬ টাকা থেকে ২২৫ টাকা পর্যন্ত—মাসিক ২০ টাক ।

৩. মাসিক মজুরি ২২৬ টাকা থেকে ৩৩৫ টাকা পর্যন্ত—মাসিক ১৫ টাকা :

এই শ্রেণীভুক্ত কর্মচারীরা সর্বনিম্ন মাসিক ১৫০ টাকা পাবেন ।

ক. এই শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিরা সর্বনিম্ন ২৪৫ টাকা পাবেন ।

খ. যে সকল ব্যক্তি মাসিক ৩৪৯ টাকা পর্যন্ত মজুরি পান তাঁদের জন্য মার্জিনাল এডজাস্টমেন্ট করা হবে ।

এই সুবিধা স্থায়ী, অস্থায়ী, বদলি ও ওয়ার্ক চার্জড্ শ্রমিকরাও পাবেন ।

সরকারের মালিকানাধীন বা তত্ত্বাবধানাধীন চা বাগানের শ্রমিকরা এই হারে এসব সাময়িক সুবিধা ভোগ করবেন :

ক. দুই সদস্যবিশিষ্ট অদক্ষ শ্রমিক পরিবার মাসিক অতিরিক্ত ২০ টাকা পাবেন ।

খ. এক সদস্যবিশিষ্ট অদক্ষ শ্রমিক পরিবার মাসিক অতিরিক্ত ১০ টাকা পাবেন ।

আমি বিশ্বাস করি এই পদক্ষেপগুলো আপনাদের বর্তমান দুর্দশার কিছুটা লাঘব করবে । অবশ্য জনগণের ভবিষ্যৎ জীবনের প্রকৃত মান উন্নয়ন এই বেতন বৃদ্ধির ওপর কোনোক্রমেই নির্ভরশীল নয় । সেটা তখনি সম্ভব হয়ে উঠবে যখন আমাদের অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে পুনর্গঠিত এবং কারখানাগুলো পুরোমাত্রায় চালু হবে । আমরা এ পর্যন্ত কোনো নতুন কর, খাজনা ধার্য করিনি । আপনারা শুনে অবাক হবেন যে, আপনাদের এই বেতন বাড়াবার জন্য সরকারকে প্রতিবছর অতিরিক্ত ৩০ থেকে ৩৫ কোটি টাকা খরচ করতে হবে । কৃষকসহ সর্বস্তরের জনসাধারণকে সুবিধা দেবার জন্য ইতিপূর্বে প্রায় ৭০ কোটি টাকার বকেয়া সুদ-খাজনা ও কর মাফ করে দেয়া হয়েছে । উৎপাদন বৃদ্ধি করে আমরা এই ঘাটতি পূরণ করতে পারি ।

আপনারা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি কায়েমের উপযোগী সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করুন । আমাদের পরিশ্রম করতে হবে, উৎপাদনের লক্ষ্য অর্জন করতে হবে । দেশের সম্পদ বাড়িয়ে আমরা জীবনযাত্রার প্রকৃত মান উন্নয়ন করতে সফল হবো । আজকের এই মে দিবসে আসুন আমরা এই শপথ গ্রহণ করি যে, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে তোলার জন্য আমরা অবিরাম সংগ্রাম করে যাব । এ দেশের চাষী, তাঁতী, কামার, কুমার, শ্রমিক ও মজলুম জনতার জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধি ফিরিয়ে আনার জন্য আমরা কাজ করব । আমার পার্টির সহকর্মীরা এবং সরকার এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ সজাগ যে, দুঃখের মধ্য দিয়ে আপনাদের দিন কাটছে । ঘরে খাবার নেই, পরনে কাপড় নেই, মাথা গুঁজবার জন্য নেই এতটুকু ঠাঁই । ইয়াহিয়ার বর্বর সেনাবাহিনীর নিষ্ঠুর ধ্বংসলীলা আপনাদের সবকিছু নষ্ট

করে দিয়ে গেছে। তবে অপনারা সম্পূর্ণভাবে আশ্বস্ত থাকতে পারেন যে এই বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে পুনর্গঠনের জন্য জনগণের সাহায্য ও সহযোগিতা নিয়ে আমরা সর্বশক্তি নিয়োগ করবো।

ইতিমধ্যে কিছুসংখ্যক বিদেশী এজেন্ট ও দুষ্কৃতকারী স্বার্থান্বেষী মহল মানুষের দুঃখ দুর্দশার সুযোগ নিয়ে মাঠে নামার চেষ্টা করছে। এদের অতীতের কার্যকলাপ আপনারা জানেন। আমার অনুরোধ আপনারা এই সাম্রাজ্যবাদী দালালদের সম্পর্কে সতর্ক থাকবেন। কিছু কিছু দুষ্কৃতকারী জায়গায় জায়গায় শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট করার জন্য চেষ্টা করছে। আপনারা তাদের ওপর কঠোর দৃষ্টি রাখবেন। সরকার তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

আমি আপনাদের মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দেব না। আপনারা জানেন আমি একবার কোনো অঙ্গীকার করলে নিজের প্রাণের বিনিময়ে হলেও পালন করতে চেষ্টা করি। আমি বিগত দিনে যে সকল প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম সেগুলো পালনের চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমি আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ হাতে নিয়ে সরকারের দায়িত্বভার গ্রহণ করিনি যে রাতারাতি সবকিছু ঠিকঠাক করে দেব। সমৃদ্ধির পথে কোনো সংক্ষিপ্ত রাস্তা আমার নেই। শতাব্দীর শোষণের পুঞ্জীভূত সমস্যা আমাদের সামনে জড়ো হয়ে রয়েছে। এগুলোর সমাধানের উদ্দেশ্যে কঠোর পরিশ্রম ও আরো আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। তাহলেই আমরা আমাদের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার ভিত্তি গড়ে যেতে পারব। আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা শান্ত ও সমৃদ্ধির মধ্যে সেখানে বসবাস করতে পারবে। খোদা আমাদের সহায় আছেন।

জয় বাংলা।

জতিসংঘে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ

[১৯৭৪ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এক ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। জাতিসংঘে তিনিই প্রথম রাষ্ট্রনায়ক যিনি বাংলাভাষায় বক্তৃতা করেন।]

জনাব সভাপতি

আজ এই মহামহিমান্বিত সমাবেশে দাঁড়াইয়া আপনাদের সাথে আমি এই জন্য পরিপূর্ণ সন্তুষ্টির ভাগীদার যে বাংলাদেশের সাড়ে ৭ কোটি মানুষ আজ এই পরিষদে প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের পূর্ণতা চিহ্নিত করিয়া বাঙালি জাতির জন্য ইহা একটি ঐতিহাসকি মুহূর্ত। স্বাধীনভাবে বাঁচার অধিকার অর্জনের জন্য এবং একটি স্বাধীন দেশে মুক্ত নাগরিকের মর্যাদা নিয়া বাঁচার জন্য বাঙালি জনগণ শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী সংগ্রাম করিয়াছেন, তাহারা বিশ্বের সকল জাতির সাথে শান্তি ও সৌহার্দ্য নিয়া বাস করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষিত ছিলেন। যে মহান আদর্শ জাতিসংঘ সনদে রক্ষিত আছে আমাদের লক্ষ লক্ষ মানুষ সেই আদর্শের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন। আমি জানি, শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সকল মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের উপযোগী একটি বিশ্ব গড়িয়া তোলার জন্য বাঙালি জাতি পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, আমাদের এই অঙ্গীকারের সাথে শহীদানের বিদেহী আত্মাও মিলিত হইবেন। ইহা বিশেষ আনন্দের ব্যাপার যে স্বাধীনতা যুদ্ধে একজন সক্রিয় যোদ্ধা সভাপতি থাকাকালেই বাংলাদেশকে এই পরিষদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া নেওয়া হইয়াছে। জনাব সভাপতি, গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির শীর্ষসম্মেলনের সাফল্যের ব্যাপারে আপনাদের মূল্যবান অবদানের কথা আমি স্মরণ করিতেছি।

যাঁহাদের ত্যাগের বিনিময়ে বাংলাদেশ বিশ্ব-সমাজ স্থান লাভ করিয়াছে এই সুযোগে আমি তাঁহাদেরকেও অভিবাদন জানাই। বাংলাদেশের সংগ্রামে সমর্থনদানকারী সকল দেশ ও জনগণের প্রতি আমি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংহতকরণ, যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠন ও ভয়াবহ চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় বাংলাদেশকে যাঁহারা মূল্যবান সাহায্য দিতেছেন তাঁহাদেরকেও আমরা ধন্যবাদ জানাই। জাতিসংঘে যাহারা আমাদেরকে স্বাগত জানাইয়াছেন তাঁদেরকে আমি বাংলাদেশের পক্ষ হইতে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম হইতেছে সার্বিক অর্থে শান্তি এবং ন্যায় সংগ্রাম আর সেই জন্যই জন্মলগ্ন হইতেই বাংলাদেশ বিশ্বের নিপীড়িত জনতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আসিতেছে। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার পরে এই ২৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে, এই সব নীতিমালার বাস্তবায়নে অব্যাহতভাবে কি তীব্র সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে হইতেছে। এশিয়া, আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকার লক্ষ লক্ষ বীর যোদ্ধার চরম আত্মদানের মাধ্যমে শুধুমাত্র জাতিসংঘ সনদ স্বীকৃত আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার পুনরুদ্ধার সম্ভব।

আগ্রাসনের মাধ্যমে বেআইনিভাবে ভূখণ্ড দখল, জনগণের অধিকার হরণের জন্য সেনাবাহিনী ব্যবহার এবং জাতিগত বৈষম্য ও বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এখনো অব্যাহত রহিয়াছে। আলজিরিয়া, ভিয়েতনাম, বাংলাদেশ এবং গিনিবিসাউ এই সংগ্রামে বিরাট বিজয় অর্জন করিয়াছে।

চূড়ান্ত বিজয়ে ইতিহাস যে জনগণ ও ন্যায়ের পক্ষেই যায়, এই সব বিজয় এই কথাই প্রমাণ করিয়াছে। কিন্তু বিশ্বের বহু অংশে এখনো অবিচার ও নিপীড়ন চলিতেছে, অবৈধদখলকৃত ভূখণ্ড পুরাপুরি মুক্ত করার জন্য আমাদের আরব ভাইদের সংগ্রাম অব্যাহত রহিয়াছে এবং প্যালেস্টাইনি জনগণের বৈধ জাতীয় অধিকার এখনো পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয় নাই। উপনিবেশ বিলোপ প্রক্রিয়ার যদিও অগ্রগতি হইয়াছে কিন্তু এই প্রক্রিয়া এখনো চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছায় নাই, বিশেষ করিয়া আফ্রিকার ক্ষেত্রে এই সত্যটি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এই অঞ্চলের জিম্বাবুয়ে (দক্ষিণ রোডেশিয়া) এবং নামিবিয়ার জনগণ জাতীয় মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য দৃঢ়তার সাথে লড়াই করিয়া যাইতেছে। বর্ণবৈষম্যবাদ, যাহাকে মানবতার বিরোধী বলিয়া বার বার আখ্যায়িত করা হইয়াছে তাহা এখানে আমাদের বিবেককে দংশন করা অব্যাহত রাখিয়াছে।

একদিকে অতীতের অন্যায় অবিচারের অবসান ঘটাইতে হইতেছে, অপরদিকে আমরা আগামী দিনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হইতেছি। আজিকার দিনে বিশ্বের জাতিসমূহ কোন পথ বাছিয়া নিবে তাহা লইয়া সংকটে পড়িয়াছে। এই পথ বাছিয়া নেওয়ার বিবেচনার ওপর নির্ভর করিবে আমরা সামগ্রিক ধ্বংসের ভীতি এবং আণবিক যুদ্ধের হুমকি নিয়া এবং ক্ষুধা, বেকারি ও দারিদ্র্যের কশাঘাতে মানবিক দুর্গতিকে বিপুলভাবে বাড়াইয়া তুলিয়া আগাইয়া যাইব অথবা আমারা এমন এক বিশ্ব গড়িয়া তোলার পথে আগাইয়া যাইব যে বিশ্বে মানুষের সৃজনশীলতা এবং আমাদের সময়ের বিজ্ঞান ও কারিগরি অগ্রগতি আণবিক যুদ্ধের হুমকিমুক্ত উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের রূপায়ন সম্ভব করিয়া তুলিবে এবং যে বিশ্ব কারিগরি বিদ্যা ও সম্পদের পারস্পরিক অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সর্বক্ষেত্রে সুন্দর জীবন গড়িয়া তোলার অবস্থা সৃষ্টি করিবে। যে অর্থনৈতিক উত্তেজনা সম্প্রতি বিশ্বকে নাড়া দিয়াছে তাহা একটি ন্যায়সঙ্গত আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিয়া জরুরিভাবে মোকাবিলা করিতে হইবে। এই বৎসরের প্রথম দিকে এই পরিষদের বিশেষ অধিবেশন বর্তমান জটিল আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে।

বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বাংলাদেশকে মারাত্মকভাবে আঘাত হানিয়াছে। যুদ্ধের ধ্বংসলীলার ওপর সৃষ্ট বাংলাদেশ পরপর কতিপয় প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হইয়াছে। আমরা সর্বশেষে যে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হইয়াছি তাহা হইতেছে এই বৎসরের নজিরবিহীন বন্যা। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় বাংলাদেশকে সাহায্য করার ব্যাপারে সক্রিয় উৎসাহ প্রদর্শন করায় আমরা জাতিসংঘ তার বিভিন্ন সংস্থা ও মহাসচিবের কাছে কৃতজ্ঞ।

আলজিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বুমেদনি এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী বুতেফ্লিকা বাংলাদেশের সাহায্যে আগাইয়া আসার জন্য জোটনিরপেক্ষ দেশসমূহের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন। মিত্রদেশগুলি এবং বিশ্বের মানবিক সংস্থাসমূহও এ ব্যাপারে সাড়া দিয়াছে। এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিই শুধু ব্যাহত হয় না, ইহার ফলে দেশে আজ দুর্ভিক্ষাবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাছাড়া বিশ্বব্যপী মুদ্রাস্ফীতির দরুন আমাদের মতো দেশগুলিতে দায় পরিশোধের ক্ষেত্রে হাজার হাজার ডলার শূন্যতার সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে বার্ষিক মাথাপিছু একশত ডলারেরও কম আয়ের জনগণ বর্তমানে মারাত্মক সংকটের সম্মুখীন হইয়াছে। তাহারা বর্তমান স্তরের চাইতেও তাদের জীবন-যাত্রার মান কমাইয়া আনিতে বাধ্য হইয়াছে।

বিশ্বখাদ্য সংস্থার বিবেচনায় শুধুমাত্র বাঁচিয়া থাকার জন্য যে সর্বনিম্ন সামগ্রীর প্রয়োজন, তাহার চাইতেও কম ভোগ করিয়াছে যেসব মানুষ তাহারা আজ অনাহারের মুখে পতিত হইয়াছে। দরিদ্র দেশগুলির ভবিষ্যৎ আরো অন্ধকার। শিল্পোন্নত দেশগুলির রপ্তানি পণ্য, খাদ্য সামগ্রীর ক্রমবর্ধমান মূল্যের দরুন তাহা আজ ক্রমশঃ তাহাদের নাগালের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। খাদ্য উৎপাদনের স্বয়ম্ভরতা অর্জনের জন্য তাহাদের প্রচেষ্টা ও প্রয়োজনীয় উৎপাদনের সহায়ক সামগ্রীর ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধি ও দুষ্প্রাপ্যতার ফলে প্রচণ্ডভাবে বিঘ্নিত হইতেছে। পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতির ফলে ইতিমধ্যেই দারিদ্র্য ও ব্যাপক বেকারির নিষ্পেষণে পতিত দেশগুলি তাহাদের পাঁচ হইতে ছয় শতাংশ উৎপাদন বৃদ্ধির হার সম্বলিত পরিমিত উন্নয়ন পরিকল্পনা ছাঁটাই করার ভয়ানক আশঙ্কার হুমকিতে পতিত হইয়াছে। এই মুদ্রাস্ফীতির ফলে কেবলমাত্র উন্নয়ন প্রকল্পের খরচই বহুগুণ বাড়িয়া যায় নাই, উপরন্তু তাহাদের নিজস্ব সম্পদ কাজে লাগাইবার জন্য তাহাদের সামর্থ্য ও প্রতিকূলভাবে কমিয়া গিয়াছে।

এই পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য বিশ্বের জাতিসমূহ ঐক্যবদ্ধভাবে কার্যক্রম গ্রহণ করিতে না পারিলে মানুষের দুঃখ-দুর্দশা আরো চরমে উঠিবে, ইতিহাসে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। মানুষের সেই দুঃখ-দুর্দশার আর কোনো পূর্ববর্তী নজির পাওয়া যাইবে না। ইহার পাশাপাশি অবশ্য থকিবে গুটিকয়েক লোজের অপ্রত্যাশিত সুখ-সমৃদ্ধি। শুধুমাত্র মানবিক সংহতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ গড়িয়া তোলা এবং পারস্পারিক স্বনির্ভরতার স্বীকৃতি এই পরিস্থিতির যুক্তিযুক্ত সমাধান আনিতে পারে এবং এই মহাবিপর্যয় পরিহার করিবার জন্য জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যাবশ্যক।

একটি যথার্থ আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক, ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার পদক্ষেপ নিতে জাতিসংঘকে এর আগে কোথাও এই ধরনের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করিতে হয় নাই। এই ধরনের ব্যবস্থায় শুধুমাত্র নিজ নিজ প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর প্রত্যেক রাষ্ট্রের সার্বভৌম অধিকারকে নিশ্চিত করাই নয়, ইহাতে একটা স্থায়ী এবং যথার্থ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জন্য বিশ্বের দেশগুলির সাধারণ স্বার্থের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক কাঠামো প্রণয়নেরও ব্যবস্থা থাকিতে হইবে। এই মুহূর্তে আমরা প্রত্যেক মানুষের জন্য মানবাধিকারে আন্তর্জাতিক ঘোষণায় স্বীকৃত মুক্তভাবে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সুবিধা ভোগের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করার আন্তর্জাতিক দায়িত্বের কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে পুনরুল্লেখ করিতেছি। আন্তর্জাতিক ঘোষণা অনুযায়ী প্রত্যেকটি মানুষের স্বাস্থ্য এবং পরিবারের কল্যাণের জন্য পর্যাপ্ত জীবনযাত্রার ব্যবস্থা নিশ্চিত করিতে হইবে।

আমরা এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ সচেতন যে বর্তমান অর্থনৈতিক সঙ্কট শুধুমাত্র শান্তি এবং আন্তর্জাতিক সমঝোতার পরিবেশেই সমাধান করা সম্ভব। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, বর্তমান অস্ত্র প্রতিযোগিতা নিয়ন্ত্রণ করার জরুরি ব্যবস্থা নিতে হইবে। ইহাতে শুধুমাত্র এই ধরনের পরিবেশই সৃষ্টি হইবে না ইহাতে অস্ত্র সজ্জার জন্য যে বিপুল সম্পদ অপচয় হইতেছে তাহাও মানবতার কল্যাণে নিয়োজিত করা যাইবে।

বাংলাদেশ প্রথম হইতেই শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান ও সকলের প্রতি বন্ধুত্ব এই নীতিমালার ওপর ভিত্তি করিয়া জোটনিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করিয়াছে। কেবলমাত্র শান্তিপূর্ণ পরিবেশই কষ্টলব্ধ জাতীয় স্বাধীনতার ফল ভোগ করিতে আমাদেরকে সক্ষম করিয়া তুলিবে এবং সক্ষম করিয়া তুলিবে দারিদ্র্য, ক্ষুধা, রোগ, অশিক্ষা ও বেকারির বিরুদ্ধে লড়াই করিবার জন্য আমাদের সকল শক্তি ও সম্পদকে সমাবেশ ও কেন্দ্রিভূত করিতে। এই ধারণা হইতে জন্ম নিয়াছে শান্তি প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি। এই জন্য সমজোতার অগ্রগতি, উত্তেজনা, প্রশমন, অস্ত্র সীমিতকরণ এবং শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতির সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, ল্যাটিন আমেরিকা বিশ্বের যে কোনো অংশে যে কোনো প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হউক না কেন আমরা তাহাকে স্বাগত জানাই। এই নীতির প্রতি অবিচল থাকিয়া আমরা ভারত মহাসাগরীয় এলাকা সম্পর্কে শান্তি এলাকার ধারণা, যাহা এই পরিষদে অনুমোদন করিয়াছে, তাহাকে সমর্থন করি।

আমরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে শান্তি, স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ এলাকায় পরিণত করার প্রতিও সমর্থন জানাই।

আমরা বিশ্বাস করি যে, সমবেত উন্নয়নশীল দেশসমূহ শান্তির স্বার্থকে দৃঢ় সমর্থন করে। জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষা এবং শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিশ্বের বিপুল সংখ্যাগুরু জনগণের অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির কথা তাঁহারা প্রকাশ করিয়াছেন।

মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য শান্তি অত্যন্ত জরুরি এবং তাহা সমগ্র বিশ্বের নর-নারীর গভীর আকাঙ্ক্ষাই প্রতিফলন ঘটাইবে এবং ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত শান্তিই দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে।

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় আমাদের অঙ্গীকার প্রমাণের জন্য উপমহাদেশের আপোষ-মীমাংসার পদ্ধতিতে আমরা জোরদার করিয়াছি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস বাংলাদেশের অভ্যুদয় বস্তুতপক্ষে এই উপমহাদেশে শান্তি এবং স্থায়িত্ব প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অবদান সৃষ্টি করিবে। ইহাছাড়া আমাদের জনগণের মঙ্গলের স্বার্থেই অতীতের সংঘর্ষ ও বিরোধিতার পরিবর্তে মৈত্রী ও সহযোগিতার সম্পর্কে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। আমরা আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী ভারত ও নেপালের সাথে শুধুমাত্র সুপ্রতিবেশীসুলভ সম্পর্কই প্রতিষ্ঠা করি নাই, অতীতের সমস্ত গ্লানি ভুলিয়া গিয়া পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক করিয়া নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করিয়াছি। পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের জন্য আমরা কোনো উদ্যোগ বাদ দেই নাই এবং সর্বশেষে ১৯৫ জন যুদ্ধবন্দিকে ক্ষমা প্রদর্শন করিয়া আমরা চূড়ান্ত অবদান রাখিয়াছি। ঐ সকল যুদ্ধবন্দি মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধসহ মারাত্মক অপরাধ করিয়াছে। ইহা হইতেছে নতুন অধ্যায়ের সূচনা ও উপমহাদেশে ভবিষ্যৎ শান্তি ও স্থায়িত্ব গড়িয়া তোলার পথে আমাদের অবদান। এই কাজ করিতে গিয়া আমরা কোনো পূর্বশর্ত আরোপ অথবা কোনো দরকষাকষি করি নাই। আমরা কেবলমাত্র আমাদের জনগণের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের কল্পনায় প্রভাবিত হইয়াছি।

৬৩ হাজার পাকিস্তানি পরিবারের অবস্থা এখনো মানবিক সমস্যারূপে রহিয়া গিয়াছে। তাহারা পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করিয়াছে এবং নিজ দেশে ফিরিবার জন্য আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটির কাছে নাম তালিকাভুক্তি করিয়াছে। যে দেশের প্রতি তাহারা আনুগত্য ঘোষণা করিয়াছে সেই দেশে তাহাদের যাইবার অধিকার আছে। আইন ও আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুসারেই এই অধিকার তাহাদের ওপর বর্তাইয়াছে। এই মানবিক সমস্যার অবিলম্বে সমাধান প্রয়োজন। আরো একটি জরুরি সমস্যা হইল সাবেক পাকিস্তানের পরিসম্পদ বণ্টন। পুনরায় বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য বাংলাদেশ প্রস্তুত রহিয়াছে। আমরা আশা করি, উপমহাদেশের জনগণের কল্যাণের স্বার্থে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে এইসব অমীমাংসিত সমস্যার সমাধান হইবে, যাহাতে স্বাভাবিকীকরণের প্রক্রিয়া সফল হইতে পারে।

শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান, সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রতি শ্রদ্ধা এবং অন্যের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতির ভিত্তিতে বাংলাদেশ প্রতিবেশী সকল দেশের সাথে সৎপ্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক বজায় রাখিবে। আমাদের অঞ্চলে এবং বিশ্বশান্তির অন্বেষায় সকল উদ্যোগের প্রতি আমাদের সমর্থনই অব্যাহত থাকিবে।

জাতিসংঘ অসুবিধা ও বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও তাহার ২৫ বৎসরের কার্যকালে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মানবিক অগ্রগতির লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখিয়াছে। এক কথায় বলা যায় বিরোধ ও মানবিক দুঃখ-দুর্দশা সত্ত্বেও জাতিসংঘ ভাবীকালের দিকে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সমুজ্জ্বল রাখিয়াছে। বিশ্ব সংস্থার সুনির্দিষ্ট সাফল্য ও সম্ভাবনাময় দিক সম্পর্কে বাংলাদেশ যেরূপ উপলব্ধি করিয়াছে এমনটি আর কেউ করে নাই। ড. কুর্ট ওয়াল্ডহেইমের সম্ভাবনাময় নেতৃত্ব এবং

তাঁর নিবেদিতপ্রাণ সহকর্মীদের জন্যই বাংলাদেশে যুদ্ধের দাগ মুছিয়া ফেলিতে, যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতিকে পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া আনিতে এবং ভারত হইতে ফিরিয়া আসা এক কোটি শরনার্থীকে পুনর্বাসিত করিতে জাতিসংঘ আমাদের দেশে ব্যাপক সাহায্য ও পুনর্গঠন কর্মসূচি গ্রহণ করিয়াছিল। এইসব শরনার্থী মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। জাতিসংঘের মহাসচিব তাঁর সহকর্মী এবং বিভিন্ন মানবিক সংস্থা যাহারা আমাদের দেশে বিরাট কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিল, তাহাদেরকে বাংলাদেশ সরকার এবং জনগণের পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আমরা বিশ্বাস করি জাতিসংঘের গঠনমূলক নেতৃত্ব উপমহাদেশের অমীমাংসিত সমস্যা সমাধানে সহায়ক হইবে। আমি আগেই বলিয়াছি, সাম্প্রতিক বিপর্যয়কারী বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য সংগ্রহের ব্যাপারে জাতিসংঘের প্রয়াসে আমরা কৃতজ্ঞ। বাংলাদেশ বিশেষ অসুবিধার জন্য এমন কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে নাই, যাহার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী এ ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় আগাইয়া আসিতে পারে। জাতিসংঘ দুর্যোগ ত্রাণ সমন্বয় অফিস স্থাপন করিয়াছে। এই ব্যাপারে স্বল্প হইলেও ইহা একটি দৃষ্টান্ত সূচনা করিয়াছে। লক্ষ্য পূরণে উদ্যোগ সমন্বিত করার ব্যাপারে তাই জাতিসংঘের সদস্যদের একটি বিশেষ দায়িত্ব রহিয়াছে।

জনাব সভাপতি, মানুষের অজয় শক্তির প্রতি বিশ্বাস, মানুষের অসম্ভবকে জয় করার ক্ষমতা এবং অজেয়কে জয় করার শক্তির প্রতি অকুণ্ঠ বিশ্বাস রাখিয়া আমি আমার বক্তৃতা শেষ করিতে চাই। আমাদের মতো যেইসব দেশ সংগ্রাম ও আত্মদানের মাধ্যমে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, এই বিশ্বাস তাহাদের দৃঢ়। আমরা দুঃখ ভোগ করিতে পারি। কিন্তু মরিব না। টিকিয়া থাকার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করিতে জনগণের দৃঢ়তাই চরম শক্তি। আমাদের লক্ষ্য স্ব-নির্ভরতা। আমাদের পথ হইতে জনগণের ঐক্যবদ্ধ ও যৌথ প্রচেষ্টা। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং সম্পদ ও প্রযুক্তিবিদ্যার শরিকানা মানুষের দুঃখ-দুর্দশা হ্রাস করিবে এবং আমাদের কর্মকাণ্ডকেও সহজতর করিবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। নতুন বিশ্বের অভ্যুদয় ঘটিতেছে। আমাদের নিজেদের শক্তির ওপর আমাদের বিশ্বাস রাখিতে হইবে। আর লক্ষ্য পূরণ এবং সুন্দর ভাবীকালের জন্য আমাদের নিজেদেরকে গড়িয়া তুলিবার জন্য জনগণের ঐক্যবদ্ধ ও সমন্বিত প্রয়াসের মাধ্যমেই আমরা আগাইয়া যাইব।

বঙ্গবন্ধুর শাসনের সাড়ে তিন বছর
উল্লেখযোগ্য ঘটনাসমূহ

১৯৭২ সাল

৮ জানুয়ারি : বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন।

১০ জানুয়ারি : কারাগার থেকে বেরিয়ে লন্ডন এবং দিল্লি হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

১২ জানুয়ারি : বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রপতির পদে ইস্তফা দেন এবং বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে নতুন রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করা হয়। বঙ্গবন্ধু সেদিনই প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ঐদিন পোল্যান্ড ও বুলগেরিয়ার সরকারদ্বয় বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন।

১৩ জানুয়ারি : এদিন বাংলাদেশকে স্বধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে ঘানার সরকার।

১৪ জানুয়ারি : বঙ্গবন্ধু সংবাদ সম্মেলনে দেশে গণতান্ত্রিক পথে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ঘোষণা করেন।

১৫ জানুয়ারি : রমনার রেসকোর্স ময়দানকে 'সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যান'-এ রূপান্তর করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। সেদিনই সরকারি আদেশে দেশের সর্বত্র মদ, জুয়া, হাউজিসহ অনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

১৬ জানুয়ারি : ৩০ লাখ শহীদদের স্মরণে এদিন জাতীয় শোক দিবস পালন করা হয়। নেপাল সরকার এদিনই বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।

১৭ জানুয়ারি : প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সকল মুক্তিযোদ্ধার অস্ত্র জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন। সেই সঙ্গে যে কোনো অবৈধ অস্ত্রশস্ত্রও জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন।

১৮ জানুয়ারি : এদিন প্রেসিডেন্ট ১৯৭২ সালের হাইকোর্ট অধ্যাদেশ জারি করে হাইকোর্ট গঠন করেন।

১৯ জানুয়ারি : মন্ত্রিসভায় কয়েকজন নতুন মন্ত্রী নিয়োগ করা হয়।

২০ জানুয়ারি : যুগোস্লাভিয়ার সরকার বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন।

২১ জানুয়ারি : প্রধানমন্ত্রীর পরিকল্পনা কমিশন গঠন এবং ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ করেন।

২২ জানুয়ারি : নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সকলের প্রতি শেখ মুজিবুর রহমানকে সাহায্যের জন্য অনুরোধ জানান ভারত থেকে বাংলাদেশে ফিরে মওলানা ভাসানী।

২৪ জানুয়ারি : পাকবাহিনীর দালালদের বিচারের জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করে বাংলাদেশ সরকার।

২৫ জানুয়ারি : তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চেকোস্লোভাকিয়ার সরকারদ্বয় বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

২৯ জানুয়ারি : বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশে গণহত্যা ও সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে।

৩০ জানুয়ারি : পল্টন ময়দানে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতিতে মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা তাদের অস্ত্রশস্ত্র জমা দেন।

৩১ জানুয়ারি : মুজিববাহিনী প্রধান শেখ ফজলুল হক মণি, তোফায়েল আহমেদ, আব্দুর রাজ্জাক ও সিরাজুল ইসলাম খান বঙ্গবন্ধুর নিকট মুজিববাহিনীর অস্ত্র জমা দেন।

১ ফেব্রুয়ারি : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে মুজিববাহিনীর উদ্দেশে ভাষণ দেন।

৬ ফেব্রুয়ারি : সেনাবাহিনী প্রধান কর্নেল এমএজি ওসমানীকে জেনারেল হিসেবে পদোন্নতি দেয়া হয়। এদিনই ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলা, থানায় শত শত গণকবর আবিষ্কৃত হয়।

৪ ফেব্রুয়ারি : ব্রিটেন ও ফ্রান্সসহ আটটি দেশের সরকার বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।

৫ ফেব্রুয়ারি : বঙ্গবন্ধু 'প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল' গঠন করে ওই তহবিলে মুক্তহস্তে নগদ অর্থ শিশুখাদ্য, বস্ত্র ও অন্যান্য যে কোনো সামগ্রী দান করার জন্য দেশের বিত্তবান জনগণ এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশ ও আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতি অনুরোধ জানান।

৯ ফেব্রুয়ারি : বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে কিউবা সরকার।

১০ ফেব্রুয়ারি : জাপান সরকার স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে বাংলাদেশকে।

১১ ফেব্রুয়ারি : সরকার ৩১টি টাউন কমিটিকে পৌরসভায় উন্নীত করে। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে এদিন শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বাংলাদেশের সকল ছাত্রছাত্রীর বিনামূল্যে বই বিতরণ করার ঘোষণা দেয়া হয়।

১৪ ফেব্রুয়ারি : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জন কেনেডির কনিষ্ঠ ভ্রাতা এডওয়ার্ড কেনেডি ব্যক্তিগত শুভেচ্ছা সফরে বাংলাদেশে আসেন। কানাডা সরকার বাংলাদেশকে স্বতন্ত্র স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।

১৫ ফেব্রুয়ারি : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতির উদ্দেশে বেতার ভাষণে বলেন, শোষণমুক্ত সোনার বাংলা কায়েমই আমাদের লক্ষ্য।

১৭ ফেব্রুয়ারি : পাকিস্তান সরকার বাংলাদেশে আটকেপড়া পাকিস্তানি এবং পাকিস্তানে আটকেপড়া বাংলাদেশীদের বিনিময়ের প্রস্তাব নাকচ করে দেয়।

২৪ ফেব্রুয়ারি : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মন্ত্রীদের বেতন এক হাজার টাকা নির্ধারণ করে দেন।

২৫ ফেব্রুয়ারি : ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার সরকারদ্বয় বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।

২৭ ফেব্রুয়ারি : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুজিববাহিনীসহ মুক্তিযোদ্ধাদের সকল সংগঠনের বিলুপ্তি ঘোষণা করেন।

১ মার্চ : সোভিয়েত ইউনিয়ন সরকারের আমন্ত্রণে বঙ্গবন্ধু ৫ দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে মস্কো গমন করেন।

২ মার্চ : সোভিয়েত রাশিয়ার সাথে বাংলাদেশের ৩৩০ কোটি টাকার অর্থনৈতিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

৪ মার্চ : বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে শ্রীলঙ্কার সরকার।

৬ মার্চ : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এদিনে ৬ দিনের রাষ্ট্রীয় সফর শেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে দেশে ফেরেন।

১০ মার্চ : সোয়াজিল্যান্ড সরকার বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।

১১ মার্চ : গ্রিস সরকারও বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।

১৩ মার্চ : সুইজারল্যান্ড সরকার বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

১৭ মার্চ : বাংলাদেশ সরকারের আমন্ত্রণে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশ সফরে ঢাকায় আসেন। এদিনই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৫৩তম জন্মদিন ছিল।

১৮ মার্চ : বঙ্গভবনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের অন্যরা সাক্ষাৎ করেন।

১৯ মার্চ : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী তাদের নিজ নিজ দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে একটি ২৫ বছরমেয়াদি শান্তি, সহযোগিতা ও মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

২৩ মার্চ : প্রেসিডেন্ট গণপরিষদ অধ্যাদেশ ও নির্বাচন কমিশন অধ্যাদেশ জারি করেন।

২৬ মার্চ : স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীনতা দিবস পালন হয়। ঐদিনই সকল ব্যাংক, বীমা ও বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের ঘোষণা করা হয়।

৪ এপ্রিল : আওয়ামী লীগের প্রথম কাউন্সিল অধিবেশনে ভাষণ দেন শেখ মুজিব। ওই কাউন্সিল অধিবেশনে শেখ মুজিবুর রহমানকে আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচন করা হয়। অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেব স্বীকৃতি দেয়।

৬ এপ্রিল : গ্যাবনের সরকার বাংলাদেশ একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

৭ এপ্রিল : জেনারেল আব্দুর রব এমসিএ এবং জেনারেল এমএজি ওসমানী সেনাবাহিনী থেকে অবসর নেন।

১০ এপ্রিল : গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। ওই দিনই গণপরিষদের স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচন করা হয়।

১১ এপ্রিল : ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে বাংলাদেশের সংবিধানের খসড়া প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়।

১২ এপ্রিল : আওয়ামী লীগের আটজন নেতা বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিপরিষদের সদস্য হিসেবে শপথ নেন।

১৪ এপ্রিল : দেশের সর্বত্র বাংলা নববর্ষ পালিত হয়। এদিনই মালাগাছির সরকার বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।

১৬ এপ্রিল : সরকার দেশে ঘোড়দৌড় ও জুয়াখেলা নিষিদ্ধ করে। অ্যাডভোকেট জিল্লুর রহমান এদিনেই আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৭ এপ্রিল : যথাযোগ্য মর্যাদায় মুজিবনগরে প্রতিষ্ঠিত বিপ্লবী বাংলাদেশ সরকারের প্রথম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করা হয়।

১৮ এপ্রিল : বাংলাদেশ কমনওয়েলথের সদস্য পদ লাভ করে। কমনওয়েলথের সদস্যপদ লাভ বাংলাদেশের প্রথম আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি।

২১ এপ্রিল : সিয়েরা লিওন-এর সরকার বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

২৫ এপ্রিল : বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয় লাওস সরকার।

২৬ এপ্রিল : লাইবেরিয়ার সরকার স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয় বাংলাদেশকে।

২৯ এপ্রিল : বাংলাদেশের সরকার প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভিয়েতনাম থেকে বিদেশী সৈন্য প্রত্যাহারের দাবি করেন।

১ মে : মহান মে দিবস পালন করা হয়। এই প্রথম বাংলাদেশে মে দিবসে সাধারণ ছুটি প্রদান করা হয়। এদিনই স্পিকার শাহ আব্দুল হামিদ ইন্তেকাল করেন।

৪ মে : পাকিস্তানের জিন্দাখানা থেকে বাংলাদেশীদের ফেরত আনার দাবিতে সারা ঢাকা শহরে জনতার বিক্ষোভ মিছিল হয়।

৮ মে : সারা দেশে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন যথাযথ মর্যাদায় পালন করা হয়।

১০ মে : বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে।

১১ মে : মেক্সিকো সরকার বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

১৭ মে : বঙ্গবন্ধু সরকার ভোগ্যপণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণে ন্যায্যমূল্যের দোকান খোলার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে।

১৮ মে : বাংলাদেশ সরকার ড. কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে শিক্ষা কমিশন নিয়োগ করে।

২১ মে : বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে সপরিবারে ঢাকায় আনার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

২৪ মে : কবি কাজী নজরুল ইসলামকে ঢাকায় আনা হয় এবং তাঁর পরিবারকে একটি ভবন ও রাষ্ট্রীয় ভাতা মঞ্জুর করা হয়।

২৫ মে : প্রথমবারের মতো কবি নজরুল ইসলামের জন্মদিন কবির উপস্থিতিতে যথাযথ মর্যাদায় পালন করা হয়। ঐদিনই আর্জেন্টিনা সরকার বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

২৬ মে : হাইতি সরকার বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

১ জুন : চিলি সরকার বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।

৬ জুন : ইকুয়েডর সরকার বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে।

১০ জুন : সরকার ওয়াপদাকে পানি উন্নয়ন এবং বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড নামে দুটো সংস্থায় বিভক্ত করে।

১৩ জুন : ড. কামাল হোসেন সংবিধানের খসড়া নিয়ে জাতীয় বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করেন।

১৭ জুন : বাংলাদেশ আইএমএফ-এর সদস্যপদ লাভ করে।

২১ জুন : বাংলাদেশকে জাম্বিয়ার সরকার বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের কথা ঘোষণা করে।

২২ জুন : বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) সদস্যপদ লাভ করে।

২৮ জুন : রুমানিয়া সরকার বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।

২৯ জুন : যোগাযোগমন্ত্রী ক্যাপ্টেন মনসুর আলী গণপরিষদে রেল বাজেট পেশ করে।

৩০ জুন : অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ গণপরিষদে পেশ করেন জাতীয় বার্ষিক বাজেট।

৩ জুলাই : বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ব্যাংকের সদস্যপদ রাভ করে।

১২ জুলাই : আঞ্জানিয়া সরকার বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।

১৩ জুলাই : বাংলাদেশ সরকার ১০ সদস্যবিশিষ্ট পে-কমিশন গঠন করে সচিব আব্দুর রবকে চেয়ারম্যান করে।

১৫ জুলাই : প্রধানমন্ত্রী পাকিস্তানে আটকদের পরিবারের জন্য মাসিক ভাতা প্রদানের ঘোষণা করা হয়।

২১ জুলাই : মাল্টার সরকার বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। সে দিন ঢাকায় ছাত্রলীগের পৃথক দুটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। একটি হয় আসম আবদুর রব ও শাজাহান সিরাজের নেতৃত্বে এবং অন্যটি হয় নূরে আলম সিদ্দিকী ও আব্দুল কুদ্দুস মাখনের নেতৃত্বে।

২২ জুলাই : চট্টগ্রাম বন্দরকে সরকার ব্যবহার উপযোগী ঘোষণা করা হয়।

২৬ জুলাই : চিকিৎসা এবং অস্ত্রোপচারের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লন্ডনের উদ্দেশে যাত্রা করেন।

২৭ জুলাই : বঙ্গবন্ধু লন্ডনের হারলি স্ট্রিটস্থ একটি ক্লিনিকে ভর্তি হন।

২৯ জুলাই : বঙ্গবন্ধুর তলপেটে স্যার এডওয়ার্ড মুর সফলতার সাথে অস্ত্রোপচার করে পাথরে ক্ষত গলব্লাডার অপসারণ করা হয়।

৪ আগস্ট : ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে ১২ লাখ একর পতিত জমি বিনামূল্যে বন্দোবস্ত করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার।

৫ আগস্ট : বলিভিয়ার সরকার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে।

৮ আগস্ট : বাংলাদেশ জাতিসংঘের মহাসচিব কুর্ট ওয়াইল্ড হেইমের নিকট জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভের জন্য আবেদন করে। এদিনই সরকার দেশের সকল বীমা কোম্পানিকে জাতীয়করণ করে এক অধ্যাদেশ জারি করে।

১০ আগস্ট : জাতিসংঘে নিযুক্ত গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের প্রতিনিধি জাতিসংঘে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করে।

২৪ আগস্ট : পানামা ও উরুগুয়ের সরকারদ্বয় স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়।

২৫ আগস্ট : জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদের প্রশ্নের নিষ্পত্তির জন্য নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যদের পুনরায় বৈঠক বসে। কিন্তু এদিনও চীন ভেটো দেয়।

২৯ আগস্ট : বাংলাদেশ সরকার দালাল আইন সংশোধন করে একটি অধ্যাদেশ জারি করে।

৩০ আগস্ট : দেশে খাদ্য পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার জন্য মন্ত্রিপরিষদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

১২ সেপ্টেম্বর : বাংলাদেশ সরকার দেশের ৫টি সাপ্তাহিক পত্রিকার ওপর রাষ্ট্রবিরোধীমূলক সংবাদ পরিবেশনের অভিযোগে শো-কোজ নোটিশ জারি করে।

১৪ সেপ্টেম্বর : ৪৮ দিন বিদেশে চিকিৎসাসহ স্বাস্থ্যোদ্ধারে থাকার পর বঙ্গবন্ধু দেশে ফেরেন।

১৭ সেপ্টেম্বর : প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি মুহাম্মদ ইদ্রিস ১ অক্টোবর থেকে ভোটার তালিকা প্রস্তুতের কাজ শুরু হবে বলে জানান এবং '৭৩ সালের মার্চ মাসে সংসদের নির্বাচন ঘোষণা করেন।

১৮ সেপ্টেম্বর : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গণভবনে উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীদের সম্মেলনে ভাষণ দেন।

২৪ সেপ্টেম্বর : প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা কমিশনের প্রথম সভার উদ্বোধন করেন।

২৫ সেপ্টেম্বর : ভ্যাটিকান বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।

২৬ সেপ্টেম্বর : সৌদি আরবের বাদশাহ ফয়সলের নিকট জরুরি তারবার্তা প্রেরণ করেন বঙ্গবন্ধু। তার বার্তায় জানানো হয় বাংলাদেশের নাগরিকদের পবিত্র মক্কা শরীফে হজ পালনে সুযোগ প্রদান করার কথা।

২৮ সেপ্টেম্বর : বাংলাদেশ বিমানবাহিনী ২য় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হয়। এ উপলক্ষে কর্মকর্তাদের সম্মেলনে ভাষণ দেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

১ অক্টোবর : সরকার সারা দেশে ন্যায্যমূল্যের দোকান চালু করে।

৫ অক্টোবর : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অবিলম্বে চোরাচালান রোধ করার জন্য সীমান্তে নৌ ও সেনাবাহিনী প্রেরণের নির্দেশ দেন।

১০ অক্টোবর : বিশ্ব শান্তি পরিষদ বঙ্গবন্ধুকে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তার অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সর্বোচ্চ সম্মানসূচক 'জুলিওকুরী' পুরস্কার প্রদান করে।

১২ অক্টোবর : স্বাধীন বাংলাদেশের খসড়া সংবিধান গণপরিষদের সুচিন্তিত বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য ড. কামাল হোসেন গণপরিষদে পেশ করেন।

১৪ অক্টোবর : পাকিস্তানে আটক বাঙালিদের প্রত্যাবর্তনে সহযোগিতা করার জন্য জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেলের নিকট জরুরি বার্তা প্রেরণ করা হয়।

১৫ অক্টোবর : আন্তর্জাতিক রেডক্রস প্রদানের নিকট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান থেকে বাঙালিদের ফেরত পাঠাতে অনুরোধ জানান।

১৭ অক্টোবর : বাংলাদেশ জাতিসংঘের স্থায়ী পর্যবেক্ষক হিসেবে যোগদানের অনুমতি পায়।

১৮ অক্টোবর : বাংলাদেশ ইউনেস্কোর সদস্যপদ লাভ করে।

১৯ অক্টোবর : গণপরিষদে বাংলাদেশের খসড়া সংবিধানের ওপর সাধারণ আলোচনা হয়।

২৫ অক্টোবর : পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙালিদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেলের বিশেষ প্রতিনিধি পাকিস্তানে যায়।

৩১ অক্টোবর : মেজর (অব.) জলিলকে সভাপতি এবং আসম আবদুর রবকে সাধারণ সম্পাদক করে গঠন করা হয় জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)।

৪ নভেম্বর : বাংলাদেশের সংবিধান অনুমোদন পায় এবং ১৬ ডিসেম্বর থেকে তা কার্যকর হবে বলে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৫ নভেম্বর : জাপান সরকার যমুনা নদীতে সেতু নির্মাণে সাহায্য-সহযোগিতা করার আশ্বাস দেয়।

৬ নভেম্বর : কলম্বো পরিকল্পনা সাহায্য সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে বাংলাদেশ।

১১ নভেম্বর : শেখ ফজলুল হক মণির নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ প্রতিষ্ঠিত হয়।

২৩ নভেম্বর : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাশিয়ার মস্কোস্থ লুমুম্বা বিশ্ববিদ্যালয় সম্মানসূচক 'পেট্রিস লুমুম্বা' পদক প্রদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে।

৩০ নভেম্বর : জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদ দানের প্রস্তাব জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

১০ ডিসেম্বর : মওলানা ভাসানীকে সভাপতি ও কাজী জাফরকে সাধারণ সম্পাদক করে 'ন্যাপ' কমিটি গঠন করা হয়।

১৬ ডিসেম্বর : বঙ্গবন্ধু সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। ঐদিন সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে একটি বিশাল জনসভায় ভাষণ দেন।

১৭ ডিসেম্বর : বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার সদস্যরা সংবিধান মোতাবেক শপথ গ্রহণ করেন।

২২ ডিসেম্বর : বঙ্গবন্ধু ঢাকার মিরপুরে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে স্মৃতিসৌধের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

২৮ ডিসেম্বর : খুলনায় আওয়ামী লীগ ও শ্রমিক লীগের নেতা অধ্যাপক আবু সুফিয়ানসহ দু'জন আঁততায়ীর গুলিতে নিহত হন।

১৯৭৩ সাল

১ জানুয়ারি : ভিয়েতনাম থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার ও শান্তি প্রতিষ্ঠার দাবিতে ছাত্র ইউনিয়ন বিক্ষোভ মিছিল করে। পুলিশ মিছিলে বাধা দান করে। বেধে যায় সংঘর্ষ। ফলে ২ জন ছাত্রনেতা নিহত হন এবং ৬ জন ছাত্র আহত হন।

১১ জানুয়ারি : শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান করে আওয়ামী লীগ ১০ সদস্যবিশিষ্ট পার্লামেন্টারি বোর্ড গঠন করা করে।

২১ জানুয়ারি : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধাদের একটি সম্মেলন সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিত হয়। ওই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভাষণ দেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

২৫ জানুয়ারি : নির্বাচন কমিশন নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সকল দলকে দলীয় প্রতীকী বরাদ্দ করে।

৩০ জানুয়ারি : নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকা প্রকাশ করে। নির্বাচনে ভোটার সংখ্যা ৩ কোটি ৫১ লাখ।

৩১ জানুয়ারি : আওয়ামী লীগের অঙ্গসংগঠন শ্রমিক লীগের আহ্বানে সারা ঢাকা শহরে হরতাল পালিত হয়।

১ ফেব্রুয়ারি : আওয়ামী লীগ তাদের দলের সকল প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে।

২ ফেব্রুয়ারি : বাংলাদেশ সরকারের একটি সরকারি আদেশে ১৬টি শিল্প ইউনিট 'সেনাকল্যাণ সংস্থার' নিকট হস্তান্তর করা হয়।

৬ ফেব্রুয়ারি : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জ ও ভোলা দুটি আসনসহ মোট আটটি আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়। ৩০০ আসনে মোট ১০৯০ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

৯ ফেব্রুয়ারি : জাতিসংঘের মহাসচিব ড. কুর্ট ওয়াইল্ড হেইম একদিনের সফরে বাংলাদেশে আসেন। ঢাকার তেজগাঁও বিমানবন্দরে তাঁকে বিপুল সংবর্ধনা দেওয়া হয়। বাংলাদেশে এই প্রথম জাতিসংঘের কোনো মহাসচিবের সফর।

১৮ ফেব্রুয়ারি : বাংলাদেশ এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংকের (ADB) সদস্যপদ লাভ করে।

২৮ ফেব্রুয়ারি : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পিজি হাসপাতালে অসুস্থ মওলানা ভাসানীকে এনে তাঁর সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করেন।

৫ মার্চ : অসুস্থ মওলানা ভাসানীকে দেখতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পিজি হাসপাতালে যান। তাঁর চিকিৎসার খোঁজখবর নেন।

৭ মার্চ : নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২৮০ আসনে জয়লাভ করে। আওয়ামী লীগের এই বিপুল বিজয়ে গণতন্ত্রের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। বিরোধী দলের অনুপস্থিতিতে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেতে বাধাগ্রস্ত হয়।

১২ মার্চ : পার্লামেন্টারি দলের নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নির্বাচিত হন।

১৮ মার্চ : আওয়ামী লীগ 'শপথ দিবস' পালন করে। এ উপলক্ষে সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভাষণ দেন।

২৫ মার্চ : মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার ৫৪৬ জন মুক্তিযোদ্ধাকে জাতীয় খেতাব প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

৭ এপ্রিল : স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সংসদের অধিবেশন বসে। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পুনরায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। সংসদের স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন যথাক্রমে মোহাম্মদ উল্লাহ ও মোহাম্মদ বায়তুল্লাহ।

১২ এপ্রিল : বাংলাদেশ সরকারের নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিষয়াদি সম্পর্কে মতবিনিময় ও আলোচনা করার জন্য দিল্লির উদ্দেশে যাত্রা করেন।

২১ এপ্রিল : বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও স্বার্থপরিপন্থী কাজের অপরাধের জন্য বাংলাদেশ সরকার ৩৯ জন বাঙালি রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীর বাংলাদেশের নাগরিকত্ব বাতিল ঘোষণা করে।

২৪ এপ্রিল : সরকার ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীর বিচার করার কথা ঘোষণা করে। এ যুদ্ধাপরাধীরা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সদস্য।

২ মে : বাংলাদেশকে খাদ্যশস্য দিয়ে সাহায্য করার জন্য বিশ্বের নিকট আহ্বান জানান জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল।

১৫ মে : মওলানা ভাসানী ৩ দফা দাবিতে অনশন ধর্মঘট শুরু করেন।

১৬ মে : বঙ্গবন্ধু অনশনরত মওলানা ভাসানীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

১৭ মে : প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ত্রাণমন্ত্রী মিজানুর রহমান চৌধুরী পদত্যাগ করেন।

২০ মে : সংসদের ৪টি আসনে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। দুটি আসনে আওয়ামী লীগ, একটি আসনে জাসদ এবং অন্যটিতে স্বতন্ত্র প্রার্থী নির্বাচিত হয়।

২২ মে : মওলানা ভাসানী ৭ দিন পর বিরোধীদলীয় নেতাদের অনুরোধে তাঁর অনশন ধর্মঘট প্রত্যাহার করেন।

২৩ মে : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বশান্তি পরিষদের সর্বোচ্চ সম্মানসূচক 'জুলিওকুরি' পদক প্রদান করেন।

২৯ মে : আওয়ামী লীগ দলীয় এমপি নূরুল হক ফরিদপুরের নড়িয়ায় তাঁর নিজ বাসভবনে আততায়ীর গুলিতে নিহত হন।

৬ জুন : কর্নেল জিয়াউর রহমান ও কর্নেল শফিউল্লাহকে ব্রিগেডিয়ারের পদে পদোন্নতি দেয়া হয়।

৮ জুন : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিকট শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট পেশ করেন ড. কুদরত-ই-খুদা।

১৮ জুন : বাংলাদেশ বিমানের প্রথম ভাড়া করা বোয়িং বিমান লন্ডন যাত্রা করে।

২৮ জুন : বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে বাংলাদেশে প্রথম একটি ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা, ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা বিল গৃহীত হয়।

১ জুলাই : বাংলাদেশ বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে।

৫ জুলাই : বাংলাদেশকে বন্যা নিয়ন্ত্রণে আন্তর্জাতিক ব্যাংক ৫ কোটি ৫১ লাখ ডলার সাহায্য দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে।

১০ জুলাই : সরকার দীর্ঘদিনের বেতন কাঠামোয় বেতন-বৈষম্য ব্যাপকভাবে সমতা আনয়ন করে। সরকার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য ১০টি জাতীয় বেতন স্কেল নির্ধারণ করে বেতন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করে।

১৩ জুলাই : বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে মরক্কো সরকার।

১৬ জুলাই : গঙ্গানদীর পানি বণ্টনের বিষয়ে দিল্লিতে ভারত ও বাংলাদেশের মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক শুরু হয়।

১৭ জুলাই : মৌরিতানিয়া, তিউনিসিয়া, আলজিরিয়া এই তিন দেশের সরকার বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।

২৬ জুলাই : বঙ্গবন্ধু যুগোস্লাভিয়ায় রাষ্ট্রীয় সফর এবং কানাডার রাজধানী অটোয়ায় কমনওয়েলথ সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে ১৮ দিনের জন্য বিদেশযাত্রা করেন।

৩১ জুলাই : ৫ দিনের সফর শেষে যুগোস্লাভিয়া থেকে কমনওয়েলথ সম্মেলনে যোগ দিতে কানাডার রাজধানী অটোয়ায় যান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

১৩ আগস্ট : বঙ্গবন্ধু ১৮ দিনের সফর শেষে দেশে ফেরেন।

২৩ আগস্ট : আইভরিকোস্টের সরকার বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।

২৯ আগস্ট : মওলানা ভাসানীর ৩ দফা দাবির পক্ষে জনসমর্থন প্রদর্শনে তাঁর অনুসারীরা সারা ঢাকা শহরে সাধারণ হরতাল পালন করে।

৬ সেপ্টেম্বর : প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জোট নিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের জন্য আলজিরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্সের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন।

৮ সেপ্টেম্বর : বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়নের সদস্যপদ লাভ করে।

৯ সেপ্টেম্বর : বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে স্বাধীন দেশ হিসেবে জায়ারের সরকার।

১০ সেপ্টেম্বর : প্রধানমন্ত্রী সম্মেলন শেষে দেশে ফিরে আসেন। সম্মেলনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন এবং প্রেসিডেন্ট বুমেদিন ও কিউবার প্রেসিডেন্ট ক্যাস্ট্রোর সাথে আলোচনা করেন।

১৫ সেপ্টেম্বর : সিরিয়া ও মিসর সরকার বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ বলে স্বীকৃতি দেয়।

১৯ সেপ্টেম্বর : আন্তর্জাতিক রেডক্রসের তত্ত্বাবধানে পাকিস্তানে আটক বাঙালিদের প্রথম দলটি একটি বিশেষ বিমানে ঢাকায় আসে।

২৪ সেপ্টেম্বর : নাইজারের সরকার বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

৩০ সেপ্টেম্বর : গিনি বিসাউয়ের সরকার বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।

২ অক্টোবর : মন্ত্রিসভায় দু'জন মহিলাসহ চারজন প্রতিমন্ত্রী নিয়োগ দেয়া হয়।

৬ অক্টোবর : ক্যামেরুন সরকার বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।

১০ অক্টোবর : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মাত্র ৪ মাসের মাথায় ব্রিগেডিয়ার শফিউল্লাহ ও জিয়াউর রহমানকে মেজর জেনারেল পদে পদোন্নতি দেন।

১৬ অক্টোবর : জর্ডানের সরকার বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।

১৭ অক্টোবর : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর কন্যা শেখ রেহানা ও পুত্র রাসেলসহ জাপানের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন।

১৯ অক্টোবর : জাপানের প্রধানমন্ত্রী কাকুই তানাকার সাথে বঙ্গবন্ধু দ্বিপক্ষীয় আলোচনায় মিলিত হন। বঙ্গবন্ধু যমুনা সেতু নির্মাণের জন্য জাপানের সহায়তার আশ্বাস পান।

২৩ অক্টোবর : দাহোমির সরকার স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে।

২৫ অক্টোবর : সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩৫৫৯৪ জন শিক্ষককে সরকারি কর্মচারী হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।

৪ নভেম্বর : কুয়েত সরকার বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।

৫ নভেম্বর : ইয়েমেন সরকার স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে বাংলাদেশকে।

১৯৭৪ সাল

১৮ জানুয়ারি : প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের সভাপতি পদ থেকে পদত্যাগ করেন। পদত্যাগের কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন– যেহেতু তাঁকে জাতির পিতা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে সুতরাং তাঁর পক্ষে আওয়ামী লীগ প্রধান থাকা সম্ভব নয়। তিনি শুধু আওয়ামী লীগের নন, তিনি সকলের।

২০ জানুয়ারি : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রস্তাবে বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্যমন্ত্রী এএইচএম কামরুজ্জামানকে আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং জনাব জিল্লুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচন করা হয়। সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর জনাব কামরুজ্জামান বাণিজ্যমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেন।

২৪ জানুয়ারি : বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন মুহম্মদ উল্লাহ। তিনি ঐদিনই রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

২৮ জানুয়ারি : স্পিকার মুহম্মদ উল্লাহ রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ায় স্পিকার পদ শূন্য হয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মালেক উকিল জাতীয় সংসদের স্পিকার পদে নির্বাচিত হন।

২৯ জানুয়ারি : যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটো ৫ দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে ঢাকায় আগমন করেন।

৩০ জানুয়ারি : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটো এক শীর্ষ বৈঠকে বসেন।

২ ফেব্রুয়ারি : বাংলাদেশ-যুগোস্লাভিয়া যুক্ত ইশতেহার ঘোষণা করা হয়। যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটো এদিনই ঢাকা ত্যাগ করেন।

৫ ফেব্রুয়ারি : বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে বিপুল ভোটে এদিন বিশেষ ক্ষমা বিলটি পাস হয়। এ আইনটি পাস হওয়ায় আওয়ামী লীগকে কঠোর সমালোচনায় পড়তে হয়।

১৯ ফেব্রুয়ারি : বাংলাদেশ ও ইরাকের মধ্যে প্রথম বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদিত হয়। এদিনই পানিসম্পদমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

২২ ফেব্রুয়ারি : যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি তারাই আমাদের স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ঐদিন পাকিস্তান সরকার বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। একই দিন তুরস্ক ও ইরানের সরকারদ্বয় বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।

২৩ ফেব্রুয়ারি : বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের লাহোরে ইসলামিক কনফারেন্সে যোগদানের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন। পাকিস্তানের তিন সামরিক বাহিনীর একটি সুসজ্জিত দল বঙ্গবন্ধুকে 'গার্ড অব অনার' প্রদান করে।

২৫ ফেব্রুয়ারি : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের লাহোর থেকে ঢাকায় ফেরেন। ঐদিনই মিসরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত এক সংক্ষিপ্ত রাষ্ট্রীয় সফরে ঢাকায় আসেন। রাষ্ট্রপতি মুহম্মদ উল্লাহ এবং বঙ্গবন্ধু তেজগাঁও বিমানবন্দরে তাকে সংবর্ধনা দেন।

২৭ ফেব্রুয়ারি : বাংলাদেশ সরকার অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে বিশেষ ক্ষমতা আইন প্রয়োগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে।

২ মার্চ : সরকারের নির্দেশে ৭৫টি ভুয়া তাঁত কারখানা বাতিল করা হয়।

৬ মার্চ : বিশেষ ক্ষমতা আইন প্রয়োগে ৯৮১টি ভুয়া সিমেন্ট ও ঢেউটিনের ডিলারশিপ বাতিল করা হয়।

৭ মার্চ : শেরেবাংলা নগরে নতুন সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়।

৮ মার্চ : আলজিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বুমেদিন হুয়ারি স্বল্পকালীন সফরে ঢাকায় আগমন করেন। সেদিনই তিনি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

১১ মার্চ : বাংলাদেশের প্রথম মিলিটারি একাডেমি কুমিল্লা সেনানিবাসে উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এ সময় কুমিল্লা সেনানিবাসের জিওসি ছিলেন মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান।

১৩ মার্চ : হঠাৎ করে বঙ্গবন্ধু অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর শ্বাসনালি দিয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছিল।

১৯ মার্চ : চিকিৎসকদের পরামর্শে বঙ্গবন্ধু চিকিৎসার জন্য মস্কোর উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন।

৫ এপ্রিল : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের এক গ্রুপ অপর গ্রুপের অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে ৭ জন ছাত্রলীগ কর্মী নিহত হয়। নিহত সকলেই সূর্যসেন হলের আবাসিক ছাত্র ছিল।

৭ এপ্রিল : ৭ ছাত্রলীগ কর্মী হত্যার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ছাত্রলীগ সম্পাদক শফিউল আলম প্রধানকে পুলিশ গ্রেফতার করে।

৯ এপ্রিল : পাকিস্তান-ভারত-বাংলাদেশ ত্রিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষর হয় দিল্লিতে। ঐদিন ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধী ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনের কথা ঘোষণা করেন।

১১ এপ্রিল : ২১ দিন চিকিৎসার পর মস্কো থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকায় ফিরে আসেন।

১৩ এপ্রিল : বঙ্গবন্ধু তাঁর মন্ত্রিপরিষদ এবং তাঁর দলের নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন।

১৪ এপ্রিল : মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ন্যাপ (ভাসানী), জাতীয় লীগ, বাংলাদেশ জাতীয় লীগ, বাংলাদেশ গণমুক্তি ইউনিয়ন, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি (লেনিনবাদী), শ্রমিক-কৃষক সাম্যবাদী দলের সমন্বয়ে একটি 'যুক্তফ্রন্ট' নামে ৬ দলীয় ঐক্যজোট গঠনের ঘোষণা দেয়া হয়।

২৩ এপ্রিল : মওলানা ভাসানী পল্টন ময়দানে এক জনসভাতে বঙ্গবন্ধু সরকারকে উৎখাত করার দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করেন।

২৫ এপ্রিল : বার্মার প্রেসিডেন্ট নে উইন বাংলাদেশে এক রাষ্ট্রীয় সফরে আসেন।

৪ মে : দেশের খাদ্যদ্রব্য দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্মূল্য, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় আলোচনা হয়।

১২ মে : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীসহ অন্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিয়ে ৫ দিনের সফরে দিল্লি যাত্রা করেন।

১৩ মে : নয়াদিল্লিতে ইন্দিরা গান্ধী ও শেখ মুজিবুর রহমান আনুষ্ঠানিক বৈঠকে বসেন।

১৪ মে : বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কয়েকটি আনুষ্ঠানিক বৈঠকের পর ভারত ও বাংলাদেশ একটি যুক্ত ঘোষণায় স্বাক্ষর করে।

১৬ মে : বঙ্গবন্ধু তাঁর সফরসঙ্গীদের নিয়ে ৫ দিনের সফর শেষে দিল্লি থেকে দেশে ফিরে আসেন।

২৫ মে : মহিলা প্রতিমন্ত্রী বদরুন্নেসা আহমেদ লন্ডনে মৃত্যুবরণ করেন।

৩১ মে : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মা সায়েরা খাতুন মৃত্যুবরণ করেন।

৩ জুন : জাতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশন শুরু হয়। ঐদিনই ৩টি শোক প্রস্তাব ও ৯টি বিল পেশ করা হয়।

৬ জুন : বাংলাদেশকে জাতিসংঘের সদস্যপদ প্রদানের প্রশ্নে স্বস্তি পরিষদের দ্বিতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

১০ জুন : এদিন নিরাপত্তা পরিষদের একটি বৈঠকে বাংলাদেশকে জাতিসংঘের সদস্যপদ প্রদানের জন্য সর্বসম্মত সুপারিশ গৃহীত হয়।

১১ জুন : চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের সভাপতি এমএ হান্নান মর্মান্তিক এক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন। এমএ হান্নান প্রথম বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র পাঠ করেন।

১৫ জুন : ভারতের রাষ্ট্রপতি ভিভি গিরি ৫ দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে ঢাকায় আসেন।

২৭ জুন : পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো ৩ দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে ঢাকায় আসেন। স্বাধীন বাংলাদেশে এটাই ভুট্টোর প্রথম সফর।

২৯ জুন : জুলফিকার আলী ভুট্টো সফর শেষে বাংলাদেশ ত্যাগ করেন।

১ জুলাই : বাংলাদেশ সরকারের শ্রম ও সমাজকল্যাণমন্ত্রী আলহাজ জহুর আহমেদ চৌধুরী মৃত্যুবরণ করেন।

৭ জুলাই : ছয়জন মন্ত্রী ও তিনজন প্রতিমন্ত্রীকে অপসারণ করে মন্ত্রিপরিষদের পুনর্বিন্যাস করা হয়।

৮ জুলাই : প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বন্যা প্লাবিত এলাকা হেলিকপ্টারে পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করেন।

১৭ জুলাই : বন্যা পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটে। দেশের বিভিন্ন নদ-নদীর পানি বিপদসীমায় অতিক্রম করে।

৩০ জুলাই : দেশের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে ঢাকাস্থ বিভিন্ন বিদেশী মিশনগুলো গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে।

৩১ জুলাই : প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় গণভবনে ত্রাণকেন্দ্র খোলা হয়।

১ আগস্ট : বন্যা পরিস্থিতির অবনতির কারণে রাজধানী ঢাকার সঙ্গে চট্টগ্রাম এবং সিলেটের সড়ক ও ট্রেন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়।

২ আগস্ট : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য সেনাবাহিনীকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেন।

৩ আগস্ট : বন্যাদুর্গত এলাকায় ত্রাণসামগ্রী পৌঁছানোর লক্ষ্যে সেনা, নৌ এবং বিমানবাহিনীকে নিয়োগ করে সরকার।

৬ আগস্ট : সর্বকালের রেকর্ড ভঙ্গ করে মেঘনা নদীর পানি বিপদসীমার ৫ ফুট উপর দিয়ে বয়ে যাওয়ার খবর পাওয়া যায়।

১১ আগস্ট : উত্তরাঞ্চলের সাথে রাজধানী ঢাকার সড়ক ও ট্রেন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

১৮ আগস্ট : প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান জাতির উদ্দেশে রেডিও ও টেলিভিশনে ভাষণ প্রদান করে জনগণকে সাহসের সঙ্গে বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে বলেন।

৭ সেপ্টেম্বর : রংপুর জেলার চিলমারী মহকুমার বন্যাদুর্গত এলাকাগুলো হেলিকপ্টারযোগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পরিদর্শন করেন।

১৬ সেপ্টেম্বর : বাংলাদেশের বন্যার্তদের সাহায্যে ১০ লাখ ডলার অনুদান প্রদানের কথা ঘোষণা করে আলজিরিয়ার সরকার।

১৭ সেপ্টেম্বর : জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ বাংলাদেশের সদস্যপদ অনুমোদন করে। বাংলাদেশ জাতিসংঘের ১৩৬তম সদস্যপদ লাভ করে।

২৩ সেপ্টেম্বর : জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিউইয়র্কের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন।

২৫ সেপ্টেম্বর : বাংলাদেশ জাতিসংঘ সদস্যপদ পাওয়ার পর প্রথম বাংলাদেশী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান ভাষণ দেন। সবচেয়ে বড় ব্যাপার বঙ্গবন্ধুই প্রথম ব্যক্তি যিনি জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বাংলায় ভাষণ দেন। ফলে বাংলাভাষা ও বাঙালি জাতির মর্যাদা বিশ্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

২৯ সেপ্টেম্বর : জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল কুর্ট ওয়াইল্ড হেইমের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান সাক্ষাৎ করেন।

১ অক্টোবর : মার্কিন প্রেসিডেন্ট জেরাল্ড ফোর্ডের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ভবন হোয়াইট হাউসে বঙ্গবন্ধু সাক্ষাতে মিলিত হন।

৩ অক্টোবর : বঙ্গবন্ধু যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরার পথে ৪ দিনের সফরে তিনি ইরাকের বাগদাদে পৌঁছান।

৬ অক্টোবর : ইরাকের প্রেসিডেন্ট বকরের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু আলোচনায় বসেন। সে দিনই বাংলাদেশ ও ইরাকের মধ্যে দুটি পারস্পরিক সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

৭ অক্টোবর : ১০ দিনের যুক্তরাষ্ট্র ও ইরাক সফর শেষ করে বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন।

৮ অক্টোবর : খাদ্য ও কৃষিবিষয়ক সংস্থা (FAO) খাদ্য সংকট মোকাবিলায় বাংলাদেশকে সহায়তা করার জন্য যথাসাধ্য খাদ্যশস্য প্রদানের আশ্বাস দেন।

২৬ অক্টোবর : বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে সরকারের অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ মন্ত্রিপরিষদ থেকে ইস্তফা দেন।

২৯ অক্টোবর : যুক্তরাষ্ট্র সরকারের পররাষ্ট্রবিষয়কমন্ত্রী ড. হেনরি কিসিঞ্জার দুদিনের সফরে বাংলাদেশে আসেন।

৩০ অক্টোবর : মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে গণভবনে দীর্ঘ ২ ঘণ্টা আলাপ-আলোচনা করেন।

৪ নভেম্বর : যমুনা সেতু নির্মাণের স্থান নির্ধারণ এবং নির্মাণের ব্যাপারে জাপানি বিশেষজ্ঞ ও বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা হয়।

৫ নভেম্বর : প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান ৯ দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে মিসর ও কুয়েতের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন।

১০ নভেম্বর : মিসরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত ও বঙ্গবন্ধুর মধ্যে কায়রোতে অনুষ্ঠিত হয় শীর্ষ আলাপ-আলোচনা বৈঠক। সেদিনই তিনি কায়রো থেকে কুয়েত চলে যান।

১১ নভেম্বর : কুয়েতের আমির এবং বঙ্গবন্ধুর মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

১৪ নভেম্বর : ৯ দিনের সফর শেষ করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন।

১৭ নভেম্বর : মওলানা ভাসানীর (ন্যাপ) দল থেকে একটি অংশ বের হয়ে নতুন দল ইউনাইটেড পিপলস্ পার্টি (ইউপিপি) গঠন করে।

২৬ নভেম্বর : পূর্ব জার্মানির প্রধানমন্ত্রী হোর্স্ট জিন্ডারম্যান ৪ দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে বাংলাদেশে আসেন।

৩ ডিসেম্বর : ঢাকা-দুবাই বিমান সার্ভিস চালু করা হয়। এদিন মালয়েশিয়ার রাজা টুংকু আব্দুল হালিম এবং রানী বারমায় সুবী ৪ দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে ঢাকায় আসেন।

৯ ডিসেম্বর : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এক বিশেষ সমাবর্তনে দেশের ৮ জন বরেণ্য ব্যক্তিকে অনারারি ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করে।

১৫ ডিসেম্বর : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতির উদ্দেশে রেডিও-টেলিভিশনে ভাষণ দেন। তিনি খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য দেশবাসীকে আহ্বান জানান।

১৮ ডিসেম্বর : তিন দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আবুধাবির উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন।

২০ ডিসেম্বর : বঙ্গবন্ধু তিন দিনের রাষ্ট্রীয় সফর শেষ করে ঢাকায় ফিরে আসেন।

১৯৭৫ সাল

৩ জানুয়ারি : বাংলাদেশ সরকার মজুদদার, কালোবাজারিদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার জন্য বিশেষ ক্ষমতাবিধি ১৯৭৫ ঘোষণা করে।

৫ জানুয়ারি : একদিনে ঢাকায় ৬টি হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

১০ জানুয়ারি : ভোলা জেলার জাতীয় সংসদ সদস্য জনাব মোতাহার উদ্দিন কতিপয় আততায়ীর গুলিতে নিহত হন।

২৫ জানুয়ারি : বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে শাসনতন্ত্রের চতুর্থ সংশোধনীতে একদলীয় শাসন ও রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকার কায়েমের বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ বিল পাসের পর কয়েকজন মন্ত্রী এবং সংসদ সদস্য নিজ পদে ইস্তফা দেন।

২ ফেব্রুয়ারি : যশোরের প্রাক্তন এমসিএ জনাব মোশাররফ হোসেন আততায়ীর গুলিতে নিহত হন।

৪ ফেব্রুয়ারি : সংসদ সদস্য মঈনুদ্দিনকে আততায়ীরা হত্যা করে।

১৮ ফব্রুয়ারি : বঙ্গবন্ধুর সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠক বসে। বৈঠকে সকল মন্ত্রীকে সম্পদের হিসাব রাষ্ট্রপতির নিকট দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়।

২৩ ফেব্রুয়ারি : নেত্রকোনার আওয়ামী লীগ এমপি আব্দুল খালেককে গুলি করে হত্যা করা হয়।

২৬ ফেব্রুয়ারি : দুষ্কৃতকারীরা আলীজান জুট মিলকে অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করে।

৮ মার্চ : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মওলানা ভাসানী কাগমারীতে এক বিরাট জনসভায় ভাষণ দেন।

২৬ মার্চ : সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ভাষণ দেন।

৩০ মার্চ : বঙ্গবন্ধুর পিতা শেখ লুৎফর রহমান টুঙ্গিপাড়ায় তাঁর গ্রামের বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর।

১৬ এপ্রিল : বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে মন্ত্রী পর্যায়ে ফারাক্কা বাঁধ প্রশ্নে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

১৮ এপ্রিল : গঙ্গা নদীতে ফারাক্কা বাঁধ চালু করার ব্যাপারে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে একটি অন্তবর্তীকালীন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

২৫ এপ্রিল : কমনওয়েলথ সম্মেলনে যোগদানের জন্য জ্যামাইকার কিংস্টনের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

১ মে : ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে বঙ্গবন্ধু দেখা করেন।

৩ মে : বঙ্গবন্ধু কমনওয়েলথ সম্মেলনে ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি পাকিস্তানকে বাংলাদেশের সম্পদ হস্তান্তরের আবেদন জানান।

১৯ মে : বাংলাদেশ ও গণচীনের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে স্থাপিত হয় সরাসরি বাণিজ্য চুক্তি।

২০ মে : বাংলাদেশ এবং ডব্লিউএফপির মধ্যে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

২৭ মে : সরকার ভেড়ামারায় ৪০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে।

৫ জুন : বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশকে ১৫ কোটি ডলার ঋণ প্রদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে।

১৬ জুন : বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৫ সালের নিউজ পেপার অধ্যাদেশের অধীনে মাত্র চারটি দৈনিক পত্রিকা ও ১২২টি সাময়িকী প্রকাশিত হবে বলে

জানানো হয়। বাকি সকল পত্রপত্রিকার ডিক্লারেশন বাতিল করা হয়। দৈনিক পত্রিকাগুলো হলো– দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক বাংলা, অবজারভার ও টাইমস।

১৯ জুন : রাষ্ট্রপতি দেশে ৬০টি জেলা ঘোষণা করেন। জানানো হয়, প্রত্যেক জেলায় একজন করে গভর্নর নিয়োগ করা হবে।

২২ জুন : বঙ্গবন্ধু সরকার ৬০ জেলার প্রশাসনিক কাঠামো ঘোষণা করে।

২৭ জুন : ঢাকা ও কাবুলের মধ্যে বিমান চলাচল চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

২৮ জুন : বাংলাদেশ সরকার একটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে বাংলাদেশ টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বোর্ড গঠন করে।

৪ জুলাই : সরকার দেশে ৩৩টি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী সরকারি সরবরাহ ও নিয়ন্ত্রণ আদেশ বহির্ভূত ঘোষণা করে।

৭ জুলাই : জাতীয় সংসদে জেলা প্রশাসন পুনর্গঠন সংক্রান্ত বিল পেশ করা হয়।

৯ জুলাই : জাতীয় সংসদ বাংলাদেশ জেলা পুনর্গঠন বিল অনুমোদন করে।

১৫ জুলাই : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ পুত্র শেখ কামালের সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিলা ক্রীড়াবিদ সুলতানার বিয়ে হয়।

১৬ জুলাই : সরকার রাষ্ট্রপতির আদেশে বাংলাদেশের ৬১ জেলার জন্য গভর্নর নিয়োগ করে তাদের নাম প্রকাশ করে।

১৮ জুলাই : বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় পুত্র শেখ জামালের সঙ্গে এটিএম সৈয়দ হোসেন সাহেবের তৃতীয় কন্যা পারভীন রোজীর বিয়ে হয়।

২১ জুলাই : বাংলাদেশের নবনিযুক্ত গভর্নরদের জন্য ২১ দিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

২৩ জুলাই : জাতিসংঘে বাংলাদেশের প্রথম স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত হন কেএম কায়সার।

২৬ জুলাই : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বঙ্গবন্ধুকে ডক্টরেট অব ল'ডিগ্রি প্রদানের যে প্রস্তাব দেওয়া হয়, তা তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হয়ে এ ডিগ্রি গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

৪ আগস্ট : রাষ্ট্রপতি ও বাকশালের চেয়ারম্যান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের ৬১টি জেলার বাকশালের সাধারণ সম্পাদক ও যুগ্ম সম্পাদকদের নাম ঘোষণা করা হয়।

৫ আগস্ট : বাংলাদেশের অন্যতম কবি, অসংখ্য গানের রচয়িতা সিকান্দার আবু জাফর মৃত্যুবরণ করেন।

৮ আগস্ট : বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিপরিষদে বন্দর, জাহাজ ও নৌপরিবহনমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হন।

১৫ আগস্ট : ইতিহাসের কলঙ্কময় দিন। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পরিবারের (শেখ হাসিনা ও শেখ রেহেনা ব্যতীত) সকলকে হত্যা করা হয়। বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহেনা তখন জার্মানিতে ছিলেন। তাই তারা বেঁচে যান। ঐদিনই সারা দেশে সামরিক শাসন জারি করে খন্দকার মোশতাক নিজেকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করেন। সেদিনই পাকিস্তান এই হত্যাযজ্ঞকে সমর্থন করে মোশতাককে স্বীকৃতি দেয়।

১৫ আগস্ট ১৯৭৫ জাতির জনকের মৃত্যু

১৯৭৫ সালের ১৪ আগস্ট দিবাগত রাতের শেষভাগে ১৫ আগস্টের ভোরে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বাংলাদেশের স্থপতি বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুষ্টিমেয় কিছুসংখ্যক উচ্চাভিলাষী অফিসার এবং কয়েকজন সশস্ত্র সৈন্যের হাতে নিহত হন তাঁর নিজ বাসভবনে। সেদিন তাঁর সহধর্মিণী মহিয়সী নারী বঙ্গজননী বেগম ফজিলাতুন্নেসা বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠপুত্র শেখ কামাল, শেখ জামাল, কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল, শেখ কামালের স্ত্রী নববধূ সুলতানা কামাল, শেখ জামালের স্ত্রী নববধূ রোজী কামাল, বঙ্গবন্ধুর ভাই শেখ নাসের, ভগ্নিপতি আবদুর রব সেরনিয়াবাত, শেখ ফজলুল হক মণি, মণির স্ত্রী আরজু মণি, নরুন্নেসা বেবী, সেরনিয়াবাতের পুত্র আরিফ সেরনিয়াবাত, কর্নেল জামিল উদ্দিন আহমেদ, আবদুর রব সেরনিয়াবাতের নাতি সুকান্ত আবদুল্লাহ বাবু, শহীদ সেরনিয়াবাত, আবদুল নঈম খান রেন্টুসহ প্রায় ২০ জনকে হত্যা করা হয়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ শেষ হলো তখন মাত্র ক'বছর। আমরা পেলাম একটি স্বাধীন দেশ। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটিতে তখন অভাব-অনটন ছিল। '৭৪ সালে অনাবৃষ্টি ও বন্যার কারণে দেশে খাদ্য ঘাটতি ঘটে। ১৭ জানুয়ারি ক্যাপ্টেন মনসুর আলীকে প্রধানমন্ত্রী করে ১৭ সদস্যবিশিষ্ট মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ১৯৭৫ সালের ২৬ মার্চ সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে এক জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দারিদ্র্য দূরীকরণ, দুর্নীতি দমন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ সমবায় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেন। সে লক্ষ্যে কাজ করতে গিয়ে তিনি সফলতাও অর্জন করেছেন। ১৯৭৪ সালে খাদ্যের মূল্য যা ছিল ১৯৭৫ সালে তা প্রায় এক-তৃতীয়াংশে নেমে এসেছিল। সে সময় তিনি প্রশাসনকে তৃণমূল পর্যায়ে এনে দেশের উন্নয়নে কাজ করছেন। কিন্তু স্বাধীনতার শত্রুরা এবং ক্ষমতালিপ্সুরা বঙ্গবন্ধুর এসব বিরোধিতা করে তাকে হত্যা করার চেষ্টা চালায়।

মার্কিন নথি থেকে জানা যায়, ১৯৭৫ সালে কেবল বাংলাদেশে নয়, সারা বিশ্বে চলে গোপন হত্যা ও হত্যাচেষ্টা। শুধু আগস্ট-সেপ্টেম্বর দু'মাসে বাংলাদেশ, লিবিয়া, চাঁদ, ইকুয়েডর, মিসর, সুদান, পর্তুগাল প্রভৃতি দেশে অভ্যুত্থান হয়।

১৯৭৫ সালের ২১ মে বিকেলে শেখ মুজিবের ওপর এক দফা হামলা হয়। মুজিব অক্ষত থাকলেও এ ঘটনায় অজ্ঞাত পরিচয় দুই ব্যক্তি আহত হন। নতুন টিভি স্টেশন পরিদর্শন শেষে শেখ মুজিব যখন বাসায় ফিরছিলেন। তখনই তাঁর ওপর আক্রমণ

চালানো হয়। রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবের নিরাপত্তায় নিয়োজিত উপ-পুলিশ সুপার মার্কিন দূতাবাসে কর্মরত পলিটিক্যাল অ্যাসোসিয়েটকে এ কথা নিশ্চিত করেন। এ ছাড়া সাংবাদিকরাও এ কথা দূতাবাসের তথ্য কর্মকর্তার কাছে বলেন।

আরো জানা যায়, শেখ মুজিব সপরিবারে নিহত হওয়ার অন্তত আট মাস আগে থেকেই দেশ-বিদেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো এ ধরনের তৎপরতার ওপর নজর রাখছিল। মুজিবকে হত্যার পরিকল্পনা হচ্ছে এ ধরনের তথ্য ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থার কাছে ছিল।

ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' ১৫ আগস্টের আগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে চলতে থাকা ষড়যন্ত্রের কথা অন্তত দু'বার বঙ্গবন্ধুকে জানিয়েছিল। কিন্তু বঙ্গবন্ধু সেসব কথা কখনো বিশ্বাস করেননি।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী থেকে চাকরিচ্যুত কিছু কর্মকর্তা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। তবে বঙ্গবন্ধু যদি সরকারি প্রেসিডেন্ট ভবনে থাকতেন তাহলে হয়তো এ হত্যাকাণ্ড নাও ঘটতে পারত। তিনি নিজ বাসভবনেই সর্বক্ষণ থাকতেন। সেখানে অল্পসংখ্যক রক্ষী ছিল। তারা সামরিক বাহিনীর এসব অসৎ অফিসারদের হাত থেকে বঙ্গবন্ধুকে রক্ষা করতে পারেনি।

১৪ আগস্ট দিবাগত রাতে লে. কর্নেল ফারুক ও লে. কর্নেল রশিদসহ বেশ কয়েকজন সামরিক বাহিনীর অফিসার ও ঢাকা ক্যান্টনমেন্টস্থ আর্মড কোরের প্রায় ৪০০ জন সৈন্যের একটি দল সামরিক মহড়া-কাম-প্রশিক্ষণের জন্য জয়দেবপুরে গিয়েছিল। মহড়া শেষে রাত সাড়ে ৩টার দিকে সামরিক দলটি কুর্মিটোলা বিমানবন্দরে এসে সমবেত হন। সেখানে লে. কর্নেল ফারুক সমবেত সৈন্যদের উদ্দেশে ভাষণ দেন। ভাষণে উপস্থিত সৈন্যদেরকে বঙ্গবন্ধু সরকারের বিরুদ্ধে কাজ করার ইন্ধন দেওয়া হয়। ফারুক বঙ্গবন্ধু সরকারের তীব্র সমালোচনা করে। ওই রাতেই বঙ্গবন্ধু সরকারকে উৎখাত করার ব্যাপারে সকলকে সম্মত করা হয়। তখন কোনো সৈন্যকে বলা হয়নি যে, বঙ্গবন্ধুকে বা তাঁর পরিবারের কাউকে হত্যা করা হবে। এ সময় বিমানবন্দরে সকল সামরিক সৈন্যের মাঝে যোগ দেন মেজর ডালিম।

আর্মড কোরের এ দলটিকে ৫টি ভাগে বিভক্ত করে একটি দলকে পাঠানো হয় বঙ্গবন্ধুর ছোটবোন জামাই আবদুর রব সেরনিয়াবাতের মিন্টো রোডের বাসায়। অপর একটি গ্রুপকে পাঠানো হয় শেখ ফজলুল হক মণির বাসায়। তৃতীয় গ্রুপটিকে পাঠানো হয় মেজর ডালিমের নেতৃত্বে ঢাকা বেতার ভবনে। লে. কর্নেল ফারুকের নেতৃত্বে প্রায় ১০০ জন সৈন্য বিমানবন্দরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থান নেয়। পঞ্চম গ্রুপটি দু'জন মেজরের নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাসা ঘেরাও করে। ভোর ৫টার দিকে সামরিক সৈন্যরা আবদুর রব সেরনিয়াবাতের বাসায় গুলিবর্ষণ করে। তখন একজন মেজর ও একজন নায়েকসহ বেশ কয়েকজন সেন্য সেরনিয়াবাতের বাসার ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করে। ঘটনা আঁচ করতে পেরে আবদুর রবের জ্যেষ্ঠপুত্র আবুল

হাসনাত আবদুল্লাহ স্টোররুমে লুকিয়ে ছিলেন। মেজরের নির্দেশে ড্রয়িংরুম থেকে সকলকে ব্রাশফায়ারে মেরে ফেলা হয়। প্রায় একই সময়ে ফজলুল হক মণির বাসায় আক্রমণ চালানো হয়। মণির দোতলা রুমে গিয়ে মণি ও তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে দু'দফা ব্রাশফায়ার করে মৃত্যু নিশ্চিত করা হয়।

ভোর সাড়ে ৫টার দিকে বঙ্গবন্ধুর বাসার চারদিকে গুলিবর্ষণ করা হয়। বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে প্রহরারত রক্ষীরা বাধা দিতে গেলে সকলকেই হত্যার উদ্দেশ্যে ব্রাশফায়ার করা হয়। ব্রাশফায়ার ও আহতদের চিৎকারের আওয়াজ শুনে শেখ কামাল দোতলা থেকে নিচের অভ্যর্থনা কক্ষে আসেন। ঠিক তখনই তাঁকে ব্রাশফায়ারে হত্যা করা হয়। দু'জন মেজর ও কিছু সংখ্যক সৈন্য নিয়ে বাসভবনের দোতলায় ওঠে। প্রথমে তারা বঙ্গবন্ধুকে পদত্যাগের প্রস্তাব করে। বঙ্গবন্ধু তাদের প্রস্তাবের উত্তরে বলেন, 'যে দেশের সেনাবাহিনীর সদস্যরা দেশের ও সেনাবাহিনীর আইনশৃঙ্খলা ও সংবিধান লঙ্ঘন করে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির বাসায় গোলাগুলির মাধ্যমে আক্রমণ করতে পারে আমি তার রাষ্ট্রপতি থাকতে চাই না। তবে তোমাদের মতো অধঃস্তন কর্মকর্তাদের নিকট আমি পদত্যাগপত্র পেশ করতে পারি না। অতএব সেনাবাহিনীর চিফ ও ডেপুটি চিফদের এখানে নিয়ে এলে আমি তাদের নিকট আমার ইস্তফা প্রদান করব।' পরে দু'জন মেজর বঙ্গবন্ধুকে বলে, সেক্ষেত্রে তাঁকে ঢাকা বেতার কেন্দ্রে গিয়ে বেতারে তাঁর পদত্যাগ ঘোষণা করতে হবে। তখন বঙ্গবন্ধু তাদেরকে বলেন যে, 'আমি বেতার কেন্দ্রে যেতে পারি তবে আমার সঙ্গে শেখ কামালকে যেতে দিতে হবে।' অবশ্য তখন ওই মেজর দু'জন এ শর্তে রাজি হয়ে তাঁকে দোতলায় নিয়ে যাওয়ার জন্য সিঁড়ির নিকট যেতেই হাবিলদার মোসলেহউদ্দিন অপর দুই বাসায় হত্যাযজ্ঞ শেষ করে বঙ্গবন্ধুর বাসায় এসে সিঁড়ির গোড়ার নিকট গিয়ে বঙ্গবন্ধুকে লক্ষ্য করে ব্রাশফায়ার করে। বঙ্গবন্ধুর পরনে তখন ধূসর রঙের চেক লুঙ্গি এবং গায়ে ছিল পাঞ্জাবি এবং হাতে ছিল পাইপ। বঙ্গবন্ধু সঙ্গে সঙ্গে লুটিয়ে পড়লেন সিঁড়িতে। সময় তখন প্রায় ৫.৪৫ মিনিট। বঙ্গবন্ধুর জীবন সমাপ্ত হলো। বেগম মুজিব তখন মুজিবকে অনুসরণ করে সামনে আসতেই তাঁকেও ব্রাশফায়ারে হত্যা করে। তারপরই চলে গণহত্যা, শেখ জামালকে খুব কাছ থেকে গুলি করে হত্যা করা হয়। শেখ কামাল ও শেখ জামালের স্ত্রীদেরও খুব কাছ থেকে হত্যা করা হয়। ১০ বছরের শেখ রাসেলের আকুতি খুনিদের হৃদয় গলাতে পারেনি। শেখ রাসেল খুনিদের ভয়ে প্রথমে ফার্নিসারের মধ্যে লুকিয়েছিল। সেখান থেকে সে দৌড়ে নিচে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানো বাড়ির কাজের লোকদের নিকট আশ্রয় নেয়। সে কাছের আবদুর রহমান রমা'র পেছনে গিয়ে হাত ধরে দাঁড়িয়েছিল। একটু পরেই একজন সৈন্য রমার হাত থেকে রাসেলকে ছাড়িয়ে বাড়ির বাইরে পাঠানোর জন্য নিয়ে যায়। রাসেল তখন ডুকরে কাঁদছিল। সে খুনিদের বলছিল, 'আমাকে জানে মেরে ফেলবে না, আমি বড় হয়ে আপনাদের বাসায় কাজের ছেলে হিসেবে থাকব। আমার হাসু আপা ও দুলাভাই জার্মানিতে আছে। আমি আপনাদের পায়ে পড়ি আপনারা আমাকে আপা ও দুলাভাইয়ের নিকট পাঠিয়ে দিন।' ওই

সামরিক সৈন্যটির হয়তো মনে একটু মায়া হয়েছিল, যার জন্য রাসেলকে বাইরে নিয়ে বাড়ির গেটস্থ সেন্ট্রিবক্সে লুকিয়ে রাখে। কিন্তু প্রায় আধাঘণ্টা পর একজন মেজর শেখ রাসেলকে সেখানে দেখে ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে বাড়ির ভেতরে এনে রাসেলের মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে তাকে হত্যা করে।

সে রাতেই বাংলাদেশ রেডিওতে একজন মেজরের কণ্ঠে ঘোষণা করা হয়– শেখ মুজিবকে সরিয়ে খন্দকার মোশতাককে রাষ্ট্রপতি করা হয়েছে।

মুজিবকে হত্যার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পাকিস্তান সরকার বাংলাদেশকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেয়। একই সঙ্গে তারা মুসলিম বিশ্ব এবং তৃতীয় বিশ্বের সকল দেশের প্রতিও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার আহ্বান জানায়। খন্দকার মোশতাক নতুন রাষ্ট্রপতি হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণের পর পাকিস্তান বাংলাদেশকে ৫০ হাজার মেট্রিক টন চাল ও দেড় কোটি গজ কাপড় বন্ধুত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ উপহার দেয়।

বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার দীর্ঘদিনেও নিষ্পত্তি হয়নি। ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর ওই বছরের ২১ অক্টোবর আবুল হাসনাত আবদুল্লাহর স্ত্রী সাহান আরা বেগম বাদী হয়ে মেজর শাহরিয়ার, মেজর আজিজ পাশা, ক্যাপ্টেন মাজেদ, ক্যাপ্টেন নূরুল হুদা হিরুকে আসামি করে রমনা থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। কারণ ১৫ আগস্ট আবদুর রব সেরনিয়াবাতের বাড়িতে যে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল সামরিক কর্মকর্তারা সে সময় আবুল হাসনাত আবদুল্লাহর মাসহ অনেকেই গুরুতর আহত হয়েছিলেন। তখন রমনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোনো মামলা করেননি। তাই আবুল হাসনাতের স্ত্রী এ মামলা দীর্ঘদিন পরে হলেও রুজু করেন। বর্তমানে মামলাগুলো বিচারাধীন।

বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের হত্যাকারী ও ষড়যন্ত্রকারীদের অনেকেই মৃত্যুবরণ করেছেন, কয়েকজন রয়েছেন জেলখানায় এবং বিদেশেও অবস্থান করছেন বেশ ক'জন। বাংলার মানুষ কলঙ্কময় ১৫ আগস্টকে কোনোভাবেই ভুলতে পারে না। জাতির মহান নেতা বঙ্গবন্ধুকে কখনোই ভোলা যাবে না।

১৫ আগস্ট হত্যাকারীরা ২০ জনকে হত্যার পাশাপাশি অনেককে আহত করেছিল। তাঁদের একজন বঙ্গবন্ধুর ভাগ্নী হামিদা সেরনিয়াবাত 'দশটি বুলেটের চিহ্ন নিয়ে এখনো বেঁচে আছি' প্রবন্ধে সেদিনের ঘটনাটি এভাবেই বর্ণনা করেন–

"বিভীষিকাময় সেই কালো রাতের দুর্বিসহ স্মৃতি এখনো আমাকে তাড়িয়ে বেড়ায়। একটি মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারি না সেই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের দুঃসহ দৃশ্য। চোখের সামনে ঝাঁঝরা হয়ে গেল জন্মদাতা পিতার শরীর। ১৪ বছরের কিশোরী বোন বেবী, ১০ বছরের ছোট ভাই আরিফসহ পরিবারের সকল সদস্য লুটিয়ে পড়ল ঘাতকের ব্রাশফায়ারে। বড় ভাই (আবুল হাসনাত আবদুল্লাহর সাড়ে ৪ বছরের ছেলে অবোধ শিশু বাবুর জীবনও মুহূর্তের মধ্যে কেড়ে নিল উত্তপ্ত বুলেট। জল্লাদের হাত একটিবারের জন্যও কেঁপে উঠেনি ফুলের মতো শিশু বাবু রাসেলের হৃদপিণ্ড এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিতে?

শরীরে দশ দশটি বুলেটের দগদগে ক্ষত চিহ্ন নিয়ে বেঁচে আছি। কিন্তু এ কেমন বেঁচে থাকা? চোখের সামনে পলকে পলকে নাচে ঘাতকের উদ্যত বন্দুকের নল, নিঃশ্বাসে এখনো লাগে বারুদের গন্ধ, মনের পর্দায় ভেসে ওঠে জনকের রক্তাক্ত শরীর, রক্তের প্লাবনে ভাসমান প্রিয় মুখগুলো।

স্বামী আকরাম আলী খানের স্টিভিডোরিং ব্যবসা। সেই সুবাদেই বেশ ক'বছর ধরে চট্টগ্রামেই থাকা। আসিফ এবং দীপ-কে নিয়েই বেঁচে আছি। চাওয়া-পাওয়ার আর কিছু নেই। কী-ইবা চাওয়ার আছে আমার, যা হারিয়েছি তা তো আর ফিরে পাব না।

২৭ নম্বর মিন্টো রোডের বাড়ি। আমার দাদির মৃত্যুবার্ষিকীর অনুষ্ঠানের পর রাতের খাবার শেষ করে অনেক রাত পর্যন্ত আব্বা, বড় ভাই ও শহীদ ভাই কথাবার্তা বললেন। এরপর যে যার মতো যান ঘুমোতে। প্রচণ্ড শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। চারদিক থেকে গুলি। ঝনঝন করে ভেঙে পড়ছে জানালার কাচ। তখন গভীর রাত কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না কী হচ্ছে, কী ঘটছে। ছোট বোন বেবীকে নিয়ে দৌড়ে গেলাম আব্বা-আম্মার রুমে। ইতিমধ্যেই সবাই জেগে গেছে।

ভাই-ভাবী-বাচ্চারাও চলে এসেছে আব্বার রুমে। সবাই স্তব্দ, কিংকর্তব্যবিমূঢ়। স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্রে বৃষ্টির মতো গুলি হচ্ছে। মা আব্বাকে বললেন, 'মিয়া ভাইয়ের (বঙ্গবন্ধু) বাসায় ফোন করে দেখো।' আব্বা বড় মামার সঙ্গে (বঙ্গবন্ধু) বাসায় ফোন করে দেখো।'

আব্বা বড় মামার সঙ্গে (বঙ্গবন্ধু) ফোনে কথা বললেন। জানি না, কী কথা হয়েছিল। মিয়া ভাই কী বললেন আম্মা জানতে চাইলেই আব্বা বললেন, 'আমাদের মতো অবস্থা তাঁরও। সেখানেও গুলি চলছে।

বেবী আবার ফোন করে বড় মামাকে বলল, 'মামা, আমাদের বাঁচান'।

শেখ মণি ভাইয়ের বাসায় ফোন করা হলো। মা বললেন, 'বাবা মণি, আমাদের বাসায় খুব গুলি হচ্ছে।' মণি ভাই বললেন, 'আমি দেখছি।'

শেষ করতে পারেননি কথা। ঘাতকের গুলি বিদীর্ণ করেছে তার দেহ। বর্বর ঘাতকরা ঠিক একই সময় একই সঙ্গে হামলা চালায় বঙ্গবন্ধু, সেরনিয়াবাত ও শেখ মণির বাসায়। বড় ভাই আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ (বর্তমান চিফ হুইপ) চিৎকার করে বললেন আক্রমণকারীদের–'খবরদার উপরে ওঠার চেষ্টা করবে না।'

একটু পরই সিঁড়িতে অসংখ্য বুটের শব্দ উঠে আসছে বর্বররা। সারেন্ডার... সারেন্ডার বলে চিৎকার করতে করতে অস্ত্র উঁচিয়ে রুমে ঢুকে পড়ে দশ-পনেরোজনের ঘাতকের দল। সবাই হাত উঁচু করে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ওরা বলল, 'ভয় পাবেন না, সবাই নিচে নেমে আসুন।'

চৌদ্দ বছরের কিশোরী বেবী বলে উঠল, 'ভয় পাব কেন? আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় পাই না।'

ভীষণ একরোখা আর সাহসী ছিল আমার সেই বোনটি। সবাই নামছি সিঁড়ি বেয়ে।

আব্বা আঁকড়ে ধরে ছিলেন আমাদের হাত। আমরা নিচে নেমে এলাম। আমির হোসেন আমুর খালাতো ভাই নান্টু (সে রাতে আমাদের বাসায় ছিল) ছুটে এসে বলে, 'চাচা, আমাদের কী হবে?'

আব্বা শান্তভাবে বললেন, 'আল্লাহ যা করেন তাই হবে।'

ঘাতকরা আমাদের সবাইকে নিচের ড্রয়িংরুমে ঢুকতে বলল, এ সময় জুনিয়র একজন অফিসার নাম জিজ্ঞেস করলো আব্বাকে।

'আমার নাম আবদুর রব সেরনিয়াবাত।'– আব্বা বললেন।

সৈন্যটি একটু হেসে বলল, 'ঠিক আছে ভেতরে যান।'

ড্রয়িংরুমে ঢুকেই দেখলাম ঘাতকবাহিনী যুদ্ধের পজিশনে ঘিরে আছে আমাদের। আমরা সবাই ইতস্তত দাঁড়িয়ে। আব্বা জানতে চাইলেন, 'আপনাদের কমান্ডিং অফিসার কে?'

ওদের একজন বলল, 'আমাদের কোনো কমান্ডিং অফিসার নেই।'

পরে জেনেছি মেজর বজলুল হুদা ও কর্নেল শাহরিয়ার তখন বাইরে দাঁড়িয়ে কমান্ড করছিল।

মা জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনারা কি আমাদের মারবেন?'

উত্তর দিল ঘাতক দলের একজন, 'না, আপনাদের মারব কেন?'

তার কথা শেষ হবার আগেই মাত্র হাত দুয়েক দূর থেকে শুরু করল ব্রাশফায়ার। ঠাঁ-ঠাঁ শব্দের মধ্যে আমি চিৎকার করে জড়িয়ে ধরলাম আব্বাকে। একটু থেমে আবার চলল ব্রাশফায়ার... লুটিয়ে পড়লাম মাটিতে। মনে হলো আব্বাও পড়লেন উপুড় হয়ে। কানের কাছে আর্তনাদ, অস্পষ্ট গোঙানি... রক্তে ভেসে যাচ্ছে ড্রয়িং রুম। পানি পানি... এরপর আর জানি না কিছুই।

জ্ঞান ফিরল হাসপাতালে। কিছুই মনে করতে পারছিলাম না, আমি এখানে কেন! ডাক্তারদের কথাবার্তা কানে আসে অস্পষ্ট। শুনলাম আব্বা, বড় মামা (বঙ্গবন্ধু), মণি ভাই, আরজু আপা– কেউ বেঁচে নেই। প্রচণ্ড চিৎকার করে জ্ঞান হারালাম আবার। জ্ঞান আসে, চোখে ভেসে ওঠে রক্তের স্রোত, ঘাতকের মুখ, আবার জ্ঞান হারাই। শরীরে দশটি গুলির ক্ষত। এভাবে চেতন-অচেতন অবস্থায় কাটে চৌদ্দ দিন, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পোস্ট অপারেটিভ ওয়ার্ডে। পুরোপুরি যখন জ্ঞান ফিরল তখন জানলাম, আমার মা-ভাবী ও বোন রীনা বেঁচে আছেন। পাশের ওয়ার্ডেই চিকিৎসাধীন। কিন্তু আব্বা নেই, ভাই আরিফ সেরনিয়াবাত নেই, বোন বেবী নেই, বাবু নেই, নেই আরজু আপা, নেই...।

ঘাতকরা কেড়ে নিয়েছে সবকিছু, স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকল ধীরে ধীরে। পরে জেনেছি আমাদের বাসায় নিরস্ত্র করে রাখা নিরাপত্তা রক্ষীরা দুর্বত্তদের চলে যাওয়ার পরপরই রমনা থানায় ঘটনা জানায়। রমনা থানার তৎকালীন ওসি ঝুঁকি নিয়ে থানার পুলিশ ভ্যানে করে আমাদেরকে পাঠিয়েছিলেন হাসপাতালে। পরের দিন আমি মাকে দেখতে পেলাম। হাসপাতালের চক্ষু বিভাগের একটি কক্ষে রাখা হলো বেঁচে থাকা

আমাদের চারজনকে। বারোজন পুলিশ দিচ্ছে নিশ্ছিদ্র পাহারা। উপরের নির্দেশ ছাড়া কেউ ঢুকতে পারে না কক্ষে। এ অবস্থায় আমাদের শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটতে লাগল দ্রুত। ডাক্তাররা কর্তৃপক্ষকে জানাল, এ অবস্থা চলতে থাকলে আমাদের বাঁচানো যাবে না। পরিচিতদের রোগীর কাছে আসতে দেওয়া উচিত। নইলে এদের নিয়ে যান সিএমএইচে। মাহুতটুলির শ্বশুর বাড়িতে থাকত আমার মেজবোন মঞ্জু আপা, ২২ দিন পর মঞ্জু আপা আসতে পারলেন আমাদের কাছে। অতি আপনজনদের সঙ্গে এই প্রথম সাক্ষাৎ, নিঃশব্দে। তার কাছে জানলাম বড় ভাই হাসনাত আবদুল্লাহ বেঁচে আছেন। ঘটনার সময় ঘাতকদের দৃষ্টি এড়িয়ে তিনি ঢুকে পড়েছিলেন অন্য একটি রুমে। ছোট ভাই খোকন, বড় ভাইয়ের দুই শিশু সন্তান কান্তা আর সাদেককে নিয়ে পায়ে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় অনেক কষ্টে মঞ্জু আপার বাসায় যায়। এর ক'দিন পর কমলাপুরের বাসা থেকে এলেন সেজ বোন শিউলি আর দুলাভাই। এভাবে ধীরে ধীরে দেখা হতে লাগল আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে। তখনো আমরা বন্দি।

ঘাতক দল তখনো খুঁজছে বড় ভাইকে। তার সন্ধানে আত্মীয়দের বাসায় চালিয়েছে তল্লাশি। মা, ভাবী, রীনা কিছুটা সুস্থ হয়ে ওঠেন। এর মাঝে চলে গেল প্রায় এক মাস। গুলিতে মায়ের ডান ঘাড়ের হাড় ভেঙে গেছে, চিবুক কেটে গেছে। সেলাই দিয়ে জোড়া লাগানো হয়েছে কোনো রকমে, ডান হাত অকেজো। রীনার জখম শুকিয়ে আসতে শুরু করেছে। কিন্তু আমার অবস্থা শোচনীয় তখনো। শরীরে দশটি গুলির আঘাতে ডান পা সম্পূর্ণ অচল। বসার শক্তিটুকুও নেই। হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন ডাক্তাররা, তখন অক্টোবর। কিন্তু ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আদেশ দিলেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে ভাবীকে রেখে মাকে, আমাকে এবং রীনাকে ছেড়ে দিতে। কারণ বড় ভাইকে এখনো ধরতে পারেনি খুনিরা। জীবিত বা মৃত হাসনাতকে যে তাদের বড় দরকার। ভাবী শাহানারা বেগমকে জিম্মি করে রাখতে চায় খুনিরা। কিন্তু মা অস্বীকার করলেন ভাবীকে ছাড়া হাসপাতাল ছাড়তে। বললেন, সেই রাতেই তো আমাদের সবকিছু শেষ হয়ে গেছে। এখন আর কিসের ভয়। মা আবার সংজ্ঞা হারালেন, জ্ঞান ফেরেনি সারাদিন। মঞ্জু আপা-দুলাভাই ডাক্তারকে বললেন, এদেরকে হাসপাতাল থেকে বের করার ব্যবস্থা করুন। মেডিকেলে এদের কোনো চিকিৎসা নেই। এর ক'দিন পর দুলাভাই ব্যারিস্টার মঈনুল হোসেনের সহায়তায় আমাদের সবাইকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করার ব্যবস্থা করলেন।

দিনটি ছিল একত্রিশ অক্টোবর পঁচাত্তর। আমরা ছিলাম বন্দি, তৎকালীন সরকারের জিম্মায়। কিন্তু হাসপাতালের পাওনা যাবতীয় চিকিৎসা খরচ বাবদ প্রায় বিশ হাজার টাকা পরিশোধ করা হলো অনেক কষ্টে, বোনদের সহায়তায়। আব্বার ব্যাংকে ছিল না পাঁচশটি টাকাও। আমাদের বরিশালের বাড়ি এবং মিন্টো রোডের সরকারি বাড়ি তখন সিলগালা করা, খুনিদের দখলে।"

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
(১৯৪৯-১৯৯৯)

১৯৪৯ : জুন ২৩ আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক (টাঙ্গাইল) এবং যুগ্ম সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান, খোন্দকার মোশতাক আহমেদ ও একে রফিকুল হোসেন (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) ১৯৫৫ সালের ২৪ অক্টোবর ঢাকার রূপমহল সিনেমা হলে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল অধিবেশনে আওয়ামী 'মুসলিম' লীগ থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগ নাম গ্রহণ।

১৯৫০ : ইস্ট বেঙ্গল স্টেট একুইজিশন অ্যান্ড টেনান্সি অ্যাক্টের অধীনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলুপ্ত।

১৯৫০ : মূলনীতি কমিটির (Basic Principles Committee) রিপোর্ট উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের স্থলে কেন্দ্রের হাতে অধিক ক্ষমতাদানের সুপারিশ।

১৯৫০ : ঢাকায় গ্র্যান্ড ন্যাশনাল কনভেনশনে উর্দু ও বাংলাভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা এবং পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিনামাসহ বিকল্প মূলনীতি প্রস্তাব গ্রহণ।

১৯৫১ : মার্চ পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগের প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মাহমুদ আলী, সাধারণ সম্পাদক অলি আহাদ।

১৯৫২ : জানুয়ারি ২৬ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তি ভঙ্গ করে পল্টন ময়দানের জনসভায় খাজা নাজিমুদ্দিনের ঘোষণা-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু।

১৯৫২ : জানুয়ারি ৩০ সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ গঠন। আহ্বায়ক, কাজী গোলাম মাহবুব।

১৯৫২ : ফেব্রুয়ারি ২১ সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ কর্তৃক বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতির দাবিতে প্রদেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান। সরকার কর্তৃক ১৪৪ ধারা জারি। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ছাত্রদের বিক্ষোভ মিছিল। মিছিলে পুলিশের বেপরোয়া গুলি চালানো। পুলিশের গুলিতে

শহীদ হন আবদুল জব্বার, আবদুল বরকত, রফিক, সফিউর রহমান, ওয়াজিউল্লাহ।

১৯৫২ : এপ্রিল পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা।

১৯৫৩ : জানুয়ারি গণতন্ত্রী দলের প্রতিষ্ঠা। সভাপতি কাজী মোহাম্মদ দানেশ। মাহমুদ আলী সাধারণ সম্পাদক।

১৯৫৩ : একে শেরেবাংলা ফজলুল হক কর্তৃক কৃষক শ্রমিক পার্টি প্রতিষ্ঠা।

১৯৫৪ : মার্চ পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন। এ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে ২১ দফা কর্মসূচি নিয়ে হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্টের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিরাট বিজয়। ৩০৯টি আসনের মধ্যে মুসলিম লীগের মাত্র ৯টি আসন লাভ।

১৯৫৪ : এপ্রিল একে ফজলুল হকের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠন।

১৯৫৪ : মে ৩০ কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল এবং '৯২-ক ধারা জারি। মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা পূর্ববাংলার গভর্নর নিযুক্ত।

১৯৫৪ : অক্টোবর ২৫ গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ কর্তৃক পাকিস্তান গণপরিষদ বাতিল ঘোষণা।

১৯৫৪ : পাকিস্তানের বাগদাদ প্যাক্ট (পরবর্তী সেন্টো)-এ যোগদান।

১৯৫৫ : জুন ৯ আবু হোসেন মন্ত্রিসভা গঠন।

১৯৫৫ : জুলাই ১০ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানি নেতাদের মধ্যে ৫ দফা শর্তযুক্ত মারী চুক্তি সম্পাদিত।

১৯৫৫ : পশ্চিম পাকিস্তানের চারটি প্রদেশকে একীভূত করে এক ইউনিট গঠন।

১৯৫৫ : পাকিস্তানের সিয়াটো সামরিক জোটে যোগদান।

১৯৫৬ : মার্চ পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্র প্রণীত। পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্র হিসেবে আখ্যায়িত হয় এবং এক ধরনের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাধীন পার্লামেন্টারি সরকার পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়। বাংলাভাষা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

১৯৫৬ : আগস্ট জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে যুক্ত নির্বাচন (Joint Electorates) ব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষে আওয়ামী লীগের আহ্বান।

১৯৫৬-৫৭: কেন্দ্রে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে ১৯৫৬ সালের ১২ সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগ রিপাবলিকান কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন। মন্ত্রিসভায় প্রথমবারের মতো পাকিস্তানের উভয় অংশ থেকে সমসংখ্যক সদস্য নেওয়া হয়। কিন্তু পশ্চিমা কায়েমি স্বার্থান্বেষী মহলের ষড়যন্ত্রের কারণে এক বছরের অধিককাল মন্ত্রিসভা ক্ষমতাসীন থাকতে সক্ষম হয়নি।

১৯৫৬ : সেপ্টেম্বর আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লীগ সরকার গঠন।

১৯৫৬ : অক্টোবর পাকিস্তানের জাতীয় সংসদের যুক্ত নির্বাচন আইন পাস।

১৯৫৬ : ডিসেম্বর সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ছাত্রদের উদ্দেশে সোহরাওয়ার্দীর বক্তৃতায় পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতি বিশেষ করে পশ্চিমা সামরিক জোটে যোগদানের সপক্ষে যুক্তি প্রদান।

১৯৫৭ : ফেব্রুয়ারি ৬-১০ আওয়ামী লীগের কাগমারী (টাঙ্গাইল) সম্মেলন অনুষ্ঠিত। এই সম্মেলনে বৈদেশিক নীতির প্রশ্নে দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে পড়ে। স্বাধীন ও জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির সমর্থক এবং প্রগতিশীল হিসেবে পরিচিত অংশ মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়। একই বছর ২৫ জুলাই এরা ঢাকার রূপমহল সিনেমাহলে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে ন্যাশনাল আওয়ামী লীগ পার্টি (ন্যাপ) গঠন করে।

১৯৫৮ : অক্টোবর ৭ মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা কর্তৃক ক্ষমতা দখল ও সামরিক আইন জারি।

১৯৫৮ : অক্টোবর ২৭ জেনারেল আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখল। ইস্কান্দার মির্জা বিতাড়িত।

১৯৫৯ : আগস্ট ৬ জেনারেল আইয়ুব খান কর্তৃক নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অযোগ্যতা সম্পর্কিত আদেশ এবডো (Elective Bodies Disqualification Order) ঘোষণা। এর অধীনে সোহরাওয়ার্দীর ৭৮ জন রাজনৈতিক নেতা ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত অযোগ্য ঘোষিত হন।

১৯৫৯ : অক্টোবর ২৬ জেনারেল আইয়ুব খান কর্তৃক মৌলিক গণতন্ত্রে অধ্যাদেশ ঘোষণা। এর অধীনে চার স্তরবিশিষ্ট একটি কাঠামো প্রবর্তন এবং ইউনিয়ন পরিষদ ব্যতীত নির্বাচন (দেশের প্রেসিডেন্ট ও জাতীয় সংসদসহ) পরোক্ষ পদ্ধতিতে একটি বিশেষ নির্বাচনীমণ্ডলী (Electoral college) কর্তৃক সম্পন্নের ব্যবস্থা।

১৯৬১ : ইউনিভার্সিটি অর্ডিন্যান্স জারি। এর অধীনে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন হরণ করে সরকারি নিয়ন্ত্রণে প্রতিষ্ঠা করা হয়।

১৯৬১ : রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী।

১৯৬২ : জানুয়ারি ৩১ পাকিস্তান নিরাপত্তা আইনে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গ্রেফতার।

১৯৬২ : জুন পাকিস্তানের দ্বিতীয় শাসনতন্ত্র প্রণীত যা আইয়ুব সংবিধান নামে খ্যাত। এর দ্বারা প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির শাসন ব্যবস্থাধীনে ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনসহ সামরিক-বেসামরিক আমলা কর্তৃক প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং ক্ষমতা কাঠামোর সকল স্তরে বাঙালির অংশগ্রহণ উপেক্ষিত হয়।

১৯৬২ : জুন ২৪ 'আইয়ুব সংবিধান' প্রত্যাখ্যান করে একটি নতুন শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দাবিতে ৯ নেতার বিবৃতি। এরা হচ্ছেন শেখ মুজিবুর রহমান,

হামিদুল হক চৌধুরী, আবু হোসেন সরকার, নূরুল আমিন, আতাউর রহমান খান, মাহমুদ আলী, ইউসুফ আলী চৌধুরী, (মোহন মিয়া), সৈয়দ আজিজুল হক, পীর মোহসেন উদ্দিন আহমেদ (দুদু মিয়া)।

১৯৬২ : জুলাই ১৫ রাজনৈতিক দল গঠন ও সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাজনৈতিক দলবিধি আইন পাস।

১৯৬২ : সেপ্টেম্বর ১৭ হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন। সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল পালিত। পুলিশের গুলিতে একজনের মৃত্যু, অনেককে গ্রেফতার।

১৯৬২ : সেপ্টেম্বর ২৫ আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম এবং মুসলিম লীগের একটি অংশের সমন্বয়ে লাহোরে আইয়ুববিরোধী মোর্চা ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (এনডিএফ) গঠিত।

১৯৬২ : অক্টোবর ২৬ পাকিস্তানের গভর্নর পদে মোনায়েম খানের নিযুক্তি।

১৯৬৩ : সেপ্টেম্বর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন অর্ডিন্যান্স জারি। এর অধীনে সরকার যে কোনো প্রকাশনা বন্ধ বা বাতিল ঘোষণার ক্ষমতা লাভ করে। এই আইন প্রয়োগ করে ১৯৬৬ সালের জুন মাসে ইত্তেফাক পত্রিকার প্রকাশনা নিষিদ্ধ এবং এর স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়।

১৯৬৩ : ডিসেম্বর ৫ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যু।

১৯৬৪ : জানুয়ারি ঢাকায় হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি গঠন। দাঙ্গা প্রতিরোধে আমীর হোসেন চৌধুরী শহীদ হন।

১৯৬৪ : মার্চ সার্বজনীন ভোটাধিকার আদায়ের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের নেতাদের দাবি।

১৯৬৪ : আইয়ুব সরকারের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় ছাত্র সংগঠন ন্যাশনাল স্টুডেন্টস ফেডারেশন (এনএসএফ) প্রতিষ্ঠা।

১৯৬৪ : জুলাই ২১ আওয়ামী লীগ পার্টি, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম ও জামিয়াতে ইসলামী এই পাঁচটি দল নিয়ে সম্মিলিত বিরোধী দল (কপ) গঠিত। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে 'কপের' মনোনয়নে আইয়ুবের বিরুদ্ধে ফাতেমা জিন্নাহর নির্বাচনী প্রতিযোগিতা।

১৯৬৫ : জানুয়ারি ২ একটি নির্বাচনীমণ্ডলীর মাধ্যমে পরোক্ষ পদ্ধতিতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠান। মিস ফাতেমা জিন্নাহকে পরাজিত করে আইয়ুব খান নির্বাচিত।

১৯৬৫ : সেপ্টেম্বর ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ। এ সময়ে 'পূর্ব' পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার ভার পশ্চিম পাকিস্তানের 'ওপর' 'তত্ত্বের' অসারত্ব প্রমাণিত হয়।

১৯৬৬ : ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় বৈঠকে শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবি পেশ।

১৯৬৬ : জুন ৭ রাজবন্দিদের মুক্তি ও পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে আওয়ামী লীগ আহূত হরতাল পালিত। ৬ দফা এ আন্দোলনে মনু মিয়াসহ বেশকিছু শ্রমিক নিহত।

১৯৬৬ : সরকার কর্তৃক রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচার হ্রাস কিংবা বর্জনের সিদ্ধান্ত। এর প্রতিবাদে কুদরত-ই-খোদা, কাজী মোতাহার হোসেন, বেগম সুফিয়া কামাল, জয়নুল আবেদীনসহ বেশ কয়েকজন শিল্পী-সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীর বিবৃতি দান।

১৯৬৬-৬৮: আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে মস্কো ও পিকিং কেন্দ্রিক বিভক্তি এবং পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও আন্দোলন প্রশ্নে মতপার্থক্য থেকে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি এ সময়ে দ্বি-ধারায় আনুষ্ঠানিকভাবে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এক অংশের নেতৃত্বে থাকেন মওলানা ভাসানী (পিকিংপন্থী) এবং অন্য অংশের নেতৃত্ব দেন ওয়ালী খান ও অধ্যাপক মোজাফফর আহম্মদ (মস্কোপন্থী)।

১৯৬৭ : মে কাউন্সিল মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম, কৃষক শ্রমিক পার্টি এনডিএফ ও আওয়ামী লীগের একটি অংশ নিয়ে পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট (পিডিএম) গঠিত।

১৯৬৮ : আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। এতে ৩৩ বাঙালি আমলা সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য ও রাজনীতিকের বিরুদ্ধে ভারতের সহযোগিতায় পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগ এনে তাদের গ্রেফতার করা হয়। এদের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমান, লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন, আহমেদ ফজলুল রহমান সিএসপি, রুহুল কুদ্দুস সিএসপি, সার্জেন্ট জহুরুল হক অন্যতম। এদের বিচার অনুষ্ঠান সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালিদের মধ্যে পাকিস্তানবিরোধী এক অভূতপূর্ব জাতীয়তাবাদী চেতনার স্ফূরণ ঘটে।

১৯৬৮ : জুন 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থনে শেখ মুজিবুর রহমানের জবানবন্দি : পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবি দাবাইয়া রাখার জন্য এই ষড়যন্ত্র মামলা।

১৯৬৮ : ডিসেম্বর ডাকসুর সহ-সভাপতি তোফায়েল আহমেদ-এর নেতৃত্বে ১১ দফা কর্মসূচিভিত্তিক আইয়ুব শাসনবিরোধী ছাত্র মোর্চা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত।

১৯৬৯ : জানুয়ারি ৮ পাকিস্তানে পূর্ণাঙ্গ গণতন্ত্র ও জনগণের পূর্ণ রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আইয়ুব শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন তীব্র করার অঙ্গীকার নিয়ে আওয়ামী লীগসহ ৮টি রাজনৈতিক দলের ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি (ডাক) গঠন।

১৯৬৯ : জানুয়ারি ২০ পুলিশের গুলিতে ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান (আসাদ) শহীদ হন।

১৯৬৯ : ২৪ জানুয়ারি গণঅভ্যুত্থান দিবস। মতিউর, রুস্তম শহীদ।

১৯৬৯ : ফেব্রুয়ারি ১৫, বন্দি অবস্থায় ঢাকার ক্যান্টনমেন্ট 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলার অন্যতম আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হক শহীদ হন।

১৯৬৯ : ফেব্রুয়ারি ১৮ ইপিআরের গুলিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. শামসুজ্জোহা শহীদ হন।

১৯৬৯ : ফেব্রুয়ারি ২২ দেশব্যাপী প্রচণ্ড আন্দোলন ও গণঅভ্যুত্থানের মুখে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব কর্তৃক আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার। শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল অভিযুক্তের মুক্তি লাভ। পল্টন ময়দানের জনসভায় মতিয়া চৌধুরীকে বাংলার অগ্নিকন্যা আখ্যা দেয়া হয়।

১৯৬৯ : ফেব্রুয়ারি ১৩ 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' থেকে মুক্তি লাভের পর সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে রেসকোর্স ময়দানে দেওয়া গণসংবর্ধনা সভায় শেখ মুজিবুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু উপাধি প্রদান।

১৯৬৯ : মার্চ ২৫ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যাপক আন্দোলনের মুখে প্রধান সেনাপতি জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের পদত্যাগ।

১৯৬৯ : নভেম্বর ২৮ গণপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর, এক ব্যক্তি এক ভোটের ভিত্তিতে নির্বাচন অধিক স্বায়ত্তশাসনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে জাতির উদ্দেশে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ভাষণ।

১৯৭০ : ফেব্রুয়ারি ২২ পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মেননগ্রুপ) কর্তৃক পল্টনের জনসভা থেকে স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ববাংলা প্রতিষ্ঠার ১১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা।

১৯৭০ : মার্চ 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার দুই নম্বর আসামি লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের নেতৃত্বে লাহোরে প্রস্তাব বাস্তবায়ন কমিটি গঠিত। এক দফা পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি।

১৯৭০ : মার্চ ৩০ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান কর্তৃক দেশের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে আইনগত কাঠামো আদেশ (এলএফও) জারি।

১৯৭০ : অক্টোবর ২৮ রেডিও টেলিভিশনে জনগণের উদ্দেশে আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্বাচনী ভাষণ।

১৯৭০ : নভেম্বর ১২ এক প্রলয়ঙ্করি ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে পূর্ব পাকিস্তানের উপকূলীয় অঞ্চলে কয়েক লাখ মানুষের মৃত্যু। এই দুর্যোগ মোকাবেলায় কেন্দ্রীয় সরকারের ঔদাসীন্য বাঙালি জনমনে তীব্র ক্ষোভ সৃষ্টি করে।

১৯৭০ : ডিসেম্বর ৭ ও ১৭ যথাক্রমে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। পশ্চিম পাকিস্তানের জুলফিকার আলী ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠ

দল হিসেবে আবির্ভূত হয়। নির্বাচনের পরপর ইয়াহিয়া খান কর্তৃক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী আখ্যাদান।

১৯৭০ : ডিসেম্বর ২০ পাকিস্তান পিপলস পার্টি জাতীয় পরিষদে বিরোধী দলের আসনে বসেন না বলে লাহোরে ভুট্টোর ঘোষণা।

১৯৭১ : মার্চ বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে অফিস-আদালত ও প্রশাসন পরিচালিত হয়।

১৯৭১ : জানুয়ারি ৩ রেসকোর্স ময়দানে আওয়ামী লীগ দলীয় নবনির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের শপথ গ্রহণ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন দলীয় প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৭১ : মার্চ ১ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান কর্তৃক ৩ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা। প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ৩ মার্চ ধর্মঘট পালনের আহ্বান।

১৯৭১ : মার্চ ২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যারয়ের কলাভবন চত্বরে অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে ডাকসু'র সহ-সভাপতি আসম আবদুর রব কর্তৃক স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন।

১৯৭১ : মার্চ ৩ ছাত্রলীগ আয়োজিত পল্টনের জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উপস্থিতিতে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান সিরাজ কর্তৃক স্বাধীন বাংলাদেশের ইশতেহার পাঠ। ইশতেহার রচনা করেন স্বপন চৌধুরী, পতাকা তোলেন, আসম আবদুর রব এবং সভাপতিত্ব করেন নূরে আলম সিদ্দিকী।

১৯৭১ : মার্চ ৩-২৫ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন।

১৯৭১ : মার্চ ৭ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

১৯৭১ : মার্চ ৭ ছাত্রলীগের উদ্যোগে স্বাধীন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ গঠিত।

১৯৭১ : মার্চ ১৬-২৩ ইয়াহিয়া-মুজিব আলোচনা ব্যর্থ।

১৯৭১ : মার্চ ২৩ 'পাকিস্তান দিবসে' পাকিস্তানের জাতীয় পতাকার পরিবর্তে পূর্ব পাকিস্তানের অফিস-আদালতসহ সর্বত্র স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড্ডয়ন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কর্তৃক ২৫ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আবার অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা।

১৯৭১ : মার্চ ২৫ মধ্য রাতের কিছু আগে ঢাকায় নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনীর বর্বর গণহত্যা, আক্রমণ, নির্বিচারে গুলি, হত্যা, অগ্নিসংযোগ এসবের বিরুদ্ধে বাঙালিদের জাতীয় প্রতিরোধ সংগ্রামের সূচনা।

১৯৭১ : মার্চ ২৬ ও ২৫ মার্চের মধ্যরাতের কিছু পরে পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র চট্টগ্রাম থেকে আঃ হান্নান কর্তৃক ২৬ মার্চ প্রচারিত হয়। এর পরপর আবুল কাশেম সন্দ্বীপ কর্তৃক ওই স্বাধীনতা পুনঃপ্রচার। এরপর শহীদুল ইসলাম কর্তৃক ওই স্বাধীনতা ঘোষণা আবার পুনঃপ্রচার।

১৯৭১ : ২৭ মার্চ মেজর জিয়া (জিয়াউর রহমান) কর্তৃক একই বেতার কেন্দ্র থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের নামে স্বাধীনতা ঘোষণা পাঠ।

১৯৭১ : ১০ এপ্রিল আগরতলায় নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে স্বাধীন বাংলা প্রবাসী সরকার গঠন।

১৯৭১ : ১৭ এপ্রিল কুষ্টিয়ার বৈদ্যনাথতলায় স্বাধীন বাংলা প্রবাসী সরকারের শপথ গ্রহণ। অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ। কুচকাওয়াজে সালাম গ্রহণ করেন মাহবুব উদ্দিন আহমদ এবং অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অধ্যাপক ইউসুফ আলী ও সার্বিক ব্যবস্থাপনায় তৌফিক এলাহী চৌধুরী।

১৯৭১ : ১৬ ডিসেম্বর সৈন্যদের আত্মসমর্পণ ও স্বাধীন বাংলাদেশ মুক্ত।

১৯৭২-৭৪ :

১. গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র বাঙালি, জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে ১ বছরের মধ্যে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন।
২. ধ্বংসপ্রাপ্ত ২৫৪টি ব্রিজসহ, রাস্তাঘাট ও কালভার্ট নির্মাণ। ধ্বংসপ্রাপ্ত রেলওয়ে ও বিমান চালু।
৩. বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ মোতাবেক ভারতীয় সৈন্যের বাংলাদেশ ত্যাগ।
৪. জাতিসংঘের সদস্যপদসহ বহুদেশের স্বীকৃতি আদায়।
৫. বঙ্গবন্ধুর জুলিওকুরী শান্তি পুরস্কার লাভ।
৬. বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের সদস্যপদ লাভ।
৭. মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট তহবিল গঠন।
৮. সবুজ বিপ্লবের ডাক।
৯. পঁচিশ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ।
১০. জাতিসংঘে বঙ্গবন্ধুর প্রথম বাংলায় ভাষণ দান।
১১. জাপান সফরকালে যমুনা নদীর উপর ব্রিজ নির্মাণের প্রস্তাব।

১৯৭৫ : বঙ্গবন্ধু যখন তিল তিল করে তার কাঙ্ক্ষিত সোনার বাংলাকে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। তার এই অভাবনীয় সাফল্যে স্বাধীনতাবিরোধী পরাজিত শক্তি ভীত ও সন্ত্রস্ত্র হয়ে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট রাতের অন্ধকারে কাপুরুষের মতো পৈশাচিক উন্মাদনায় সপরিবারে জাতির

জনককে নির্মমভাবে হত্যা করে। শুধু তাই নয়; বঙ্গবন্ধুর নিকট আত্মীয়সহ স্বাধীনতাযুদ্ধে নেতৃত্ব দানকারী জাতীয় চার নেতাকে ওই হিংস্র হায়েনারা বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে।

১৯৮১ : ১৭ মে বঙ্গবন্ধু তনয়া বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কান্ডারি জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রত্যাবর্তন এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ।

১৯৮২-৮৫: নিরবিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা নেতাকর্মীদের নিয়ে দলকে পুনর্গঠন এবং বিভিন্ন জাতীয় কর্মসূচি পালন।

১৯৮৬ : জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জননেত্রী শেখ হাসিনার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং শক্তিশালী বিরোধী দল হিসেবে সংসদে আত্মপ্রকাশ।

১৯৮৭-৮৯ : গণতন্ত্রের পূর্ণ উদ্ধারের জন্য আন্দোলন। নূর হোসেনসহ বিভিন্ন নেতাকর্মীর আত্মহুতি।

১৯৯০ : জননেত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে পুরো দেশজুড়ে স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন এবং স্বৈরাচারের পতন। সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন।

১৯৯১ : জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং জাতীয় সংসদের প্রধান বিরোধী দল হিসেবে জননেত্রী শেখ হাসিনার মুখ্য ভূমিকা পালন।

১৯৯২-৯৫: স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে বিকৃত করার প্রতিবাদে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সর্বস্তরের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন।

১৯৯৬ : ১৫ ফেব্রুয়ারি প্রহসনমূলক নির্বাচনের তীব্র নিন্দা ও সর্বস্তরের জনগণকে নিয়ে নব্য স্বৈরাচারিণী বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে সোচ্চার গণআন্দোলন ও গণজাগরণে খালেদা জিয়ার পতন। রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে জনতার মঞ্চ স্থাপন।

১৯৯৬ সালের ১২ জুন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সাধারণ মানুষের ভোট-ভাত ও নাগরিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং বিজয়।

১৯৯৬ : সাধারণ মানুষের ভোট, ভাত এবং নাগরিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং অভাবনীয় সাফল্য। '৯৬ সালের ২৩ জুন জনগণের আশীর্বাদপুষ্ট জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথের মাধ্যমে সরকার গঠন।

১৯৯৬-৯৯: ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আন্তরিক প্রচেষ্টায় ঐতিহাসিক গঙ্গার পানিচুক্তির বাস্তবায়ন ঘটে। ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর সংবিধানের আওতায় রাষ্ট্রীয় ও

অখণ্ডভাবে প্রতিপূর্ণ ও অবিচল আস্থা রেখে পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল নাগরিকের অধিকার সংরক্ষণ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ঐতিহাসিক পার্বত্য শান্তিচুক্তি সম্পাদন।

বয়োজ্যেষ্ঠদের বয়স্কভাতা, গৃহহীনদের গৃহায়ণ তহবিল গঠন ও বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কর্মসংস্থান ব্যাংক স্থাপন করে দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম গ্রহণ।

মুক্তিযুদ্ধের অম্লান স্মৃতিকে নবপ্রজন্মের সামনে তুলে ধরার লক্ষ্যে ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে 'শিখা চিরন্তনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন'।

১৯৯৮ : শতাব্দীর ভয়াবহতম বন্যাকে দৃঢ়তার মাধ্যমে মোকাবেলা।

বাংলাদেশের একক বৃহত্তম স্থাপনা বিশ্বের ১১ দীর্ঘতম সেতু ঐতিহাসিক বঙ্গবন্ধু সেতু ১৯৯৮ সালের ২৩ জুন শুভ উদ্বোধন।

মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ইউনেস্কো কর্তৃক শান্তি পুরস্কার লাভ।

সাহিত্যে অসামান্য অবদানের জন্য মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারতের শান্তি নিকেতন কর্তৃক ডিগ্রি লাভ।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদাত্ত আহ্বানে বহু সন্ত্রাসী স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার জন্য আত্মসমর্পণ।

ঢাকা-কলকাতা সরাসরি বাস যোগাযোগ।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জীবনের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

- শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে রাত ৮টায় জন্মগ্রহণ করেন।
- ১৯৩৪ সালে মাদারীপুর ইসলামিয়া হাইস্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি করে দেয়া হয়। সেখানে লেখাপড়া করা অবস্থায় শেখ মুজিবুর রহমান বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হন।
- ১৯৩৫ সালে বঙ্গবন্ধুর বাবা শেখ লুৎফর রহমান গোপালগঞ্জে বদলি হওয়ায় বঙ্গবন্ধুকেও সেখানে গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে ভর্তি হতে হয়।
- ১৯৩৭ সালে তিনি গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হন।
- ১৯৩৮ সালে প্রধানমন্ত্রী এ কে ফজলুল হক এবং তার বাণিজ্যমন্ত্রী ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গোপালগঞ্জ পরিদর্শনে আসেন। অতিথিরা স্কুল পরিদর্শন করে ফেরার পথে শেখ মুজিবুর রহমান তাদের সামনে দাঁড়ান। স্কুলের ছাত্রাবাস সংস্কারের জন্য দাবি জানান। বাংলার দুই মহান নেতার সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানের এটাই প্রথম সাক্ষাৎ। সেদিন ফজলুল হক স্কুলের ছাত্রাবাস পুনর্নির্মাণের জন্য ১ হাজার ২শ' টাকা বরাদ্দ দেন।
- ১৯৩৯ সালে চাচাতো বোন ফজিলাতুন্নেসার সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানের আনুষ্ঠানিক বিয়ে হয়। এর আগে বঙ্গবন্ধুর ৯ বছর বয়সে ৩ বছর বয়সী চাচাতো বোনের সাথে বিয়ে হয়।
- ১৯৪০ সালে তিনি নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশন-এ যোগ দেন। সে সময় তিনি বঙ্গীয় মুসলিম লীগের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন।
- ১৯৪২ সালে তিনি গোপালগঞ্জ মিশন স্কুল হতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এ সালেই তিনি কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন।
- ১৯৪৩ সালে শেখ মুজিব গোপালগঞ্জ ও টুঙ্গিপাড়ায় এসে জনগণের সেবায় ব্রত হন। তখন দেশে দুর্ভিক্ষ চলছিল। তিনি নিজের বাড়ির গোলার ধান ও চাল স্থানীয় জনগণের মধ্যে বিলিয়ে দেন।
- ১৯৪৬ সালে তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইসলামিয়া কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

- ১৯৪৭ সালে তিনি ইসলামিয়া কলেজ হতে বিএ পাস করেন। তিনি ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে বিএ পাস করেন।
- ১৯৪৭ সালেই তিনি গণতান্ত্রিক যুব লীগের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হন।
- ১৯৪৭ সালেই তিনি পূর্ব-পকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এটি বাংলাদেশ ছাত্রলীগ নামে অভিহিত।
- ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ তিনি ভাষা আন্দোলনের ব্যাপারে গ্রেফতার হন।
- ১৯৪৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ধর্মঘটকালীন আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের দায়ে তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ক্লাস হতে বহিষ্কার করা হয়।
- ১৯৪৯ সালেই খাদ্য-সংকট সংক্রান্ত বিক্ষোভ প্রদর্শনের দায়ে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।
- ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের প্রতি তিনি জেল হতে সমর্থন জানান এবং ১৬ ফেব্রুয়ারি হতে ২৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অনশন ধর্মঘট পালন করেন।
- ১৯৫২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়।
- ১৯৫৩ সালে তিনি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।
- ১৯৫২ সালে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও শেখ মুজিবুর রহমান চীনের রাজধানী বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত শান্তি সম্মেলনে যোগ দেন।
- ১৯৫৩ সালের ১৭ এপ্রিল পল্টন ময়দানে মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগ-এর জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় শেখ মুজিবুর রহমান ভাষণ দেন।
- ১৯৫৪ সালে তিনি প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং কৃষিমন্ত্রী নিযুক্ত হন।
- ১৯৫৫ সালে তিনি গণপরিষদ সদস্য নির্বাচিত হন।
- ১৯৫৬ সালে তিনি আবার পূর্ব-পাকিস্তানের মন্ত্রিসভায় যোগদান করেন। এ বছরই তিনি স্টকহোম-এ শান্তি সম্মেলনে যোগ দেন।
- ১৯৫৭ সালে তিনি মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করেন। ওই সালে তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ব্যক্তিগত প্রতিনিধি হিসেবে জেনেভা সফর করেন।
- ১৯৫৭ সালে তিনি চিকিৎসার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যান। এ বছরের শেষ ভাগে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী শেখ মুজিবকে পাকিস্তান টি বোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেন।
- ১৯৫৮ সালের ২০ অক্টোবর শেখ মুজিবুর রহমান তার বাসভবন থেকে সামরিক জান্তার নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার হন।
- ১৯৫৯ সালের ৭ ডিসেম্বর তিনি মুক্তি পান।
- ১৯৬২ সালে আইয়ুব সরকার সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতার সংক্রান্ত আন্দোলনের

দায়ে তাঁকে আবার গ্রেফতার করে এবং ছয় মাস তাঁকে আটক রাখা হয়।

- ১৯৬৩ সালে শেখ মুজিবুর রহমান জনাব সোহরাওয়ার্দীর জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের সাথে সহযোগিতা করেন। ওই সালেই তিনি মৃতপ্রায় আওয়ামী লীগকে পুনর্জীবিত করেন।
- ১৯৬৪ সালে তিনি পূর্ব-পাকিস্তান সম্মিলিত বিরোধী দলীয় প্রার্থী মাদারে মিল্লাত মিস ফাতিমা জিন্নাহর নির্বাচনী অভিযান পরিচালনার জন্য গঠিত স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। এ বছরই ৫ ডিসেম্বর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বৈরুতে মৃত্যুবরণ করেন।
- দলীয় নেতাকর্মীদের নির্দেশে শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৩ সালের ৮ আগস্ট রাতে ঢাকা থেকে লন্ডনের পথে করাচি যাত্রা করেন। তিনি লন্ডনে ১৭ আগস্ট পর্যন্ত অবস্থান করেন।
- ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধে শেখ মুজিব ও তার দল ভারতীয় হামলার তীব্র প্রতিবাদ জানায় এবং পূর্ব বাংলার প্রতিরক্ষা শক্তিশালী করার দাবি জানায়।
- ১৯৬৬ সালের ১৩ মার্চ আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় ঐতিহাসিক ৬ দফা অনুমোদিত হয়।
- শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালের ২০ মার্চ থেকে ৮ মে পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রায় সকল জেলা, মহকুমায় সভা ও পথসভা করেন। এর মধ্যে ৭ এপ্রিল পাবনা, ৮ এপ্রিল বগুড়া, ৯ এপ্রিল রংপুর, ১০ এপ্রিল দিনাজপুর, ১১ এপ্রিল রাজশাহী, ১৪ এপ্রিল ফরিদপুর, ১৫ এপ্রিল কুষ্টিয়া, ১৬ এপ্রিল যশোর, ১৭ এপ্রিল খুলনায় বক্তৃতা করেন। ১৯ এপ্রিল পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। যশোর এসডিও কোর্ট তাকে জামিনে মুক্তি দেয়।
- ওই সালের ৮ মে তাঁকে দেশরক্ষা আইনে গ্রেফতার করে জেলে পাঠানো হয়।
- ১৯৬৬ সালের ৭ জুন শেখ মুজিবের গ্রেফতারের প্রতিবাদে সারা দেশব্যাপী হরতাল পালন করা হয়।
- ১৯৬৮ সালের ১৮ জানুয়ারী তাঁকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামিরূপে গ্রেফতার করা হয়।
- ১৯৬৮ সালের ১১ এপ্রিল তাঁর বিচারের জন্য এক বিশেষ আদালত গঠন করা হয়।
- ওই সালে ১৯ জুন আগরতলা মামলার শুনানি আরম্ভ হয়।
- ১৯৬৯ সালের ২৭ জানুয়ারি মামলার শুনানি শেষ হয়।
- ১৯৬৯ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি হতে অভিযুক্তদের বক্তব্য শ্রবণ শুরু হয়।
- ওই দিন শেখ মুজিব বিচার কক্ষে তাঁর বিবৃতি পাঠ করেন।
- ১৯৬৯ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি গোলটেবিল বৈঠকের দিন ধার্য করা হয়। কিন্তু শেখ সাহেব প্যারলে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের অসম্মতি প্রকাশ করায় গোলটেবিল বৈঠক ওই দিন হতে পারে না।

- ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করা হয় । বাংলার শোষিত ও নিঃশেষিত সংগ্রামী জনতা এবং ছাত্র ও শ্রমিক সমাজের তুমুল আন্দোলনকে কোনোক্রমেই দমন করতে না পেরে আইয়ুব খান এই মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয় ।
- ওই সালের ওই দিন ফাল্গুনের দুপুরে ঠিক বারটার সময় শেখ সাহেব শহীদ মিনারে শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে ঘরে ফিরেন ।
- ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে ছাত্রসমাজ তাঁকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করে ।
- ১৯৬৯ সালের ১০ মার্চ শেখ সাহেব গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করেন ।
- ওই সালের ১৩ মার্চ সে গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হয় ।
- ওই সালে মোনায়েম খান অপসারিত হয় এবং ডা. হুদা বাংলার গভর্নর হন ।
- ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ মাত্র পাঁচ মিনিট স্থায়ী এক করুণ ভাষণে তার শেষ ভাষণ দিয়ে আইয়ুব খান সরে পড়েন এবং জল্লাদ ইয়াহিয়া খান প্রধান সাময়িক শাসক এবং পরে প্রেসিডেন্ট হন ।
- বাংলাদেশ ধ্বংস করবার ব্যাপক প্রস্তুতির উদ্যোগ পর্বে ভণ্ড ইয়াহিয়া সাধারণ নির্বাচনের জন্য ১৯৭০ সালের ১ জানুয়ারি হতে নির্বিবাদে সকল রাজনৈতিক দলের প্রচারণা অধিকার দেয় ।
- ১৯৭০ সালের ৩০ জানুয়ারি তিনি রাজশাহীতে স্মরণকালের বৃহত্তম জনসভায় ভাষণ দেন ।
- ১৯৭০ সালের জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ– এই তিন মাস বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যস্ত ছিলেন ।
- ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর ও ১৭ ডিসেম্বর জাতীয় পবিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদদ্বয়ের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সর্বক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে ।
- ১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারি ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে শপথ দিবস অনুষ্ঠিত হয় ।
- ১৯৭১ সালের ১১ জানুয়ারি ইয়াহিয়া খান শেখ সাহেবের সাথে আলাপ-আলোচনার জন্য ঢাকায় আসেন এবং ২৫ জানুয়ারি ভুট্টো সাহেব ঢাকায় আসেন শেখ সাহেবের সাথে আলাপ-আলোচনার জন্য ।
- ১৯৭১ সালে ইয়াহিয়া খান অপ্রত্যাশিতভাবে ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবি ঘোষণা করায় স্বাধীনতা সংগ্রামের সর্বপ্রথম সূচনা করেন ।
- ওই ৩ মার্চ বঙ্গবন্ধু হরতাল পালনের আহ্বান জানান এবং ৭ মার্চ পর্যন্ত তাঁর কর্মসূচি পেশ করেন । ৬ মার্চ ইয়াহিয়া খান বেতার ভাষণে সব দোষ বঙ্গবন্ধুর ঘাড়ে চাপান ।
- ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু জনসভায় তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ দেন ।
- ১০ মার্চ ইয়াহিয়া খান নেতৃ-সম্মেলন আহ্বান করেন । ৩ মার্চ এবং এ দিন ও শেখ সাহেব তা প্রত্যাখ্যান করেন ।

- ১৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু মুক্তি সংগ্রামের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেন ।
- ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদে যোগদানের অসম্মতি জ্ঞাপন করায় ১৭, ১৮ এবং ১৯ মার্চ বঙ্গবন্ধু ও ইয়াহিয়া খানের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্নে ৩ দফা আলোচনা হয় ।
- ২৫ মার্চ নেমে আসে অমানিশার কালরাত্রি ।
- ২৫ মার্চের পূর্বে বঙ্গবন্ধু কর্নেল ওসমানীকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব দেন । ওই দিন রাতে শেখ সাহেবকে গ্রেফতার করা হয় ।
- ২৬ মার্চ, ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয় ।
- ১০ এপ্রিল কুষ্টিয়ার মেহেরপুরের আমকুঞ্জ হতে ঘোষণা করা হয় স্বাধীনতার সনদ– যা কার্যকর হলো ২৬ মার্চ থেকে ।
- ১১ এপ্রিল বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে গঠিত বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে ভাষণ দেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ।
- ১৭ এপ্রিল বাংলাদেশকে গণপ্রজতান্ত্রিক সরকার হিসেবে ঘোষণা করা হয় ।
- ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তান মুক্তিবাহিনী ও মিত্র বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করে ।
- ২৩ ডিসেম্বর পাকিস্তানের লায়লপুরের জেল থেকে বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করে রাওয়ালপিণ্ডির একটি গৃহে অন্তরীণ রাখা হয় ।
- ৩ জানুয়ারি বাংলাদেশের নয়নমণি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিনাশর্তে মুক্তি পান ।
- ৭ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু বিমানযোগে লন্ডন গমন করেন ।
- ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি কমেট বিমানযোগে লন্ডন হতে নয়াদিল্লির পালাম বিমানবন্দরে পৌঁছলে ভারতীয় নেতারা তাঁকে অভ্যর্থনা জানান এবং ওই একই বিমানে তিনি ১টা ৪১ মিনিটে ঢাকার তেজগাঁও বিমানবন্দরে অবতরণ করেন ।
- ১১ জানুয়ারি, ১৯৭২ সালে অস্থায়ী শাসনতান্ত্রিক আদেশ জারি হয় ।
- ১২ জানুয়ারি বিচারপতি জনাব আবু সা'দাত মুহম্মদ সায়েম বাংলাদেশ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন ।
- ১২ জানুয়ারি আবু সাঈদ চৌধুরী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন । বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্রপতির পদে ইস্তফা দেন এবং বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন ।
- ১৩ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর সভাপতিত্বে বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় পতাকার নকশা সংশোধন করা হয় ।
- ১৯৭২ সালের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয় । ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ৫৩তম জন্মদিন ছিল ।
- ১৯৭২ সালের ১০ অক্টোবর বিশ্বশান্তি পরিষদ বঙ্গবন্ধুকে জুলিও কুরি পুরস্কার প্রদান করে ।

- ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ওইদিন বিজয় দিবসে রমনা রেসকোর্স ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় ভাষণ দেন এবং ঘোষণা করেন, যুদ্ধাপরাধীদের বাংলার মাটিতে বিচার করা হবে।
- ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ দেশব্যাপী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে ন্যাপ, জাতীয় লীগ, জাসদ ও কমিউনিস্ট পার্টি অংশ নেয়। নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তার কারণে আওয়ামী লীগ ২৮০ আসনে জয়লাভ করে। ১৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৬ জন সদস্য নিয়ে শপথ গ্রহণ করেন।
- ১৯৭৩ সালের ২৫ অক্টোবর বঙ্গবন্ধু সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩৫৫৯৪ জন শিক্ষককে সরকারি কর্মচারী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।
- ১৯৭৪ সালের ১৮ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের সভাপতি পদ থেকে পদত্যাগ করেন। তিনি ঘোষণা করেন, তাকে জনগণ জাতির পিতা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে; সুতরাং তার পক্ষে আওয়ামী লীগ প্রধান থাকা সম্ভব নয়। এ বছরের ১৫ ডিসেম্বর খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন।
- ১৯৭৫ সালের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। ৩০ মার্চ বঙ্গবন্ধুর পিতা শেখ লুৎফর রহমান ৯৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।
- এ বছরই ১৫ জুলাই বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠপুত্র শেখ কামালের সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিলা ক্রীড়াবিদ সুলতানার বিয়ে হয়। ১৭ জুলাই বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় পুত্র শেখ জামালের সঙ্গে বিয়ে হয় সৈয়দা পারভীন রোজীর।
- ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। তার কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা জার্মানিতে থাকায় বেঁচে গেলেন। ওইদিনই সারা দেশে সামরিক শাসন জারি করা হয়। ১৬ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর লাশ টুঙ্গিপাড়ায় দাফন করা হয়।

পরিশিষ্ট-১

মুজিবনগর সরকারের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র, ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১

যেহেতু ১৯৭০ সনের ৭ই ডিসেম্বর হইতে ১৯৭১ সনের ১৭ই জানুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশে অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে,

এবং

যেহেতু এই নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ তাঁদের ১৬৯টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ দলীয় ১৬৭ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত করিয়াছিলেন,

এবং

যেহেতু আহূত এ পরিষদ স্বেচ্ছাচার ও বেআইনিভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করা হয়,

এবং

যেহেতু পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ তাহাদের প্রতিশ্রুতি পালন করিবার পরিবর্তে বাংলাদেশের গণপ্রতিনিধিদের সহিত পারস্পরিক আলোচনাকালে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ ন্যায়নীতি বহির্ভূত এবং বিশ্বাসঘাতকতামূলক একটি যুদ্ধ ঘোষণা করেন,

এবং

যেহেতু উল্লিখিত বিশ্বাসঘাতকতামূলক কাজের জন্য উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জনের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৭১ সনের ২৬ মার্চ ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং বাংলাদেশের অখণ্ডতা ও মর্যাদা রক্ষার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান,

এবং

যেহেতু পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ বর্বর ও নৃশংস যুদ্ধ পরিচালনা করিয়াছে এবং এখনো বাংলাদেশের অসামরিক ও নিরস্ত্র জনগণের বিরুদ্ধে নজিরবিহীন গণহত্যা ও নজিরবিহীন নির্যাতন চালাইতেছে,

এবং

যেহেতু পাকিস্তান সরকার অন্যায় যুদ্ধ, গণহত্যা ও নানাবিধ নৃশংস অত্যাচার

পরিচালনা দ্বারা বাংলাদেশের গণপ্রতিনিধিদের একত্রিত হইয়া শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিয়া জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে,

এবং

যেহেতু বাংলাদেশের জনগণ তাঁহাদের বীরত্ব, সাহসিকতা ও বিপ্লবী কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশের ওপর তাঁহাদের কার্যকরী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে,

সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বাংলাদেশের জনগণ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রতি যে ম্যান্ডেট দিয়াছেন, সেই ম্যান্ডেট মোতাবেক আমরা নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আমাদের সমবায়ে গণপরিষদ গঠন করিয়া পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা আমাদের পবিত্র কর্তব্য,

সেইহেতু

আমরা বাংলাদেশকে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি এবং উহা দ্বারা পূর্বাহ্নে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা অনুমোদন করিতেছি।

এতদ্বারা আমরা আরো সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি যে, শাসনতন্ত্র প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপ্রধান** ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপ-রাষ্ট্রপ্রধান পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

রাষ্ট্রপ্রধান প্রজাতন্ত্রের সশস্ত্র বাহিনীসমূহের সর্বাধিনায়ক পদেও অধিষ্ঠিত থাকিবেন। রাষ্ট্রপ্রধানই সব প্রকার প্রশাসনিক ও আইন প্রণয়নের ক্ষমতার অধিকারী।

রাষ্ট্রপ্রধানের প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিয়োগের ক্ষমতা থাকিবে। তাঁহার গণপরিষদের অধিবেশন আহ্বান ও উহার অধিবেশন মুলতবি ঘোষণার ক্ষমতা থাকিবে। উহা দ্বারা বাংলাদেশের জনসাধারণের জন্য আইনানুগ ও নিয়মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় সকল ক্ষমতারও তিনি অধিকারী হইবেন।

বাংলাদেশের জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে আমরা আরো সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছে যে, কোনো কারণে যদি রাষ্ট্রপ্রধান না থাকেন অথবা যদি রাষ্ট্রপ্রধান কাজে যোগদান করিতে না পারেন অথবা অক্ষম হন, তাহা হইলে তাঁহার কর্তব্য ও প্রদত্ত সকল ক্ষমতা ও দায়িত্ব উপ-রাষ্ট্রপ্রধান পালন করিবেন।

আমরা আরো সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি যে, বিশ্বের একটি জাতি হিসেবে এবং জাতিসংঘের সনদ মোতাবেক আমাদের ওপর যে দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্তাইয়াছে উহা যথাযথভাবে আমরা পালন করিব।

আমরা আরো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, আমাদের এই স্বাধীনতার ঘোষণা ১৯৭১ সনের ২৬ মার্চ থেকে কার্যকরী বলিয়া গণ্য হবে।

আমরা আরো সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছে যে, আমাদের এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার

জন্য আমরা অধ্যাপক এম ইউসুফ আলীকে যথাযথভাবে রাষ্ট্রপ্রধান ও উপ-রাষ্ট্রপ্রধানের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য দায়িত্ব অর্পণ ও নিযুক্ত করিলাম।

স্বাক্ষর

এম ইউসুফ আলী

বাংলাদেশ গণপরিষদের পক্ষ থেকে।

[মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক বাংলাদেশ পত্রিকার ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, ২৯ মে ১৯৭১ থেকে পুনর্মুদ্রিত—সম্পাদক।]

[English Version)

THE PROCLAMATION OF INDEPENDENCE MUJIBNAGAR, BANGLADESH

WHEREAS free election were held in Bangladesh from 7th December, 1970 to 17th January, 1971, to elect representative for the purpose of framing a Constitution,

AND

WHEREAS at these elections the people of Bangladesh elected 167 out of 169 representatives belonging to the Awami League,

AND

WHEREAS General Yahya Khan summoned the elected representatives of the people to meet on the 3rd March, 1971, for the purpose of framing a constitution,

AND

WHEREAS the Assembly so summoned was arbitrarily and illegally postponed for indefinite period,

AND

WHEREAS instead of fulfilling their promise and while stillc onferring with the representatives of the people of Bangladesh, Pakistan authorities declared an unjust and treacherous war,

AND

WHEREAS in the facts and circumstances of such treacherous conduct Bangbandhu Sheikh Mujibur Rahman, the undisputed leader of 75 million people of Bangladesh, in due fulfilment of the legitimate right of self-determination of the people of Bangladesh,

duly made a declaration of independence at Dacca on March 26, 1971, and urged the people of Bangladesh to defend the honour and integrity of Bangladesh,

AND

WHEREAS in the conduct of a ruthless and savage war the Pakistani authorities committed and are still continuously committing numerous acts of genocide and unprecedented tortures amongst others on the civilian and unarmed people of Bangladesh,

AND

WHEREAS the Pakistan Government by levying and unjust war and committing genocide and by other repressive measures made it impossible for the elected representatives of the people of Bangladesh to meet and frame a Constitution, and give to themselves a Government.

AND

WHEREAS the people of Bangladesh by their heroism, bravery and revolutionary fervour have established effective control over the territories on Bangladesh,

We, the elected representatives of the people of Bangladesh, as honour bound by the mandate given to us by the people of Bangladesh whose will is supreme, duly constituted ourselves into a Constituent Assembly,

AND

having held mutual consultations,

AND

in order to ensure for the people of Bangladesh equality, human dignity and social justice,

declare and constitute Bangladesh to be a sovereign People's Republic and thereby confirm the declaration of independence already made by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman,

AND

do hereby affirm and resole that till such time as a Constitution is framed, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman shall be the President of the Republic and that Syed Nazrul Islam shall be the Vice-President of the Republic,

AND

that the President shall be the Supreme Commander of all the Armed Forces of the Republic,

shall exercise all the Executive and Legislative powers of the Republic including the power to grant pardon.

shall have the power to appoint a Prime Minister and such other Ministers as he considers necessary,

shall have the power summon and adjourn the Constituent Assembly,

AND

Do all other things that may be necessary to give to the people of Bangladesh an orderly and just Government.

We the elected representatives of the people of Bangladesh do Further resolve that in the event of there being no president or the President being unable to enter upon his office or being unable to exercise his powers due to any reason whatsoever, the Vice-President shall have and exercise all the powers, duties and responsibilities herein conferred on the President,

We further resolve that we undertake to observe and give effect to all duties and obligations that devolve upon us as a member of the family of nations and to abide by the Charter of the United Nations.

We further resolve that this Proclaimation of Independence shall be deemed to have come into effect from 26th day of March, 1971.

We further resolve that in order to give effect to this instrument we appoint Prof. Yosuf Ali our duly Constituted potentiary and to give to the President and the Vice-President oaths of office.

PROF. YUSUF ALI
Duly Constituted Potentiary
By and under the authority of the
Constituent Assembly of
Bangladesh.

[The final decision for the formation of the Provisional Government of Bangladesh was taken on April 10, 1971 and the formal declaration was made in a public ceremony on April 17, 1971.]

পরিশিষ্ট-২

১৬ ডিসেম্বর (১৯৭১) তারিখে ভারত-বাংলাদেশ মিত্রবাহিনীর নিকট পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর আত্মসমর্পণের দলিলের বঙ্গানুবাদ :

পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড পূর্ব রণক্ষেত্রে ভারতীয় এবং বাংলাদেশ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক লে. জেনারেল অরোরার কাছে আত্মসমর্পণে সম্মতি প্রদান করেছেন। এই আত্মসমর্পণে বাংলাদেশে অবস্থানরত পাকবাহিনীর স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনীর সকল সদস্য, সকল আধাসামরিক এবং বেসামরিক অস্ত্রধারী সৈনিক অন্তর্ভুক্ত থাকবেন। এ সকল সৈন্য যে যেখানে যেভাবে আছেন সেইভাবে অস্ত্র পরিত্যাগ করবেন এবং তাদের নিকটস্থ জেনারেল অরোরার অধীনস্থ বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করবেন।

এই দলিল স্বাক্ষরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড জেনারেল অরোরার আদেশাধীনে ন্যস্ত হবে। তাঁর আদেশের বরখেলাপ আত্মসমর্পণ চুক্তি ভঙ্গের শামিল হবে এবং যুদ্ধের সর্বগ্রাহ্য নিয়মাবলি ও বিধি অনুযায়ী অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এই আত্মসমর্পণ চুক্তি ব্যাখ্যা সম্পর্কিত কোনো সন্দেহের উদ্ভব হলে লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

লে. জেনারেল অরোরা এই মর্মে পবিত্র আশ্বাস প্রদান করেছেন যে, যারা আত্মসমর্পণ করবেন তাদের প্রতি জেনেভা চুক্তি অনুযায়ী যোগ্য সম্মান ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়া হবে। লে. জেনারেল অরোরার অধীন সেনাবাহিনীর সাহায্যে বিদেশী নাগরিক, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং পশ্চিম পাকিস্তানের বেসামরিক নাগরিকদের নিরাপত্তা প্রদান করা হবে।

স্বাক্ষর,
জগজিৎ সিং অরোরা
লে. জেনারেল
জিওসি এবং পূর্বাঞ্চলীয় ভারতীয়
বাহিনী ও বাংলাদেশ বাহিনীর
সর্বাধিনায়ক
১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১

স্বাক্ষর,
আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজী
লে. জেনারেল
সামরিক আইন প্রশাসক, জোন-বি
এবং পাকিস্তান বাহিনীর পূর্বাঞ্চল
কমান্ডের সর্বাধিনায়ক
১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১

পরিশিষ্ট-৩

১৯ মার্চ ১৯৭২ তারিখে স্বাক্ষরিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এবং প্রজাতন্ত্রী ভারতের মধ্যে পারস্পরিক মৈত্রী, সহযোগিতা ও শান্তি চুক্তির বঙ্গানুবাদ :

শান্তি, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের একই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এই আদর্শের বাস্তব রূপায়নের লক্ষ্যে একযোগে সংগ্রাম, রক্তদান এবং আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে বন্ধুত্বের বন্ধন সুদৃঢ় করার অঙ্গীকার নিয়ে মুক্ত, স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের বিজয় অভ্যুদয় ঘটিয়ে, সৌভ্রাতৃত্বপূর্ণ ও সৎ প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক রক্ষা করতে এবং উভয় রাষ্ট্রের সীমান্তকে চিরস্থায়ী শান্তি ও বন্ধুত্বের সীমান্ত হিসেবে রূপান্তরের দৃঢ় সংকল্প নিয়ে; নিরপেক্ষতা, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, পারস্পরিক সহযোগিতা, অপরের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থেকে এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বকে সম্মান প্রদর্শনের মূলনীতিসমূহের প্রতি দৃঢ়ভাবে আস্থাশীল থেকে; শান্তি, স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা রক্ষার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এবং সম্ভাব্য সকল প্রকারের পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে নিজ নিজ দেশের অগ্রগতির জন্য; উভয় দেশের মধ্যকার বর্তমান মৈত্রীপূর্ণ সম্পর্ক আরো সম্প্রসারণ ও জোরদার করার জন্য দৃঢ় সংকল্প নিয়ে; এশিয়া তথা বিশ্বের স্থায়ী শান্তির স্বার্থে এবং উভয় রাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনে পারস্পরিক মৈত্রী ও সহযোগিতা আরো সম্প্রসারিতকরণে বিশ্বাসী হয়ে; বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা জোরদার করার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনে এবং উপনিবেশবাদ, বর্ণবৈষম্যবাদ ও সামন্তবাদের শেষ চিহ্নটুকু চূড়ান্তভাবে নির্মূল করার লক্ষ্যে প্রয়াস চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে; আজকের বিশ্বের আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলোর সমাধান যে শুধু সহযোগিতার মাধ্যমে সম্ভব, বৈরিতা ও সংঘাতের মাধ্যমে নয়– এ ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয়ী হয়ে; রাষ্ট্রসংঘের সনদের নীতিমালা ও লক্ষ্যসমূহ অনুসরণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা পুনর্ব্যক্ত করে এক পক্ষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ও অন্য পক্ষে প্রজাতন্ত্রী ভারত বর্তমান চুক্তি স্বাক্ষরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

অনুচ্ছেদ-১ : চুক্তি সম্পাদনকারী উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন উভয় পক্ষ নিজ নিজ দেশের জনগণ যে আদর্শের জন্য একযোগে সংগ্রাম এবং স্বার্থত্যাগ করেছেন, সেই আদর্শে

অনুপ্রাণিত হয়ে দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করছে যে, উভয় দেশ এবং তথাকার জনগণের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি ও মৈত্রী বজায় থাকবে। একে অপরের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে এবং অপরের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্ত ক্ষেপ না করার নীতিতে অবিচল থাকবে। চুক্তি সম্পাদনকারী উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন উভয়পক্ষ উল্লেখিত নীতিমালা এবং সমতা ও পারস্পরিক উপকারিতার নীতিসমূহের ভিত্তিতে উভয় দেশের মধ্যকার বর্তমান বন্ধুত্বপূর্ণ সুপ্রতিবেশীসুলভ সার্বিক সহযোগিতা ও সম্পর্কের উন্নয়ন আরো জোরদার করবে।

অনুচ্ছেদ-২ : জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল রাষ্ট্র ও জনগণের প্রতি সমতার নীতিতে আস্থাশীল থাকার আদর্শে পরিচালিত হয়ে চুক্তি সম্পাদনকারী উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন উভয়পক্ষ সর্ব প্রকারের উপনিবেশবাদ ও বর্ণ-বৈষম্যবাদের নিন্দা করছে এবং তাকে চূড়ান্তভাবে ও সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করার জন্য প্রচেষ্টা চালানোর ব্যাপারে তাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথা পুনরুল্লেখ করছে। চুক্তি সম্পাদনকারী উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন উভয়পক্ষ উপরোক্ত অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতা করবে এবং উপনিবেশবাদ ও বর্ণ-বৈষম্যবিরোধী এবং জাতীয় মুক্তির সংগ্রামে জনগণের ন্যায়সঙ্গত আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন দান করবে।

অনুচ্ছেদ-৩ : চুক্তি সম্পাদনকারী উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন উভয়পক্ষ বিশ্বের উত্তেজনা প্রশমন, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা এবং জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা মজবুত করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে জোটনিরপেক্ষতা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতির প্রতি তাদের অবিচল আস্থা পুনরুল্লেখ করছে।

অনুচ্ছেদ-৪ : উভয় দেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রধান প্রধান আন্তর্জাতিক সমস্যাবলি নিয়ে চুক্তি সম্পাদনকারী উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন পক্ষদ্বয় সকল স্তরে বৈঠক ও মতবিনিময়ের জন্য নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করবে।

অনুচ্ছেদ-৫ : চুক্তি সম্পাদনকারী উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন উভয়পক্ষ অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি ক্ষেত্রে পারস্পরিক সুবিধা ও সর্বাত্মক সহযোগিতা শক্তিশালী ও সম্প্রসারিত করে যাবে। উভয় দেশ সমতা, পারস্পরিক সুবিধা এবং সর্বোচ্চ আনুকূল্যপ্রাপ্ত রাষ্ট্রের বেলায় প্রযোজ্য নীতির ভিত্তিতে বাণিজ্য, পরিবহন ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে সহযোগিতা সম্প্রসারিত করবে।

অনুচ্ছেদ-৬ : চুক্তি সম্পাদনকারী উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন উভয়পক্ষ বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদী অববাহিকার উন্নয়ন এবং জল বিদ্যুৎ শক্তি ও সেচব্যবস্থা উন্নয়নের ক্ষেত্রে যৌথ সমীক্ষা পরিচালনা ও যৌথ কার্যক্রম গ্রহণে অভিন্ন মত পোষণ করে।

অনুচ্ছেদ-৭ : চুক্তি সম্পাদনকারী উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন উভয়পক্ষ শিল্প, সাহিত্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও খেলাধুলার ক্ষেত্রে সম্পর্ক উন্নয়নের সচেষ্ট হবে।

অনুচ্ছেদ-৮ : দুই দেশের মধ্যকার বর্তমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক অনুযায়ী চুক্তি সম্পাদনকারী উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন পক্ষদ্বয়ের প্রত্যেকে ন্যায় ও নিষ্ঠার সাথে ঘোষণা করছে

যে, তারা একে অপরের বিরুদ্ধে পারিচালিত কোনো সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হবে না বা অংশগ্রহণ করবে না। চুক্তি সম্পাদনকারী উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন পক্ষদ্বয় একে অন্যের ওপর আক্রমণ থেকেও নিবৃত্ত থাকবে এবং তাদের ভূখণ্ডে এমন কোনো কাজ করতে দেবে না যাতে চুক্তি সম্পাদনকারী কোনো পক্ষের প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে কোনো ক্ষতি হতে পারে অথবা কোনো পক্ষের নিরাপত্তার প্রতি হুমকি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

অনুচ্ছেদ-৯ : কোনো এক পক্ষের বিরুদ্ধে তৃতীয়পক্ষ সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হলে চুক্তি সম্পাদনকারী উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন পক্ষদ্বয়ের প্রত্যেকে এতদুল্লেখিত তৃতীয়পক্ষকে যে কোনো প্রকার সাহায্যদানে বিরত থাকবে। এতদ্ব্যতীত যে কোনো পক্ষ আক্রান্ত হলে অথবা আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে সেই আশঙ্কা দূরীভূত এবং নিজের দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে যথাযথ সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উভয়পক্ষ জরুরি ভিত্তিতে আলাপ-আলোচনায় মিলিত হবে।

অনুচ্ছেদ-১০ : চুক্তি সম্পাদনকারী উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন উভয়পক্ষ নিষ্ঠার সাথে ঘোষণা করছে যে, এই চুক্তির সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ ও অহিতকর হতে পারে এমন কোনো গোপন বা প্রকাশ্য এক বা একাধিক রাষ্ট্রের সঙ্গে উভয়ের কেউই কোনো প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হবে না।

অনুচ্ছেদ-১২ : এই চুক্তির কোনো এক বা একাধিক অনুচ্ছেদের বাস্তব অর্থ নিয়ে চুক্তি সম্পাদনকারী উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন পক্ষদ্বয়ের মধ্যে কোনো মতপার্থক্য দেখা দিলে তা পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সমঝোতার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে নিষ্পত্তি করতে হবে।

এই চুক্তি ১৯৭২ সালের ১৯ মার্চ ঢাকায় সম্পাদিত ও স্বাক্ষরিত হলো।

ইন্দিরা গান্ধী
প্রধানমন্ত্রী
প্রজাতন্ত্রী ভারতের পক্ষে

শেখ মুজিবুর রহমান
প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পক্ষে

পরিশিষ্ট-৪

কারাগারে অনশনরত শেখ মুজিবুর রহমান সম্বন্ধে প্রাদেশিক পরিষদে আনোয়ারা খাতুনের মুলতবি প্রস্তাব, ১৯৫২

১৯৫২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি তদানীন্তন বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য মিসেস আনোয়ারা খাতুন কারাগারে অনশনরত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সম্পর্কে যে মুলতবি প্রস্তাব আনয়ন করেন নিচে তার হুবহু বিবরণ :

The Assembly met in Legislative Chamber, Legislative Building, Ramna, Dhaka, on Wednesday the 20th February 1952 at 3 PM

Speaker : Abdul Karim

Adjournment Motion

Mrs. Anwara Khatun : I beg to move that the Assembly do adjourn its business of today to discuss indefinite matter of urgent public importance and of recent occurrence, namely the situation created by the failure of the govt. of East Bengal to prevent hunger strike resorted to by Mr. Sheikh Mujibur Rahman, a Security Prisoner from 16th February 1952.

Sir, Mr. Mujibur Rahman is a very prominent political worker and as such people of this province are very anxious to know about his well-being. He resorted to hunger strike of and from 16th February 1952 and govt. failed to stop the same. This failure of govt. is sought to be discussed in the motion moved.

The hon'ble Mr. Nurul Amin : Sir, I have no information about the alleged hunger-strike that has been made the subject matter of this adjournment motion. If Mr. Mujibur Rahman has taken such a decision, I am sorry for it, because he must have been ill advised to do that firstly, it will neither do good to Mr. Mujibur Rahman nor to his supporters outside. Secondly, Sir, this is not a matter of an

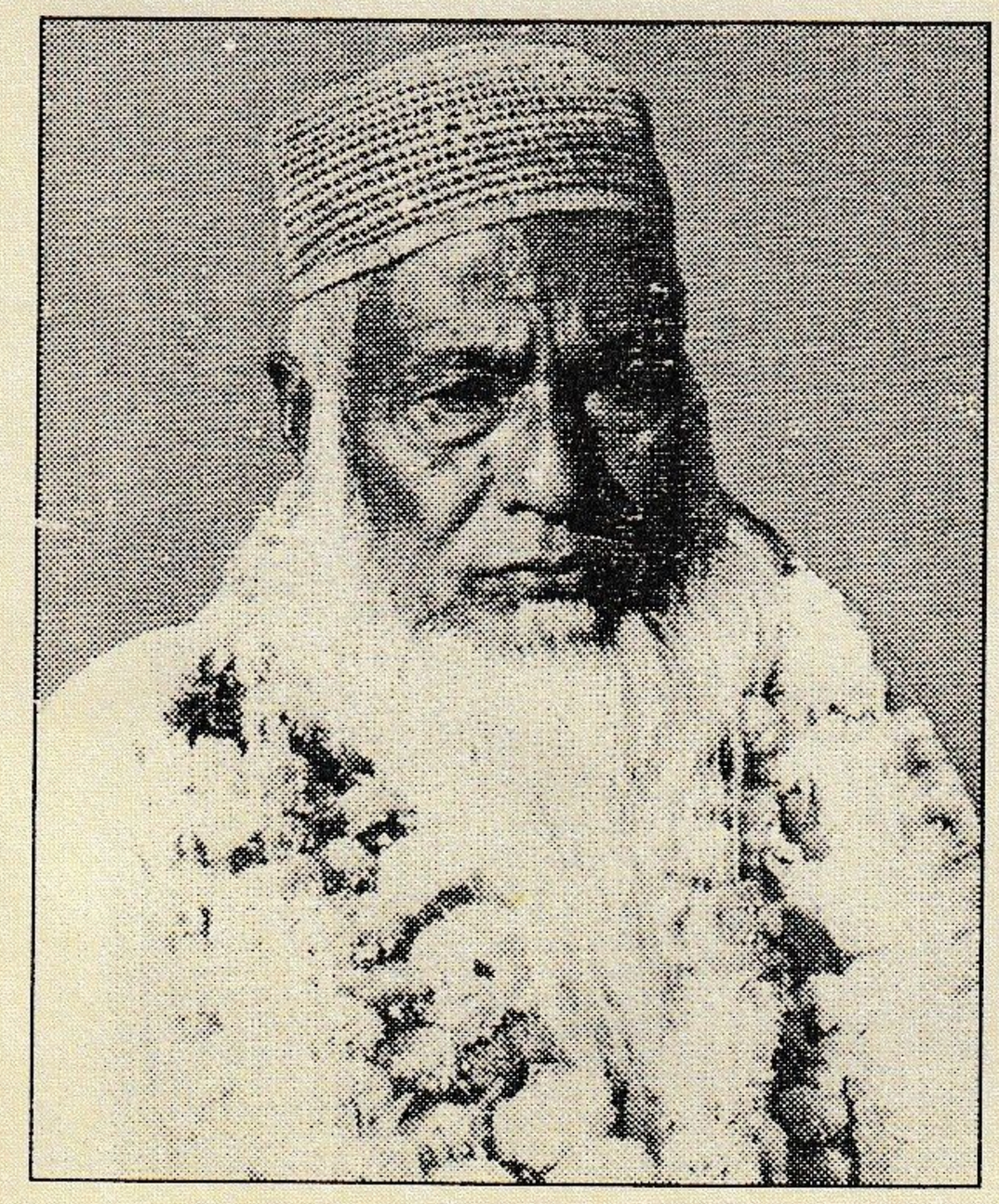
adjournment motion. This is a self-imposed infliction for which nobody is responsible. Supposing one is going to commit suicide and somebody else comes before the House and says that as he is going to commit suicide the House should be adjourned. That, as she said cannot from the subject matter of an adjournment motion becouse neither government nor anybody else is responsible for this decision on the part of this gentleman. So far as the case of his confinement as Security Prisoner is concerned, I am prepared to give reply to a short notice question, if anybody puts it in the House, so that, the House may know the correct position. With these words, I oppose the adjournment motion.

[সূত্র : East Bengal Legislative Assembly Proceedings, 1952]

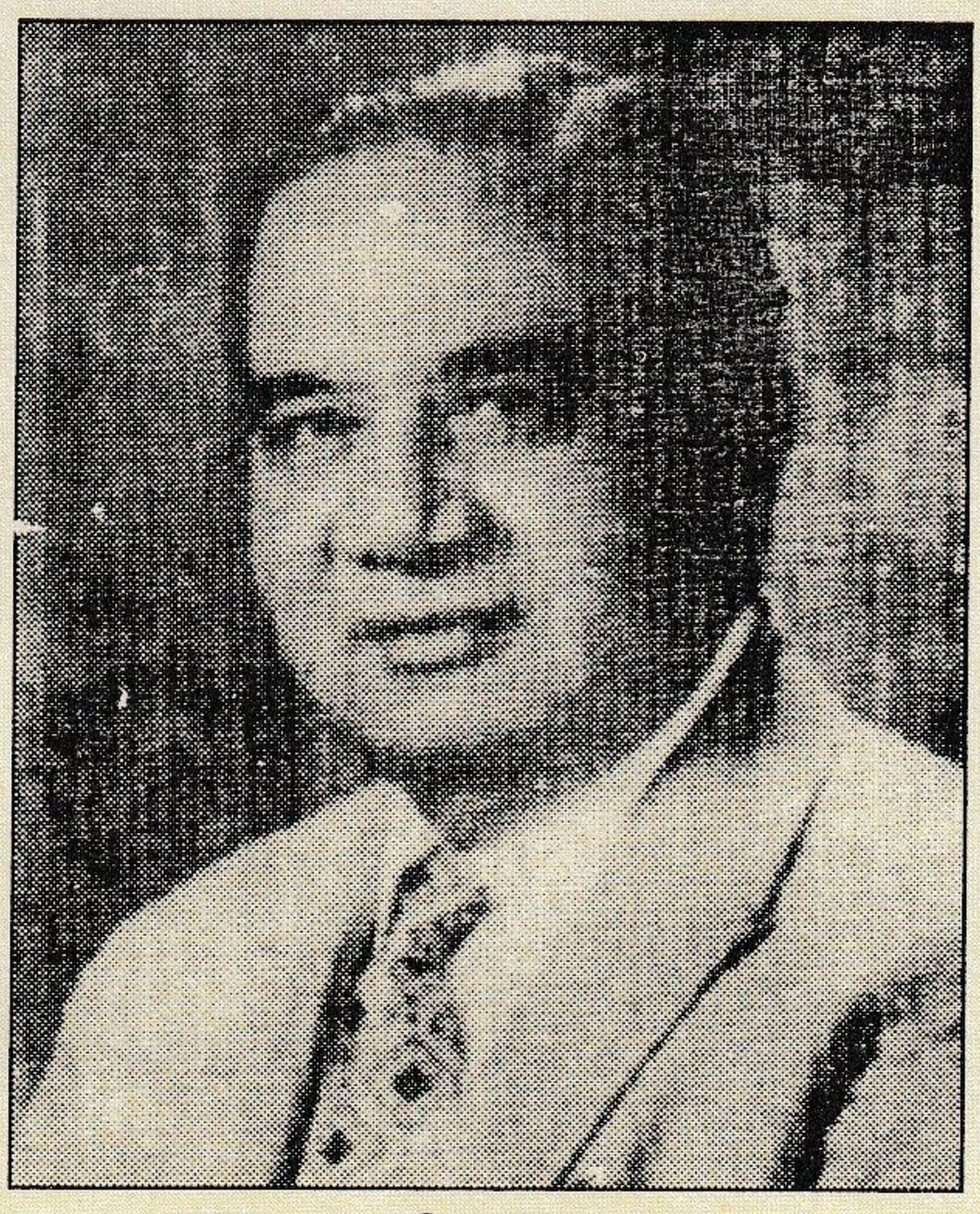
আলোকচিত্র



শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক



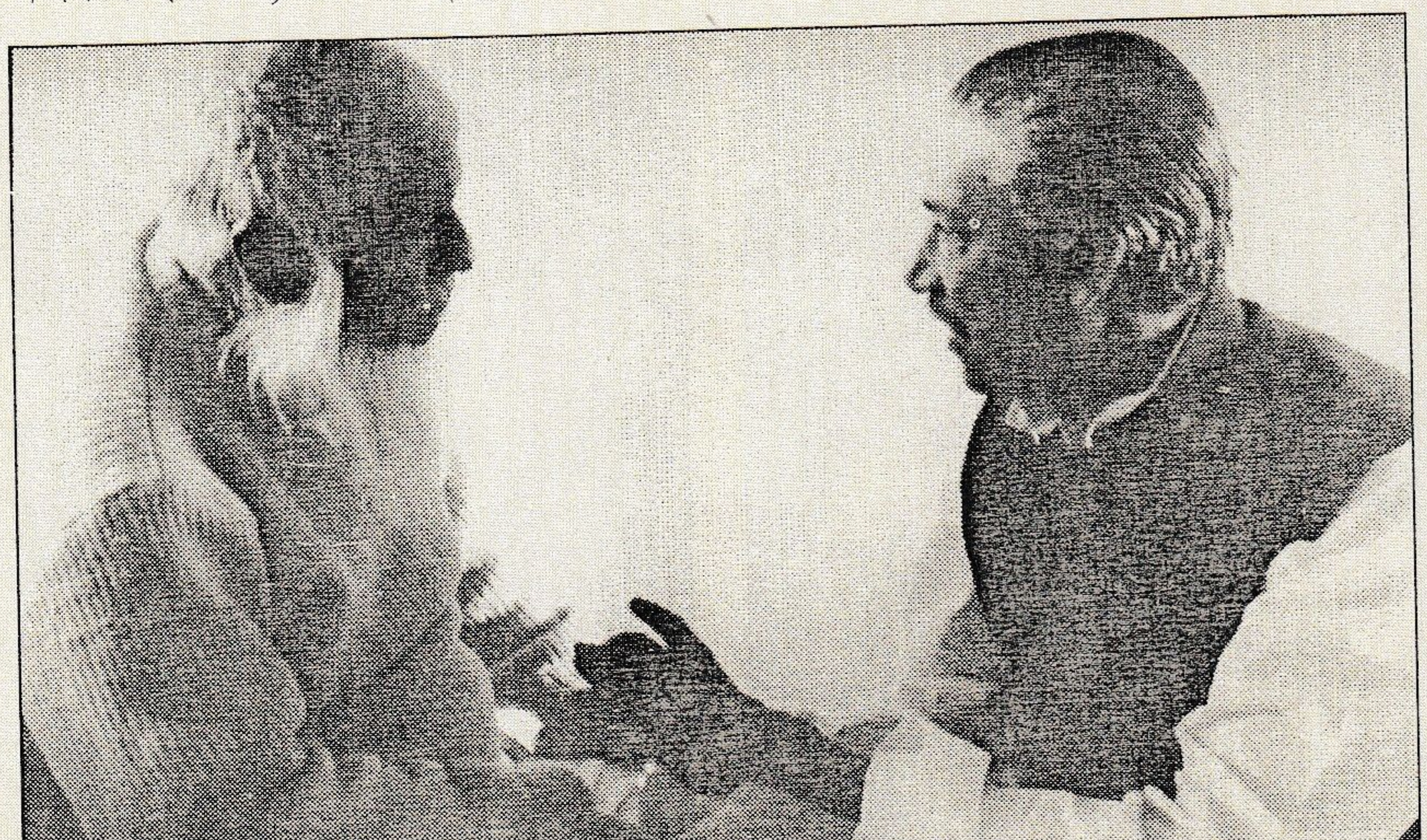
মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী



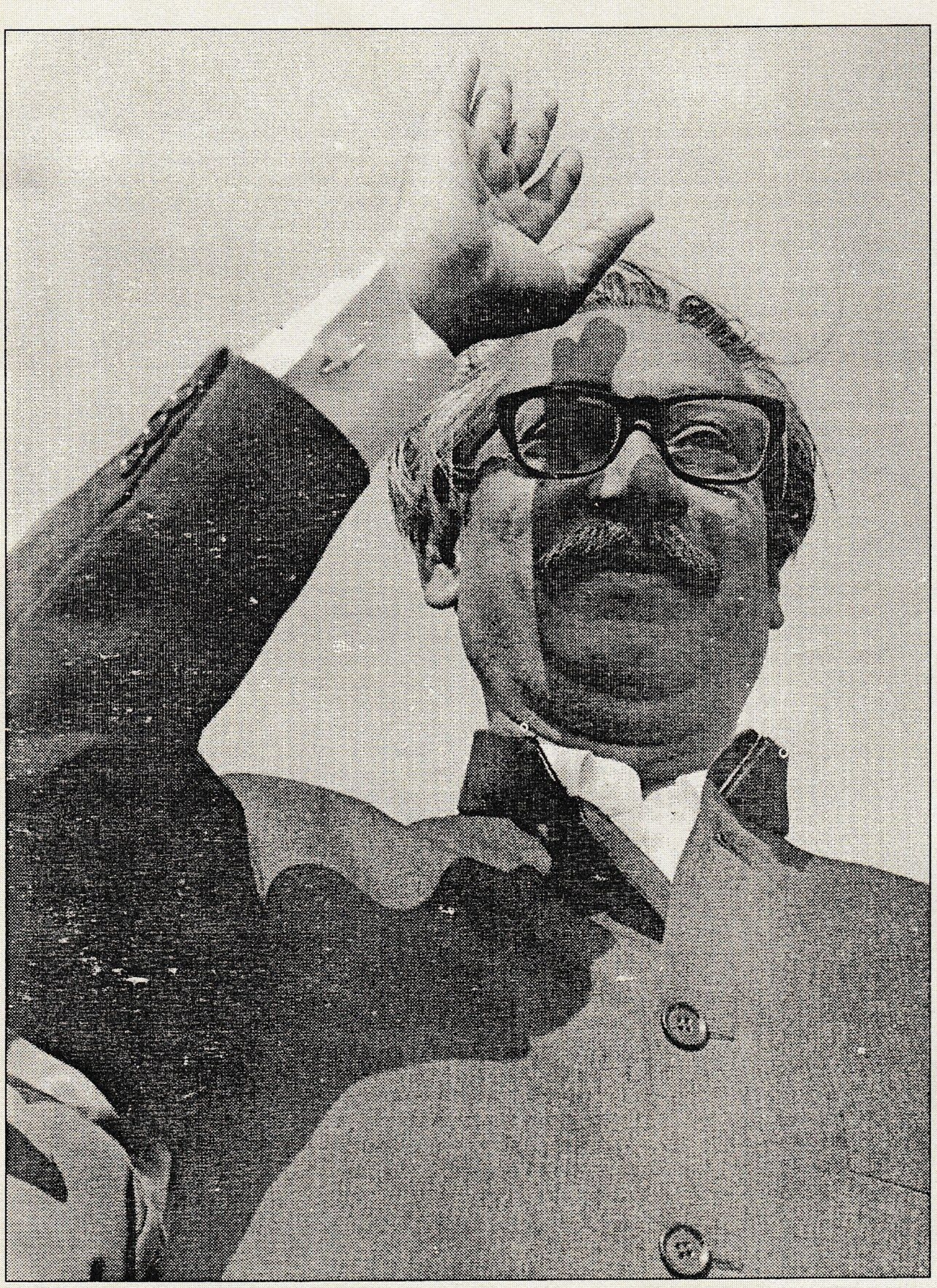
হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী



স্বাধীনতার মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, এম মনসুর আলী, এএইচএম কামারুজ্জামান ও তাজউদ্দীন আহমদ



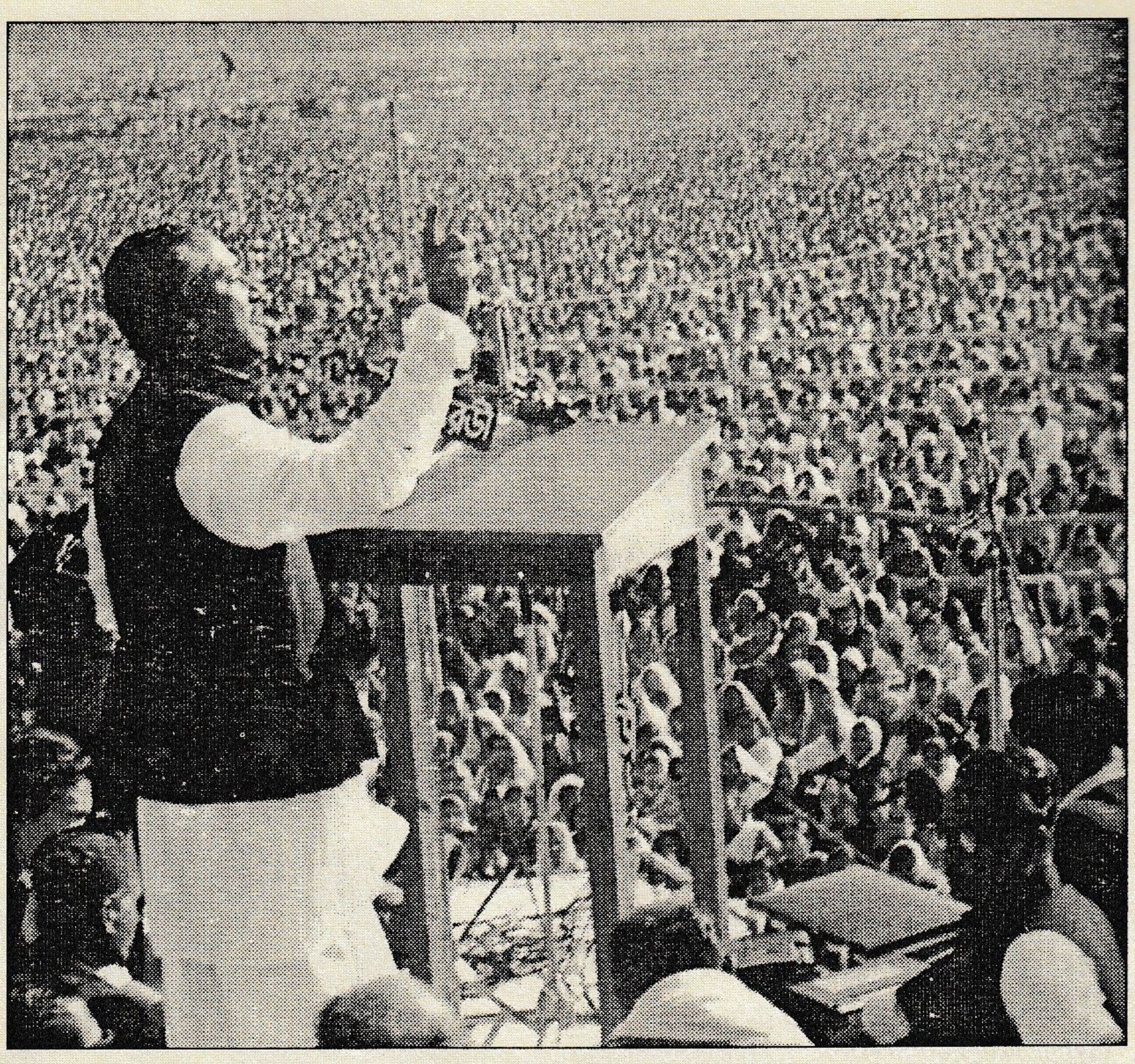
মওলানা ভাসানীর সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, ১৯৬৯



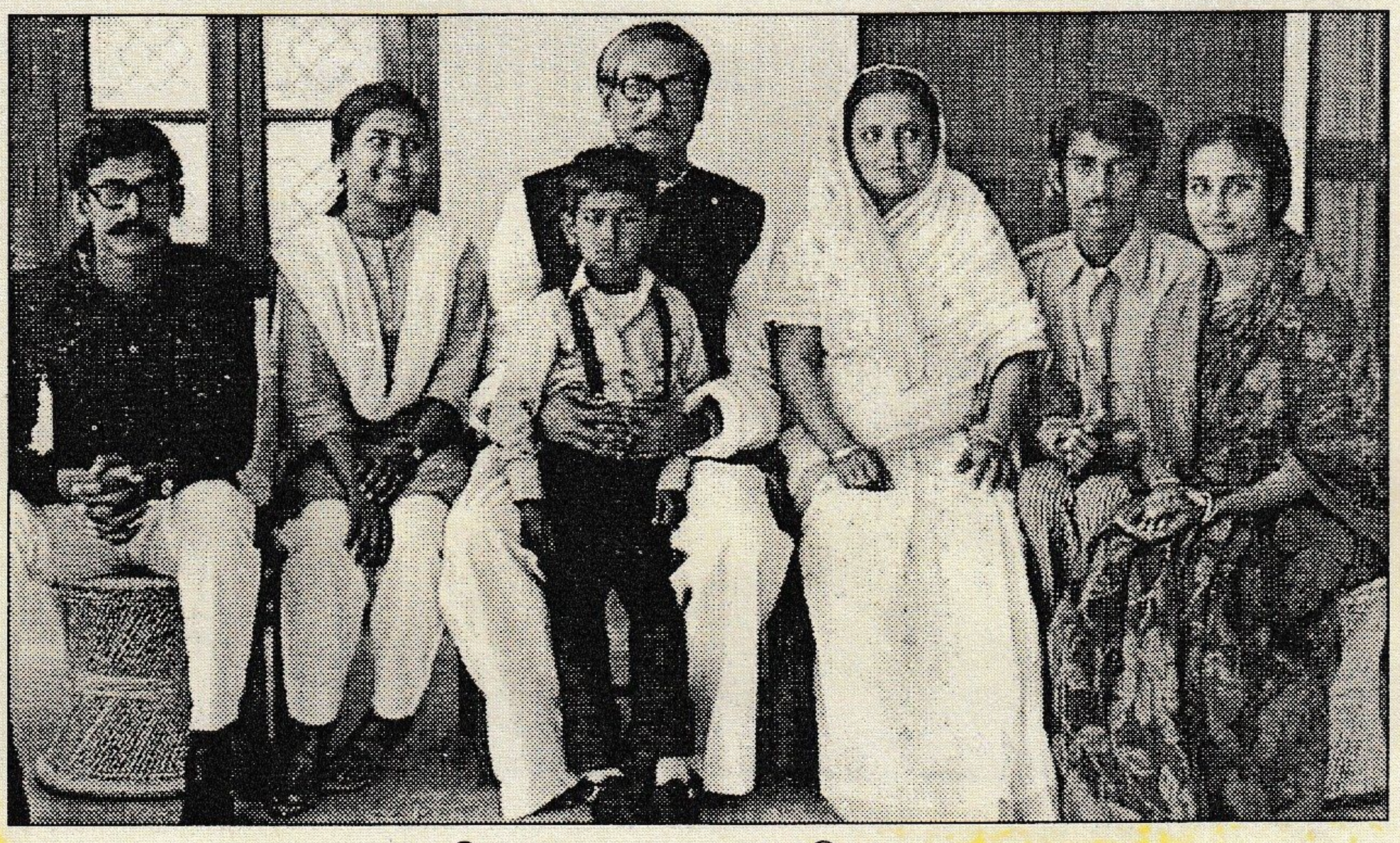
স্বাধীনতার মহানায়ক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



বাবা শেখ লুৎফর রহমান এবং মা সায়রা বেগমের সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



৭ মার্চে রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ



সপরিবারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



১৫ আগস্ট ১৯৭৫। ৩২ নম্বর ধানমন্ডির বাসভবনের সিঁড়িতে এভাবেই পড়ে ছিল
হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিথর দেহ

গ্রন্থপুঞ্জি

১. এম আনিসুজ্জামান 'স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু' কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা ফেব্রুয়ারি ১৯৯১

২. এমআর আখতার মুকুল 'মুজিবের রক্ত লাল' দ্বিতীয় সংস্করণ, সাগর পাবলিশার্স, ঢাকা ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯

৩. এমআর আখতার মুকুল 'মহাপুরুষ' সাগর পাবলিশার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯১

৪. এমএ ওয়াজেদ আলী 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ' দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা চতুর্থ সংস্করণ এপ্রিল ২০০০

৫. কৃত্তিবাস ওঝা 'আমি মুজিব বলছি' ঢাকা ১৯৭২

৬. ড. জাহিদ হোসেন প্রধান সম্পাদিত 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ইতিহাস' ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ ডিসেম্বর ২০০৫

৭. শহীদ আশরাফ সম্পাদিত 'শেখ মুজিব ও বাংলাদেশ' বিউটি বুক হাউজ, ঢাকা ১৯৭১

৮. সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান' ভাস্কর প্রকাশনী, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০১

৯. ফয়েজ আহমদ 'আগরতলা মামলা; শেখ মুজিব ও বাংলার বিদ্রোহ' সাহিত্য প্রকাশ ঢাকা ১৯৯৪

১০. এমআর আখতার মুকুল 'আমি বিজয় দেখেছি' সাগর পাবলিশার্স, ঢাকা ১৯৮৫

১১. আবুল ফজলে 'শেখ মুজিব : তাঁকে যেমন দেখেছি' ঢাকা ১৯৭৮

১২. মযহারুল ইসলাম 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব' আগামী প্রকাশনী, ঢাকা চতুর্থ সংস্করণ জুলাই ২০০২

১৩. মযহারুল ইসলাম 'কিশোর-নবীনদের বঙ্গবন্ধু' সংবর্ত প্রকাশন, ঢাকা ফেব্রুয়ারি ১৯৯২

১৪. মোহাম্মদ শাহজাহান সম্পাদিত 'মুজিব মানেই মুক্তি' বন্ধু সংহতি পরিষদ, ঢাকা ১৭ এপ্রিল ১৯৮৪

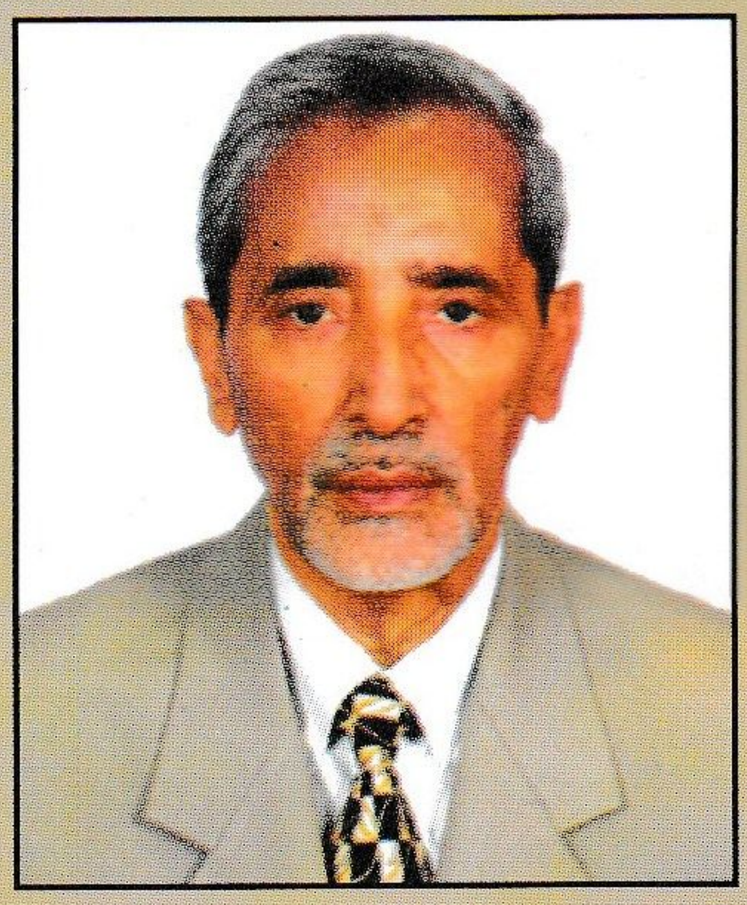
১৫. শেখ হাসিনা 'শেখ মুজিব আমার পিতা' সাহিত্যম, কলকাতা ১৯৯৯

১৬. বুলবুল মহলানবীশ 'মুক্তিযুদ্ধের পূর্ব প্রস্তুতি ও স্মৃতি '৭১' ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা বইমেলা ২০০৬

১৭. শাহজাহান বিন মোহাম্মদ ও কাজী লতিফুর রহমান 'শেখ মুজিব ও বাংলাদেশ' প্রভিন্সিয়াল বুক ডিপো লিমিটেড, ঢাকা ১৯৭৩
১৮. এএইচ খান 'ফাদার অব দা নেশন' র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা ১০০৭
১৯. আবুল মনসুর আহমদ 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা
২০. মোনায়েম সরকার সম্পাদিত 'বাঙালির কণ্ঠ' বঙ্গবন্ধু পরিষদ, ঢাকা ১৭ মার্চ ১৯৯৮
২১. আনু মাহমুদ 'বঙ্গবন্ধু : শান্তি গণতন্ত্র উন্নয়ন' পরমা, জানুয়ারি ১৯৯৯
২২. এমআর আখতার মুকুল 'বাহান্নর জবানবন্দি' সাগর পাবলিশার্স, ফাল্গুন ১৩৯২ বাংলা
২৩. আফম সাইদ 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা ফ্যাক্টস এন্ড উইটনেস' উৎস প্রকাশন, ঢাকা।

পত্র-পত্রিকা

দৈনিক বাংলা, দৈনিক সংবাদ, দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক বাংলার বাণী, দৈনিক আজাদ, সাপ্তাহিক জয়বাংলা, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, সাপ্তাহিক দেশ, সাপ্তাহিক পূর্ব দেশ।



১৯৩৫ সালের ১৫ অক্টোবর ভারতের মুর্শিদাবাদ জেলার বাবলা গ্রামে ভূ-পর্যটক ও ব্যবসায়ী এম আর এ তাহা'র জন্ম। প্রয়াত পিতা-মাতা আবদুল কাদের ও খায়রুন্নেছার পাঁচ সন্তানের মধ্যে তিনি চতুর্থ।

বিচিত্র ও বর্ণাঢ্য অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ এম আর এ তাহা'র কর্মময় জীবন। বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করার পর ১৯৫৯ সালে শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন পশ্চিমবঙ্গের তালিবপুর হাইস্কুলে। ওই স্কুল থেকেই ১৯৫৪ সালে তিনি ম্যাট্রিক পাশ করেন।

১৯৬০ সালে চলে আসেন ঢাকায় এবং আগামসিহ্ লেনে অবস্থিত সিটি ল' কলেজে আইন শাস্ত্র পড়ার জন্য ভর্তি হন। পড়া শেষ না করেই ১৯৬১ সালে হাবিব ব্যাংকে যোগদান করেন। ১৯৭০ সালে শুরু করেন নিজস্ব ব্যবসা। ব্যবসা তাঁর পেশা হলেও নেশার বিষয়গুলো বহু বিস্তৃত। মানুষ ও প্রকৃতিকে ভালোবাসার অপ্রতিরোধ্য টানে বেরিয়ে পড়েন যখন-তখন আর ঘুরে বেড়ান দেশ-বিদেশে। সবকটি মহাদেশের প্রায় পঁয়তাল্লিশটি দেশ তিনি ভ্রমণ করেছেন। দেখেছেন মানুষের জীবনযাত্রা, তাদের আচার আচরণ, শুনছেন তাদের আনন্দ-বেদনা, উত্থান-পতনের ইতিহাস আর সেই আলোকেই লিখেছেন বেশ কিছু ভ্রমণ কাহিনী। কলেজ জীবনে কবিতা লেখা প্রতিযোগিতায় পেয়েছেন প্রথম পুরষ্কার। বঙ্গবন্ধু তাঁর প্রিয় মানুষদের মধ্যে একজন। তাই বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখার ইচ্ছা অনেকদিনের। 'স্বাধীনতার মহানায়ক' তাঁরই ফসল।

তিনি মাল্টিপল ট্র্যাভেল ক্লাব, বাংলাদেশ বুক ক্লাব, বাংলা একাডেমী, সি.আর.পি. এবং প্রবীণ-হিতৈষী সংঘসহ বহু প্রতিষ্ঠানের সদস্য। বর্তমানে নেচার কনজারভেশন কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন।



একটি ইত্যাদি প্রকাশনা

ISBN 984851920-3

স্বাধীনতার মহানায়ক
এম আর এ তাহা
প্রচ্ছদ : নিয়াজ চৌধুরী তুলি